# সপ্তম ভাগের সূচীপত্র।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

## রাজকবি জয়নারায়ণ।

আজ যে গুপ্ত কবির লুপ্ত গৌরবের কথা আমি পরিষদে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহার সংবাদ আমাদ্বারাই যে আজ জনসমাজে প্রথম প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নহে। বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব ইতিহাস "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ বসু মহাশয়ই আমাদিগকে এই কবির কথা প্রথম শুনাইয়াছেন, সে জন্য তিনিই ধন্যবাদার্হ। দীনেশ বাবু তাঁহার অতুল্য গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে ২৯৪ পৃষ্ঠায় আমাদিগকে এই রাজকবির পরিচয় প্রথম দিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ে দীনেশ বাবু এই কবির রচিত "কাশীখণ্ড" মহাকাব্যের অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়া কবির কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং উক্ত কাব্যে কবির যতটুকু আত্মপরিচয় পাইয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সেই পরিচয়াংশটুকু আমিও উদ্ধৃত করিতেছি,—

কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর।
কাশীগুণগান হেতু ভাবি নিরন্তর॥
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লেখ।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখ।
সত্র শত চৌদ্দ শক * পৌষ মাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব রায়াগত কাশী॥
তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥

ইহা হইতে কবি কোথায় কবে, কি ভাবে, কাহার সাহায্যে "কাশীখণ্ড ভাষা করি" লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা জানা গেল; কিন্তু কে কবি তাহা জানা গেল না। তৎপরে আছে,—

শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ।
[illegible]া শুনেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ॥
[illegible]ুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
তাহারে করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥
এক[illegible]চ জিল্ লাচাড়ি হৈল যবে।
বিদ্যাবাগীশের কাশীপ্রাপ্তি হৈল তবে॥
ভাদ্র মাসে মুখুর্য্যা গেলেন নিজ বাটী।
বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী॥
পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়।
বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায়॥
পঞ্চান্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা।
বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত করিয়া॥
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ।
এই দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন॥

* ১১৯৯ সাল ; ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ।

মূৰ্ত্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে; কাল গতে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইবে; তখন ম্যাণ্ডেভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুশীনগর ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্র খানা এক স্থানে রক্ষা করার উপযুক্ত হইবে। * * * কাশীখণ্ডের পুথি প্রেমানন্দ দাসের হস্তের লেখা। এই প্রেমানন্দ দাস "মনোশিক্ষা" নামক বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ রচয়িতা। পুথিখানি খৃষ্টীয় ১৮০৯ অব্দের। উহাতে প্রেমানন্দের স্বরচিত বৈষ্ণবী মাধুর্য্য মাখা দুর্গাবন্দনার দুটি গান আছে।"

দীনেশ বাবুর প্রবন্ধ বিবরণ হইতে রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা উদ্ধৃত হইল। আমি ইঁহার কাশীখণ্ডের পুঁথি পাই নাই, সুতরাং বলিতে পারি না তাহার আর কোন অংশে ইনি আত্মপরিচায়ক আর কোন কথার উল্লেখ করিয়াছেন কি না। কিন্তু সম্প্রতি এই কবি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে; সেই সমস্ত বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণকে উপহার দিবার জন্যই আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রাজকবি জয়নারায়ণ প্রণীত "শ্রীকরুণানিধানবিলাস" নামে আর একখানি গীতময় কাব্য আমি পাইয়াছি। গত ১৩০[illegible] সালে যখন পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি[illegible] সমর্থকোষ কার্য্যালয়ে "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর" একখানি প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ আনিতে[illegible] তখন শোভাবাজারের রাজবংশীয় রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণের দৌহিত্র, আমার বাল্যবন্ধু, বি[illegible] সাহা শ্রীললিতমোহন [illegible] সমর্থকোষসম্পাদক আমাকে একখানি জীর্ণ শীর্ণ গলিত খণ্ডিত পুস্তক প্রদান করেন। এই পুস্তক খানির আদ্যন্ত কিছুই ছিল না। ১৩০৩ সালের মাঘ মাসে "মালা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকার এক সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতেই আমি এই প্রাচীন কাব্যখানির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করি। তখন ইহার আদ্যন্ত না পাইয়া ইহার আভ্যন্তরিক প্রমাণবলে ও কল্পনাসাহায্যে ইহার নাম "শ্রীকরুণা নিধান লীলা গান" বলিয়া উল্লেখ করি এবং এক স্থলে বৈষ্ণবোচিত বিনয়সূচক "দাস" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া কবির নামও "জয়নারায়ণ দাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। "মালা" এক সংখ্যার পর আর বাহির না হওয়ায় এই পুস্তকের বিবরণ "[illegible] পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি এবং তাহাতেও কিয়দংশ প্রকাশি[illegible] হয়। পরে হঠাৎ একদিন মেটকাফ হলে গিয়া পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তকগুলি নাড়িতে নাড়িতে ইহার একখানি পূর্ণাবয়ব পুস্তক প্রাপ্ত হই। সুখের ও সৌভাগ্যের কথা যে মেট্‌কাফ হলে দুই খানি পুস্তক আছে। মেটকাফ হলের পুস্তক হইতেই অদ্যকার প্রবন্ধ সংগঠিত।

মেটকাফ হলে যে দুইখানি পুস্তক আছে, তাহা পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ছিল। [illegible]ই কলেজের মোহর উহাতে আছে; তদ্ভিন্ন এক খানি টিকিট লাগান আছে, তাহাতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ লেখা আছে; সুতরাং ইহা যে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত, তাহাও জানা যাইতেছে। পুস্তক কোথায়, কবে মুদ্রিত, তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমা[illegible] আলোচ্য রাজা জয়নারায়ণ খিদিরপুর ভূকৈলাস রাজবংশের প্রথম রাজা—মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর। ইঁহাদের বংশে পাঠক উপাধি ছিল এবং যদুনাথের সময় হইতে ইঁহারা "বল্লালীয় কাম" পরিত্যাগ করিয়া ভঙ্গ হন। প্রথম ভঙ্গ কুলীন যদুনাথ পাঠক হইতে কবি মহারাজ অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইঁহার আত্মপরিচয় হইতে এস্থলে বংশলতাটি অঙ্কিত করা গেল।

সুধানিধি (কান্যকুব্জ হইতে গৌড়াগত)
|
ছান্দড় (রাঢ়ীয় বংশ প্রতিষ্ঠাতা)
|
শ্রীধর
|
সুরভি
|
সাগর
|
যশোপতি
|
বিশ্বামিত্র
|
ত্রিতামিত্র
|
শরণি
|
পিঙ্গল
|
[illegible] (বল্লালী কুলীন) (১)
|
[illegible] [illegible] উদ্ভব)
|
[illegible]
|
[illegible] (অক্ষয়াচার)
|
[illegible] (পুষ্পবতি)
|
[illegible]
|
বাণেশ্বর
|
বিশ্বনাথ (২)
|
কংসারি (৩)
|
শ্রীধর
|
যদুনাথ পাঠক (৪)
|
গোপীকান্ত
|
রামকৃষ্ণ

---

(১) কবি ইঁহাকেই [illegible] মেলভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মেলবন্ধন ইঁহার অনেক পরে হয়।

(২) কবির "উদয় বাণেশ্বর বিশ্বনাথ যশ" এই চরণের "যশ" শব্দটি পূর্ব্ব চরণের "পশ" শব্দের মেলকপ্রতির জন্য "যশস্বী" অর্থে ব্যবহৃত; [illegible] নাম নহে।

(৩) সম্ভবতঃ এই কংসারিই প্রথম সর্ব্বানন্দী মেল মধ্যে গণ্য হন।

(৪) ইনি অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক ছিলেন কিন্তু "বল্লালীয় কাম" ত্যাগ করিয়া [illegible] হন।

উপরে যে বংশলতা দেওয়া গেল, তাহার সমস্ত নাম কবির কাব্যে নাই, থাকিতেও পারে না। ইতিপূর্ব্বে কবির কাব্য হইতে যতটুকু উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহার অধিক কোন বিষয় তাঁহার নিজ কথা হইতে জানিবার উপায় নাই।

কবির নিজ কথা হইতে আমরা যখন জানিতে পারিলাম যে তিনি খিদিরপুরবাসী গোকুলচন্দ্র ঘোষালের ভ্রাতুষ্পুত্র, তখন তাঁহার জীবনচরিত সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন নহে জানিয়া আমি ভূকৈলাস রাজবাটীতে গিয়াছিলাম। কুমার সত্যশ্রী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের প্রসাদে আমি সে বিষয়ে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি। কবির পুত্র ৺ রাজা কালীশঙ্কর

(৫) ইনি বাকুদাড়া গ্রামে বাস করেন। ইহার পূর্ব্বে এই বংশের বাসস্থান কোথা ছিল, জানা যায় না।

(৬) ইনি ধনী হইয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন এবং পৈতৃক "পাঠক" উপাধি ত্যাগ করেন।

(৭) গবর্ণর বেরেলেষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

ঘোষাল বাহাদুর এক বৃহৎ তাম্রফলকে কবির জীবনী ইংরাজী এবং পারস্য ভাষায় খোদাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই তাম্রফলক কাশীর জয়নারায়ণ কালেজের গাত্রে সংলগ্ন করাইয়া দিবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল আরও এক উপায়ে কবি মহারাজকে চির কালের জন্য সাধারণের সম্মুখে যেন বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছেন। রাজা কালীশঙ্কর তাঁহার পিতার এক মৃণ্ময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া ভূকৈলাসের প্রাসাদের অন্তর্গত শিবগঙ্গা পুষ্করিণীর দক্ষিণতীরে এক বৃহন্মন্দিরমধ্যে উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই মূর্ত্তি অবশ্য ভাস্কর শিল্পের সূক্ষ্ম নিপুণতার পরাকাষ্ঠা না হইলেও ইহা হইতে সেই কবি মহারাজের সৌম্য শান্ত আকৃতির সাড়ে চৌদ্দ আনা বুঝা যায়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মহারাজের প্রতিমার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, স্কন্ধে কোচান উড়ানীমাত্র, দক্ষিণ কর উপবীত ধরিয়া জপে এবং বাম কর জপসংখ্যা রক্ষণে নিযুক্ত, দৃষ্টি সম্মুখস্থ ইষ্টদেবী পতিতপাবনীর মন্দিরমুখে নিবদ্ধ, মস্তক মুণ্ডিত, উপবেশন পদ্মাসনে, দেহের চর্ম্ম লোল নহে, গাত্রবর্ণ পীতাভ। বেদীর গাত্রে বাৎস্য গোত্রীয় কান্যকুব্জাগত সুধানিধি হইতে কবি মহারাজের সপ্ত পৌত্রের নাম সংযুক্ত বংশপরিচায়ক কয়েকটি সংস্কৃত স্বর্ণাক্ষর মর্ম্মর প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্ত্তিও জয়নারায়ণ কালেজের জন্য নির্ম্মিত হয়, কিন্তু কবির পৌত্র রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর উহা কাশীতে না পাঠাইয়া বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজের একখানি হস্তিদন্ত ফলকে চিত্রিত চি[illegible]আছে। যদি পরিষৎ ব্যয় বহন করেন, তবে সেই চিত্র হইতে মহারাজের ছবি প্র[illegible]করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহার কাছে সেই ছবি আছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় আমি উপস্থিত সদস্যমণ্ডলীর দর্শনার্থ তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল যে বৃহৎ তাম্রফলকে তাঁহার পিতৃজীবনী উৎকীর্ণ করাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত কুমার বাহাদুরেরা তাহা আমা[illegible] দিয়াছেন। পরিষৎ ইচ্ছা করিলে ইহার অনুলিপি বা প্রতিকৃতি ছাপাইতে পারেন[illegible] অনুমতিও আমি আনিয়াছি। *

তাম্র ফলকখানি দীর্ঘ ২ হাত ১০ অঙ্গুলি, প্রস্থ ১ হাত ১৩ অঙ্গুলি। চারিদি[illegible] অঙ্গুলি কিনারা বাদ দিয়া একটি [illegible] রেখার চতুরস্র মধ্যে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ফলকের উর্দ্ধাংশে ইংরাজীতে ও [illegible]াংশে ফারসীতে লিপি খোদিত হইয়াছে। ইংরাজীতে প্রথম পংক্তিতে বৃহদক্ষরে প্রস্তাবের নাম খোদিত আছে; তৎপরে ২৪১ পংক্তি মূল বিষয় খোদিত আছে। ফারসীতে প্রস্তাবের নাম ব্যতীত সম্পূর্ণ এগার পংক্তি আছে। ফলক খানি প্রায় চারিসুতা মোটা হইবে এবং উহার এক কোণে ইংরাজীতে "B. C. C." এই তিনটি অক্ষর ও "80 oz" (৮০ আউন্স) ও[illegible] লিখিত আছে। এই তাম্রফলকে ইংরাজীতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীটুকু উৎকীর্ণ আছে,—

* [illegible]ক্ত তাম্রফলকখানি সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল।

মিঃ ক্যামাক যখন সমস্ত জেলা জরীপ করাইয়া রাজস্বের আয় বৃদ্ধি করেন, তখনও মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কালেক্টর সাহেবের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে মিঃ ক্যাম্যাক বিশেষ সন্তুষ্ট হন। ১২০৩ সালে মিঃ টমাস প্যাট্ল্ যখন মুরশিদাবাদের তদানীন্তন নবাব বাবরজঙ্গ বাহাদুরের সহিত বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখনও মহারাজ বাহাদুর মধ্যস্থ হইয়া সুশৃঙ্খলে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে মহারাজ বাহাদুর কোম্পানীর পক্ষে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কোনরূপ বেতন বা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। গবর্মেণ্টের নিকট প্রতিপত্তি ও স্বদেশীয় উপকারার্থ তিনি ইচ্ছা করিয়া বিনা স্বার্থে ঐ সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি নিজে যথেষ্ট ধনার্জ্জন করিতেন। সেই আয় হইতে তিনি খিদিরপুরে ও অন্যান্য স্থানে অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্য ও জমীদারীর আয়ে তিনি সুখে স্বাধীন ভাবে থাকিতেন। তাঁহার আয় যথেষ্ট ছিল। তাহা হইতে তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। নানা স্থানে নানা দেবতা ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তি আদি দান করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে গরীব প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। ১১৮৭ সালে কালীঘাটের কালীদেবীর চারিখানি হাত রৌপ্যে গড়াইয়া দেন। খিদিরপুরের নিকট নিম্নভূমি ভরাট করিয়া তথায় এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এই স্থানই সাধারণতঃ ভূকৈলাস নামে খ্যাত। উক্ত প্রাসাদের নানা স্থানে কমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও রাজেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, সূর্য্য, রামসীতা, হনুমান, যোগ-ভৈরব ও ধাতুনির্ম্মিত পতিতপাবনী নামে সিংহবাহিনী দুর্গা প্রতিষ্ঠিত করেন; এতদ্ভিন্ন ঐ প্রাসাদের মধ্যেই 'শিবগঙ্গা' নামে এক বৃহৎ পুষ্করিণীও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১২০০ সালে মহারাজ জয়নারায়ণ কাশীতে "করুণানিধান" নামে শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করেন। কাশীতে সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ অভাব দেখিয়া মহারাজ এক চুনার পাথর দিয়া চারিতল বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১২২৪ সালে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ীতে সকল শ্রেণীর বালকদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসী, ও ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে খৃষ্টিয়ান এবং দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং ছাত্রসংখ্যা দুই শত হয়। এই দুই শত ছাত্রের ও শিক্ষকগণের থাকিবার আহারাদির ও বেতনের জন্য তিনি চিরদিনের জন্য কিছু মাসিক বৃত্তিও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাকুণ্ডের নিকট তিনি এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ধাতুময় গুরুপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই বাটীর সংলগ্ন গুরুকুণ্ড নামক পুষ্করিণীও তাঁহারই কীর্ত্তি। কাশীবাস কালে তিনি যে ভাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির রচনায় কাল কাটাইতেন, তদুল্লেখ বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন নহে। ১ম শঙ্করী-সঙ্গীত (সংস্কৃত শ্লোকে একামকাননবিহারিণী ভগবতীর লীলা বর্ণনা), ২য় ব্রাহ্মণার্চ্চন-

চন্দ্রিকা (বেদ পুরাণ তন্ত্রশাস্ত্রাদি হইতে ব্রাহ্মণ অর্চনার বিধিব্যবস্থা), ৩য় জয়নারায়ণ-কল্প-দ্রুম (সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণলীলা), ৪র্থ কাশীখণ্ড অনুবাদ (ভাষা বাঙ্গালা পদ্যে ও বৃন্দাবনী ভাষায় স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ), ৫ম করুণানিধানবিলাস (বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা)। জয়নারায়ণ কাশীতে বহুকাল বাসের পর, মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে কাশীবাসী সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে এক এক পত্র লিখিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করেন। কাশীর মণিকর্ণিকা তীর্থে ১২২৮ সালের ২৫ কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন দ্বিপ্রহরে ৬৯ বৎসর বয়সে উপস্থিত বন্ধুবর্গের মধ্যে থাকিয়া মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল একমাত্র পুত্র রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন। তখন তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রও জন্মিয়াছিল। ইঁহাদিগের ভরণপোষণ ও সুখে স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপের জন্ম মহারাজ যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও সকল ব্যক্তিরই মরণ আছে, তথাপি যাঁহারা দয়ালু পরদুঃখকাতর তাঁহাদের বিয়োগে বন্ধুবান্ধবে কাতর হইয়া পড়ে; যাহারা উপকার পাইত সেই সকল গরীব লোকে তাঁহাদের অভাবে বিশেষ কাতর হইয়া থাকে। যত দিন তাঁহার কীর্ত্তিমালা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে লোকে নিঃসহায়কে সাহায্য দান করিবে, ততদিন তাঁহার স্মৃতি জাগরিত থাকিবে এবং সেই জন্যই এই বিবরণ উৎকীর্ণ হইল।"

৺লোকনাথ ঘোষ প্রণীত "ভারতীয় রাজা ও মহারাজগণের বিবরণ" নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে জানা যায়, কন্দর্প ঘোষালের মধ্যম পুত্র গবর্ণর বেরেলেষ্ট্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন এবং জয়নারায়ণ প্রথমে শনদ্বীপের কানুনগো ছিলেন। কবির পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল সিন্ধু যুদ্ধের সময় লর্ড এলেনবরার নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনিই কাশীতে 'অন্ধাবাস' স্থাপন করেন এবং অন্ধদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইঁহারই সময়ে ভূকৈলাসে এক মহাপুরুষ আসেন। শিবপুরের চড়ায় জোয়ারের সময়ে এই মহাপুরুষের সমাধিস্থ দেহ ভাসিতে দেখা যাইত, কিন্তু ভাঁটার সময় কোথায় লুকাইয়া যাইত কেহ জানিত না। কিছু দিন পরে এই দেহ ভূকৈলাসে নীত হয়। ইঁহার দর্শনার্থ বহু যাত্রীর সমাগম হইত। উলঙ্গ মহাপুরুষ বহুকাল সমাধিস্থ পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পানাহারের প্রয়োজন হইত না। অবশেষে নানা উপায়ে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল; তিনি কেবল রাজবংশীয়গণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাঁহার পরিণাম জানা যায় না।

খিদিরপুরে যে স্থানে কন্দর্প ঘোষাল প্রথম বাড়ী করেন, গঙ্গার পুরাতন ডক নির্ম্মাণের সময় তাহার অধিকাংশ তন্মধ্যে পড়ে; সেই বাড়ীতেই দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাস করিতেন। পুরাতন ডক নির্ম্মাণের পরও প্রাচীন বাটীর যে সামান্যাংশ বর্ত্তমান ছিল, তাহাও এবারকার নূতন ডক নির্ম্মাণের সময় অন্তর্হিত হইয়াছে। এক সময় একটি রাস্তা নির্ম্মাণের সময় খিদিরপুরের একস্থান খোঁড়া হইতেছিল; ভূগর্ভ হইতে একটি নাতি বৃহৎ শিবমন্দির ও তন্মধ্যে শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। এই শিবমন্দিরে একখানি

খোদিত লিপি ছিল, তদ্দৃষ্টে জানা গিয়াছিল, যে সেই শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের স্থাপিত। নূতন তক নির্ম্মাণের সময় একস্থানে দুইটি মৃণ্ময় জালা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার একটি অভয় এবং কড়ি ভরা; কিন্তু কড়িগুলি জীর্ণ হইয়া প্রায় মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছিল। ইহাদিগের জমীদারী পরগণে সলিমাবাদের মধ্যে "গুরুধাম" নামে এক গ্রাম আছে; সেখানেও মহারাজ জয়নারায়ণের স্থাপিত দেবতা আছেন; গুরুর নামানুসারে এই গ্রামের নামও "গুরুধাম" রাখিয়াছিলেন। কাশীর গুরুধামে গুরুপাদুকা আছে।

ইহাদের বংশে নামের পূর্ব্বে সত্যশব্দের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ শুনা যায়;— গোকুলচন্দ্র ঘোষালের মৃত্যুর পর যখন সকলে তাঁহাকে দাহন করিতে যান, তখন জয়নারায়ণ ঘোষাল স্বীয় গুরু গোষ্ঠীর এক ব্যক্তির হস্তে ধনাগারের চাবি দিয়া শ্মশানে গমন করেন। সেই ব্রাহ্মণ ইত্যবসরে ধনাগার হইতে কিছু ধন অপহরণ করেন। গুরুভক্ত জয়নারায়ণ পরে এই প্রবঞ্চনার ব্যাপার শুনিয়া স্বীয় বংশধরদিগকে সর্ব্বদা সত্যস্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে সকলের নামের আদিতে "সত্য" শব্দের ব্যবহার আদেশ করেন।

জয়নারায়ণের প্রাসাদে দশভুজা সিংহবাহিনী পতিতপাবনী দেবীর মূলমন্দির, তাহার দক্ষিণে কালভৈরব বা কোতোয়ালের মন্দির, তদ্দক্ষিণে রাজেশ্বর-শিবের মন্দির, তাহার সম্মুখে ময়ূরারূঢ় চতুর্ভুজ ষড়াননের মন্দির, তৎপার্শ্বে মকরারূঢ়া গঙ্গার মন্দির আছে। এই মন্দিরশ্রেণীর পরে পতিতপাবনীর সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির; তৎপরে দুই প্রকাণ্ড মন্দিরে গুরুপ্রসন্নেশ্বর ও কমলেশ্বর দুই বৃহৎ শিব। দক্ষিণে শিবগঙ্গা পুষ্করিণীর তীরে ষড়ানন, রামসীতা, হনুমান, জগন্নাথ ও আর এক দেবতার মূর্ত্তি আছে।

মহারাজ জয়নারায়ণ কবে, কি ভাবে, এই নবাবিষ্কৃত কাব্যখানি রচনা করেন, তাহার বিবরণ তিনি নিজেই এই কাব্য মধ্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন:

প্রস্তাবনা ॥ পদবন্ধন। মঙ্গলরাগ। তাল রূপকুশি।

বহুদেশে বহু শাস্ত্র আছে নিরূপিত।
কেহ কেহ ভিন্ন দেশে বিশেষ বিদিত ॥১
দেশে দেশে লোকাচার ভিন্ন ভিন্ন জাতি।
উপাসনা দেশে দেশে স্থান নানা ভাতি ॥২
পুরাতন শাস্ত্র পুথি স্বদেশ ভাষাতে।
দেব পরাক্রম কথা লিখিত তাহাতে ॥৩
এইরূপ পূর্ব্বাপর ব্যবহার যত।
বিচারিতে সর্ব্ব তত্ত্ব দেশে ভিন্ন মত ॥৪
ইহাতে ভারতখণ্ডে পর্ব্ব অবতার।
বিচা[illegible] শাস্ত্রমতে [illegible] ॥৫
এক মতে দুইরূপে [illegible] নাহি হয়।
অতএব এক কর্ত্তা ভাবনা নিশ্চয় ॥৬
কাশী মধ্যে সংসর্গ যতেক ঘটিল।
গোরণ্ড যবন চীন বহু জাতি ছিল ॥৭
হিন্দু মধ্যে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বহুত।
গণেশের উপাসক মহারাষ্ট্র যত ॥৮
তপনের উপাসক কাশীতে কিঞ্চিৎ।
অঘোরী নানকপন্থী কবীর-শাসিত ॥৯
হিন্দু জাতি ইচ্ছাময় হীন রাজনীতি।
কলিযুগ অল্প ধর্ম্ম জীব পাপান্বিত ॥১০
মুক্তি যুক্তি জ্ঞান ভক্তি এই দুই মার্গ।
সর্ব্বদেশে এই সার স্বর্গ অপবর্গ ॥১১
কর্ত্তার নিশ্চয় বিনা ভক্তি কিবা করে।
কর্ত্তাকে বিশ্বাস বিনা জ্ঞান মনা হরে[illegible]

প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল।
মধ্যম বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল ॥১৩
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল।
মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল ॥১৪
চিন্তামণি কোথা পাব এই আশা করি।
কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিরি ॥১৫
কৃষ্ণ রূপ মনে কিছু আশ্রয় করিল।
ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নকল দেখিল ॥১৬
অমৃত রায়ের দ্বারা তাহা প্রকাশিল।
অবিরত সেই লীলা নয়নে হেরিল ॥১৭
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয়।
সেইমত রচিবারে হইল নিশ্চয় ॥১৮
বাঙ্গালী ভাষাতে লীলা করিতে রচন।
রঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল দুজন ॥১৯
সংস্কৃত পরাকৃত নিজশক্তি মত।
আরম্ভ করিল দোঁহে হয়ে একচিত ॥২০
বারশত বিশ সাল মাস অগ্রহায়ণ।
রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈলা আয়োজন ॥২১
স্বপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত।
সেই ভাষা তরজমা করেন পণ্ডিত ॥ ২২
যার পর নাই আর সে বস্তু কানাই।
নিশ্চয় প্রকাশ ইহা জানিবে সবাই ॥২৩
ভাবের উদয় ধন্দ কভু নাহি কবি।
ভুলিয়ে রহিল মন হেরি কৃষ্ণছবি ॥২৪
অতএব গ্রন্থ দোষ করিবে মার্জ্জনা।
ভকতজনার পায় আমার প্রার্থনা ॥২৫

ইতি পীঠবন্দনা সাঙ্গ।

আমাদের এখানকার সাহিত্যে যাহাকে "মুখবন্ধ" "ভূমিকা" ইত্যাদি বলে, তাহাকেই তখন "পীঠবন্দনা" নামে অভিহিত করা হইত। অনেকে "গৌরচন্দ্রিকা" বা "গৌরচন্দ্রী"কেও ঐরূপ ভূমিকা বা মুখবন্ধের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিশেষ ভুল করিয়া থাকেন। এই "আলোচ্য গ্রন্থেও "গৌরচন্দ্রী" আছে। পীঠবন্দনার পূর্ব্বেই তাহা আছে। গৌরচন্দ্রী হইতে এই কাব্যের আরম্ভ। আরম্ভটী এইরূপ ;—

শ্লোক।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

গৌরচন্দ্রী।
রাগ সিন্ধু ; তাল সম ;
গোরা করিল উপায়,
জীবের তারণ হেতু ধরি দ্বিজকায় ॥ ধুয়া ॥
নবদ্বীপে নিজ নাম নূতন রটায়।

পরাজ্রাতা
অচিতে চেতন দিতে, জগজন বুঝাইতে,
শ্রীহরি চৈতন্যনাম প্রেমেতে বিলায় ॥
ত্যজিয়া সংসার সুখ, ঘুচাইতে লোকদুঃখ,
উদাসীন হইয়া দীক্ষা গুরুকে জানায় ॥
সর্ব্বেশ্বর সেই হরি, আপনি কুকারে হরি,
বল সবে হরি হরি সদা রসনায় ॥
কভু স্বর তাল মানে, উনমত্ত নাম গানে,
কভু প্রেমরসে ডুবি সকলে ডুবায় ॥

এইরূপ গানে গৌরবন্দনার নামই গৌরচন্দ্রী বা গৌরচন্দ্রিকা।

পীঠবন্দনার পর কৃষ্ণরূপ বর্ণনা। তাহার পর গদ্যে একটু বিবরণ আছে,—

জয়নারায়ণ-কল্পদ্রুম সংস্কৃত পুস্তকের নাম রঘুনাথ পণ্ডিত রাখিলেন এই বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম শ্রীকরুণানিধানবিলাস ভক্তজনের আজ্ঞামত হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা বার বৎসর যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা কিঞ্চিৎ করিতে উদ্যোগমাত্র কর্ত্তা এক গুরু এক ভক্তজন [illegible]নেক কিন্তু [illegible]র এক [illegible]

গদ্য[illegible]র শেষ বাক্য ও পূর্ব্বোদ্ধৃত পীঠবন্দনা পড়িলে বোধ হয় যে কবি যেন

অনেকটা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তৎপরে রাগতাল-হীন কবিতায় কবি ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও তাঁহার স্তব করিয়াছেন। তৎপরে কবিতায় গুরুস্তুতি করিয়াছেন। এই গুরুস্তব একবারে কর্ত্তাভজার ভাবে ভরা। তার পর গুরুস্তুতির একটি গান। এ পর্য্যন্ত যে যে গান বা কবিতার কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাতে কবির নামের ভণিতা নাই, কিন্তু এই গানটিতে আছে;—

গুরুচরণ পরশমণি রাখরে হৃদয়ে।
যতনে সঞ্চয় কর ফল ফলিবে সময়ে॥ ধুয়া।
ত্রিতাপে দহিছে দেহ     মতি নাহি হয় দেহ
গুরুপদ অভেদ কি কাজ সংশয়ে॥
পরজাতা।
সকলের সার গুরু     গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
গুরু বিনে নাহি মুক্তি ভবপাশ দায়ে॥
পেয়েছ মানব তনু     জপ কর গুরু মনু
দেবের দুর্লভ হবে সংসারে বসিয়ে॥
জয় নারায়ণ দীন     কি জানে সে গুরুগুণ
দুর্গাপদ পা'ন গুরু সদাশয়ে কয়॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণলীলার মঙ্গলাচরণ।

পরমকর্ত্তাকে নমস্কার॥ নম নম পরমকর্ত্তার পায়।     পাব যশ দয়া কর দয়াময়।
অভয়চরণ প্রাপ্তির উপায়॥     নির্ব্বিঘ্নে পূরণ কর মহুয়ার॥।

তৎপরে কবি যথাক্রমে মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, ভানু, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জগৎকে বন্দনা করিয়া মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। তাহার পর,—

যুগ মধ্যন্তরে নানা অবতার।
অসংখ্য প্রভুর লীলা না জানি বিস্তার।
দশম শ্রীভাগবতে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে।
রহস্য মাধুর্য্য লীলা দুর্লভ ব্রহ্মাণ্ডে॥
অসুর-নিবারি হরি কেবল কারণ।
পৃথিবীতে সেই লীলা করিতে কীর্ত্তন॥
প্রতিমূর্ত্তি রচনায় করিয়া রচন।
শুনিবে ভক্তজন করিয়া গায়ন॥

নয়নে হেরিব রূপ সহ পরিবার।
বালক সাজায়ে শোভা দেখ নিরন্তর॥
তালমানে সুররাগে গাবে সুরবান।
পণ্ডিতে পড়িবে পুঁথি মনে করি ধ্যান॥
গ্রন্থের ভাষাতে আর নাগী বাঙ্গালাতে।
গাইবে সকলে মেলি সুখ হয় যাতে॥
সুগতে নাচন কার্য্য করি স্থির মনে।
কৃষ্ণপদ চিন্তামণি ভাবহ যতনে॥

"সুগত" শব্দে বৌদ্ধসংঘ বুঝায় কিন্তু এস্থলে সভা বুঝিতে হইবে। ইংরাজীতে meeting বলিলে যাহা বুঝি এই "সুগত" শব্দের সেই অর্থই যেন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর প্রকৃত বিষয়ের আরম্ভ এইরূপ,—

দ্বাপর অবসানে ধরণী টলমল।     অসুরের রাজাভুক্ত প্রজা যত ছিল।
অসুর বিক্রম আর পাপেতে বিকল॥     কুকর্ম্মে পাপের বৃদ্ধি অনেক হইল॥

অবলা ধরণী ভারে যোরূপ হইল। ... রাজ পদে গিয়া প্রণাম করিল।
তথাচ পাপের ভার নাহিক ঘুচিল। ... আদি দৈত্য বাধা সব নিবেদিল।
ব্যাকুল হইয়া ধরা ধাইয়া চলিল। শুনিয়া অমররাজ ব্রহ্মলোকে গেল।

এইরূপে ভাগবতানুসারে কবি শ্রীকৃষ্ণাবতারের সূচনা করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারে দেবতাগণ, ধরণী এবং লক্ষ্মী সরস্বতীসমন্বিত বিষ্ণুকে লইয়া গোলোকে রাধাকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এই স্থলে বৈকুণ্ঠনাথ ও গোলোকনাথের একত্ব কবিকর্ত্তৃক একটি মাত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অতি সুকৌশলে রক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার সে কৌশল রাখিতে পারেন নাই। জয়নারায়ণ লিখিয়াছেন,—

শুনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সকল মস্তকে হাত
রাখি কহে ভয় নাহি আর।
কর্ত্তাকে বিনয়ে বল গোলোকে সকলে চল
আমি তথা আসিব সত্বর।

এস্থলে এই "আসিব" ক্রিয়াতে অতি সুন্দর ভাব প্রকাশ হইয়াছে। তাহার পর গোলোকের ষোড়শ দ্বার বর্ণনা, বৈভব বর্ণনা, মহারাসমঞ্চ বর্ণনা ইত্যাদি আছে। তাহার পর দেবকী ও কংসের জন্ম বিবরণ হইতে কথারম্ভ হইয়াছে। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা। তদানুসঙ্গিক গর্ভস্তুতি প্রভৃতিও গানে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর কবি স্বীয় কাব্যকে কেবল শাস্ত্রানুসারী না করিয়া রসাল করিবার জন্য বাঙ্গালীর গৃহোচিত নববধূর প্রথম গর্ভ সংবাদের আনন্দ ছবি বর্ণনা করিয়াছেন। একটা নমুনা দি,—

ঘরে ঘরে যাই শুনিতে পাই করিছে কাণাকাণি। গোকুলেতে রাধা হবে চলিল গোপিনী।
মথুরাতে গোকুলেতে এই কথা শুনি। বৃদ্ধকালে পুত্র পাবে আপনি নন্দরাণী।
দেবকীর গর্ভ পূর্ণ অদ্য রাত্রি জানি। খড়ি পাতি জ্যোতিষ বলে অতি শুভবাণী।
পূর্ণব্রহ্ম পুত্র হবে এই অনুমানি। দুই কুলেতে জন্ম হবে একই নীলমণি।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ, নন্দালয়ে রক্ষা, কংসপীড়ন ও বসুদেব প্রসাদনের পর কবি লিখিয়াছেন "শ্রীভাগবতের পাঁচ অধ্যায়মতে এই জন্মলীলা সাঙ্গ॥" জন্মোৎসবের একটি গীত,—

সকল বাধা দূরে পলাইল। ধুয়া। বিকসিত হইয়া ভাসিল। ১
দুঃখের ভঞ্জন হরি জগতে আইল। যশোদার কোলে। শিশুরূপ ছলে।
পরজাতা। মুনি সরোবরে। ... শ্যাম ইন্দীবরে। গোকুলেতে বিলাস করিল। ২

ইহার পর নন্দোৎসবের বাধাই গীত। তৎপরে ঢাড়ির গীত। "ঢাড়ি" সম্ভবতঃ "ঢালী" নহে।

আমরা ঢাড়ি দূরে বাড়ী যশ শুনে গৃহে পশ্যাছি। লব তোর বসন ভূষণ রত্নমালা কাবু পেয়াছি। ২
লব সুবর্ণতোড়া তাদের জোড়া আশা কর্যাছি। মোরা গোপালের আলাই বালাই লয়্যা মরি
ঘোড়া লব হাতি লব মোরা সব মনে কর্যাছি। ১ বিদায় লব নাচি।
ঢাড়িন বলে লাল কোলে সুখী হয়্যাছি। ঢাড়ি নাচে ঢাড়িন নাচে প্রসবের কাচ কাচি। ৩

একটি বাধাই গীত—

ওরে আজি আইল আনন্দ বাধাই।
চল চল সখি দেখিতে যাই॥
টিকারি নাগারি বাজে তুরী ভেরী
কোলাহল শুনিবারে পাই॥ ধুয়া।
মণি মতিহার গাঁথ্যাছি সুন্দর
শ্যামগলে দিবরে পরাই।
অসিত অষ্টমী জন্ম জানি আমি
রোহিণীতে জয়ন্তী মিশাই॥ ১

দধি ভারে ভারে লৈয়া সঙ্গে করা
পরিবার সহ চলে যাই।
শশি ভানু-ছানি রূপ জ্যোতি জিনি
সখি নিজে দিলেক সাজাই॥ ২
নন্দগৃহে পশি হেরে শ্যাম শশী
রহে রাধা বামেতে দাঁড়াই।
আনন্দ কৌতুকে তুষিলা যৌতুকে
হেরি হেরি হৃদয় জুড়াই॥ ৩

তাহার পর নন্দালয়ে ভাঁড়, হিজড়া, ভাট ইত্যাদি আসিল; সকলে নাচিল, গাহিল—

নাচাইতে ভাল নেটো পায়াছ আমারে।
দেখাইতেছি নাচন নাচিয়া বারে বারে॥ ১
চৌরাশী লাক বার যোয়াং আনি বারে বারে।
তবু পরিতোষ লেশ না হইল তোমারে॥ ২
দশ মাস নাচাইলে জননী উদরে।

পুন নাচাইলে তুমি ধরণী উপরে॥ ৩
মায়াতে বাজায় তাল খোল উপচারে।
এ হেন মনের দুঃখ আর কব কারে॥ ৪
এবার পেয়াছি কাবু যশোদার ঘরে।
চারি ফল দিতে হবে ভাঁড়ে দয়া করে॥ ৫

তার পর কবি কৃষ্ণের দোলনায় শয়নলীলা, স্তনপানলীলা, ষষ্ঠী পূজা, অষ্ট দিনে আট-কড়িয়া পূজা, জৃম্ভণলীলা ইত্যাদি লীলা গাহিয়া দ্বাদশ দিনে পুতনা বধ গাহিয়াছেন।

কবির কর্ত্তাভজার কথা আরও কয়েক স্থলে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একস্থলে তিনি বলিতেছেন,—

ঋষিগণ ধ্যানে দেখি জানিল নিশ্চয়।
শ্রীকর অষ্টম অংশে প্রভুর উদয়॥

দনুজ-নিধন হবে ভুবন অভয়।
কর্ত্তাকে ভজিবে জীব পাপ পাবে ক্ষয়॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে সমস্ত জীব কর্ত্তাভজা হইয়া যাইবে কবির এইরূপ মহদাশা দেখিয়া বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি মহারাজ জয়নারায়ণের নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীকর অষ্টমবংশ অর্থে শ্রীকর হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছেন। এই শ্রীকর যে কে তাহার পরিচয় কবি কোন পুরাণ হইতে লইয়াছেন, তাহা জানা যায় না; তবে নন্দোৎসবের সময়ে ভাটেরা শ্রীকর বংশের এক পরিচয় গাহিয়াছিল, তাহাতে জানা যায় নন্দঘোষের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম শ্রীকর।

কবি জয়নারায়ণ পুতনাবধের পর কাকাসুর বধ, গাভীবৎস প্রদর্শন, শকটভঞ্জন, একইশা পূজা, তৃণাবর্ত্ত বধ, নামকরণ, নৃত্য, ঘুটুঙ্গু খেলা প্রভৃতি লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকেরা এই ঘুটুঙ্গু খেলাটি শিশু কৃষ্ণ কিরূপে খেলিয়াছিলেন, তাহা দেখুন;—

ঘুঙ্গুর বাজে ঝম ঝম ঝম। অতি মনোরম চম চম চম॥
ধরণী সকলে, পাতি কর-কমলে,
ঘুটুঙ্গু চলত লালা ছম ছম ছম॥
শোভা পদতলে, অরুণ চলমল,

বদনে বাজায় হর বম বম বম॥ ২॥
ভরিয়া সুগীত, তড়িত জড়িত,
তরুণ তমাল সম সম সম॥ ৩॥

এক সখী যুক্তি করি আসিয়া তখনে।
অকলঙ্ক চাঁদ আমি দিব এইক্ষণে॥
কৃষ্ণে অভিমান শান্ত করিবার তরে।
মোহিনী হইল জন্ম বৃষভানুঘরে॥
সখী মিলি রাধিকারে আনিল সত্বরে।
কোটী চন্দ্র প্রকাশিত শ্রীমুখ উপরে॥
মুখচন্দ্র দেখি কৃষ্ণ উঠিল তখন।
রাধিকার গলা ধরি নাচিকে মোহন॥
মুখচন্দ্রে চুম্ব দিয়া সুধারস খায়।
দেখিয়া রাণীর মন আনন্দিত হয়॥

রাণীর যাহাই হউক শ্রীকৃষ্ণ তখন গলিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়া বসিলেন,—

চাঁদ পাইয়াছি হাতে ছাড়া দিব না।
এ চাঁদে সুধার রাশি চাহিয়া দেখ না॥

এই স্থলে রাধাকৃষ্ণের মিলনসূচক একটী গীত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা যাইতেছে না;—

কালাচাঁদ গগনচাঁদে ধরিবারে চায়।
চাঁদের আকুট রাধা চাঁদেতে মিটায়॥
কাল ধল পীত শশী দেখি যশোদায়।
উত্তম বিচার করি তুষিল তাহায়॥
শ্বেত চাঁদ কলঙ্কেতে হয় নিতি ক্ষয়।
মোর কালাচাঁদে দেখি আজ্ঞা না মিতায়॥
রাধামুখ স্বর্ণ চাঁদ অরুণে হারায়।
দুই চাঁদ কোলে করি যশোদা দাঁড়ায়॥
দেখহ চাঁদের হাট রাধাকৃষ্ণ গায়।
যশোদা কনকমেরু চাঁদ বেড়া তায়॥

ইহার পর কবি ঋষিগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শন, কণ্বমুনির আগমন, মৃত্তিকাভক্ষণ, কর্ণবেধ, দ্বিতীয় বৎসরের জন্মতিথিপূজা (বরষ গাঁঠ পূজা), রামকাহিনী বলিয়া নিদ্রা আনয়ন ও নিদ্রাঘোরে সীতাবিরহ, শালগ্রাম গ্রাস, স্নান, ভোজন, গোয়াল সঙ্গে আঁখমুদুলি খেলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই খেলাটী কিরূপ তাহার বিবরণ উদ্ধৃত হইল,—

আঁখ মুদলি খেলে মিলি ব্রজবালে।
রেং বরেং বরেং বতাল দেয় বাহুমূলে॥
খেলায় জিতিলে হরি, হারে যারে কাঁধে করি,
সখাভাব দেখাইল ভুবনমণ্ডলে॥

তাহার পর গেঁদ খেলা—

নকুটে খেলায় গেঁদ গেঁদে গেঁদ মারে।
রামকৃষ্ণ খেলে ভাল বালক ভিতরে॥
যার গেঁদ ভূমে পড়ে সেই জন হারে।
বানর করিয়া তারে নাচায় সত্বরে॥
হুপ হুপ বলি সবে ক্ষেপায় তাহারে।
জীবে কি বুঝিবে লীলা না জানে অমরে॥

এই গেঁদ খেলা ও আঁখমুদলি যথাক্রমে আজকালকার গেণ্ডুয়া খেলা বা ভাঁটাখেলা ও চোক ঢুটাকুটি খেলার অনেকটা নিকটবর্ত্তী। তার পর হাউলীলা—

বৃন্দাবনে খেলে কৃষ্ণ সমোবয়ো লৈয়া।
ভয়েতে যশোদা তথা গেল অতি ধায়া॥
হাউভয় দেখাইয়া চাহে আনিবারে।
এক শিশু বনে আসি হাউরূপ ধরে॥
যশোদা পলায় দেখি বিশাল আকারি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে নেত্রে ঝরে বারি॥
ইহারে বধিলে বাছা বাঁচিবারে পারি।
মায়েরে কাতর দেখি আসি কহে হরি॥
শ্রীদাম হইল হাউ দেখাইতে ভয়।
ভয় নাই চল মাতা লই মোরে ঘর॥
সন্ধ্যার আরতি করি শিশুরে খাওয়ায়।
জগৎ জনক হৈয়া পুজেন মাতায়॥

কবির নিজস্ব কবিত্ব দেখাইবার মত এইবার একটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিব। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-কার, শ্রীমদ্ভাগবতকার, হরিবংশকার প্রভৃতি পুরাণকারগণ কৃষ্ণলীলার অসংখ্য উপাখ্যান

এই বঞ্জারা বণিক দল এখনও দক্ষিণাপথে যথেষ্ট। ইংরাজি ইতিহাসে ইহারা বুঞ্জারী নামে খ্যাত। ইহারা ভ্রমণকারী বণিকসম্প্রদায়। বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা সহিত ইহারা দলে দলে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে যখন তাম্বু ফেলে, সেই খানেই তখন বাস। ইহাদের সঙ্গে কতকগুলি ব্যাঘ্রবিক্রম কুকুর থাকে, তাহারা রাত্রিতে বাণিজ্য দ্রব্য ও স্ত্রীশিশুর বস্ত্রাবাসে চৌকী দেয়। ইংরাজী পশুতত্ত্বে এই সকল কুকুর "বঞ্জারা কুকুর" নামে স্বতন্ত্র আখ্যা পাইয়া থাকে। কৃষ্ণের সময় না হউক, কবির সময়ে অর্থাৎ এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে বঞ্জারাগণ বলদ লইয়া নানা স্থানে সমুদ্রোত্থিত মুক্তার ব্যবসায় করিয়া বেড়াইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের সময়ে বন্দুকের ব্যবহার পড়িতে বেশ হাসি পায়।

তাহার পর নানা লীলায় কৃষ্ণের পঞ্চম বৎসর কাটিয়া গেল। নন্দরায় গণ্ডার ভালুকের ভয়ে গোকুল নগর ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলেন। এই পর্য্যন্ত লিখিতে কবির এক মাস সময় লাগিয়াছিল। কবি বলিতেছেন,—

প্রথমে গোধন পার হইল সকল।
শকট সম্ভার শেষে পারে উত্তরিল॥

* * *

যাটি মাস কৃষ্ণলীলা গোকুলে প্রচার।
কিঞ্চিৎ পুরাণে লেখা সূত্রমাত্র তার॥
এক মাস সেই লীলা বহু ভাগ্যগুণে।
নয়ন সফল হয় দেখি বৃন্দাবনে॥
কৃষ্ণ হারা হৈয়া গোপী কৃষ্ণলীলা করি।
বাঁচিয়া রহিল তারা লীলা হেরি হেরি॥
সেই সূত্র মনে করি জুড়াইতে প্রাণ।
নব বৃন্দাবনে লীলা পুরাণ প্রমাণ॥
যথা শক্তি করি যুক্তি লৈয়া ভক্তগণ।
মদনবিলাস লীলা অমিয়া সমান॥
একচল্লিশ লীলায় নীত নব গান।
এক মাসে পূর্ণ কৈল করুণানিধান॥
স্বপনে পাইয়া আজ্ঞা জয়নারায়ণ।
সহায় মঙ্গলদাস বৈষ্ণব সুজন॥
সংস্কৃত তাল সুরে মাধব পণ্ডিত।
ব্রজের ভাষাতে ভট্ট গাইল বিহিত॥
বাঙ্গালী ভাষায় গায় ভুবনমোহন।
বুদ্ধিহীন বাণীহীন জয়নারায়ণ॥
শুনিতে তোমার গুণ, শ্রবণ কঠিন হল
নিদারুণ রসনায় হরি হরি বলিবারে বিধে।
কি কব কুসঙ্গ রঙ্গ তব ধ্যানে দিল ভঙ্গ
বিহীন সুজন সঙ্গ যাতনায় জাঁতা যেন পিষে॥

এই পুঁথিমতে গোকুললীলা একমাস পঞ্চদশ দিবসে সাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছয় বৎসর চলিতেছে। একদিন,—

বালক বালিকা সব করে এই মনে। খেলাতে বিবাহ দিব কেহ না জানিব।
কৃষ্ণের বিবাহ দিব এই রাই সনে॥ এই খেলা নন্দঘরে নিশ্চিন্তে খেলিব॥

এই পরামর্শ হইয়া থাকিল। তাহার পর রাত্রিতে অগ্রণী হইয়া,

কহেন বলাই বুঝিলরে ভাই বসন ভূষণে অনঙ্গে হারাই
মাধবিরে আনিয়া বসাও কানাই। দুলার সুবেশে বিয়েতে কানাই॥

তাহার পর নানা রত্ন ভূষণে দুলালের বরবেশ সম্পাদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যশোদাকে ডাকা হইল,—

কুঞ্জে, আ[illegible]ঞ্জে, দূর্ব্বাদল কুঞ্জে, কেতকী কুঞ্জে, অরগজা যন্ত্রের কুঞ্জে, কর্পূর[illegible], অগুরু, [illegible], নৌকা, সর্ব্বতক্র, শেষে প্রভাতে রাধার গৃহে লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তার[illegible]সের পূর্ব্বে একপক্ষ ব্যাপিনী সাঁজিলীলা অর্থাৎ প্রতিপদাদি হইতে অমাবস্যা প[illegible] কৃষ্ণলীলাদি রচনা করিয়া পূজার্চ্চনাদি দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতিবর্দ্ধন লীলা বর্ণিত আ[illegible]তঃ এই সাঁজির ব্যাপার এখনও বৃন্দাবনে ব্রজবাসীরা করিয়া থাকেন। প্রথম সাঁজির বিবরণ দিতেছি,—

সাঁজি লীলা আরম্ভ।

শুভ কৃষ্ণ প্রতিপদ আইল সখী আহ্লাদ
এই সে কুমার মাস সাঁজির সময়।

সবে মিলা কর কেলি
চল ধায়া ফুল তুলি
রচিব শ্রীবৃন্দাবন লাগি যত্নুরায়।

যোগ পীঠ সাঁজি মাঝে
চরণ বাহাতে রাজে
অষ্টাদশ চিহ্ন সাজাও তাহায়॥

কাল ফুলে ভানু সুতা
রাম ঘাটে বিশোভিতা
বলাই মন্দির তটে রচিল এহায়।

কদম্বেতে চীর ঘাট
রজতে রচহ বাট
অক্রুরের ঘাট আজি যাতে শোভা পায়॥

লতাগুল্ম তরুবর
আছে যত দুইধার
সাবধানে রচ সখী ভুল নাহি যায়।

দক্ষিণ বাঁকে মথুরা
ভূতেশ্বর জটাধরা
শেষশায়ী কাত্যায়নী রচ রচনায়॥

তড়াগ বাউলি আদি
চিত্র কর নিরবধি
কমঠ মকর মীন দেখ যমুনীয়॥

ফুলের সাঁজি বসাইয়া
পূজে রাই কৃষ্ণ ধায়্যা
হেনকালে কৃষ্ণ আসি ছলেতে দাঁড়ায়॥

চিনিয়া কৃষ্ণের ছল
প্রেমে রাধা চলমল
গলাগলি করি রাই সাঁজিকে দেখায়।

*    *    *    *    *

প্রথম সাঁজির দিন
ভুলাইল কৃষ্ণ মন
প্রত্যহ আসিব আমি কহে যদুরায়।

বৈকালে তুলিব ফুল
ভ্রমিয়া যমুনা কূল
সাঁজি মধ্যে ব্রজলীলা সকলে রচায়॥

তার পর প্রতিদিন কৃষ্ণলীলা রচনায় ও কৃষ্ণসম্ভোগে পোনের দিনে রাধার সাঁজিলীলা সমাপ্ত হয়।

তার পর কবি বার মাসে তের পার্ব্বণের লীলা লিখিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া [illegible] ফাঁক যায় নাই। অবশ্য এ লীলায় রাধিকাই কৃষ্ণকে ভাইফোঁটা দিতেছেন, এমন [illegible] করিতে কবির সাহসে কুলায় নাই; কিন্তু মথুরা হইতে সুভদ্রাকে ব্রজে টানিয়া আনিয়াছেন।

যদ্যপি সময় নহে ব্রজেতে যাইতে। তথাপি আইল ভদ্রা ভাইকে তুষিতে॥

ব্রজে প্রেমের বাজার দেখিয়া ভদ্রা নাকে হাত দিল। কৃষ্ণ তখন একটু লীলাভাব সঙ্কুচিত করিলেন। ভদ্রা মোহিত হইয়া কৃষ্ণবলরাম মায় রাখালবালক সকলকেই ফোঁটা দিল এবং যাইবার সময় রাধিকার হস্তেই কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া গেল,—

গোপীসহ রাধিকারে সুভদ্রা তুষিল। সহজ ভাবেতে সদা প[illegible]রী।
এই দুই ভাই মোর ব্রজেতে রহিল। ইহা বলি চলে ভদ্রা [illegible]।

তাহার পর রাধাকৃষ্ণ সখীসখাগণ লইয়া দশ অবতার, কোজাগরী লীলা, মন[illegible]ণেশ পূজা, দুর্গোৎসব কালী পূজা রাসলীলা কাত্তিকপূজা চড়কপূজা ইত্যাদি ক[illegible]কল পূজায় রাধাকৃষ্ণকেই উক্ত দেবদেবী সাজাইয়া লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। [illegible]জায় কিছু ধূমধাম হইয়াছিল। রাধা ভগবতী হইয়া মৃগাক্ষী নাম্নী সখীকে সিংহ করিয়া চিত্রাকে মহিষাসুর করিয়া বাসন্তী সাজিয়া বসিয়াছেন। এই পূজা উপলক্ষে তিন রাত্রি কুঞ্জে কবি গাওনা হইল। দুই দলের বাগ্‌যুদ্ধ। এক দলের নেত্রী চন্দ্রাবলী। অপর দলে কামকলা প্রধানা। রীতিমত শুকদেব সাজিয়া ব্যাসদেব সাজিয়া বিরহ, টপ্পা, সখীসংবাদ, খেউড় গাহিয়া কবির গানের লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। চড়কের লীলার সময় সখীরা তরজা গাহিয়াছিল।

এইরূপে নানালীলা বর্ণনার পর কৃষ্ণমুখে কবি ভবিষ্যৎ আজ্ঞা প্রচার করিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বৃন্দাবন লীলাবর্ণনার উপসংহার করিয়াছেন। চড়কের বৈশাখ মাসের লীলা শেষ হইলে,

জ্যৈষ্ঠেতে ঘোষণা শুনি ব্রজাঙ্গনা অক্রুর আসিবে কৃষ্ণ লৈয়া যাবে
কাতর হইল প্রাণ মনে। কংস বিদ্যমানে।

গোপীরা শুনিয়া গোপীনাথকেই জানাইল,—'তবে গোপী বাঁচিবে কেমনে'। গোপীনাথ উত্তর দিলেন,—

দ্বিতীয় রূপেতে আমি যাব রথে
একরূপে যাব বৃন্দাবনে।
এই নিত্যধাম আমার বিশ্রাম
বিচ্ছেদ না হব কোন দিনে।
* * * *
বিলাপ করিও না ধনি আমি হে তোমার। ধুয়া।
রাখিয়াছি তব মন বাকি নাহি আর। চিতান।
নবধা ভক্তির পথে কি নিয়াছ প্রাণমনে
তবে কেন ভাবহ অসার।
[illegible]বে বিরহ জ্বালা শুন সব ব্রজবালা
এই সার প্রতিজ্ঞা আমার।
নিকুঞ্জ আষাঢ়ে বসিয়া নিগূঢ়ে
পরাণের পতি।
লীলা বৃন্দাবন হইল পূরণ
শুনহ সুমতি।
গুণ যশোদার করিল উদ্ধার
ব্রজের বসতি।

এবে অন্তর্দ্ধানে লীলার বিধান
হইবে সঙ্গতি।
আসে দুগ্ধ কলি ফুটে ভক্তি-কলি
করি শুদ্ধমতি।
লবে মোর নাম হবে পূর্ণকাম
পাবে ভক্তি মতি।
আমি বহু নর হইবে উদ্ধার
ব্রজে করি স্থিতি।
শুন যুগ কথা যাতে যাবে ব্যথা
কৃষ্ণে হবে রতি।
তিন যুগ অবশেষে কলির পত্তন।
এই যুগে হবে সার আমার কীর্ত্তন।
একাচার এক নাম হইবে যখন।
প্রকাশ হইব আমি আসিয়া তখন।
* * * *
কু-আনন্দ নিরানন্দ চিন্তারূপ জরা।
এ সকল দেহ মধ্যে অহিবেক করা।

জীবের মুক্তায় এই করিতে হইবে।
অহঙ্কারে ধর্ম্মমত কঠোর † † † ।
চারিভাগ পৃথিবীর গণনা করিবে।
পশ্চিমে বিলাত আখ্যা † † † † ।
[illegible]তে এফরিকা সকলে জানিবে।
পূর্ব্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে।
পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা ধরা গোলাকার।
আকাশে ঘুরিবে সদা তারা সহকার।
মধ্যেতে থাকিবে ভানু চাঁদ বেড়া তার।
উদয় অস্তের গুণে দিবানিশি কয়।
ষষ্টি দণ্ড দিবানিশি এই ছোট দিন।
বাড়িবে দেশের গুণে ছয়মাস দিন।
*  *  *  *
অসুর মরিয়া জীব জন্ম লবে যত।
পৃথক্ পৃথক্ মত বলাবে সতত।

করিবে জীবের ত্রাণ [illegible] মতে।
সত্যধর্ম সঙ্গীতে আসিবে সত্বরে।
চারিদেশে সত্যধর্ম হইবে প্রকাশ।
কাটিবেক দুইজন নাম চন্দ্রহাস।
উত্তরেতে লামা গুরু নানক পশ্চিমে।
রামশরণ নামে এক হবে পূর্ব্বধামে।
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে।
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক [illegible]।
তিন দেবী তিন পদ্ম করিয়া বিকল্প।
ইষুকে সকলে তারা গণিবে প্রধান।
এইকালে মম নাম হইবে গোপন।
ইষু বিনা গতি নাই হইবে যন্ত্রণা।
*  *  *  *
নিত্যরূপে রাধাগোপী রাখি নিজ সঙ্গে।
অন্তর্দ্ধানে ব্রজলীলা আরম্ভে সুরঙ্গে।

এই তক প্রভুর বৃন্দাবন লীলা সাঙ্গ।

এই উদ্ধৃতাংশের ভবিষ্যৎ কথাগুলির মূল্য যত অধিক হউক বা না হউক, কবির কৌশলটি বড় মন্দ নহে। কৃষ্ণকে আধুনিক ভূগোল ইতিহাস শিখাইয়া কবি একটু উপকার করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে কৃষ্ণ নানক, যীশু, লামা (বুদ্ধ) এমন কি কর্ত্তাভজা রামশরণ পালের নামও করিয়াছেন, কিন্তু সত্যধর্ম্ম প্রচারক চন্দ্রহাসটি কে আমরা তাহা জানি না। রামশরণ পালকে সত্যধর্ম্মপ্রচারক অবতার বলিয়া কবি এখানে যেমন স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহাকে কর্ত্তাভজা মতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেও বিশ্বাস করিতে সন্দেহ করি না। বৃন্দাবন-লীলা সাঙ্গের পর কবি কয়েকটি ভজন গাহিয়া এইরূপে বাহুলীলায় অবতারণা করিয়াছেন;—

কার্ত্তিকের ত্রয়োদশী অক্রুর আইল।
কৃষ্ণ বলদেবে লই মথুরা চলিল।
গোপিনী বিরহ আদি বাহু লীলা যত।
মাথুর মধুর গান রচিল ভকত।
ভাগবতে একচল্লিশ অধ্যায় বিদিত।
প্রভুর প্রবেশ হইল মথুরা পিরীত।
*  *  *  *
বাহুরূপা গোপীগণে তুষ্ট করিবারে।
উদ্ধব চলিল তথা ধরি আজ্ঞা শিরে।
গোপিনীর প্রেম বাণী উদ্ধব শুনিয়া।

ভক্তির পাইল বীজ জগৎ লাগিয়া।
*  *  *  *
হস্তিনাপুরেতে অক্রুর করিল গমন।
পূর্ব্বার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ কথা হইল সমাপন।
*  *  *  *
দ্বিজ কুমারের কথা হইল বিখ্যাত।
দ্বারকা বিহার সার হইল সমাপ্ত।
শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণগুণ গান।
দ্বিতীয়াংশের কথা এ সব আখ্যান।

এই পর্য্যন্ত বাহ্যলীলার কথাও শেষ হইল। তাহার পর কবি গ্রন্থরচনার ইতিহাস দিতেছেন,—

জয়নারায়ণ দাস করে নিবেদন। বৃন্দাবন ছাড়ি মন না রও কখন॥

কবি এ গ্রন্থে বৃন্দাবনলীলা বা আন্তরলীলা যেমন বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বাহ্যলীলা তাহার লক্ষাংশের একাংশও নহে। আন্তরলীলা বর্ণনা করিতে ১ হইতে ৩৫২ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে; আর বাহ্যলীলার আরম্ভ ৩৫২ পৃষ্ঠার প্রথমে ও শেষ ৩৫৩ পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে, কেবল ৪৩টি মাত্র কবিতায়। তিনি যে দ্বারকালীলা বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিবেন না, তাহা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "বৃন্দাবন ছাড়ি মন না রও কখন" এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়। তাহার পর,—

নবতি অধ্যায়ে সাঙ্গ সুখের রচন।
মন বুদ্ধি হীন বড় করিতে বর্ণন॥
ইতি বাহ্য লীলা সাঙ্গ॥
দশমস্কন্ধ মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্র।
এই কথা ত্রিভুবন করিবে পবিত্র॥
ইতি শ্রীকরুণানিধানবিলাস গান।
বারশত একুইশ সালে হইল পূরণ॥
এক শত চোয়াল্লিস মাসে শ্রীকৃষ্ণ লীলা।
নিজ বৃন্দাবনে হরি অনেক করিলা॥
তার মধ্যে স্থূল লীলা দ্বিশত তেত্রিশ।
যথাশক্তি লিখিলাম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ॥
লিপির অনেক দোষ করিতে শোধন।
আশ্রয় কেবলমাত্র ভক্তের চরণ॥
প্রতিদিনে নবলীলা করিতে রচন।
অসম্ভব আশা ছিল না হৈল পূরণ॥
তিনশত পঞ্চষষ্টি একই বৎসরে।
বার ভাগ তেতাল্লিশ শত কাশী পুরে॥
অনায়াস এই লীলা রচ কবীশ্বরে।
সূত্রমাত্র স্থূল লীলা পৃথিবী ভিতরে॥
পাঁচ ভাব ছয় রস নব ভক্তি সার।
অন্তর্গত বহু লীলা নাহি পারাবার॥
কিছুকাল মৃজাপুরে করিয়া যাপন।
কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের সেবিল চরণ॥
ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ করি গান।
ব্রজের ভাষাতে তাহা করিল রচন॥
শ্রীমহাভারত ভাষা কাশীরাজে কৈল।
পঞ্চম বৎসরে তাহা পূরণ করিল॥
সমস্ত তাহাকে আমি নিযুক্ত করিল।
বাঙ্গালাকে কাশীদাসী সংক্ষেপে কহিল॥
স্বর্গ আরোহণ পর্ব্ব শাস্ত্রের শাসন।
শুনি শুদ্ধ মনে দুখী জয়নারায়ণ॥
শ্রীউদিতনারায়ণ নারায়ণ পতি।
ব্রজের ভাষাতে সাঙ্গ করিলেন পুথি॥
জয় জয় ত্রিভুবনে হইল মঙ্গল।
রাজার মঙ্গল মাগি সবাই কুশল॥
মম বংশে কৃষ্ণভক্ত হও যেই জন।
মাধুর্য্য সুখদ লীলা করিবে বর্ণন॥
এই পুথি মধ্যে যত আছে চুক ভুল।
করিবে ইহার শুদ্ধ হয়া অনুকূল॥
ইতঃপর নিজকর্ম্ম জন্ম আদি যত।
ভারতে আসিয়া আমি করিল সকত॥
বিশেষিয়া সব কথা লিখিব সকল।
যাহাকে জীবের কর্ম্ম জানিয়া কৌশল॥

পূর্ব্বোক্ত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, কাশীরাজ উদিতনারায়ণের মহাভারতানুবাদ শেষ হইলে, হরি কথার আলোচনা বন্ধ হইল ভাবিয়া কবি-মহারাজ জয়নারায়ণ অসুখী হন। সেই অসুখ দূর করিবার জন্যই কাশীতে মঙ্গলদাস বাবাজীর সঙ্গে নব বৃন্দাবনের অনুষ্ঠান করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। মৃজাপুরের কৃষ্ণদাস বাবাজীও এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত অংশ হইতে আরও জানা গেল,—১২২১ সালে কবি এই "শ্রীকৃষ্ণলীলাবিলাস" সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় কবিতা হইতে জানা যাইতেছে, তিনি ইহাতে ২০৩টি লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চম কবিতায় যে হেঁয়ালী লিখিয়া গিয়াছেন, চতুর্থ ও ষষ্ঠ কবিতা হইতে আমি তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি :—এক বৎসরে ৩৬৫ দিন হয়, তাহাকে বার গুণ করিলে ৪৩৮০ হয়; প্রতিদিন একটি করিয়া "নবলীলা" লিখিতে কবির বাসনা ছিল, ঘটে নাই; অর্থাৎ এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃন্দাবনবাস কালের সমস্ত দিনের লীলা লিখিবার জন্য কবির ইচ্ছা ছিল, তাহা ঘটে নাই; ২০৩টি মাত্র লেখা হইয়াছে। কাব্যারম্ভ কত দিনে হয়, তাহার কোন সঙ্কেত পাওয়া গেল না। ১২২১ সালে সমাপ্ত হইয়া থাকিলে, এত বড় কাব্যরচনায় সম্ভবতঃ দু এক বৎসর বিলম্ব যে না ঘটিয়াছে এমন বোধ হয় না; কারণ একস্থলে কবি "রোগীর স্তুতি" ও "আরোগ্য স্তুতি" লিখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে বোধ হয়, উহা তাঁহারই কোন কঠিন রোগের সময়েই লিখিত হইয়া থাকিবে। ঐ স্থলে "সত্যস্তুতি" "সত্য আচরণ স্তুতি" ইত্যাদি আছে; তাহাতেও কর্ত্তাভজা মতের কথা পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে কাশীরাজের মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছিল।

তাহার পর কবি কতকগুলি নীতিধর্ম্মসংক্রান্ত পদ গাহিয়া, উপদেশ দিয়া এবং সেই সকল কথার প্রমাণস্বরূপ, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নানা পুরাণ, নানা তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের রচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরে পঞ্চাশদ্বর্ণে শ্রীকৃষ্ণ স্তব করিয়াছেন। তাহার পর নিজকুল পরিচয় লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই কাব্যে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে। পতঙ্গলীলা, শতরঞ্চ ক্রীড়ালীলা, কুস্তিলীলা প্রভৃতি বর্ণনায় তাহার আধিক্য দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ভোজনলীলা, বেশভূষা লীলা প্রভৃতির বর্ণনায় অনেকানেক খাদ্যের ও বসনভূষণের নূতন নাম পাওয়া যায়। এ সকল শব্দের সংখ্যা বড় বেশী। উদাহরণস্বরূপ দু চারিটা উদ্ধৃত করিলে তৃপ্তি হয় না বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

অক্ষরাদি দেখিয়া অনুমান হয়, এই কাব্য ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।*

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

---

# বিদ্যাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

সুপরিচিত বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ মিথিলা প্রদেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মিথিলায় ব্রাহ্মণের ভিতর শ্রোত্রিয় ও মৈথিল বলিয়া দুই শ্রেণী আছে; তাহার মধ্যে মৈথিলদের অনেক গাঞি আছে; যাঁহারা শ্রোত্রিয় তাঁহাদের আর পৃথক্ গাঞি নাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

পরবর্ত্তী বিষয়িবার বিস্ফী। তাঁহার বংশের আদি পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর বিষয়িবার বিস্ফী নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন; তদবধি ইঁহারা বিষয়িবার বিস্ফী বলিয়া পরিচিত। বিষয়িবার বিস্ফী বিদ্যাপতি ঠাকুর মহারাজ শিবসিংহের সভাসৎ ছিলেন। এই শিবসিংহ রাজা দেবসিংহের পুত্র ও ভবসিংহের পৌত্র এবং কামেশ্বরের প্রপৌত্র। ইঁহারাও ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বংশের আদিপুরুষ জগৎপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার পর এই বংশেরই একজন ওএনী নামক গ্রামে আসেন; তিনি নাকি কোন রাজার নিকট ওএনী গ্রামটী শাসনরূপে পাইয়াছিলেন; তাঁহার অন্য নাম প্রকাশ নাই; তিনি ওএন ঠাকুর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইনি কামেশ্বর হইতে ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। কামেশ্বর একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ নিরীহ মহাত্মা ছিলেন; সামান্য কুটীরে আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া দিনাতিপাত করিতেন ও বিষয়স্পৃহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যখন কামেশ্বর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত ওএনী গ্রামে থাকিয়া মিথিলা প্রদেশকে অলঙ্কৃত করিতেন, তখন হরিসিংহদেব মিথিলার অধিপতি। হরিসিংহদেব নান্যদেবের বংশধর। নান্যদেবকে ১০১৯ শকাব্দে দেখিতে পাওয়া যায়। সিমরৌনগড় নামক স্থানে একখানি কীর্ত্তিশিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই শ্লোকটী খোদিত আছে:—

৯ ১ ০ ১

নন্দেন্দু-বিন্দু-বিধু-সম্মিতশাকবর্ষে
তচ্ছ্রাবণে সিতদলে মুনিসিদ্ধতিথ্যাং।
স্বাতীশনৈশ্চরযুতে করিবৈরিলগ্নে
তন্নান্যদেবনৃপতির্বিদধীত বাস্তং॥

অর্থাৎ মহারাজ নান্যদেব ১০১৯ শকাব্দে শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে শনিবারে সিংহলগ্নে এই বাস্তুটী নির্ম্মাণ করিলেন। যিনি ১০১৯ শকে নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিলেন তিনি অবশ্য তাহা হইতে কিছু পূর্ব্বে রাজা হইয়া- [illegible]। যাহাই হউক ধরিয়া লইলাম তিনি দশম শাক শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা হন। নান্যদেব কর্ণাটী, যিনি কর্ণাট দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষা নামক গ্রন্থে যুদ্ধবীর কথা প্রস্তাবে নান্যদেবের এক পুত্রের এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন যে "আসীৎ মিথিলায়াং কর্ণাটকুলসম্ভবস্য নান্যদেবনাম্নো রাজ্ঞঃ পুত্রো মল্লদেবনামধেয়ঃ কুমারঃ"। তবেই নান্যদেব কর্ণাটী হইলেন। নান্যদেব কোন অপরিজ্ঞেয় কারণে দশম শতাব্দীতে মিথিলায় আসিয়া মিথিলার অধিপতি হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বংশীয়েরা রাজা হইতে থাকিলেন। নান্যদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হরিসিংহদেব যখন মিথিলা শাসন করেন, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রে সাত খানি রত্নাকর কর্ত্তা প্রসিদ্ধ চণ্ডেশ্বর তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই চণ্ডেশ্বর বিদ্যাপতি ঠাকুরের খুল্লপিতামহ। ইঁহার উপাধি ছিল [illegible] মহত্তক সান্ধি[illegible]। তাঁহার

পিতা বীরেশ্বর, তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন ও বীরেশ্বরপদ্ধতি বলিয়া তিনি এক পদ্ধতি করিয়া যান; মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও বীরেশ্বরপদ্ধতি অনুসারেই তাঁহাদের দশকর্ম্ম করিয়া থাকেন। তিনিও হরিসিংহের ও তাঁহার পিতা শক্রসিংহের মন্ত্রিত্ব করিতেন। চণ্ডেশ্বরের পিতামহ দেবাদিত্য; তিনিও সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া বিখ্যাত। দেবাদিত্যের পিতা কর্ম্মাদিত্যও মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বিদ্যাপতির পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও রাজকুলসেবী ছিলেন। চণ্ডেশ্বরের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুরই প্রথমে মিথিলার বিষয়িবার বিস্ফীতে বাস করেন। বিষ্ণুঠাকুর পৌত্র কর্ম্মাদিত্য হইতে সকলকেই রাজমন্ত্রী দেখা যাইতেছে। আর ওদিকে হরিসিংহদেবের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ নান্যদেবকেই প্রথমে মিথিলার রাজপদে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং চণ্ডেশ্বরের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর আর হরিসিংহদেবের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ নান্যদেব এক সময়ের লোক। নান্যদেব হইতে তদ্বংশীয়েরা রাজা হইতে থাকিলেন, আর ইঁহারাও তাঁহাদেরই মন্ত্রী হইতে থাকিলেন।

মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর যখন মিথিলাপতি হরিসিংহদেবের মন্ত্রী, তখন শিবসিংহের প্রপিতামহ কামেশ্বর ওএনী গ্রাম অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহার ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ ওএন ঠাকুরই ওএনী গ্রামটী দান স্বরূপ পাইয়াছিলেন। কোন্ রাজার নিকট তিনি সে গ্রাম পাইয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শন না থাকিলেও তিনি যে নান্যদেবের কাছে অথবা তাঁহারই সময়ে আর কাহারও কাছে পাইয়াছিলেন তাহা এক প্রকার স্থির; কেন না কামেশ্বরের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ ওয়েন ঠাকুর যে হরিসিংহদেবের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ নান্যদেবের সমসাময়িক লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চণ্ডেশ্বর কামেশ্বর ও হরিসিংহদেবের উল্লিখিত পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই সমসাময়িক ও দশম শাক শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক।

হরিসিংহদেব যেমন পরাক্রান্ত তেমনই আবার প্রজারঞ্জক ছিলেন। মিথিলার তাৎকালিক প্রজারা তাঁহাকে পিতা বলিয়া জানিতেন। হরিসিংহদেব বল্লালসেনের দৃষ্টান্তে আপন সাম্রাজ্য মিথিলার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এক পঞ্জী প্রণয়ন করান। সেই হইতেই মিথিলার ব্রাহ্মণের ভিতর দুই শ্রেণী হইল; এক মৈথিল আর এক শ্রোত্রিয়; ইহার ভিতর আবার গাঞি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। আজিও মৈথিলে শ্রোত্রিয়ে আদান প্রদান ও আহারাদি পর্য্যন্ত নাই। দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রোত্রিয়ই সম্মানী, তিনিই কুলীন। মহারাজ হরিসিংহদেব যাহা করিলেন, তাহা সকলেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিল।

হরিসিংহ পরাক্রমী ছিলেন, প্রজারঞ্জক ছিলেন, অশেষগুণে গুণবান্ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কপালে অধিক দিন রাজ্যভোগ ছিল না। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়; তাঁহার মত ক্ষত্রিয় মিথিলায় তখন আরও অনেক ছিল; তিনি সব করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু জাতি বশ করিতে পারেন নাই; তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বস্ব গেল। কিংবদন্তী হরিসিংহ দেব এক যবনের

অনুষ্ঠান করেন ; সমস্ত প্রস্তুত ; যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; যিনি রাজা তাঁহাকে অভিষিক্ত হইতে হইবে। হরিসিংহ রাজা ; তিনি নান্যদেবের বংশধর ; তিনিই অভিষিক্ত হইবেন। জ্ঞাতি ক্ষত্রিয়েরা বলিল, তাহা হইবে না, হরিসিংহকে অভিষিক্ত হইতে দিব না। ক্রমে যজ্ঞ নষ্ট হইল। হরিসিংহ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সহায়হীন ; শেষে সমস্ত ছাড়িয়া ফকির হইয়া চলিয়া গেলেন। নান্যদেবের বংশ এইখানেই পর্য্যবসিত হইল। হিন্দুস্থানে তখন মুসলমান রাজা। এ বার্ত্তা ক্রমে তাৎকালিক মুসলমান সম্রাটের কর্ণে উঠিল ; তিনি বিনা আয়াসেই রাজ্য দখল করিলেন। কিংবদন্তী এই সময়ে মুসলমান সম্রাটের সহিত কামেশ্বরের কি রকমে দেখা হয় ; কামেশ্বরের নিরীহতা ও কতিপয় সিদ্ধপুরুষোচিত অদ্ভুতগুণে নাকি সম্রাট বড়ই সন্তুষ্ট হন ; তাই তিনি কামেশ্বরকে মিথিলার রাজা হইতে বলেন। কামেশ্বর নাকি কিছুতেই উহা গ্রহণ করিতে চাহেন না। শেষে সম্রাটের আগ্রহাতিশয়ে স্বীকার করিলেন। মিথিলার দরিদ্র ব্রাহ্মণ কামেশ্বর রাজা হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে সনন্দ দিলেন। দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়েরা, যাহারা রাজপুত্র হরিসিংহকে সন্ন্যাসী করিয়াছে, তাহারা মুসলমান সম্রাটের ভয়ে আর মাথা তুলিতে পারিল না। মিথিলা মুসলমানের করদ রাজ্য হইল ; ব্রাহ্মণ রাজা হইলেন।

কামেশ্বরের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভোগীশ্বর, মধ্যম কুসুমেশ্বর, কনিষ্ঠ ভবসিংহ। কামেশ্বরের পর ভোগীশ্বর রাজা হইলেন। ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর যখন রাজা, তখন আবার চণ্ডেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র গণপতি ঠাকুরকে রাজবাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়। গণপতি ঠাকুর রাজা গণেশ্বরের পরম মিত্র ছিলেন। কবি বিদ্যাপতি এই গণপতি ঠাকুরেরই পুত্র। প্রবাদ গণপতি কপিলেশ্বর নামক মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া পুত্ররত্ন বিদ্যাপতিকে পাইয়াছিলেন। আজিও মিথিলায় কপিলেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান। বিদ্যাপতি বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্রের সহাধ্যায়ী ; ইঁহারা উভয়েই হরি মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। হরি মিশ্র পক্ষধর মিশ্রের পিতৃব্য। পক্ষধর ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন ; ইঁহারই নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়া নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি ইঁহাকেই বিচারে পরাস্ত করিয়া যান এবং গুরুর আলোককে নির্ব্বাপিত করিয়া আপনার দীধিতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করেন। বিদ্যাপতি মধুময় কবিত্ব লইয়া পাঠশালা হইতে বাহির হইলেন। রাজবাড়ীতে তখন বড় গোলযোগ উপস্থিত ; মহারাজ গণেশ্বর জ্ঞাতিবর্গের চক্রান্তে অকালে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি সুহৃদের শোকে অধীর। গণপতি পণ্ডিত ছিলেন, ধার্ম্মিক ছিলেন ; এ সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার রাজসংসারে আর ভাল লাগিল না। তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন ; তাহার পর হইতে তিনি নাকি ধর্ম্মকার্য্যে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। ইত্যবসরেই তিনি গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও গ্রন্থের ফল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য অর্পণ করেন।

গণেশ্বরের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ কীর্ত্তিসিংহ, কনিষ্ঠ বীরসিংহ। কীর্ত্তিসিংহ দেখিলেন, বড় বিপদ। কনিষ্ঠ পিতামহ ভবসিংহ তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্যের অর্দ্ধেক দিতে চাহেন। কীর্ত্তিসিংহ ভাবিলেন সে আবার কি ? আমার পৈতৃক রাজ্য আমি ভিক্ষা লইতে যাইব কেন ? গোলমাল না করিয়া চুপি চুপি একেবারে দিল্লীশ্বরের কাছে হাজির। দিল্লীশ্বর সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া কতকগুলি সৈন্য সহিত কীর্ত্তিসিংহকে আপন রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ ভবসিংহ গোলযোগ দেখিয়া বলিয়া বসিল, আমি নির্দ্দোষী, রাজ্যত কীর্ত্তিসিংহের, সে রাজা হইবে ইহাতে এত গোলযোগ যে কে করিল তাহা আমি জানি না ; গণেশ্বরের আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধেও আমি নির্দ্দোষ। যাহা হউক আর কোন গোলযোগ হইল না ; কীর্ত্তিসিংহ রাজা হইলেন। কীর্ত্তিসিংহ যখন রাজা, তখন আমাদের বিদ্যাপতি তাঁহার সভাপণ্ডিত। তিনি কীর্ত্তিসিংহের দিল্লী গমন হইতে পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কীর্ত্তিলতা বলিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থখানি আজও আর অন্ত কোথাও দেখি নাই ; কেবল নেপাল মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়েই তাহা দেখিতে পাইয়াছি। তাহার পর কীর্ত্তিসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা বীরসিংহ উভয়েই নিঃসন্তান হইয়া মরিলেন। ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহ রাজা হইলেন। দেবসিংহ যখন রাজত্ব পান, তখন তাঁহার পুত্র শিবসিংহ পরিণতবয়স্ক। যুবরাজ শিবসিংহ বুদ্ধিমান পরাক্রমী ও সাহসী ছিলেন ; তিনি অশ্বারোহণে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। বিদ্যাপতি অতি শৈশবে তাঁহার পরিচিত। সুবুদ্ধি সুরসিক শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে অমূল্য রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বিদ্যাপতি দেখিলেন এইবার মিলিয়াছে, যাহা খুঁজিতেছি তাহা পাইয়াছি। এই সময়েই বিদ্যাপতি কোকিল-প্রথম পঞ্চমস্বরের সৃষ্টি করেন ; এই সময় হইতেই জগৎ যাহা কখন শুনে নাই তাহা শুনিয়াছিল, আজও যাহার স্বরলহরী স্মৃতিজগতে সজীব হইয়া রহিয়াছে। হৃদয়বান্ হইলে যাহা হয়, প্রেমিক হইলে যাহা হয়, শিবসিংহ তাহাই হইয়াছিলেন। শিবসিংহ এতদূর সাহসী হইয়াছিলেন যে তিনি আপনাকে মুসলমানের অধীন বলিয়া মনে করিতেন না। ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে কর পাঠান বন্ধ করিলেন। দেবসিংহ উপযুক্ত পুত্রের অমতে কার্য্য করিতে পারিতেন না। কাজেই কর পাঠাইতে পারিতেন না, কিন্তু আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া যাইত। ক্রমে আতঙ্ক সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বরের সৈন্যগণ মিথিলা ঘেরোয়া করিল। দেবসিংহ পলায়ন করিলেন। কিন্তু শিবসিংহের অসীম সাহস, শিবসিংহ একাকী শত্রুসেনায় প্রবেশ করিলেন। তাহার পর শিবসিংহ ধৃত হইয়া দিল্লী প্রেরিত হইলেন, সেখানে কারাগারে তাঁহার স্থান হইল। দেবসিংহ বশ্যতা স্বীকার করিলেন, তাঁহার রাজ্য বজায় রহিল। কিন্তু সে রাজ্যে তাঁহার সুখ কি ? তাঁহার প্রিয়তম পুত্র কারাগারে। বিদ্যাপতি ভাবিলেন শিবসিংহ নাই, রাজসংসারে আর কি করিতে থাকিব ? আমি কোথা হইতে আর পঞ্চমস্বরে ডাকিব ? আবার সে রসাক্রম কোথায় ? বিদ্যাপতি একেবারে দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত। অনেক চেষ্টা করিয়া দিল্লীশ্বরের দর্শন

গাইলেন; একেবারে পঞ্চমে সুর বাঁধিলেন। মুসলমান মোহিত হইয়া গেল। বিদ্যাপতি শিবসিংহের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। শিবসিংহ মুক্ত হইলেন। কবিবর বিদ্যাপতি শিবসিংহকে লইয়া মিথিলায় আসিলেন; দেবসিংহের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বিদ্যাপতির যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কবিত্বে বিদ্যাপতি মুসলমান সম্রাটকে জয় করিলেন।

তখন হইতেই বিদ্যাপতির আওয়াজ খুলিল। মিথিলার একপ্রান্তে বসিয়া বিদ্যাপতি যে সুর ধরিয়া গিয়াছিলেন তাহাই প্রবাহরূপে বাঙ্গালায় বহিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সেই প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে দক্ষিণাপথে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

স্বাধীনচেতা শিবসিংহের অন্তঃকরণে বিদ্যাপতির উদার মধুর ভাব গাঁথিয়া গেল। বিদ্যাপতি সুর, শিবসিংহ তন্ত্রী; বিদ্যাপতি না হইলে শিবসিংহ অচেতন, শিবসিংহ না হইলে বিদ্যাপতি অস্তিত্বহীন।

প্রকৃত কবি হইলে যাহা হয় বিদ্যাপতি তাহাই হইলেন। বিদ্যাপতি ভক্ত হইলেন, বিদ্যাপতি প্রেমিক হইলেন। স্বাধীনচেতা শিবসিংহ আরও বিশালমনা হইলেন, তিনি মুসলমানের অধীন হইতে চাহিলেন না। বৃদ্ধ পিতা অনেক বারণ করিলেন, তথাপি শিবসিংহ আবার দিল্লীতে কর প্রেরণ বন্ধ করিলেন। সম্রাট্ এবার স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েশ্বরকে আসিয়া সমবেত হইতে বলিলেন।

এসব ব্যাপার শিবসিংহের অবিদিত রহিল না। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ এমন সময়ে পীড়িত হইলেন। ক্রমে পীড়া বর্দ্ধিত হইল; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেবসিংহ গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ওদিকে মুসলমানও আসিয়া পড়িল, এদিকে দেবসিংহও গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন। শিবসিংহ পিতার সৎকার করিয়াই রণস্থলে পতিত হইলেন; মুসলমান সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; শিবসিংহের জয় হইল। মুসলমান বিজয়ী শিবসিংহ মিথিলার শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দেশে আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিদ্যাপতি নগরে নগরে গাহিয়া বেড়াইলেন, তোমরা সকলে শুন তোমাদের রাজা শিবসিংহ কি করিয়াছেন। তোমাদের রাজা

অনলরন্ধ্র কর লক্খণ নরবই সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ্পই জাউলসী॥
দেবসিংহ জং পুহমী ছড্ডই অদ্ধাসন সুররাঅ সরু।
দুহু সুরতান নিন্দে অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥
দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুণ্ন বলিও।
সত্তবলে গঙ্গা মিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥

একদিস যবন সকল দল চলিও একদিস সোঁ জমরাঅ চরু।
দুহুএ দলটি মনোরথ পুরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু॥
সুরতরুকুসুম ঘালি দিস পুরেও দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভেঁ গগন ভরু॥
আরম্ভীঅ থস্তেটি মহামখ রাজসুঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘরদান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইঠৌ উছবৈ বিসরি গও॥

হে নগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্ব্ব রাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লাক্ষ্মণাব্দে চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন। রাজ্য রাজশূন্য হয় নাই; তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন; শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান্। তিনি সম্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহ্নবীর অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভস্মীভূত করিয়া কটাক্ষমাত্রে যমরাজ সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তাহার পর যবনরাজ, তাঁহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য; তোমাদের নূতন রাজা অকুতোভয়; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে; দেখ নাই; আকাশে সারি গাঁথিয়া দেবতাগণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই না সুরতরু কুসুম পড়িতে লাগিল। সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।

বিদ্যাপতি এইরূপে শিবসিংহের কীর্ত্তি গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিবসিংহ রাজা হইলেন। দান যে কতই হইল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যে অব্দে শিবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন সেই অব্দেই বিদ্যাপতিকে তিনি তাঁহার স্বগ্রাম বিষয়িবার বিস্ফী গ্রামটী শাসনরূপে দান করিয়াছিলেন। তিনি একখানি তাম্রময় শাসনপত্রে লিখিয়া দিলেন :—

স্বস্তি গজরথেত্যাদিসমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমানশ্রীমদ্রামেশ্বরীবরলব্ধপ্রসাদ-ভবানীভবভক্তিভাবনপরায়ণ-রূপনারায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎ-শিবসিংহ-দেবপাদাঃ সমরবিজয়িনঃ। জরইল তপ্পায়াং বিসপীগ্রামবাস্তব্যসকল-লোকান্ ভূকর্ষকাংশ্চ সমাদিশন্তি মতমস্ত। ভবতাং গ্রামোঽয়মস্মাভিঃ সপ্রক্রিয়াভিনবজয়দেবমহারাজপণ্ডিতঠক্কুরশ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽতো যূয়মেতেষাং বচনকরীভূয় কর্ষণাদিকং কর্ম্ম করিষ্যথেতি লসং ২৯৩ শ্রাবণ শুদি সপ্তম্যাং গুরৌ। শ্লোকাস্তু।

অব্দে লক্ষণসেনভূপতিমতে বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে মুনিতিথৌ পক্ষেঽবলক্ষে গুরৌ।
বাগ্‌বত্যাঃ সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহবিবৃদ্ধবাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যেসভং ॥

ইত্যাদি আরও ৭টী শ্লোক আছে। তাম্রশাসনে আমরা দেখিতে পাইলাম মহারাজ শিবসিংহের রাজধানীর নাম গজরথপুর; উহা বাগ্‌বতী নদীর তীরবর্ত্তী। এখনও গজরথপুর বলিয়া একটী গ্রাম দ্বারভাঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে আছে; উহাও বাগবতী নদীর তীরে; উহাই যে সেই গজরথপুর তাহা মিথিলা প্রদেশে সকলেই বলেন।

মহারাজ শিবসিংহ যখন রাজ্যাভিষিক্ত হন তখন তিনি প্রৌঢ়; কিন্তু তখনও তাঁহার সন্তান হয় নাই এবং পরেও তাঁহার সন্তান হয় নাই। শিবসিংহ রূপনারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রবাদ রূপনারায়ণ শিবসিংহ রাজ্যাভিষেকের পর তিন বৎসর রাজত্ব করিলে আবার মুসলমান সম্রাট বিপুল আয়োজনে মিথিলা আক্রমণ করেন। শিবসিংহ বুঝিলেন এবার আর নিস্তার নাই। রাজাবনৌলিগ্রাম নেপাল পাহাড়ের পাদদেশে। তথায় তখন দ্রোণবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। শিবসিংহের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাপতি এ বিপদের সময় মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য রাণী লখিমাকে লইয়া তথায় চলিয়া গেলেন। শিবসিংহ একাই রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। যেদিকে সম্রাট সেইদিকে বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইলেন। শিবসিংহ তরবারির অগ্রভাগ দিয়া সম্রাটের শিরস্ত্রাণ উড়াইয়া দিয়া সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে বিপক্ষ সেনা ছুটিতেছিল; মুসলমান সম্রাট বলিলেন শিবসিংহকে ধরিয়া কাজ নাই; শিবসিংহ যে মুহূর্ত্তে আমার শিরস্ত্রাণ উড়াইয়াছেন সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে হত্যা করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বীরের মত আমাকে দেখাইয়া আপন স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে বিহার করিতে চলিয়া যাইবেন। আর উঁহাকে ধরিয়া কাজ নাই। আর যুদ্ধেও কাজ নাই; বুঝিয়াছি শিবসিংহ আর ফিরিবেন না; অনুসন্ধান কর শিবসিংহের আর আছে কে; তাহাকেই এ রাজ্য দিয়া চল আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। তাহাই হইল। শিবসিংহের থাকিবার মধ্যে পত্নী লখিমা, তিনিও তখন রাজা বনৌলি গ্রামে। সম্রাট তাঁহাকে রাজত্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। লখিমা রাণী হইলেন। বিদ্যাপতি যেমন ছিলেন তেমনই রহিলেন। শিবসিংহের অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না; তিনি সর্ব্বদাই শিবসিংহকে দেখিতে পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কবিত্ব তখন আরও সজীব হইয়া উঠিল কিন্তু পতিপ্রাণা লখিমা বেশী দিন বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না, অল্প দিনের মধ্যেই সংসার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাহার পর শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ রাজা হইলেন; তাঁহার পর তাঁহার পত্নী বিশ্বাসদেবীকে মিথিলার রাণীপদে

দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি [illegible] [illegible] সময়ে তিনি [illegible] বাক্যাবলী প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মবিষয়ক [illegible]। [illegible] পর দেবসিংহের বংশে যবনিকা পড়িল। তাহার পর দেবসিংহের [illegible] হরসিংহের পৌত্র ধীরসিংহ রাজা হইলেন ;* ইনি হৃদয়নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। হৃদয়নারায়ণ ধীরসিংহ কোন্ সালে রাজা হন, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; তবে তিনি যে ৩২১ লাক্ষ্মণাব্দে মিথিলার রাজা ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দারভাঙ্গা মহারাজের লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকাবলী দেখিতে দেখিতে সেতুদর্পণী নামে একখানি পুরাতন [illegible] পুথি পাই ; উহা মহাকবি কালিদাস প্রণীত সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত কাব্যের টীকা ; উহার গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনিবাস। গ্রন্থখানির শেষে লিপিকাল দেওয়া আছে ; যথা—

পরমভট্টারকেত্যাদিমহারাজাধিরাজশ্রীশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবীয়ৈকবিংশত্যধিকশতত্রয়তমাব্দে কার্ত্তিকামাবস্যায়াং শনৌ সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমানরিপুরাজকংসনারায়ণশিবভক্তিপরায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীশ্রীমদ্ধীরসিংহসভুজ্যমানায়াং তীরভুক্তৌ * * শ্রীরত্নেন চরেণ * * লিখিতমদঃ পুস্তকমিতি।

তাহা হইলে ৩২১ লাক্ষ্মণাব্দে ধীরসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ভৈরবসিংহ। তিনি যখন মিথিলার রাজা, তখনও আমরা বিদ্যাপতিকে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতি মহারাজ ভৈরবসিংহের সময়ে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর সমাপ্তি বাক্যের অগ্রে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়—

ভূপঃ শ্রীভবসিংহবংশতিলকঃ শ্রীদর্পনারায়ণঃ
স্বাত্মানন্দনন্দনক্ষিতিপতিঃ শ্রীধীরসিংহঃ কৃতী।
শক্রশ্রীঃ সহভূরূপেন্দ্রমহিতশ্রীভৈরবক্ষ্মাভুজো
দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং তস্যাস্তু সৎপ্রীতয়ে॥

ভৈরবসিংহের পর রামভদ্র রাজা হন। বিদ্যাপতি এই রামভদ্রের সময়েই লোকান্তর গমন করেন।

বিদ্যাপতি যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর মিথিলার অধীশ্বর। তাহার পর মিথিলায় কত জন রাজা হইলেন ; কামেশ্বরের বংশও প্রায় শেষ হইয়া আসিল ; বিদ্যাপতি তখনও জীবিত। কামেশ্বরের বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মীনাথ। তাঁহার পর আর এই বংশের কাহাকেও দেখা যায় না। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন ; শিবসিংহের পরবর্ত্তী রাজারাও অল্প অল্প দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি [illegible] মিশ্রের খুড়া হরিমিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিতেন ; পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি কীর্ত্তিসিংহের সভাপণ্ডিত হইলেন ; কীর্ত্তিসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি প্রথমেই কীর্ত্তিলতা [illegible]

* ৩২ পৃষ্ঠা শেষ পংক্তিতে বিশ্বাস দেবী স্থলে [illegible] দেবী মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহা সংস্কৃতে রচিত। তাঁহার কবিত্বকুসুমের এই প্রথম বিকাশ। শিবসিংহ রাজা হইলে সেই মুকুলিত কুসুমের অস্ফুট গন্ধ তাঁহার মনোহরণ করিল; তিনি তাঁহাকে সাদরে মাথায় তুলিলেন; বিদ্যাপতি এত দিনের পর প্রকৃত স্থান পাইলেন। এইবার তাঁহার পূর্ণ বিকাশ। শিবসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি তাঁহার নিরুপম পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ক্রমে তিনি এক জন ভক্ত সাধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবসিংহকেও তাহাই করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভক্ত শিবসিংহ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও বিদ্যাপতি অটল ভাবে সংসারের দুঃসহ বেগ সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রাজসংসারে থাকিতেন বটে; কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। শিবসিংহ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর তিনি আর গান গাহেন নাই, তাহার পর তাঁহার গঙ্গাবাক্যাবলী প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির স্বগ্রাম বিস্ফী দেখিতে গিয়াছিলাম। এখন আর তথায় তাঁহার বংশীয়েরা কেহই নাই;—প্রায় চারি পুরুষ হইল, তাঁহার বংশধরেরা সে গ্রাম ছাড়িয়া সৌরাট নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বিস্ফীতে এখন আর কিছুই নাই। আছে কেবল তাঁহার বাস্তুভিটার ভগ্নাবশেষ; ভগ্নাবশেষই বা কেন, কেবল স্মৃতি চিহ্ন। খানকটা খুব উচ্চ ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে বলে উহাতেই তাঁহার বাটী ছিল; বাটী বোধ হয় মেটেই ছিল। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় একটী সুড়ঙ্গ—এখন অনেক বুজিয়া আসিয়াছে; জঙ্গলও হইয়াছে। প্রবাদ এই অন্ধকার স্থানে বসিয়াই নাকি তিনি চরমের আলোকের অনুসন্ধান করিতেন। আর আছেন এক লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব। বিদ্যাপতি স্বয়ং ইঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আগে ইঁহার পাকা মন্দির ছিল; এখন আর সে মন্দিরের কিছুই নাই; চারিদিকে মাটীর দেওয়াল আর উপরে চাল। লিঙ্গটী যেখানে আছেন, তাহা একটী অন্ধকারময় কূপ, সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না;—সিঁড়ি আছে, নামিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিতে হয়। এখনও তাঁহার নিত্য পূজা হয়। বিদ্যাপতির ভিটার ধারে কমলানদী প্রবাহিত; এখন নদীরও বেগ মন্দ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি আপন জীবনের শেষ বুঝিতে পারিয়া স্বগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে আসিতেছিলেন। প্রায় ক্রোশ দুই বাকি আছে, আর যাইতে পারেন নাই;—বাজিতপুর পর্য্যন্ত আসিয়া চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি নাকি কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমি এতদূর মার জন্য আসিলাম, মা কি আমাকে লইতে এতটুকু আসিতে পারিবেন না। প্রবাদ সেই রাত্রির মধ্যেই গঙ্গা তথায় আসিয়াছিলেন; সেইখানেই তিনি আনন্দভরে পার্থিব দেহ ত্যাগ করেন। এখন বাজিতপুরে গঙ্গার একটী স্বল্প প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের ইহা একটী মহাতীর্থ। এইরূপে বিদ্যাপতি মনুষ্যসমাজকে মোহিত করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

অষ্ট বৎসর রূপ আগে গেলা বৃন্দাবনে ।
সনাতন [গোস্বামি] দেখা সুখ নাহি মনে ॥
রাত্রদিবা ভাবে রূপ গৌরাঙ্গ চরণ ।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন ॥
এই বাঞ্ছা করিয়া ফিরিল বৃন্দাবন ।
যুগলকিশোর পদ করি আরাধন ॥
পাৎসার উজির হইআছিলা সনাতন ।
রূপের লাগিআ সদা স্থির নাহি মন ॥
গৌরাঙ্গপদারবিন্দে করি আরাধন ।
বিষয়বন্ধন মোর করহ মোচন ॥
বিষয় বিষের জ্বালা সহন না জায় ।
হৃদয়ে পুড়িয়া মরি কি হবে উপায় ॥
এই ভাবে রাত্রদিয়া কান্দে সনাতন ।
না ধরে নয়ানের জল বিরস বদন ॥
দেখিআ সঙ্গের লোক জে জন অজ্ঞান ।
মনে মনে ভাবি সবে হএ চমৎকার ॥
যুক্তি পরামিস সবে করে আনে পানে ।
সত্বরে জানাইল গিআ পাৎসার কানে ॥
সাহেব সেলাম করি অবেজ মোর এক ।
উজির ঠাকুর কান্দে নাহি জানে ভেদ ॥
সুনিআ উকিল মুখে হইলা বিস্মিত ।
আন দেখি সনাতন আছে কুন জিত ॥
হুকুম হইল সনাতন আনিবারে ।
ধাইআ চলিলা উকিল সনাতন তরে ॥
আবেশ হইয়াছেন শয্যা করিআ ।
হেন কালে উকিল [illegible] [illegible] ॥
উজির ঠাকুর বলি [illegible] [illegible] ।
নিদ্রা হৈতে চমকিআ উঠিলা সনাতন ॥

সকল উকিল তবে করিলা নমস্কার।
পাৎসার হুজুর হৈছে হুজুর জাইবার।
হুকুম মানিআ হুজুর চলিলা সনাতন।
পাৎসার হুজুর গিআ দিল্লা দরশন॥
হুজুরা করিআ দাড়াইলা সনাতন।
পাৎসা পুছেন বাহিরে রহ কি কারণ॥
এ কথা সুনিআ সনাতন তবে হাসে।
কুন বেটা এমত কথা কহে তুমার পাশে॥
সে জন আমার বৈরী মিথ্যা কথা কহে।
মুকাবিলা হৈলে জানি কেমন মহাশয়ে॥
ঈষৎ হাসিআ পাৎসা কহিলা বচন।
মিথ্যা না কহিয় কিছু অহে সনাতন॥
তুমার ভাই শ্রীরূপ আছিল প্রিয়পাত্র।
হামেসা বৈঠক ছিল শয়ন একত্র॥
হেন প্রাণের রূপ প্রিয় গেল জেই দেশে।
হেন বুজি জাইবা তুমি তাহার উদ্দেশে॥
পড়ার মধ্যে সেক হেবু বাড়ি ফতেপুর।
হামেসা থাকয়ে সেই পাৎসার হুজুর॥
তাকে বোলাইআ পাৎসা কহে বারবারে।
সনাতন হাহল আঁজি করিল তুমারে॥
সোণার পাখে ঢাকিআ রাখ পুতা দরে।
সাবধানে রাখ জেন জাইতে না পারে॥
এই মত পাৎসার হুকুম হইল তারে।
সনাতন রাখে নিআ বন্দী [কারাগারে]।
পাশে পাশে প্রহরী থাকয়ে অবিরত॥
সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত আছেন এই মত॥
সেক হেবুকে ডাকিআ বলেন সনাতন।
আমাকে [লইয়া] তুমার কুন প্রয়োজন॥
সেক হেবু কহে সাহেব কি বল আমারে।
পাৎসার হুকুম বিনে কে করিতে পারে॥

আমা হৈতে কুন কার্য্য [কর] উপদেশ।
তুমার দুঃখ দেখি মর তনু হৈল শেষ॥
এ কথা সুনি হাতে ধরি বলে সনাতন।
বন্দি হৈতে তুমি মোরে করহ মোচন॥
পায়ে ধরি সেক হেবু করে নিবেদন।
কিরূপে করিব আমি বন্দিতে মোচন॥
এ কথার যুক্তি আমি লৈমু কার পাশ।
তুমাকে ছাড়িআ দিলে আমার সর্ব্বনাশ॥
তবে সনাতন বলে ভয় নাহি তব।
ইহার উপদেশ আমি কহি শুন তব॥
এক লক্ষ মুদ্রা আছে দিব আমি তরে।
যদি পাৎসা তলপ করে হাজার দিঅ তারে॥
এই হুকুম রাখিয় ধন তারে দিআ।
বহু ধন পাইলে পাৎসা দিবেন ছাড়িঞা॥
জে আজ্ঞা মানিআ হেবুক পড়িল পায়ে।
জে হৌক সে হৌক প্রভু আমার উপায়ে॥
ইহা সুনি লক্ষ মুদ্রা দিলা তার হাতে।
ছুড়া হৈয়া সনাতন জায়ে রাজপথে॥
জয় জয় গৌরাঙ্গ বোলি সিংহগতি ধায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক দেখি দূরেতে পালায়॥
দুই প্রহর রাত্রি শেষে গেলা নদীতীরে।
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে উচ্চস্বরে॥
সমুদ্র তরঙ্গ দেখি কান্দে উচ্চরায়ে।
কেমতে হইব পার না দেখি উপায়॥
এই দুঃখ মনে ভাবি রহে কতক্ষণ।
হেন কালে কুম্ভীররাজ দিল দরশন॥
কুম্ভীর দেখিআ তবে আনন্দিত মন।
ঊর্দ্ধবাহু করিঞা ডাকেন সনাতন॥
আমারে কর তুমি এই নদী পার।
তুমারে করিব স্মরণ চির যত কাল॥

সনাতন হুঙ্কার কুম্ভীর মহাবীর।
কূলে আসি উঠি করে সপ্ত প্রদক্ষিণ ॥
সনাতন বলে হরির নাম দিব তরে।
আমার সেবক করি ঘুষিব সংসারে ॥
হরির নাম মহামন্ত্র কর্ণে দিল তার।
তাহার কান্ধেতে চড়ি নদী হৈলা পার ॥
তিন তিন দিনের পথ জায় এক দিনে।
উন্মত্ত হইআ ধায়ে বাহ্য নাহি মনে ॥
পবনের গতি হৈআ চলে নরেশ্বর।
সুনিলেন গৌরাঙ্গ চান্দ আছে কাশীপুর ॥
নিকটে জাইতে অঙ্গ কাঁপে থরথর।
দারিদ্রে পাইল জেন পরশ পাথর ॥
দাড়াইঞা অন্তপ্পুরে ভাবে মনে মনে।
কিরূপে জাইব আমি প্রভু দরশনে ॥
ফকির ফকির বলি ডাকে সর্ব্বজন।
মহাপ্রভু জানিলা আশিলা সনাতন ॥
অন্তরে উল্লাস বড় পুলক শরীর।
আনহ ডাকিঞা দেখি কেমত ফকির ॥
ফকির ফকির বুলি ডাকে এক জনে।
আহ আহ প্রভু দেখা কর এইক্ষণে ॥
এ কথা সুনিআ তবে হইলা কাতর।
দশনে ধরিআ তৃণ চলিলা গোচর ॥
মহাপ্রভু দেখিআ উঠিলা সেই ক্ষণ।
দণ্ডবত্ত হইআ পড়িলা সনাতন ॥
উঠ উঠ বলিআ করিলা আলিঙ্গন।
চিরদিনে পাইলাম তুমার দরশন ॥
অস্পর্শ পামর মুই অতি বড় হীন।
আমাকে স্পর্শিতে প্রভু নাহি কুন দিন ॥
তবে জে করুণা কর আপনার গুণে।
দেখিলে নিন্দিব সব পাষণ্ডির গণে ॥

এ বুল শুনিতে [illegible] [illegible] ছুবাল।
মুহেন পামর পাপী বাই ক্ষিতিতলে॥
তুমার চরণে এই করি নিবেদন।
বৃন্দাবনে রূপ সঙ্গে হউক মিলন॥
প্রভু বলে এ ● ● লম্ভিব তুমার।
দুই ভাই বৃন্দাবনে করহ বিহার॥
চান্দমুখে বলে গোরা চল শীঘ্রগতি।
অবিলম্বে পাইবা তুমি সেই নরপতি॥
আজ্ঞা বলবান করি করিলা গমন।
কালিন্দী যমুনা বলি করিলা স্মরণ॥
এথা হইতে সনাতন গেলা বৃন্দাবনে।
রূপ সঙ্গে দেখা হৈল ভাণ্ডীর মহাবনে॥
দেখিঞা শ্রীরূপ গোসাঞি আনন্দিত মন।
দারিদ্রে পাইল জেন পুতাবাঞ্ছা ধন॥
রূপে কান্দে সনাতনের ধরিঞা চরণ।
এতকাল পরে মরে করিলা স্মরণ॥
ইহা শুনি কোলেত করিলা সনাতন।
না কান্দ না কান্দ ভাই স্থির কর মন॥
রূপে বলে তুমা সঙ্গ পাইল চিরদিনে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা কহ সনিয়ে শ্রবণে॥
তবে সোনাতনে বলে প্রভু কাশীপুরে।
তুমা প্রতি যত কৃপা কত কহিব তারে॥
সনাতন সঙ্গে রূপ বসি একাসনে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ কথা আর নাহি মনে॥
বৃন্দাবনে পরিক্রমা করে দুইজন।
হা হা নিত্য নিত্য বলি করয়ে রোদন॥
● ● ● বলি ভুমিতে লুটায়।
অমৃতমঞ্জরী জেন পাথারে মিলায়॥
কান্দিতে কান্দিতে দুহে হৈলা অচেতন।

নানা জাতি পক্ষী কান্দে হেরিঞা বয়ান।
কমল মুদিত হয়ে দেখিআ নয়ান ॥
হাহাকার হইল সকল বৃন্দাবন।
পাষাণ * * কান্দে কি কারণ ॥
কে জানি কান্দিআ ফিরে যমুনার তীরে।
কেহুত ইহার ভাব বুজিতে না পারে ॥

* * * * *

যে দিন যেখানে জায়ে সেইখানে রহে ॥
এইমত পরিক্রমা করে দুই জনে।
কথ ক্ষণ পরে আইলা গিরি গোবর্দ্ধনে ॥
গোবর্দ্ধন বন্দিআ বসিলা দুই ভাই।
সেই স্থানে জিজ্ঞাসিলা শ্রীরূপ গোসাঞি ॥
সুন সুন মহাপ্রভু করি নিবেদন।
কহ দেখি নিত্য কথা করিয়ে শ্রবণ ॥
কেমতে বা নিত্য রহে কাহার উপরে।
কাহা হৈতে উদ্ভব হৈল কহত আমারে ॥
কুন বর্ণ হয়ে সেই কিসের গঠন।
চন্দ্র সুর্য্যের গতি নাই কিসের কারণ ॥
পবনের গতি নাই মনের অগোচর।
কুন গতি পায়ে সেই কহ নরেশ্বর ॥
আর এক নিবেদন সুনহ বচন।
স্বাধীন বিজয়ে হয়ে কিসের পতন ॥
শ্রীমন্দির কিসে হইতে হইল নির্ম্মাণ।
সুনিবারে চাহি কিছু ইহার বিধান ॥
কাহা হৈতে উদ্ভব হইল সেই স্থান।
কথ খানি দীর্ঘ হয়ে প্রস্থ প্রমাণ ॥
কোথা হতে জীব সব করে গতাগতি।
সে জন বা হয়ে কোথা তার যেই স্থিতি ॥
কিশোরকিশোরী আদি অষ্ট সপ্তগণ।
কাহা হৈতে উদ্ভব হয়ে কহত কারণ ॥

এই সকল উদ্ভব জাহা হৈতে মরে।
নাম বর্ণ ভেদ করি কহ মহাশয়॥
কুন মূর্ত্তি ধরি সেই রহে কুন স্থানে।
কৃপা করি কহ মরে সুনিঞ শ্রবণে॥
সুনিঞা এ সব কথা গোসাঞি সনাতন।
দুই ভাই গলাগলি করয়ে রোদন॥
ভাবেত কম্পিত তনু টলমল করে।
পর্ব্বতের জল জেন ভূমে আশি পড়ে॥
থরথরি করি কাপে সর্ব্ব কলেবর।
অচেতন হইআ পড়েন নরেশ্বর॥
দুই প্রহর অবধি দুহার নাহিক চেতন।
চৈতন্য করিতে হেন নাহি কুন জন॥
হেন কালে মহাপ্রভু নিজ মূর্ত্তি ধরি।
রূপ সনাতন বলি ডাকয়ে ফুকারি॥
মধুলোভে অলি রহে পদ্মের ভিতরে।
দুই ভাই রহিলা ডুবি প্রেমের সাগরে॥
অঙ্গে হস্ত দিআ প্রভু কহে নিত্যকথা।
নিত্যশক্তি তুমার হইব বিজ্ঞ সর্ব্বথা॥
উঠ রূপ সনাতন উঠহ ত্বরিতে।
নিত্যনির্ণয় কথা করহ বিদিতে॥
তুমা হৈতে জীব সব পাইব পরিত্রাণ।
তুমি বিনে কে জানিবে ইহার সন্ধান॥
এইমত স্বপ্ন দেখি উঠিলা দুই ভাই।
চক্ষু মেলি দেখিলা সেখানে কেহ নাই॥
হাহাকার করিয়া কান্দেন দুই ভাই।
প্রবোধ দিআ মহাপ্রভু গেলা কুন ঠাই॥
এইমত বিলাপ করিআ কথো ক্ষণ।
তারপরে নিত্যকথা পড়িল স্মরণ॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞামত অর্থ অনুসারে।
নিত্যনিরূপণ কথা কহে নরেশ্বরে॥

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পরে জেই স্থান।
তাহার অবধি সুন হৈঞা সাবধান॥
যখনে আছিল সব ঘোর অন্ধকার।
তদবধি নাহি ছিল দিবার প্রচার॥
চম্পক-কলিকা নাম সূর্য্যের আকার।
সরণি টীকাতে কহে ইসব বিচার॥
নপুংসক শরীর আপনি একেশ্বর।
কোশ বীজমূর্ত্তি অঙ্গ নবীন সুন্দর॥
বৈকুণ্ঠের পরাৎপর জেই স্থান হয়।
অখণ্ড মণ্ডল সেই টল নাহি হয়ে॥
তাহার উপরে আছে গুপ্ত চন্দ্র গ্রাম।
সেই স্থানে আছে এক চম্পককলিকা নাম॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ এক নাহি হয়ে।
জন্ম জরা মৃত্যু ব্যাধি নাহিক সংশয়॥
পরম পুরুষ সেই নাহি তার পর।
আদি অন্ত কহিতে না পারে মহেশ্বর॥
চারি বেদে যার গুণ গণিতে না পায়।
হাহাকার করি ব্রহ্মা কান্দিয়া বেড়ায়॥
চম্পক-কলিকা নাম চারি বেদের পর।
জে শরীর হৈতে হৈল যুগল কিশোর॥
সুনিঞা এ সব কথা সনাতনমুখে।
শ্রীরূপে পুছেন তত্ত্ব পরম কৌতুকে॥
এমত অপূর্ব্ব কথা না সুনিছি আর।
রজনী লভিলা জন্ম কেমত প্রকার॥
কর্ণে সুনিলে হয়ে হৃদয়ে প্রবোধ।
তিনে এক হৈলে বুঝে মনুষ্য মুগধ॥
বিনে গর্ভবাসে জন্ম নাহি কুন লোকে।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হয়ে কুন রূপে॥
নাহি সুনি এ সব কথা কুন যুগপুরাণে।
বহুভাগ্যে এ সব কথা সুনিল শ্রবণে॥

জন্মজন্মান্তরের পাপ জেই জেই লিখন।
খণ্ডিল সকল পাপ তুমার কারণ॥
ইহা বলি অশ্রু বহে নয়ান যুগলে।
পড়িলা কাতর হৈঞা সনাতনের কোলে॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে সুয়াস্থ্য না পায়।
ধরি সনাতন পদে ধরণী লুটায়॥
রূপকে ধরিঞা উঠাইলা সনাতন।
সনাতনে বোলে রূপ স্থির কর মন॥
সে কথা কহিয়ে সুন অবধান করি।
জেরূপে উদ্ভব হৈলা কিশোরাকিশোরী॥
এ কথা সুনিআ রূপ যুড় করি হাত।
আজ্ঞা কর কর্ণে সুনি দুঃখ যাউক পাত॥
যুগলকিশোর পদ করি আরাধন।
উদ্ভবনির্ণয় শ্লোক পড়ে সনাতন॥
চম্পক-কলিকাতত্ত্ব সুন এক মনে।
জেরূপে আছয়ে সেই অখণ্ড ভুবনে॥
অচেতন যোগনিদ্রা চিরকাল ধরি।
অষ্টবীজে মঞ্জরী অষ্ট সতত বিহারী॥
ক্লীং শ্রীং দুই বীজ ধরে বাহুমূলে।
চক্ষু মধ্যে জ্যোতি জেন আছএ বিরলে॥
এক অভিমত সেই কিশোরাকিশোরী।
রূপে রসে ডগমগি আনন্দবিহারী॥
রূপের ছটা রসে লাগে রসের ছটা রূপে।
দিবস রজনী ভেদ এই অনুরূপে॥
সনাতন মুখে সুনি এসব বিচার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রূপ পুছে পুনর্ব্বার॥
কিরূপে রাত্রি হয়ে দিবা কুনরূপে।
কৃপা করি কহ সুনি এসব কৌতুকে॥
বেদ বিনে শূন্য কথা নাহি জ্ঞানলোকে।
অপূর্ব্ব অমৃত কথা তুমি কহ মুখে॥

মুখের লাবণ্য দেখি হাসে সনাতন।
এতেক সন্ধান নাহি জানে কুন জন॥
রাত্রি বল দিবা বল সবে দুইজন।
দিবারাত্রির কথা সুন হৈআ একমন॥
পূর্ব্বে জে কহিআছি ঘোর অন্ধকার।
তদবধি নাহি ছিল দিবার প্রচার॥
চম্পক-কলিকানাম আদি তত্ত্ব সার।
সরণি টীকায় কহে এ সব বিচার॥
বাম ভুজ পানে হয়ে দিবার প্রচার।
দক্ষিণ ভুজ পানে হয়ে ঘোর অন্ধকার।
চতুষ্প্রহর দিবা হয় রাত্রি চাইর প্রহর।
অঙ্গের বরণে হয়ে এই দিবাকর॥
উত্তরের পরিবর্ত্ত দিলা সনাতন।
পুনর্ব্বার রূপে কিছু করে নিবেদন॥
যোগনিদ্রা কারে বলি কেমত প্রকার।
কিরূপে চৈতন্ত তবে হইল তাহার॥
এ কথা সুনিতে বাঞ্ছা অতি বড় মনে।
নির্ণয় করিয়া তত্ত্ব কহত আপনে॥
তুমার মুখের জেই সেই তত্ত্ব সার।
তাহার উপরে নাই করিতে বিচার॥
তবে সনাতনে বলে কহিয়ে তুমারে।
চৈতন্ত পাইলা জেই জেই অনুসারে॥
পঞ্চ আত্মা পঞ্চ স্থানে আছে নিয়োজিত।
কার সঙ্গে করে দেখা হয়ে সমুচিত॥
প্রাণের সহিতে প্রাণের না হৈল মিলন।
তদবধি অবধি আছিল অচৈতন্ত॥
উদান অপান সমান তিন জন।
এই তিন প্রাণের সনে করায়ে মিলন॥
প্রাণে বলে সুনহ তুমরা তিনজন।
ধ্যান অচেতন নিদ্রা জায়ে কি কারণ॥

যুড় হস্ত করি তবে কহে তিন জন।
অঙ্গ সঙ্গ করি ধ্যান হয়ে অচেতন॥
প্রাণনাথ সনে তবে এতেক বিচার।
এমত পাপিষ্ঠ জন আছে কেবা আর॥
এই মতে আর্ত্তনাদ করি কথক্ষণ।
উদানে ডাকিআ করে আত্ম নিবেদন॥
মনকে জানায় গিআ এই সমাচার।
আমা হৈতে না হৈল উহার প্রতিকার॥
উদানে কহিল গিয়া মনের গোচর।
ধ্যান অচেতন দেখি প্রাণ কাতর॥
ই কথা সুনিলা যদি উদানের মুখে।
করিলা চৈতন্য মনে পরম কৌতুকে॥
উঠ উঠ ধ্যান তুমি কেবল বর্ব্বর।
তুমার অচেতনে প্রাণ আছেন কাতর॥
এ বুল সুনিঞা তবে উঠে কাল দিআ।
যোগনিদ্রা হৈল ভঙ্গ চমকিত হৈআ॥
প্রাণের সহিত হৈল পঞ্চ সহোদর।
রূপে রসে করে নিত্য বাহুর উপর॥
সুনিয়া এ সব কথা আনন্দ অন্তরে।
কহিবারে চাহে রূপ বচন না সরে॥
মহাভাবের বরণ সকল কলেবর।
ডুবু ডুবু করে আখি প্রেমের সাগর॥
বুক বইয়া ধারা বহে ওষ্ঠ থর থর।
কহিতে না পারে প্রেমে বিভুল অন্তর॥
দেখিআ এসব রীত গোসাঞি সনাতন।
আপনা পাসর কেনে হৈঞা অচেতন॥
সুনিআ এসব কথা হেট কৈলা মনে।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা সনাতন স্থানে॥
কিশোর কিশোরী হয়ে কিশের গঠন।
কুন বর্ণ হয়ে সেই কিশের বসন॥

কেমত বয়েস তাহার হয়ে কত দিন।
জিজ্ঞাসিতে নহে মর মুই মতি হীন॥
সুনিআ এসব কথা গোসাঞি সনাতন।
ঈষৎ হাসিআ কহে মধুর বচন॥
যদি জিজ্ঞাসিলা মরে কহিয়ে তুমারে।
আপন ভজন কথা না সুনাব আরে॥
তবে জে কহিয়ে আমি তুমার কারণ।
নিরূপণ তত্ত্ব কথা সুন দিআ মন॥
চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বয়েস নিয়ম।
ইহার অধিক নাহি কহিলাম মরম॥
রূপে রসে অঙ্গ কান্তি মনুষ্য আকার।
মনুষ্য স্বরূপে করে কৌতুক বিহার॥
নীল পীত বাস দুহে সর্ব্বক্ষণ পৈরে।
মেঘের সহিত যেন বিদ্যুত সঞ্চারে।
এই ত্রিভুবনের মনে করয়ে হরণ।
নয়ান ইঙ্গিতে যদি দেখে কুন জন॥
এমত বিনোদ রূপে করে রসের গঠন।
অধর আখি কর পদর কিরণ॥
চূড়ারে মালতীর মালা গুঞ্জরে টালনি।
চাচর চিকুর কেশ চূড়ার বলনি॥
পূর্ণৈশ্বর্য্য ধর নয়ানের ছাদে।
কিশোর তিলক ভালে মধ্যে পূর্ণ চান্দে॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি মনোহর।
নাসিকায়ে গজমুক্তা রতন পাথর॥
চরণে নূপুর শুভে গলে বনমালা।
আজানুলম্বিত ভুজ শুভে তাড় বালা॥
পীত বস্ত্রে শ্যাম তনু অতি শোভা করে।
বস্ত্র ছেদি অঙ্গ কান্তি প্রকাশ উপরে॥
ক্ষণে ক্ষণে পীত বস্ত্র উড়ে মন্দ বায়ে।
নব জলধর অঙ্গে লহরী খেলায়॥

এই বর্ণ বস্ত্র বয় কহিল তুয়াকে।
ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলী অধরে॥
বীজকে বলিয়ে রস রসের মুর্ত্তি অঙ্গ।
রূপে রসে ডগমগি আনন্দ তরঙ্গ॥
মূল হৈতে রস হয়ে রসের কলিকা।
রসাবেশে হৈল নাম শ্রীরসকলিকা।
কিশোরী নাম ধরে বয়েস অনুসারে।
ত্রৈলোক্যমোহন হরি তার মন হরে॥
এমন বরণ অঙ্গ রূপের গঠন।
যদি দেখে ইঙ্গিতে না জিয়ে সেই জন॥
শত কোটি সুর্য্যের তেজ অঙ্গের বরণ।
ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা দুখানি চরণ॥
নীলপট্ট পরিধান রতন কাচুলি।
পৃষ্ঠেত বিচিত্র বেণী অধর বান্ধুলি॥
রতন নুপুর পায়ে কেয়ুর ভুজমূলে।
কর্ণে শুভে কর্ণফুল রত্নহার গলে॥
নাসায়ে বেশর শুভে অধরের কাল।
নয়ানে কাজল শুভে সিন্দুর কপাল॥
চম্পককলিকা আগে মেলে বাম আখি।
আখির উপরে রূপ কোটি সূর্য্য দেখি॥
সেইরূপের গঠন হয়ে কিশোরী সুন্দরী।
মন্দ মন্দ মুখে হাস্য অশেষ মাধুরী॥
রূপের তুলনা দিতে নাহি কুন খানে।
শত কোটি অংশ কলা পারে কুন জনে।
রসের পরাণ রূপ রসের কলিকা।
রসাবেশে হৈল নাম প্রেমচণ্ডিকা॥
এই ত যুগল রূপ জার চিত্তে থাকে।
জার চিত্ত এক থাকে সেই রূপ দেখে॥
আপনার সিদ্ধি নাম গুরু বর্ণে আর।
বর্ণ বস্ত্র বয়েস জানিয় জার জার॥

নিত্যের স্বভাব রতি বসাইলা গুরু তারে।
গুরু গৌরব প্রতি সেই ভাব রাখিব অন্তরে ॥
আপনে প্রকৃতি হৈঞা হইব তার বশ।
মাগিঞা লইব তবে তাহার পরশ ॥
পরশ রতন হার থাকে জার বুকে।
আনন্দ থাকিব গিঞা সেই নিত্য লোকে ॥
সনাতনমুখে রূপ সব ভেদ পাইলা।
পুনরপি আর কিছু পুছিতে লাগিলা ॥
আজ্ঞা কর সুনি চান্দমুখের মাধুরী।
কিরূপে উদ্ভব হৈল অষ্ট মঞ্জরী ॥
তাহার অবধি করি কহ সুনি কানে।
অন্ধলেরে চক্ষুদান দেয়ত আপনে ॥
সুনিঞা এসব কথা গোসাই সনাতন।
কিশোরী কিশোর স্মরি পঠয়ে বচন ॥
জে জেখানে হৈতে হৈলা জার উপনীত।
তাহার অবধি কহি সুন দিঞা চিত ॥
চম্পক-কলিকা হাসি নিরক্ষে কলেবর।
ফল ফুল ধরিআছে বৃক্ষের উপর ॥
চক্ষেতে শ্রীরূপমঞ্জরী অতি গুণবান।
কর্ণেতে শ্রীরতিমঞ্জরী হৈলা উপাদান ॥
মুখেতে শ্রীরসমঞ্জরী প্রেমের সন্ধান।
বাহুতে লবঙ্গমঞ্জরী সকল প্রধান ॥
কুচেতে শ্রীমঞ্জুলালি মাধুর্য্য বিলাস।
রসস্থানে শ্রীমঙ্গলমঞ্জরী হইলা প্রকাশ ॥
নাভিতে স্বরূপমঞ্জরী বৈষ্ণব সেই হয়ে।
শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী গুরু জানিয় নিশ্চয়ে ॥
মঞ্জরী উদ্ভব কথা সুনিঞা নির্ণয়।
চরণে ধরিআ রূপ করেন বিনয় ॥
এমত অপূর্ব্ব কথা নাহি সুনি আর।
মর ভাগ্যে তুমার মুখে সুনিলু বিচার ॥

লবঙ্গমঞ্জরী গুরু কহিলা আপনে।
মনুষ্য শরীরে তারে পাইব কেমনে॥
সনাতনে বলে আমি কহিয়ে তুমারে।
এক গুরু পরে আর নাহিক সংসারে॥
তবে জে মনুষ্যাকার দীক্ষা উপদেশ।
লবঙ্গস্বরূপ রূপ জানিয় বিশেষ॥
গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি না করিহ নরে।
লবঙ্গ স্বরূপে রূপ নিত্য সেবা করে॥
নিত্যের স্বভাব জে রাখয়ে গুরুতরে।
দেহের পতন হৈলে পায় গিআ তারে॥
লবঙ্গস্বরূপে রূপ কৃপাদাতা হয়ে।
ভারাবতারণে সেই গুরু মহাশয়॥
গুরু গোসাঞি কৃপা করি বীজ আরোপিলা।
বীজের মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখাইলা॥
অতএব বর্ণবয়েস রাখিআ হৃদমাঝে।
স্বভাব স্বরূপে তারা রাধাকৃষ্ণ ভজে॥
দেহের স্বভাব তেজি করাইলা উপদেশ।
প্রকৃতি গোপীর ভাব বসাইলা বিশেষ॥
সেই ভাব মনে করি রহে সর্ব্বক্ষণ।
গুরু গোসাঞি আজ্ঞা সদা করয়ে পালন॥
গুরু শিষ্য দুই দেহ এক কলেবর।
গুরু আজ্ঞা শিষ্য হয় নহে ভিন্ন পর॥
সুনিআ এসব কথা সনাতন মুখে।
পুনরপি আর কিছু পুছিলা শ্রীরূপে॥
স্বরূপমঞ্জরী বৈষ্ণব বলিলা আপনে।
মনুষ্য শরীরে তারে পাইব কেমনে॥
তবে কহে সনাতনে সুন [illegible] মন।
যে ভাবে পায়েন জীব বৈষ্ণব সেবন॥
স্বরূপ রূপ সেই পুরুষ [illegible]।
পরাপর পরম বৈষ্ণব [illegible]॥

সেই ভাব অনুসারে বন্দী ভক্তগণ।
ভক্তগণ পদধূলি মস্তকে ভূষণ॥
নিত্যগুরু পরিচয়ে জাহা হৈতে হয়ে।
চক্ষুদান তাহা হৈতে শিক্ষাগুরু কয়ে।
দীক্ষাগুরু হৈতে জানে সেবার বিধান।
প্রকৃতি স্বভাব হৈয়া দেয়ে চক্ষুদান॥
দীক্ষা শিক্ষা নিত্য গুরু বৈষ্ণব পরিচয়।
বস্তু এক মূর্ত্তি তিন রাখিয় হৃদয়॥
এই কথা সুনিআ রূপ দণ্ডবত করে।
মঞ্জরীর বর্ণ বস্ত্র পুছে তার পরে॥
তবে সনাতনে বলে জে পুছিলা মরে।
তাহার নির্ণয় আমি কহিয়ে তুমারে॥
সমান বয়েস সভার একই স্ব স্ব বরণ।
এক দিনে উদ্ভব হইল এ সকল॥
বর্ণ বস্ত্র বয়েস জাহার জেই হয়ে।
তাহার অবধি কহি সুন মহাশয়ে॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
সোণার বরণ অঙ্গ জানিয় নিশ্চয়॥
পারিজাত পুষ্পের বরণ বস্ত্র পৈরে।
নিরন্তর দুহার চরণ সেবা করে॥
শ্রীরসমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
কুঙ্কুম অঙ্গের বর্ণ জানিয় নিশ্চয়ে॥
রক্ত রেখা শ্রীগঙ্গাজল ক্ষীরদ সাড়ি পৈরে।
সুবর্ণ ঝারিতে দুহার জল সেবা করে॥
শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
সিন্দূর বরণ অঙ্গ জানিয় নিশ্চয়॥
রক্ত রেখা পট্টবাস গঙ্গাজল সাড়ি পৈরে।
নিরন্তর দুহার কর্পূর সেবা করে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
গৌরবর্ণ অঙ্গ তার এইত নির্ণয়ে॥

জবা পুষ্প [illegible] বস্ত্র সর্ব্বক্ষণ [illegible]।
নিরন্তর তুহার ব্যজন সেবা করে॥
শ্রীমঞ্জুলালির বয়েস তের হয়ে।
হরিতাল অঙ্গের বর্ণ এইত নির্ণয়ে॥
হিঙ্গুল বরণ বস্ত্র সর্ব্বক্ষণ উপরে।
ঘৃত আদি শর্করা ভক্ষণ সেবা করে॥
শ্রীমঙ্গলমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
রবির কিরণ অঙ্গ এইত নির্ণয়ে॥
কুঞ্জকেলি পুষ্পের বরণ বস্ত্র পৈরে।
নিরন্তর তুহার চামর সেবা করে॥
এই জে কহিয়ে তুমা না করিঅ আন।
এই সপ্ত মঞ্জরী শ্রীরাধিকার প্রাণ॥
শ্রীরূপে পুছেন পুন সর্ব্বস্ব সংগ্রামে।
সাধ্য বস্তু সাধন এই জানিব মরমে॥
সমুদ্র মথনে যেন উপজিল চন্দ্র।
হর ব্রহ্মা আদি করি সভার আনন্দ॥
অন্ধকার দূরে গেল হইল দীপ্তিমান।
ধরণী শীতল হইল স্বর্গে হৈল স্থান॥
তথা কান্তি এথা দীপ্তি হইল উদয়ে।
এমত একান্ত ভাব রূপের হৃদয়ে॥
সকল গোচর আছে নয়ানের কুনে।
সাধ্য সাধন এই জানিয় আপনে॥
নিত্য স্বভাব ভাব দেখি সনাতন।
রূপকে ধরিঞা পুন কৈলা আলিঙ্গন॥
তুমার অভিপ্রায়ে লভিল সেই জন।
এই সে কারণে তোমার এথা আগমন॥
যোগশাস্ত্র বিচারিঞা না পায়ে কখন।
একবারে পাইলা তুমি পরম নিধন॥
তবে রূপে বলে হৈল আমার উপায়।
পাইলাম পরম তত্ত্ব তুমার কৃপায়॥

পূর্ব্বে যে কহিআ আছি স্থান নিরূপণ।
তদবধি সুনিতে আছয়ে মর মন ॥
সেই কথা স্মৃতি করি কহে সনাতন।
যেমতে করিলা সেই স্থানের গঠন।
জিহ্বারসে জন্মিলা শ্রীমধুকর্ণিকা।
ষড় ভুজ হইলা সুবর্ণ কলিকা ॥
চম্পককলিকা কহে চাইআ তার পানে।
আর মন্দির ঘর করিলা আপনে ॥
সুনিআ এসব কথা হরষিত মনে।
আমা হেন ভাগ্যবান নাহি কুন খানে ॥
এই অঙ্গীকার যদি হয়ে তুমার মনে।
আমাকে ইহার বর্ণ জানায় আপনে ॥
যে তুমি করিয় স্মরণ আপনার গুণে।
সিদ্ধি কল্পতরু নাম ধরহ আপনে ॥
জতেক কহিলা প্রভু আপনার গুণে।
কহিবা সকল কথা সুনিয়ে শ্রবণে ॥
কেবল করুণাসিন্ধু তুমি দয়াময়ে।
জখনে জে উচ্চারিলা তাহা জেন হয়ে ॥
এই মতে নিবেদন করি বারে বার।
সিদ্ধিকল্পতরু তুমি মহিমা অপার ॥
অশেষ ভকতি করি করিলা নমস্কার।
শ্রীমধুকর্ণিকা হৈলা বল মা আকার ॥
ভাগ্য করি মানিলা হরষিত মনে।
বক্ষস্থলে নিত্য স্থান করিলা আপনে ॥
ষড় ভুজ মটের আপনে হৈলা নীর।
অঙ্গের বরণ করিলা শ্রীমন্দির।
প্রহর পঞ্চাশ কোটি দীর্ঘ পরিসর ॥
স্থানের প্রমাণ এই নাহি জানে পর ॥
এক প্রহরর পথ প্রমাণ মন্দির।
চতুর্দ্দিকে শুভা করে কনক প্রাচীর ॥

কল্পতরু চারি দ্বারে পুষ্প [illegible] করে।
ষট্‌কর [illegible] সপ্তদল মন্দির ভিতরে ॥
মস্তকের ঘূর্ণিতে রতন সিংহাসন।
সপ্তদল মধ্যে নিঞা করিল স্থাপন ॥
নানা জাতি পুষ্প দিয়া রচিত উপরে।
সৌরভে মুহিত সব মন্দির ভিতরে ॥
তাহাতে বিরাজ করে কিশোরা কিশোরী।
সপ্ত দলে সপ্ত সেবা সপ্ত মঞ্জরী ॥
কতেক কহিব তার অশেষ চাতুরী।
নানা রঙ্গ বিলাস ভুঞ্জে কতেক মাধুরী ॥
ঐশান্ত দলে স্থিতি শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী।
সভায়ে করেন গান অতি গুণধারী ॥
পূর্ব্বদলে করে স্থিতি শ্রীরূপমঞ্জরী।
ডম্প বাদ্যে করে গান অতি মনুহারি ॥
অগ্নিদলে করে স্থিতি শ্রীরসমঞ্জরী।
মন্দিরা লৈয়া করে গান অশেষ মাধুরী ॥
দক্ষিণের দলে স্থিতি করে অনঙ্গমঞ্জরী।
রসমণ্ডলে গান করেন নৃত্য করি ॥
পশ্চিমের দলে স্থিতি শ্রীরসমঞ্জরী।
দুহু মুখ হেরি গান পিনাকযন্ত্রধারি ॥
নৈঋত দলে স্থিতি শ্রীস্বরূপমঞ্জরী।
বীণাযন্ত্রে করে গান হয়ে শুক শারী ॥
শ্রীমঞ্জুলালি করে স্থিতি উত্তরের দলে।
কপিলী সে গান করে অতি কৌতুহলে ॥
সপ্তস্বরে করে গান সপ্ত মঞ্জরী।
শুনিয়া আনন্দ বড় কিশোরা কিশোরী ॥
এইরূপে রসে গান করে নিরন্তর।
সভার অগোচর স্থান [illegible] তার পর।
এই মত প্রমাণ গোলোক নিত্য স্থান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব না পায় ইহার সন্ধান ॥

গুহ্যের অধিক গুহ্য এই স্থান হয়ে।
অপ্রকাশ্য মহানিধি প্রকাশ্য জে নয়ে ॥
আনন্দ হইঞা বলে শ্রীরূপ গোসাঞি।
আমা হেন ভাগ্যবান আর কেহ নাই ॥
আজি হৈতে হৈল মর সাফল্য জীবন।
নিত্য বিলাস কথা স্তুনিয়া মরম ॥
আর এক কথা মোর পড়িআছে মনে।
কৃপা করি কহ মরে সুনিয়ে শ্রবণে ॥
কিশের উপরে হয়ে এই বৃন্দাবন।
তাহার অবধি করি কহত আপন ॥
তবে সনাতনে বুলে কহিয়ে তুমারে।
না কহিয় কার ঠাই রাখিঅ অন্তরে ॥
পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারি কায়ে।
দিক মধ্যে বৃন্দাবন কবু নাহি হয়ে ॥
দিক মধ্যে দিক নয় ঐশান্য কুন।
সেই কুন মধ্যে তবে হয়ে বৃন্দাবন ॥
সূর্য্যের কুমারী হয়ে কাশী বিশ্ব (১) নাম।
কুঞ্জসুখবিলাসিনী (২) অতি গুণধাম ॥
লক্ষ বৎসর তবে করিয়া কামনা।
কৃষ্ণ সঙ্গ পাইআ নাম হৈল যমুনা ॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন যমুনা নাভিস্থলে।
অষ্ট ক্রোশ হয়ে তার বাহ্য অন্তরে ॥
ষোল ক্রোশ মধ্যে হয়ে পদ্ম অষ্টদল।
তাহার বাহ্য অষ্ট ক্রোশ মোক্ষফলী ॥
অষ্ট ক্রোশ মধ্যে হয়ে নিভৃত বৃন্দাবন।
তাহে অষ্টকুঞ্জ করে নিত্য সখীগণ ॥
তাহার মধ্যে চারি ক্রোশ নিকুঞ্জ মন্দির।
মলয়া পবন তাহে বহে ধীর ধীর ॥

---

(১) কালিন্দীবতী নাম। (২) কুঞ্জসুখবিলাসিনী।
জেসোর পুঁথি মতে পাঠ; শেষ প্রবন্ধ দেখ।

চৌআরি রচন হয়ে নিকুঞ্জ বলি তারে ।
চারি কল্পতরু তার হয়ে চারি ধারে ॥
নিকুঞ্জ ভিতরে হয়ে পদ্ম অষ্টদল ।
রতন সিংহাসন সুভে তাহার উপর ।
কুসুমে রচিত শয্যা তাহার ভিতর ।
তাহাতে বিরাজ করে কিশোরী কিশোর ॥
নিত্য শক্তি সেই দলে সপ্তমঞ্জরী ।
নিত্য আনন্দময়ে হয়ে শুক শারী ॥
সনাতন মুখে সুনি এতেক বিচার ।
আনন্দে করেন নৃত্য হরিষ অন্তর ॥
হরি হরি শব্দ করি গগন পরশে ।
ধরণি লুটায়ে কেনে ভাবের আবেশে ॥
ক্ষণে সনাতন পদধূলি লয়ে বুকে ।
পদধূলি লইআ মাখে চান্দমুখে ॥
এমত উন্মাদ দেখিআ সনাতন ।
রূপকে ধরিআ করে পুন আলিঙ্গন ॥
বুকের উপরে রাখি কহে কানে কানে ।
গুহ্যের অধিক গুহ্য ব্যক্ত করে কানে ।
তবে শ্রীরূপ গোসাঞি মনে করি সার ।
কুঞ্জের বর্ণ ভেদ পুছেন পুনর্ব্বার ॥
কুন কুঞ্জ কুন দিগে কুন বর্ণ তার ।
কৃপা করি কহ সুনি এসব বিচার ॥
কুন সখী কুন কুঞ্জে সদা বাস করে ।
কুন বর্ণ কুন বয়েস কুন বস্ত্র পৈরে ॥
এতেক সুনিআ তবে রূপের বচন ।
কুঞ্জের বর্ণ ভেদ শ্লোক পড়ে সনাতন ॥
ঐশান্য কুনেতে হয় মেঘের বরণ ।
নানা জাতি পুষ্প তাহে করয়ে শোভন ॥
মদন সুকতা নামে কারুণ্য কল ধরে ।
বিশাখা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে ॥

চৌদ্দ বৎসর অষ্ট মাস তাহার বয়েস।
শিখিপুচ্ছ বসন লোটন বান্ধা কেশ॥
বিদ্যুতের বর্ণ অঙ্গ ঝলমল করে।
নিরক্ষিতে নারে কেয় রূপে আখি ভরে॥
মেঘের সহিতে জেন বিদ্যুত সঞ্চারে।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি এই সেবা করে॥
বিশাখা স্বরূপে হয়ে লবঙ্গমঞ্জরী।
একরূপ একমুখ লখিতে না পারি॥
দুহার মিলন সুখে এক কুঞ্জে বাস।
নানান কৌতুকে করে হাস্য পরিহাস॥
পুর্ব্বদিকে নন্দাখ্যা কুঞ্জ অতি সুভা করে।
কত কালা কত ধলা কুঞ্জের ভিতরে॥
নানাবর্ণে চিত্র যেন করে চিত্রকারে।
কুঞ্জের মাধুরী দেখি নয়ান না ফিরে॥
চিত্রদেবী করে বাস তাহার ভিতরে।
সুখের অবধি নাহি আনন্দ অন্তরে॥
তাহান বয়েস এহি নিয়মে করি চিহ্ন।
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস আর চারি দিন॥
কিশোরে লবঙ্গমালা গাথিআ সাধনে।
অন্তরে আনন্দ হৈআ এই সেবা করে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী করে সেই কুঞ্জে বাস।
নানা রঙ্গকৌতুকে হাস্য পরিহাস॥
পূর্ণ ইন্দু কুঞ্জের নাম অগ্নি কুনে ধরে।
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন অন্ধকার হরে॥
চাহিতে শীতল করে তাপ জায় দূরে।
চম্পকলতা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস বিংশতি দিবস।
তাহার নিয়ম এই কহিল বয়েস॥
চম্পাক পুষ্পের বর্ণ সেই কলেবর।
চাম্পা পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র পৈরে নিরন্তর॥

বর্ণ বস্ত্র বয়েস সে জে প্রেমরসভরে ।
আনন্দ উল্লাসে চন্দন সেবা করে ॥
চম্পক লতার প্রাণ শ্রীরতিমঞ্জরী ।
এক কুঞ্জে করে বাস অশেষ চাতুরী ॥
দক্ষিণে চম্পককুঞ্জ অতি শোভা করে ।
কুঞ্জের মাধুরী দেখি নয়ান না ফিরে ॥
শারী শুকে করে গান কুঞ্জের আশ পাশ ।
রঙ্গদেবী হরষিতে সেই কুঞ্জে বাস ॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস আর তিন দিন ।
পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ এই তার চিহ্ন ॥
রঙ্গণ পুষ্পের বরণ বস্ত্র পৈরে নিরন্তরে ।
হেরিআ দুহার মুখ চামর সেবা করে ॥
রঙ্গদেবীর প্রাণ হয়ে স্বরূপমঞ্জরী ॥
এক কুঞ্জে করে বাস আনন্দবিহারী ।
নৈঋত কুনে শ্যাম কুঞ্জ শ্যাম বর্ণ ধরে ।
সুদেবী ঠাকুরাণী তাহে বাস করে ॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস চৌদ্দদিন আর ।
বয়েস নির্ণয় এহি কহিল তাহার ॥
চন্দ্রের বরণ অঙ্গ জানিয় উহার ।
অরুণ বসন পৈরে কটির মাঝার ॥
জল সেবা করে সেই ঝারি লৈয়া হাতে ।
দুহার মুখ হেরি সদা আনন্দ অন্তরে ॥
কস্তুরীমঞ্জরী করে সেই কুঞ্জে বাস ।
হাস্যরসে আনন্দিত পরম উল্লাস ॥
পশ্চিমেত কুঞ্জ এক অনুবর্ণ ধরে ।
ললিতা ঠাকুরাণী তাহাতে বাস করে ॥
চতুর্দ্দশ অষ্টমাস সাত দিন আর ।
বয়েস নির্ণয় এহি কহিল তাহার ॥
কুঙ্কুম অঙ্গের বর্ণ শুক্লবস্ত্র পৈরে ।
মনের আনন্দে সেই পুষ্প সেবা করে ॥

৮

সেই কুঞ্জে করে বাস অনঙ্গমঞ্জরী।
কত বা কহিব তার রূপের মাধুরী॥
উত্তরে অনঙ্গকুঞ্জ অম্বুজ বর্ণ ধরে।
ইন্দুরেখা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস সাত দিন আর।
বয়েস নির্ণয় এহি কহিল তাহার॥
হরিতাল অঙ্গের বর্ণ তাহে শুভা করে।
দাড়িম্ব পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র সদা পৈরে॥
শ্রীমঞ্জুলালি করে বাস তাহার ভিতরে।
দুই জন এক প্রাণ ভিন্ন দেহ ধরে॥
বর্ণভেদ কুঞ্জনির্ণয় কহিল তুমারে।
এই সব কুঞ্জের নির্ণয় রাখিয় অন্তরে॥
অষ্ট সখী অষ্ট বর্ণ অষ্ট সেবা করে
অষ্ট বর্ণ অষ্ট বস্ত্র অষ্ট সখী পৈরে॥
অষ্ট বয়েস অষ্ট সখী যার যত দিন।
বর্ণভেদ রাখিয় মনে জার যত দিন॥
সখী প্রাণ মঞ্জরী অষ্ট কহিল তুমারে।
এতেক সুনিঞা রাখ হৃদয় মাঝারে॥
নিত্য স্থানে মঞ্জরী স্থিত সখী বৃন্দাবন।
* মূর্ত্তি অথবা রস করে আস্বাদন॥
সাধকে সুনিয়া কানে রাখিব নয়ানে।
বিনে গুরু উপদেশে না জানে কুন জনে॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনা আর নাহি হবে।
সাধ্য সাধন যত এইত নিশ্চয়॥
সাধ্য বস্তু সাধন এই কহিল তুমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥

সমাপ্ত।

চম্পক-কলিকা পুস্তিকা বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে প্রকাশিত হইল। হস্তলিখিত পুঁথির আট খানি পাতা। প্রথম ও অষ্টম পত্রের কেবল এক পিঠে লেখা। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের কোণে দুই জায়গায় পুঁথি ছিন্ন। অক্ষর মোটের উপর স্পষ্ট; দুই এক স্থানে কালী উঠিয়া গিয়া অস্পষ্ট ও অপাঠ্য হইয়াছে মাত্র।

পুস্তকের শেষে ভিন্ন হস্তাক্ষরে ভিন্ন কালীতে লিখিত আছে "এ পুস্তকের মালিক শ্রীকিশর দাস সাকিন ডোআদিগ মৌজে লুহারপাড়া ইতি সন ১২৫২ বাং।" পুঁথির কাগজের অবস্থা দেখিয়া পুঁথির বয়স তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

গ্রন্থের নাম, গ্রন্থ রচয়িতার নাম ও রচনাকালের নাম গ্রন্থ মধ্যে কোথাও নাই। প্রত্যেক পাতার উপরের বাম কোণে গ্রন্থের নাম চম্পক-কলিকা লিখিত আছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখিয়া ইহাকে কোন বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। গ্রন্থের ভাষার হেঁয়ালি সাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য নহে। সহজিয়া প্রভৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ণব মতের একটু আভাস পাওয়া যায়। যাহাই হউক এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রচার বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য করিবে।

বাঙ্গালার হস্তলিখিত পুঁথির সাধারণ নিয়মানুসারে এই পুঁথিতেও বর্ণাশুদ্ধির অভাব নাই। কোন্ কোন্ স্থলে বর্ণাশুদ্ধি লিপিকারের বা গ্রন্থকারের অনভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন, তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। মোটের উপর ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনাম পদগুলির বানান পুঁথির মধ্যে যথাদৃষ্ট তথা মুদ্রিত হইল। অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করা গেল। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

সনাতন পুঁথির মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র সোনাতন, কুত্রাপি বা সুনাতন হইয়াছেন। আমরা সনাতনত্ব বজায় রাখিলাম।

দেবী, মঞ্জরী, মালতী, সখী, ঠাকুরাণী, মাধুরী প্রভৃতি ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রায় সর্ব্বত্রই ইকারান্ত লিখিত আছে; এখানেও সংশোধন করা গেল।

ওকার বহুস্থলে উকারে পরিণত হইয়াছে। যথা শোভা=সুভা, মোচন=মুচন, মোহন=মুহন, লোক=লুক, কোল=কুল, সোণা=সুনা, কোণ=কুন, মনোহর=মনুহারি। ওকারের এই পরিণাম বৈয়াকরণগণের চিন্তার বিষয়। সর্ব্বত্র সংশোধন করি নাই।

বয়েস, নয়ান, দারিদ্র, মলয়া পবন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংশোধন না করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে।

গ্রন্থ মধ্যে কয়েক স্থলে তথাহি পূর্ব্বক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা আছে। উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলি লিখিতে লিপিকারের সাহসে কুলায় নাই। তিনি সেই সেই স্থলে তথাহির পর ফাঁক দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। একস্থলে সাহস

পুস্তকে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কবিরাজগণে তাহার অর্থবোধ ও ব্যাখ্যা অসাধ্য।
পত্রিকা-সম্পাদক।

---

# বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত।

ব্রুগ্‌মান্ তাঁহার ইণ্ডো-জর্ম্মাণীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা পুনরুক্তি (repetition), দীর্ঘকাল-বর্ত্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইণ্ডো-জর্ম্মাণীয় ভাষার অভিব্যক্তি দশার পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইণ্ডোজর্ম্মাণ ভাষায় অনেক দ্বিগুণিত শব্দ কালক্রমে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া গেছে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার দৃষ্টান্ত, মর্ম্মর, গর্গর (ঘড়া, জল শব্দের অনুকরণে), গদ্গদ, বর্ব্বর (অস্পষ্টভাষী), কঙ্কণ। দ্বিগুণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে; যথা কর্কশ, কঙ্কর, ঝঞ্ঝা, বম্ভর (ভ্রমর), চঞ্চল।

অসংযুক্ত ভাবে দ্বিগুণীকরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে, যথা, কালে কালে, জন্মজন্মনি, নব নব, উত্তরোত্তর, পুনঃ পুনঃ, "পীত্বা পীত্বা," যথা যথা, যদ্‌যৎ, অহরহঃ, প্রিয়ঃপ্রিয়ঃ, সুখ-সুখেন, পুঞ্জপুঞ্জেন।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে হয় পুনরাবৃত্তি, নয় প্রগাঢ়তার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে বাঙ্গালায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্য্য ভাষায় তত নহে। বাঙ্গলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তগুলি একত্র করা যাক্। মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়—এগুলি পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে, মানুষে মানুষে—এগুলি পরস্পর সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে, উপরে উপরে—এগুলি নিয়তবর্ত্তিতাবাচক। অর্থাৎ এগুলিতে, সর্ব্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করে।

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া—এগুলি দীর্ঘকালীনতাবাচক।

অল্প অল্প, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুক্‌রা টুক্‌রা—এগুলি বিভক্ত বহুলতাবাচক। "নূতন নূতন কাপড়" বলিলে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক্ করিয়া দেখা হয়। "অনেক অনেক লোক" বলিলে লোকগুলিকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ "অনেক লোক" বলিলে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

লাল লাল, কালো কালো, সাদা সাদা, মোটা মোটা, রকম রকম—এগুলিও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর। লাল লাল ফুল বলিলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি লাল ফুল বুঝায়।

যাকে যাকে, যেমন যেমন, যেখানে যেখানে, যখন যখন, যত যত, যে যে, যারা যারা—এগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে—এ দুইটিও ঐ প্রকার। আশায় আশায় আছি অর্থাৎ প্রত্যেক বার আশা হইতেছে; ভয়ে ভয়ে আছি অর্থাৎ বারংবার ভয় হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পৃথক পৃথক রূপে আশা বা ভয় উদ্রেক করিতেছে।

মুঠো মুঠো, ঝুড়ি ঝুড়ি, বস্তা বস্তা—এগুলিও পূর্ব্বানুরূপ।

টাট্‌কা-টাট্‌কা, গরম-গরম, ঠিক ঠিক—এগুলি প্রকর্ষবাচক।

টাট্‌কা-টাট্‌কা বলিলে টাট্‌কা শব্দকে বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

চার-চার, তিন-তিন এগুলিও পূর্ব্ববৎ। চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির, অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।

গলায় গলায় ( আহার ), কানে কানে ( কথা )—ইহাও পূর্ব্ব শ্রেণীর; অর্থাৎ অত্যন্তই গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ; নিতান্তই কানের নিকটে গিয়া কথা। "হাতে হাতে" ( ফল, বা ধরা-পড়া ) বোধ করি স্বতন্ত্রজাতীয়। বোধ করি তাহার অর্থ এই, যে, যেমনি হাত দিয়া কাজ করা, অমনি সেই হাতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া, যে হাতে চুরি করা সেই হাতেই ধৃত হওয়া।

নিজে নিজে, আপনি-আপনি, এখনি এখনি—পূর্ব্বানুরূপ। অর্থাৎ বিশেষরূপে নিজেই, আপনিই আর কেহই নহে, বিলম্বমাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ। "সকাল-সকাল" শব্দও বোধ করি এই জাতীয়, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দ্রুতরূপে সকাল।

জল্‌ জল্‌, চুর্‌ চুর্‌, ঘুর্‌-ঘুর্‌, টল্‌ টল্‌, নড়্‌-নড়্‌ এগুলি জ্বলন, চূর্ণন, ঘূর্ণন, টলন, নর্ত্তন শব্দজাত; এগুলিতেও প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাঙ্গলা অনেকগুলি শব্দদ্বৈতে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে। যথা :—

যাব যাব, উঠি উঠি।

মেঘ-মেঘ, জ্বর-জ্বর, শীত-শীত, রাগ-রাগ, মর্‌-মর্‌, পড়-পড়, ভরা-ভরা, ফাঁকা-ফাঁকা, ভিজে ভিজে, ভাসা ভাসা, কাঁদ-কাঁদ, হাসি-হাসি।

মানে-মানে, ভাগ্যে-ভাগ্যে শব্দের মধ্যেও এই ঈষদূনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন অর্থে, মান প্রায় যায় যায় করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ যেটুকু ভাগ্যসূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ।

ঘোড়া-ঘোড়া ( খেলা ), চোর-চোর ( খেলা ) এই জাতীয়। অর্থাৎ সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারি নকল করিয়া খেলা।

এইরূপ ঈষদূনতাসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আর্য্য ভাষায় নেই

যায় না। ফরাসী ভাষার এক প্রকার শব্দ ব্যবহার আছে, যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসী চলিত ভাষায় কোন জিনিষকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব্ব করিয়া কহিতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে। যথা me-mere, মে-মেয়ার্ অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার্ অর্থে মা, মে-মেয়ার অর্থে ছোট্ট মা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। Bete বেট্ শব্দের অর্থ কিছু, be-bete বে-বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট কিছু, আদরের কিছুটি। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্ব্বতা বুঝাইতেছে।

আর এক প্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাঙ্গলায় এবং বোধ করি ভারতীয় অন্য অনেক আর্য্য ভাষায় চলিত আছে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক। যেমন, জল-টল, পয়সা-টয়সা। জল-টল বলিলে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে কটা আনুষঙ্গিক জিনিষ শ্রোতার মনে উদয় হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যায়।

বোঁচ্কা-বুঁচকি, দড়া-দড়ি, গোলা-গুলি, কাটি-কুটি, গুঁড়া-গাঁড়া, কাপড়-চোপড় এগুলিও প্রভৃতি-বাচক বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নির্দ্দিষ্টতর। বোঁচ্কা-বুঁচ্কি বলিলে ছোট বড় মাঝারি এক জাতীয় নানা প্রকার বোঁচ্কা বোঝায়, কিন্তু অন্য জাতীয় কিছু বোঝায় না।

মহারাষ্ট্রী হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্য্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বাঙ্গলা ভাষার সহিত তত্তৎ ভাষার শব্দদ্বৈত বিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

## চম্পক-কলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য।

পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত চম্পক কলিকা পুস্তিকা ছাপান শেষ হইলে উহার আর একখানি হস্তলিপির সন্ধান পাই। জেমো (মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি সবডিবিসন) বিশ্বাসপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মহাশয়ের নিকট এই দ্বিতীয় পুঁথিখানি পাইয়া বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পাঠভেদ রহিয়াছে। জেমোর পুঁথির আটখানি পাতা, প্রথম পত্রের এক পিঠে, অন্য পত্রের দুই পিঠে লেখা। প্রথম পাঁচ পাতার হস্তাক্ষরের সহিত শেষ তিন পাতার হস্তাক্ষরের মিল নাই। পুঁথির শেষে লেখকের নাম "দিনহিন শ্রীরসময় দাস" লিখিত আছে; নিবাস বা তারিখ কিছুই নাই। মোটের উপর জেমোর পুঁথি আকারে বিশ্বকোষের পুঁথির অপেক্ষা অনেক ছোট; বিশ্বকোষের পুঁথিতে প্রায় সাড়ে সাত শত চরণ পয়ার আছে, জেমোর পুঁথির চরণ সংখ্যা আন্দাজ চারি শত। গ্রন্থারম্ভে সনাতনের কারামোচন ঘটিত উপাখ্যানটী ইহাতে একবারেই নাই; তার পরে স্থানে স্থানে দুই চারি ছত্রের একবারে

অভাব। এইরূপ অনেক শ্লোক বাদ দেওয়ায় জেনোর পুঁথি নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও স্থানে স্থানে খাপছাড়া হইয়াছে। উভয় পুঁথির মধ্যে যে অংশ সাধারণ, তাহা মিলাইয়া দেখিলাম, প্রায় প্রত্যেক ছত্রেই কিছু না কিছু পাঠভেদ রহিয়াছে। মোটের উপর বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথিই অধিকতর প্রামাণ্য। দুই এক জায়গা হইতে জেনোর পুঁথি হইতে উদ্ধৃত করিলেই উভয়ের প্রভেদ কতকটা বুঝা যাইবে।

( ১ )

অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে।
এথা গোয়াস্তি সনাতনের নাহি রাত্রি দিনে॥
রূপের লাগিএ সদা স্থির নহে মন।
শ্রীগৌরাঙ্গচরণ সদা করে আরাধন॥
বিষয় বন্ধন মোর করাহ মোচন।
তোমা বিনে ত্রাণকর্ত্তা নাহি অন্যজন॥
বিসয় বিষের জ্বালা সহন না যায়।
হৃদয়ে পোড়এ মন কি করি উপায়॥
এই ভাবি রাত্রি দিন কান্দে সনাতন।
না ধরে নয়ানে জল বিরস বদন॥
পাতশার স্থানে হৈতে পলাইআ গেলা।
কাশীপুর আঞা তবে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥
জয় জয় গৌরাঙ্গ বুলি ধায় সনাতন।
সমুদ্র দেখিয়া তবে করেন রোদন॥
হেনকালে এক কুম্ভীর আইলা তোথাই।
সনাতন ডাক দিঞা কহিল তাহাই॥
হরি নাম মন্ত্র দিল তার।
কুম্ভীরের পৃষ্ঠে চড়ি নদী হৈল পার॥
তিন দিন উপবাসী চলে একেশ্বরে।
শুনিলা গৌরাঙ্গ চন্দ্র আছে কাশীপুরে॥

( ২ )

শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
যন্ত্র দেখি নিত্য লীলা নির্ণয় কেমন॥
কোন বর্ণ হয় সেই কিসের গঠন।
চন্দ্র সূর্য্য গতাগতি নহে কি কারণ॥
শ্রীমন্দির কেমতে হইল নির্ম্মাণ।
কোনখানে থাকি হইল সেই স্থান॥
কিশোর কিশোরী আদি যত পরিগণ।
কোথা বা হৈতে উদ্ভব হয় কোথা বা গমন॥
এ সকল উদ্ভব জাহা হৈতে হয়।
কোন নাম ধরে সেই কোন্ মহাশয়॥

( ৩ )

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উপরে সেই ধাম।
তাহার নির্ণয় শুন হঞা সাবধান॥
দশ বীজ অঙ্গ মূর্ত্তি লাবণ্য সুন্দর।
বৈকুণ্ঠে পরাৎপর আখণ্ড শিখর॥
সকলের টল আছে নাভি তার কিং।
অস্ত অস্ত স্থানেতে আছেন হঞা বন্ধ॥
তার পরে আছে গুপ্তচন্দ্রিকা নামে গ্রাম।
সেইখানে আছেন চম্পককলি নাম॥
চম্পককলিকা হয় চারি বেদের সার।
জে শরীরে হয় যুগল কিশোর অবতার॥
রূপে রসে ডগমগি কিশোর কিশোরী।
অষ্ট মঞ্জরী অষ্ট বর্ণেতে বিহারী॥
চম্পককলিকা হয় আদি তত্ত্ব সার।
লক্ষ সূর্য্য জিনি হয় বর্ণ তাহার॥
বামভুজ পার্শ্বে হয় দিবস রজনী বার।
দক্ষিণভুজ পার্শ্বে সব অন্ধকার॥
রূপ কহে শুন ভাই আমার বচন।
কিসের উপরে হয় সেই বৃন্দাবন॥
সনাতন বোলে শুন চারিদিগে হয়।
শিশু মধ্যে বৃন্দাবন কোন ভিন নয়॥
শিশু মধ্যে ভিন্ন নয় ত্রিশাঙ্ক হয় কোণ।
সেই কোণ মধ্যে হয় নিত্য বৃন্দাবন॥
সূর্য্যের কুমারী কালিন্দীশ্বরী নাম।
কৃষ্ণসুখ বিলাসিনী অতি গুণধাম॥
লক্ষ হাজার বৎসর করিঞা ভাবনা।
কৃষ্ণ মন্ত্র পাঞা নাম হইল যমুনা॥

ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন যমুনা বাহিরদলে।
তার মধ্যে অষ্ট ক্রোশ পদ্মে অষ্টদলে॥
অষ্ট ক্রোশ মধ্যে হয় নিভৃত বৃন্দাবন।
তাহে অষ্ট কুঞ্জ করে নিত্য সখীগণ॥
তার মধ্যে চারি দিকে নিকুঞ্জ মন্দির।
মলয় পবন তাহে বহেন সুস্থির॥
তাহাতে বিরাজ করে কিশোর কিশোরী।
রত্নবেদি শোভা করে অতি মনোহারী॥
ঐশান্ত কোণেতে কুঞ্জ মেঘের বরণ।
মদন কুঞ্জ নাম তার পরম মোহন॥
নানাজাতি ফুল ফল সেই কুঞ্জে ধরে।
বিশাখা সুন্দরী তাহে সদা বাস করে॥
শিখিপুচ্ছ বর্ণ বস্ত্র লোটন বান্ধা কেশ।
রূপে গুণে জগমণি আনন্দ বিশেষ॥

( ৪ )

গ্রন্থ শেষে।

এহি সব সখী যাবে দোহাকার সঙ্গে॥
নিরন্তর পরিচর্যা করে দোহা রঙ্গে।
কুঞ্জের মাঝারে শয্যা করে মহারঙ্গে॥
কুঞ্জের মাঝারে শয্যা বৃন্দার রচিত।
সঙ্গে আসি সেইখানে হয় উপনীত॥
শয়ন আসিলে স্তুতি রহে দুই জন।
নানা বাদ্য নানা গীত গায় সখীগণ॥
নানা দ্রব্য ভোজন করায় সখীগণে।
তার শেষ ভোজন করয়ে সখীগণে॥
এহি মতে সখীগণ নিত্য সেবা করে।
সখীপ্রাণ মঞ্জরী কহিলাও তোমারে॥
নিত্য স্থানে মঞ্জরী স্থিতি সখী বৃন্দাবনে।
সাধকে শুনিয়া করে চর্বিত চর্বণ॥
উপদেশ গুরু বিনে না জানে অন্য জন॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনে সিদ্ধি কিছু নয়।
কৃপা করি কহ যদি সাধু মহাশয়॥
সাধ্য বস্তু তত্ত্ব ইহা কহিনু তোমারে।
ইহা ভিন্ন নাহি আর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
ভজভাবকের মঞ্জরী পরিচয়।
উপাসনা সিদ্ধ এহি কহিনু তোমায়॥
সনাতনের মুখে রূপ এতেক শুনিয়া।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥
যোগ শাস্ত্রে যে বিচারিতে না পারে এখন।
তোমার প্রসাদে আমি পাইলাঙ নিত্য ধন॥
ধন্য ধন্য করিলা গোসাঞি সনাতন।
শ্রীরূপ তুলিয়া কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন॥

ইতি সনাতন গোসাঞি বিরচিত চম্পককলিকা সমাপ্ত।

এতদ্ভিন্ন জেমোর পুঁথির মাঝামাঝি রূপসনাতনের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছলে নিম্নোক্ত গদ্যাংশ আছে।

অথ জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণলীলা কয় মত : দুই মত : প্রকট : আর অপ্রকট প্রকট লীলাতে : মথুরাদি গমন : অপ্রকটে বৃন্দাবনে স্থিতি। অবতারী কে : নন্দনন্দন ; অবতারী বসুদেব নন্দন। কয় কৃষ্ণ : তিন কৃষ্ণ। কয় রাধা : তিন রাধা। তিন কৃষ্ণ কে কে : বসুদেব নন্দন : নন্দনন্দন : ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিন রাধা কে কে : কাম রাধা : প্রেম রাধা : ভাব রাধা। কাম রাধা চন্দ্রাবলী : প্রেম রাধা বৃষভানু নন্দিনী : ভাব রাধা পৌর্ণমাসী। কয় রতি : তিন রতি : সাধারণী : সমঞ্জসা : সমর্থা। অনুগত কয়টি : তিনটি : রাগানুগা : প্রেমানুগা : কামানুগা। কৃষ্ণের কয় শক্তি : তিন শক্তি : অন্তরঙ্গা : বহিরঙ্গা : তটস্থা। ভজনের অধিকারী কয়টি ; তিনটি : সাধক : সিদ্ধ : প্রবর্তক। আশ্রয় কি : গুরু পাদপদ্ম। অবলম্বন কি : বৈষ্ণব গোসাঞি। উদ্দীপন কি : কৃষ্ণ কথা। দেশ কোথা : বৃন্দাবন নবদ্বীপ। কাল কি : অক্রূর : অথবা কলিকাল। পাত্র কে : শ্রীকৃষ্ণজী অথবা মহাপ্রভু। তিন বাঞ্ছা কি কি : তত্ত্ব ভাব : তত্ত্ব নাম : প্রেম আস্বাদন। প্রেমের স্বভাব কি : বাউল। সিদ্ধের উপাসনা কি : কামগায়ত্রী। কামবীজ সাধকের : যুগল মন্ত্র প্রবর্তকের। হরিনামের ধাম কোথা : শ্রীবৃন্দাবন। প্রমাণ কি : ষোল ক্রোশ সমাধর্য (?) অষ্ট ক্রোশ। কোন মন্ত্রে উপাসনা : যুগল মন্ত্রে। কোন যুগল : রাধাকৃষ্ণ। কৃষ্ণ মন্ত্র কয় অক্ষর : আঠার অক্ষর। মন্ত্রের সাত অক্ষর। কামগায়ত্রী সাড়ে পঁচিশ অক্ষর। কাম বীজ সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। কৃষ্ণের গুণ কি : পঞ্চ গুণ। কি কি : রূপ গুণ : রস গুণ : স্পর্শ গুণ : শব্দ গুণ : গন্ধ গুণ। কয় ভাব : পঞ্চ ভাব : শান্ত ভাব : বাৎসল্য ভাব : সখ্য ভাব : মধুর ভাব। কৃষ্ণের বাণ কয়টি : পঞ্চ বাণ : আকর্ষণ : স্তম্ভন : জৃম্ভন : শোষণ : মোহন : ইতি জিজ্ঞাসা সমাপ্ত।

পত্রিকা-সম্পাদক।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

## বৌদ্ধ-দর্শন

## ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ।

( সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত )

শাক্যমুনির প্রচারিত দার্শনিক মত কালক্রমে বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাধ্যমিক ও যোগাচারই সমধিক প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদর্শনোক্ত যাবতীয় মতেরই [illegible] একমাত্র শূন্যতাজ্ঞান হইলেও ইঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বিভিন্ন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত না বলিয়া একমাত্র যোগাচার মতই বিবৃত করিব।

যোগাচার দার্শনিকগণ চীন ও জাপান প্রদেশে "বিজ্ঞানমাত্র সম্প্রদায়" বা "[illegible] সম্প্রদায়" নামে প্রসিদ্ধ। কত কাল হইল যোগাচার দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ। সংস্কৃত ও চীন গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কুমারলব্ধ নামক দার্শনিক গান্ধার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছিলেন। তদনন্তর উক্ত দর্শনের মত মধ্য এসিয়ার কুমারজীব নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক চীন ও জাপান প্রদেশে নীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নয় শত বৎসর কাল চীনদেশে যোগাচার মত বহুল প্রচার লাভ করে। ক্রমে চীনবাসিগণ মাধ্যমিক দর্শনের মত [illegible] ত্যাগ করিয়া যোগাচার মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে [illegible] চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণ করিতে আগমন করেন, তখন [illegible] পূর্ব্বে যোগাচার মতেরই সমধিক প্রচার বর্ত্তমান ছিল। হুয়েন সাং স্বয়ং [illegible] গুরুর ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। [illegible] নামক বৌদ্ধ [illegible] দর্শনসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া উক্ত দর্শনের [illegible] প্রচার করেন। [illegible]

নন্দ, উজ্জয়সেন, সম্যক্‌দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ যোগাচার দর্শনের আলোচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ অতীব ভক্তিসহকারে উল্লিখিত দার্শনিকবর্গের স্তূপের নষ্ট অবশেষাদি দৃষ্টিগোচর করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যোগাচার সম্প্রদায়ের যে সকল পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন তাঁহাদের সহিত আলাপ ও কথোপকথনের বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

সন্ধিনির্মোচন সূত্র, লঙ্কাবতার সূত্র ও গণ্ডব্যূহ সূত্র এই তিনখানি অতিপ্রাচীন যোগাচারসংক্রান্ত গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা ব্যতীত যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র, মহাযানালঙ্কারশাস্ত্র, মহাযানসম্পরিগ্রহসূত্র, দশভূমীশ্বর শাস্ত্র, বিভাগযোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানমাত্র দ্বাদশ শাস্ত্র, বিজ্ঞানমাত্র ত্রিদশ শাস্ত্র, মধ্যান্তবিভাগশাস্ত্র, বিজ্ঞানমাত্রসিদ্ধিশাস্ত্র, মহাযানঅভিধর্ম্মসংগীতিশাস্ত্র প্রভৃতি যোগাচার গ্রন্থসমূহ এক সময়ে ভারতবর্ষে বিরচিত হইলেও এখন এদেশে উহার একরূপ বিরল প্রচার বা অপ্রচার; কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি দেশে এখনও ঐ সকল গ্রন্থের অনেক অনুবাদ বর্ত্তমান।

নালন্দা নামক প্রসিদ্ধ বিহারের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক শীলভদ্রের নিকট হুয়েনসাঙ ৬৩২—৬৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত যোগাচার মত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি চীন প্রদেশে গমন করিয়া বহু শিষ্যকে ঐ মত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য কুয়েইচি ৬৩২ খৃঃ—৬৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত যোগাচার দর্শন সমস্ত চীন প্রদেশে প্রচারিত করেন।

হুয়েনসাঙের পূর্ব্বেও পরমার্থ, বোধিরুচি ও গুণমতি নামক পণ্ডিতত্রয় ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করিয়া যোগাচার দর্শনের মত প্রচারিত করিয়াছিলেন। যোগাচার দর্শনের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া মধ্য ভারতবর্ষের অচিন্ত্য বিহারে (Ajanta cave) এই মতের আলোচনা করিতেন।

যোগাচার দর্শনের মতে বিজ্ঞান দুই প্রকার; প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। ক্ষণিক জ্ঞানসমূহের প্রত্যেকের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। ঐ জ্ঞানধারা বা জ্ঞানসমষ্টির নাম আলয়বিজ্ঞান। যেমন অসংখ্য জলকণার সমবায়ে নদীর উৎপত্তি হয়, ঐ জলকণাসমূহ ব্যতীত নদী নামক কোন পদার্থ নাই, সেইরূপ ক্ষণিক জ্ঞানসমূহের সমষ্টিতেই অহং (আত্মা) এর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জ্ঞানসমূহ ব্যতীত অহং-পদবাচ্য কোন পদার্থ নাই। জ্ঞানসমূহ নানা প্রকার। কালিক জ্ঞান, দৈশিক জ্ঞান, বস্তু-প্রাতিনিধিকজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার জ্ঞান, বিদ্যমান আছে। এই সকল জ্ঞানের নানাপ্রকার সমবায়ে জগতের নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান পর পর জ্ঞানে সংক্রান্ত হইয়া স্মরণাদি জন্মাইয়া থাকে।

মাধ্যমিকবৃত্তির সূক্ষ্মলক্ষণপরীক্ষা নামক অষ্টম প্রকরণে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাচীন মতসমূহ উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রকীর্ত্তি লিখিয়াছেন—বুদ্ধিবোধ্য পদার্থমাত্রই ক্ষণিক। যোগাচার

বিশেষ। ঘট পট ইত্যাদি সমুদয়ই জ্ঞানের বৈচিত্র্য মাত্র। যাঁহারা [illegible] বাহ্য পদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত কেহই বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি করিতে পারেন না। যদি বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারিত, তাহা হইলে উহাকে যথার্থ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম, কিন্তু বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের অতীত হইতে পারেনা, বাহ্য পদার্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না, কারণ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত তুমি কিরূপে প্রমাণ করিবে যে বাহ্য পদার্থ ছিল।

জ্ঞানের পরেও বাহ্য পদার্থের উৎপত্তি হয় নাই, কারণ বাহ্য পদার্থের সহিত সংশ্রব ব্যতীত তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধই জ্ঞানের উৎপাদক। অতএব বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের পরে উৎপন্ন হয় নাই। জ্ঞানের পূর্ব্বেও যে উহা বিদ্যমান ছিল না ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বাহ্য পদার্থ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান যুগপৎ বা সমকালে উৎপন্ন হইতেছে। বাহ্য পদার্থ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান এতদুভয়ের কেহই অপরকে উৎপাদন করিতেছে না অর্থাৎ উভয় পদার্থ এক; সুতরাং জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নাই।

স্বপ্নাবস্থায় যেমন নানা বাহ্য পদার্থ অনুভূত হয়, অথচ উহার কোনটিই সত্য নহে, সেইরূপ এই সংসারে আমরা জ্ঞানের বৈচিত্র্য হেতু বিবিধ বাহ্য পদার্থের সৃষ্টি করিতেছি।

আনন্দগিরি ২।২।২০ বেদান্তসূত্র ভাষ্যে বৌদ্ধমত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, পদার্থমাত্রই ক্ষণিক। সকল পদার্থই যে ক্ষণিক উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বীজের ধ্বংস হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। যদি বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই সমকালে বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারা যাইত; কিন্তু বীজ ও অঙ্কুর সমকালে বিদ্যমান থাকে না, বীজের ধ্বংস না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। অতএব পূর্ব্বক্ষণস্থায়ী কারণ হইতে পরক্ষণস্থায়ী কার্য্যের উৎপত্তি হয় এই মত অগ্রাহ্য অর্থাৎ ভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয় না, অভাব পদার্থ হইতেই ভাব পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক।

বাৎস্যায়ন ৩।২।১১ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—ক্ষণ শব্দের অর্থ অতি অল্প কাল। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণস্থায়ী, জীবদেহও ক্ষণিক। প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবদেহের পরমাণু-সমূহ রূপান্তরিত হইয়া নবীকৃত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই পূর্ব্ব দেহের নাশ ও নূতন দেহের উৎপত্তি হইতেছে। উদ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকায় ৪।২।৩১ ও ৪।২।৩৫ সূত্রের ব্যাখ্যা স্থলে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন;—জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নাই, আমাদের অনাদি বাসনাই জ্ঞান-বৈচিত্র্যের কারণ।

উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থের প্রথমেই ক্ষণভঙ্গবাদের (ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদের) বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন;—বৌদ্ধগণ প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিতেন, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমরা যে বীজ অবলোকন করিতেছি, উহা পর মুহূর্ত্তে অঙ্কুররূপে পরিণত হইবে। যদি অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার পরও বীজ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আমরা

[illegible] হইয়া থাকে। [illegible]

জয়ন্ত স্বামী [illegible] লিখিয়াছেন—একমাত্র জ্ঞানই সত্য, [illegible] জ্ঞানের আকার মাত্র।

শবরস্বামী মীমাংসা দর্শনের ১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে প্রতিপক্ষগণের (বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের) মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ নাই, জ্ঞান সকল ক্ষণিক। নিত্য আত্মা (আত্মা) নাই। যাহারা বলেন নিত্য আত্মা স্বীকার না করিলে স্মরণাদির উপপত্তি হয় না, তাঁহারা ভ্রান্ত। আমি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাহা স্মরণ করিতেছি; অতএব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের দ্রষ্টা ও বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের স্মর্ত্তা একই পদার্থ (নিত্য আত্মা), এই মত যুক্তি সঙ্গত নহে। দর্শন ও স্মরণ উভয়ই জ্ঞান এবং উহারা উভয়ই এক সন্ততিজ অর্থাৎ উভয়ই এক জ্ঞানধারার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা বীজ ছিল তাহাই যেমন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অঙ্কুররূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দর্শন জ্ঞান ছিল তাহাই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে স্মরণজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে।

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধদর্শনপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন;—বুদ্ধদেব তাঁহার স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন;—

১ম। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক।

২য়। সকলই দুঃখময়।

৩য়। সমুদয়ই স্বলক্ষণ অর্থাৎ স্বসদৃশ।

৪র্থ। সকলই শূন্য।

সাংখ্য সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ক্ষণিকবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। কপিল অজ্ঞগণের (অজ্ঞানী অর্থাৎ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের) মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহারা স্থির আত্মা স্বীকার করেন না এবং কেবলই জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যভাষ্যে উক্ত মতের বিবাদ বিবৃতি করিয়াছেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশ।

---

# জৈন পুরা-কাহিনী।

আজ কয়েক বর্ষ হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলে জৈন-ধর্ম ও জৈন-গ্রন্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিয়াছে। এই আলোচনার ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে বাদ বিসংবাদ ও পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জর্মাণ অধ্যাপক বেবার (Weber) ও ফরাসী-পণ্ডিত বার্থ (Barth) উভয়ে ঘোষণা করিতেছেন, জৈনশাস্ত্রসমূহ নিতান্ত আধুনিক, উহাদের প্রাচীনত্বায় বিশ্বাস করিবার পক্ষে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অধ্যাপক বেবার মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম হইতেই জৈন ধর্মের উৎপত্তি। প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধগণ এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে যখন জৈনেরা বৌদ্ধ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে তাঁহাদের ধর্মশিক্ষাগুরু শাক্যমুনিকে অস্বীকার করিলেন, এমন কি তাঁহারা মিথ্যাগল্প রচনা করিয়া আপনাদিগকে শাক্যবুদ্ধের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইরূপে তাঁহারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণের আদর্শে স্ব স্ব গুরুগণের চরিতাখ্যান কীর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বেবার সাহেব বলিতে-ছেন, সেইজন্তই আমরা জৈনশাস্ত্রে বৌদ্ধগ্রন্থের অনেক প্রতিচ্ছবি দর্শন করিতেছি। অধ্যাপক বার্থ বলিতেছেন, যখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জৈনশাস্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন অতিপ্রাচীন জৈনপ্রবাদসমূহ কিরূপে প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? কারণ ঐ সময়ের পূর্ব্বতনকালে রচিত কোন জৈনশাস্ত্র বা জৈনগ্রন্থ লিপিবদ্ধ ছিলনা, তাহা জৈনেরা নিজেই স্বীকার করিয়া আসিতেছে। তিনি মনে করেন, জৈনগণ বহুকাল ধরিয়া কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় মধ্যে গণ্য ছিল না, পরে তাহারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদর্শে অভিনব ধর্মমত প্রচার করিয়াছে।

বেবার ও বার্থ সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছেন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন তাহার পথপ্রদর্শক। লাসেনের মতে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ জিন ও অর্হৎ শব্দদ্বারা বুদ্ধকেই বুঝায়। জৈনদের যেমন চব্বিশজন তীর্থঙ্কর আছেন, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সেইরূপ চব্বিশজন বুদ্ধের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। যদিও ঐ চব্বিশজনের মধ্যে পরস্পর নামের পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। জিনের অপর নাম সুগত ও সর্ব্বজ্ঞ, বুদ্ধদেবেরও তাহাই নামান্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে 'তীর্থেয়' বা 'তীর্থিক' নামে উল্লেখ করেন, কিন্তু জৈনগণ আপনাদিগের প্রধান আরাধ্য দেবাধিদেবকে 'তীর্থঙ্কর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন; এ পক্ষে প্রায় ব্রাহ্মণদিগেরই অনুকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন তাঁহাদের আচার্য্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, জৈনদের মধ্যেও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা-ধর্মপালন সম্বন্ধে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা বরং কঠিন নিয়ম পালন করিয়া থাকে। বৌদ্ধেরা যেমন অসংখ্য যুগপর্য্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনেরাও বৌদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়া উৎসর্পিণী ও

উপরে বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে যে মত উদ্ধৃত হইল, আমরা জৈনদিগের ঠানং (স্থানাঙ্গ) সূত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঐরূপ মত দেখিতে পাই। যথা ৩য় উদ্দেশকে—

"তত্থবওাপন্নত তং বহা মনোদণ্ডে বচদণ্ডে কায়দণ্ডে।"

প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী স্থানাঙ্গ-বর্ণিত উক্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। জৈন সাধুগণ নিগ্রন্থনামে খ্যাত, জ্ঞাতিপুত্র শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীরই নামান্তর। জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে (৪৫ স্তবকে) মক্‌খলিপুত্র গোশাল মহাবীরকে 'নায়পুত্ত'(জ্ঞাতপুত্র) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

চীন, ভোট, নেপাল, সিংহল, প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐ ছয় জন তীর্থিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; ঐ ছয় জনের মতই জৈনধর্ম্মমূলক। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মক্‌খলিপুত্র গোশালের বিবরণও ভগবতীসূত্রে বর্ণিত আছে। শেষোক্ত জৈনগ্রন্থ-মতে, গোশাল মহাবীরেরই একজন শিষ্য ছিলেন, কিন্তু মহাবীরের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটায় তিনি আপনাকে 'জিন' বলিয়া পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত প্রচার করেন।

সিংহলের সামন্নফলসুত্ত নামক পালিগ্রন্থে নিগ্রন্থগণ চাতুর্যাম-ধর্ম্ম-সম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে পার্শ্বমত্যেয়-কালাস-বেসিয়-পুত্তের সহিত মহাবীরের ধর্ম্ম প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"তজ্জবং অন্তিএ চাতুজ্জামাতো ধম্মত্তো পঞ্চ মহবচইয়ং সপড়িক্কমণং ধম্মং উপসম্পজ্জিওণং বিহরিওএ"
অর্থাৎ আপনার নিকট থাকিয়া চাতুর্যামরূপ ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে পঞ্চযাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টীকাকার শিলাঙ্ক লিখিয়াছেন, ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্যামধর্ম্ম এবং মহাবীর স্বামী যে ধর্ম্ম মত প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পঞ্চযাম বা পঞ্চমহাব্রতপালনরূপ ধর্ম্ম। যখন মহাবীর স্বামী পার্শ্বমতাবলম্বীর নিকট পার্শ্বমত শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, জৈন এবং বৌদ্ধদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে যখন চাতুর্যাম ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, চাতুর্যাম ধর্ম্মমত বহুপ্রাচীন, মহাবীর স্বামী বা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শাক্যবুদ্ধেরও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী।

জৈনদিগের কল্পসূত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ স্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্টজন্মের ৫২৭ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীরের নির্ব্বাণ হয়। এরূপ স্থলে খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কর্ত্তৃক চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জৈনাচার্য্যগণ নন্দিসূত্রের প্রমাণ দিয়া বলিয়া থাকেন, পার্শ্বনাথ স্বামীর বহুপূর্ব্বে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতেই জৈনমত সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জৈনদিগের অধিকাংশ অঙ্গে লিখিত আছে যে, বর্দ্ধমান বা মহাবীর ৮৪০০০০০ প্রশ্নবিশিষ্ট দ্বাদশ অঙ্গ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার টীকাকারগণ বর্দ্ধমানস্থানে ঋষভদেবের নাম বসাইয়া লইয়াছেন। প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য্য জিনসেন হরিবংশপুরাণে লিখিয়াছেন, মহাবীর স্বামী একাদশাঙ্গ প্রচার

করেন; দ্বাদশাঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাঁহার শিষ্য গৌতম কর্তৃক প্রচারিত হয়। যদিও মহাবীর স্বামীর পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ জৈন শাস্ত্র-মতে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম জৈন অঙ্গসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কল্পসূত্রের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জৈন শাস্ত্রসমূহ প্রথম লিপিবদ্ধ হয়; এ সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ৯৯৩ বীর গতাব্দে অর্থাৎ ৪৬৬ খৃষ্টাব্দে স্কন্দিলাচার্য্যের অধিনায়কতায় মথুরা-সঙ্ঘে জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কল্পসূত্রে লিখিত আছে, ৯৪০ বীর গতাব্দে (৪১৩ খৃষ্টাব্দে) বলভীরাজ ধ্রুবসেন আদেশ করিয়াছিলেন যে, সাধারণে প্রকাশ্যে কল্পসূত্র পাঠ করিবে। এরূপ স্থলে তাহার বহু পূর্ব্বে জৈন অঙ্গসমূহ পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিগম্বর জৈনদিগের মতে বীর-নির্ব্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১০৭ হইতে ১৫৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পুষ্পদন্ত নামে এক জন আচার্য্য সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এ দিকে সমবায় অঙ্গ, প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গ ও অনুযোগদ্বারসূত্রে স্পষ্ট লিপি-পদ্ধতির উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতেই জৈন-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিবার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বাস্তবিক মহাবীর স্বামী যে সকল অঙ্গ প্রচার করেন, প্রথমে সে সমস্ত তাঁহার শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বহুকাল মুখে মুখে থাকায় অনেক গ্রন্থ নষ্ট বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। হেমাচার্য্যের স্থবিরাবলিচরিত পাঠে জানা যায়, বীর-নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষের (অর্থাৎ ৩৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দের) কিছু পূর্ব্বে পাটলিপুত্রনগরে শ্রীসঙ্ঘ হয়; সে সময়ে জৈন শাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীসঙ্ঘে পাঁচ শত ভিক্ষু মিলিয়া জৈন শাস্ত্রসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জৈন শাস্ত্রগুলিকে অনেকে যেরূপ আধুনিক মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা সে রূপ আধুনিক নহে। জৈন সিদ্ধান্তগুলি পরবর্ত্তী কালে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গগুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ বলিতে চাহেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচারিত হয়; কিন্তু জৈন-দিগের মূল অঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহা জর্ম্মাণ-পণ্ডিত বেবার মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদিগের বেদসংহিতায় যেরূপ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রের গণনা দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ কাল নির্ণীত হইয়াছে; এরূপ স্থলে ঐ সকল অঙ্গ যে বহু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক জৈনদিগের পুরা কাহিনী-সমূহ কত দূর প্রামাণিক। লাসেন ও বেবারপ্রমুখ জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ জৈনদিগের স্থবিরাবলিগণ ও শাখাসমূহ অপ্রামাণিক বা

কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন; এই জন্যই জৈন গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহার উপর তাঁহারা তত আস্থাবান্ নহেন; কিন্তু আমরা বহুতর সাময়িক প্রমাণ পাইয়াছি, যদ্দ্বারা আমরা প্রমাণ করিব, উক্ত পুরাবিদ্‌গণ যাহা কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কাল্পনিক নহে, তাহা ঐতিহাসিক। মথুরা, বরাবর, ও কটক জেলাস্থ খণ্ডগিরি হইতে যে সকল জৈন শিলালিপি বাহির হইয়াছে, সেই সকল সাময়িক লিপি আমাদের কথার পোষকতা করিতেছে।

মথুরা হইতে যে সমস্ত প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কনিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি শকরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ। ইহার অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ ও অবশেষে ডাক্তার ফুহরার আবিষ্কার করিয়াছেন। কনিংহাম্ সাহেব বহুকাল হইল, ঐ সকল শিলালিপির ছবি প্রকাশ করিলেও তিনি ঐ সকল লিপি জৈন বলিয়া মনে করেন নাই। ডাক্তার বুহলর সাহেবই ঐ বিষয়ের পথপ্রদর্শক। উক্ত মহাত্মাদিগের সঙ্কলিত লিপিসমূহের সাহায্যে আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিব।

১। বর্দ্ধমান প্রতিমায় উৎকীর্ণ লিপি।

কনিংহাম্ সাহেব মথুরায় কঙ্কালি-তিলা নামক স্তূপ মধ্য হইতে একটী জৈন দেবমূর্ত্তিতে এই কয় ছত্র পাইয়াছিলেন। ডাক্তার বুহলর ইহার বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশ করেন:—

সিদ্ধং সং ২০ গ্রমা ১ দি ১৫ কোটিয়তো গণতো বাণিয়তো কুলতো বৈরিতো শাখাতো শিরিকাতো ভত্তিতো বাচকস্য অর্য্য-সঙ্ঘসিহস্য নির্ব্বর্ত্তনং দত্তিলস্য···বিলস্য কোঠুবিকিয় জয়বালস্য দেবদাসস্য নাগদিনস্য চ নাগদিনায়ে চ মাতু শ্রাবিকায়ে দিনায়ে দানং···ই বর্দ্ধমানপ্রতিমা *

অনুবাদ—'সিদ্ধ হউক! সংবৎ ২০, গ্রীষ্মমাস ১, তারিখ ১৫, শিরিকাভাগে, বৈরি-শাখায় বাণিয় কুলে ও কোটিয় গণে উৎপন্ন বাচক (১) আর্য্যসঙ্ঘসিংহের নির্ব্বর্তন। দত্তিলের (কন্যা), বিলের কুটুম্বী, জয়পাল, দেবদাস ও নাগদিনের মাতা শ্রাবিকা দিনার (২) দান—এই বর্দ্ধমান-প্রতিমা।'

২। জৈন পীঠের উপর উৎকীর্ণ লিপি।

সিদ্ধং মহারাজস্য কনিষ্কস্য রাজ্যে সংবৎসরে নবমে···মাসে প্রথ ১ দিবসে অস্যাং পূর্ব্বায়ে কোটিয়তো গণতো বাণিয়তো কুলতো বৈরিতো শাখাতো বাচকস্য নাগনংদিস নির্ব্বর্ত্তনং ব্রহ্ম···ধুতয়ে ভট্টিমিতস

* Cunningham's Arch. Sur. Reports. Vol. III. plate XIII, No 6.

(১) বাচক—ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা। (২) দিনা—সংস্কৃত রূপ 'দিন্না' বা 'দত্তা'।

কটুম্বিনিয়ে বিকটায়ে শ্রীবর্দ্ধমানস্য প্রতিমা কারিতা সর্ব্বসত্ত্বানং হিতা সুখায়ে *

'সিদ্ধ হউক! মহারাজ কনিষ্কের রাজ্যকালে নবম সংবৎসরে প্রথম মাসে ৫ম দিনে—ঐ পূর্ব্বোক্ত তারিখে কোটিয়গণে বাণিয় কুলে বৈরিশাখার উৎপন্ন, বাচক নাগনন্দির নির্ব্বর্ত্তন, ভটিমিত্রের কুটুম্বী (১) ও ব্রহ্মের কন্যা বিকটা কর্ত্তৃক সর্ব্ব মনুষ্যের মঙ্গল ও সুখের জন্য শ্রীবর্দ্ধমানপ্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত।'

৩। কঙ্কালি-তিলা হইতে প্রাপ্ত খণ্ডিত লিপি।

সংবৎসরে ৯০ ব......স্য কুটুবনি...বদানস্য বধূয় কোটিয়তো গণতো (প্রশ্ন-) বাহনকতো কুলতো মঝমাতো শাখাতো......স নিকায় ভতি গালাএ থবানি... †

নিতান্ত অস্ফুট বলিয়া অনুবাদ করা হইল না। ইহাতে কোটিয়গণ প্রশ্নবাহনকুল ও মধ্যমা শাখার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

৪। কঙ্কালি-তিলার একটী উলঙ্গ মূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ।

সিদ্ধং নমো অরহতো মহাবীরস্য দেবনাশস্য। রাজ্ঞ বাসুদেবস্য সংবৎসরে ৯৮ বর্ষ মাসে ৪ দিবসে ১১ এতস্যা পূর্ব্বায়ে অর্য্যরোহনিয়তো গণতো পরিহাসককুলতো পোনপত্রিকাতো শাখাতো গণিস্য অর্য্যদেবদত্তস্য ন ‡

অনুবাদ—'সিদ্ধ হউক! অর্হৎ মহাবীর দেবনাশকে নমস্কার। রাজা বাসুদেবের সংবৎসরে, ৯৮ বর্ষে ৪ মাসে ১১ দিবসে—উক্ত তারিখে আর্য্য রোহণের গণে, পরিহাসক কুলে (ও) পোনপত্রিকা (পৌর্ণপত্রিকা) শাখায় উৎপন্ন গণি আর্য্য দেবদত্তের...'

৫। উক্ত স্থান হইতে আবিষ্কৃত আর একখানি লিপি।

স ৪৭ গ্র ২ দি ২০ এতস্যা পূর্ব্বায়ে বারণে গণে পেতিধমিককুল-বাচকস্য রোহনদিস্য শিসস্য সেনস্য নিবতনং শ্রাবক দ। §

'সংবৎ ৪৭, গ্রীষ্ম ২য় মাসে, ২০শ দিনে উক্ত তারিখে বারণগণে ও পেতিধমিক (প্রৈতি-ধর্ম্মিক) কুলে বাচক রোহনন্দির শিষ্য সেনের নির্ব্বর্ত্তন।'

---

* Cunningham's Arch. Sur. Reports, vol. III, plate XIII, No 4.

† Do Do „ plate XV. No 19.

‡ Do Do Do plate XV. no 20.

§ ডাক্তার বুহ্‌লর 'চারণ' পদ পাঠ করিতে বলেন। কিন্তু মূলে স্পষ্ট 'বারণ' আছে।

(১) কুটুম্বী—গৃহপত্নী।

৬। কঙ্কালি তিলা হইতে নবাবিকৃত অপর শিলালিপি। *

সিদ্ধম্ ॥ মহারাজস্য রাজাতিরাস্য দেবপুত্রস্য যাহি কনিষ্কস্য সং ৭ হে ১ দি ১৫ এতস্যাং পূর্ব্বায়াং অর্য্যোদেহিকিয়াতো গণাতো অর্য্যনাগভুতিকিয়াতো কুলাতো গণিস্য অর্য্যবুদ্ধশিরিস্য শিষ্যো বাচকো অর্য্য··· নিকস্য ভগিনি অর্য্য জয় অর্য্য গোষ্ঠ··· †

'সিদ্ধ হউক। মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র সাহী কনিষ্কের ৭ সংবতে হেমন্তের ১ম মাসে ১৫ শ দিনে উপরোক্ত ( দিনে ) আর্য্য উদ্দেহিকীয়গণে আর্য্যনাগভুতিকীয় কুলে উৎপন্ন গণি আর্য্যবুদ্ধশ্রীর শিষ্য বাচক আর্য্য ··নিক, তাহার ভগিনী আর্য্য জয়া ও আর্য্য গোষ্ঠ।'

৭। ঐ স্থান হইতে নবাবিকৃত অপর শিলালিপি। *

সিদ্ধম্ সব ৮৪ (?) হেমন্তমাসে চতুর্থে ৪ দিবসে ১০ অস্যাং পূর্ব্বায়াং কোট্টিয়াতো গণাতো স্থানিয়াতো কুলাতো বৈরাতো শাখাতো শ্রীগুহাতো সম্ভোগাতো বাচকস্যার্য্যহস্তহস্তিস্য শিষ্যো গণিস্য অর্য্যমাঘহস্তিস্য শ্রদ্ধচরিবাচকস্য অর্য্যদেবস্য নির্বর্ত্তনে গোবস্য সীহপুত্রস্য লোহিককারুকস্য দানং সর্ব্বসত্বানাং হিতসুখা এক সরস্বতী প্রতিষ্ঠাবিতা অবতলে রঙ্গানর্ত্তনো মে।

'সিদ্ধ হউক! সংবৎ ৮৪ হেমন্ত কালে চতুর্থে ১০ ম দিবসে, ( শুক্র পক্ষে ) কোট্টিয় গণে স্থানীয় কুলে বৈরাশাখায় ও শ্রীগুহ সম্ভোগে উৎপন্ন বাচক আর্য্যহস্তহস্তীর শিষ্য গণি আর্য্যমাঘহস্তীর শ্রদ্ধচারী আর্য্যদেবের নির্ব্বর্ত্তনে সকল মনুষ্যের মঙ্গল ও সুখের জন্য এক সরস্বতী প্রতিষ্ঠাপিত সিংহপুত্র গোপ লোহিক কারুকের দান।'

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন, উপরোক্ত শিলালিপিগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কোন সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এখন দেখা যাউক, উক্ত লিপিসমূহে যে সকল গণ, কুল ও শাখার উল্লেখ আছে, জৈনশাস্ত্রে ঐ সকল গণ ও শাখাদির উল্লেখ আছে কিনা? আমরা জৈনদিগের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বাস্তবিক ঐ সকল গণ ও শাখার উল্লেখ পাইয়াছি।

---

* চারি পাঁচ বর্ষ হইল, ডাক্তার বুহলার কঙ্কালি-তিলার নানা স্থান, পুনরায় খনন করাইয়া যে সকল শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, এ সমস্তই নবাবিষ্কৃত বলিয়া উল্লেখ করা হইল। সুপণ্ডিত ডাক্তার বুহলর এ সকলেরও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। [ Epigraphia Indica, vol II. দ্রষ্টব্য। ]

† ইহার মূল লিপির ফটোলিথো Weiner zeitschrift fur die Kunde des Margenlandes, Vol. II, p. 145, P. pt. প্রকাশিত হইয়াছে।

আর্য্যরোহণগণ পরিহাসকুল—পোণপত্রিয়া শাখা।

কল্পসূত্রে লিখিত আছে, অশোকের পৌত্র সংপ্রতিরাজের দীক্ষাগুরু আর্য্য সুহস্তীর বার জন শিষ্য ; তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রজ আর্য্যরোহণ একজন ; ইনি উদ্দেহগণের প্রবর্ত্তক ; ঐ সকল গণ আবার চারিটী শাখায় এবং ছয়টী কুলে বিভক্ত, তন্মধ্যে পূর্ণপত্রিকা শাখা ও পরিহাসককুল একটী।

উদ্দেহিকীয়গণ—আর্য্যনাগভূতিকীয় কুল।

উপরোক্ত আর্য্যরোহণগণই উদ্দেহকগণ বলিয়া কল্পসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যনাগ-ভূতিকুল এই গণেরই অন্তর্গত, তাহা কল্পসূত্রেই পাওয়া গিয়াছে। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের পট্টাবলীমতে বীরগতে ২৬৫ বর্ষে (অর্থাৎ ২৬২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) আর্য্য সুহস্তী মোক্ষলাভ করেন। এরূপ স্থলে ঐ সময়ে বা তাঁহার অনেক কাল পরে তাঁহার প্রধান শিষ্য আর্য্যরোহণ কর্ত্তৃক উদ্দেহকগণ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

বারণগণ—পেতিধম্মিক কুল।

কল্পসূত্রের মতে—(পূর্ব্বোক্ত) আর্য্যসুহস্তীর অপর শিষ্য হারীত গোত্রজ শ্রীগুপ্ত চারণ গণ প্রবর্ত্তন করেন। এই চারণগণ চারিটী শাখা ও সাতটী কুলে বিভক্ত, এই সপ্তকুলের মধ্যে প্রীতিধম্মিক একটী। শিলালিপির বারণ লিপিকর প্রমাদে কল্পসূত্রে চারণরূপে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন লিপিতে 'ব' ও 'চ' প্রায় একরূপ লিখিত। এরূপ স্থলে 'বারণ' 'চারণ' হইবে, তাহাতে আর বাধা কি? সময়সুন্দর কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকায় লিখিয়াছেন যে লিপিপ্রমাদেও অনেক গণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় প্রাচীন কল্পসূত্রের যথেষ্ট পাঠান্তর লক্ষিত হয়. এরূপ স্থলে অধিক সম্ভব কল্পসূত্রের রচনাকালে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে) বারণগণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিলুপ্ত না হইলে এরূপ লিপিকর প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কোটিয়গণ বাণিয়কুল বইরিশাখা। কোট্টিয়গণ প্রশ্নবাহনকুল মধ্যমাশাখা। কোটিয়গণ স্থানীয়কুল বইরিশাখা।

কল্পসূত্রে লিখিত আছে, আর্য্যসুহস্তীর অন্যতম শিষ্য ব্যাঘ্রাপত্যগোত্র সুস্থিত ও সুপ্রতি-বুদ্ধ অপর নাম কোটিক ও কাকন্দক হইতে কৌটিকগণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই গণে চারিটী শাখা ও চারিটী কুল ; এতন্মধ্যে বইরি বা বজ্রী শাখা এবং বাণিয় কুলের উল্লেখ আছে ; কিন্তু স্থানীয় কুলের উল্লেখ নাই। কল্পসূত্রের মতে, উক্ত স্থবিরদ্বয়ের অন্যতম শিষ্য প্রিয়গ্রন্থ মধ্যমা শাখা স্থাপন করেন। জৈন পট্টাবলীমতে, বীরগতে ৩১৩ বর্ষে (২১৪খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) সুপ্রতিবুদ্ধের গুরু ভ্রাতা সুস্থিত মোক্ষলাভ করেন।

যাহা হউক, কল্পসূত্র ও জৈনগ্রন্থ হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, খৃষ্ট জন্মের দুই শতবর্ষের পূর্ব্বে জৈনসম্প্রদায় মধ্যে নানা শাখার ও শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছিল ; মথুরার সুপ্রাচীন শিলালিপিসমূহ তাহারই সমর্থন করিতেছে।

এইবার আমরা কয়েকটী সমসাময়িক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছি যে জৈন ধর্ম্ম ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খৃষ্ট জন্মের দুই তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

মথুরার কঙ্কালি-তিলা হইতে আবিষ্কৃত আর একখানি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতর শিলা-লিপিতে লিখিত আছে—

নমো অরহংতানং নমো সিদ্ধান সং ৬২
গ্র ৩ দি ৫ এতায়ে পূর্বায়ে রারকস্ত অর্যককসঘস্তস্য
শিষ্যা আতপিকোগহবর্যস্য নির্বর্তন চতুবর্ণস্য সংঘস্য
যা দিন্না পটিভাগ ১। বৈহিকায়ে দত্তি।

'অর্হৎগণকে নমস্কার, সিদ্ধগণকে নমস্কার। সংবৎ ৬২ *, গ্রীষ্ম ৩, দিন ৫। এই দিনে রাঢ়-বাসী আর্য্য কর্কশঘর্ষিতের শিষ্য আতপিকগ্রহবর্য্যের নির্বর্ত্তন। বহিকার দান।'

এতদ্ভিন্ন জুনাগড়ের উপরকোটের প্রাচীনতম লিপিতে 'কেবলীজ্ঞান সংপ্রাপ্তানাং' খণ্ডগিরিস্থ হাতিগুম্ফার প্রসিদ্ধ শিলালিপিতে অর্হৎ প্রভাব, এবং বরাবর শৈলের অশোক-লিপি ও নাগার্জ্জনী শৈলের অশোক পৌত্র দশরথের শিলালিপিতে জৈন সন্ন্যাসী আজীবক-গণের প্রসঙ্গে প্রমাণিত হইতেছে সম্রাট অশোকের সময়ে ও কিছু পরে জৈনগণ আমাদের রাঢ় দেশ হইতে গুজরাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

# বুদ্ধ দেবের জীবন-চরিত।

( সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত )

হিন্দু শাস্ত্রে ভগবানের প্রধানতঃ দশ অবতার স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুদ্ধদেব নবম অবতার। দশ অবতারের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥

প্রথমতঃ মৎস্য অবতার। দ্বিতীয়তঃ কূর্ম্ম। বরাহ তৃতীয় অবতার। চতুর্থ অবতারের নাম নৃসিংহ। বামন পঞ্চম অবতার। পরশুরাম ষষ্ঠ অবতার। রামচন্দ্র সপ্তম অবতার। বলরাম অষ্টম অবতার। নবম অবতার বুদ্ধ। কল্কী দশম অবতার।

সাহিত্যদর্পণকার এই দশ অবতার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।

---

* ডাক্তার বুহলার (Buhler) সাহেবের মতে, এই সংবৎ শকদিগের সংবৎজ্ঞাপক নহে। এই অঙ্কের আকার দেখিলে তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরো
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥

মৎস্য অবতারে যাঁহার শঙ্খাবৃত দেহে মহাসমুদ্র বিলীন হইয়াছিল, কূর্ম্ম অবতারে যিনি জগন্মণ্ডল পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, বরাহ অবতারে যিনি দন্তাগ্রভাগ দ্বারা ধরণীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, নৃসিংহ অবতারে যিনি নখ দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, বামন অবতারে যিনি পদ দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, পরশুরাম অবতারে যিনি ক্রোধের বশে ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, বলরাম অবতারে যিনি হস্তদ্বারা প্রলম্বাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, বুদ্ধ অবতারে যিনি ধ্যানের প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব অধিকার করিয়াছিলেন, কল্কী অবতারে যিনি অধার্ম্মিক লোকসমূহকে খড়্গ দ্বারা নিহত করিবেন, তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।

জয়দেব দশাবতারস্তোত্রে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ পূর্ব্বক দয়ার্দ্রচিত্তে পশুহিংসার অপকারিতা প্রদর্শন করতঃ যজ্ঞবিধায়ক মন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরি, তোমার জয় হউক।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি। নারায়ণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন; দ্বিতীয় বারে বরাহরূপে অবতীর্ণ হন। তৃতীয় বারে নারদরূপ ধারণ করেন। চতুর্থ বারে নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হন। কপিল পঞ্চম অবতার। ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয়। সপ্তম বারে আকূতীর গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ হন। অষ্টম অবতার ঋষভ। নবম অবতার পৃথু। দশম অবতারে মৎস্যরূপ ধারণ করেন। কূর্ম্ম একাদশ অবতার। দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরি। ত্রয়োদশ বারে মোহিনী রূপ ধারণ করেন। নৃসিংহ চতুর্দ্দশ অবতার। বামন পঞ্চদশ অবতার। পরশুরাম ষোড়শ অবতার। ব্যাস সপ্তদশ অবতার। রামচন্দ্র অষ্টাদশ অবতার। একোনবিংশ বারে নারায়ণ রামকৃষ্ণরূপ গ্রহণ করেন। এক্ষণে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, ভগবান্ এই যুগে গয়া প্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। কলিযুগের শেষ কালে নারায়ণ বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয় অংশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে যে ভগবান্ স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া দেবগণকে কহিলেন :—এই মায়ামোহ সমুদায় দৈত্যগণকে মোহিত করিবে, দৈত্যগণ বেদমার্গবিহীন হইলে তোমরা অনায়াসে উহাদিগকে বধ করিতে পারিবে।

অনন্তর মায়া-মোহ নর্ম্মদা নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, সেখানে অসুরগণ তপস্যা করিতেছে। অসুরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে দৈত্য-পতি-গণ, তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ? যদি তোমরা ঐহিক বা পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর। আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ করিব, উহাই মুক্তির উপযোগী। উহা হইতে শ্রেয়োধর্ম্ম আর নাই। এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে স্বর্গ বা মুক্তি যাহা অভিলাষ কর তাহাই পাইবে। মায়া-মোহের প্ররোচনায় দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইল। এইটি ধর্ম্ম এইটি অধর্ম্ম, এইটি সৎ এইটি অসৎ, ইহাতে মুক্তি হয় উহাতে মুক্তি হয় না, এইটি পরমার্থ ওটি অলীক, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম উহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, এইরূপ নানা সন্দেহজনক বাক্য বলিয়া মায়া-মোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইল। মায়া-মোহ বলিয়াছিল "হে দৈত্য-গণ, তোমরা মহক্ত ধর্ম্ম অর্হত অর্থাৎ মান্য কর"। এই জন্য যাহারা মায়ামোহপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে খ্যাত হয়। মায়ামোহের ধর্ম্ম ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর মায়ামোহ অসুরগণকে বলিল, যদি নির্ব্বাণ লাভ করা তোমাদিগের বাঞ্ছনীয় হয়, অথবা যদি তোমরা স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ কর। এই জগৎপ্রবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। এই জগতের কোন আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও। ইত্যাদি।

এইরূপে অগ্নিপুরাণ বায়ুপুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে নানা বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্য বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ষড়্‌বিংশ সূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অভাবপদার্থ হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয় এই মত খণ্ডন করিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন। তদনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ দৈত্যগণকে বিমূঢ় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধ দেব রুদ্ররূপী মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

> ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।
> অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
> প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু।

হে মহাবাহো রুদ্র, আপনি মোহশাস্ত্র সমূহ বিরচন করুন। হে মহাভুজ, আপনি অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুন। আপনি কতকগুলি কল্পিত শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে লোক সকল আমার প্রতি বিমুখ হয় তাহা করুন। বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে মহাদেব প্রভৃতিও স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিকধর্ম্মে প্রবেশ পূর্ব্বক লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বেদসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎপ্রবাহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং সেই অবিদ্যার নিবৃত্তিতেই নির্ব্বাণ লাভ হয়, এই কথা বলিয়া কতকগুলি জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যাসী ও পাষণ্ডের সৃষ্টি

করেন। এই সকল দেখিয়া ব্যাস তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ব্যাস শঙ্করের সহ কলহ করিয়া উঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও তদনন্তর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব এইরূপে জগৎকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন দেখিয়া আমি—অগ্নিদেব—এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৈদিকমার্গের সমুদ্ধারের অভিপ্রায়ে আমি বেদের সূত্রসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বেদসমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত মোহ নিবারণ করিয়াছি।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ বুদ্ধদেবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

অমরসিংহ স্বীয় অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের নামের পূর্ব্বেই বুদ্ধের নাম কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্তিশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

ব্রহ্মাঽবিদ্যাভিভূতো দুরধিগমমহামায়য়ালিঙ্গিতোঽসৌ
বিষ্ণুরাসক্তিরেকাৎ নিজবপুষি ধৃতা পার্ব্বতী শঙ্করেণ।
বীতাবিদ্যো বিমায়ো জগতি স ভগবান্ বীতরাগো মুনীন্দ্রঃ
কঃ সেব্যো বুদ্ধিমদ্ভির্বদত বদত মে ভ্রাতরস্তেষু মুক্তো॥

ব্রহ্মা অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত; বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গনে বিমুগ্ধ; শঙ্কর আসক্তিবশতঃ পার্ব্বতীকে নিজদেহে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুনিপুঙ্গব বুদ্ধ অবিদ্যা, মায়া ও আসক্তি এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।

বিদেহনামক কবি সমন্তকূটবন্নণা নামক পালিগ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

সততবিততকিত্তিং ধ্বস্তকন্দপ্পদপ্পং
তিভুবহিতবিধানং সব্বলোকেককেতুম্।
অমিতমতিমনঙ্কং সন্তিদং মেরুসারং
সুগতমহমুদারং রূপসারং নমামি॥

যাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় সারবিশিষ্ট, এবং যিনি লোকসমাজের কেতু সদৃশ, সেই অমিতবুদ্ধিশালী, মনোহর, শান্তিদাতা, রূপবান্ ও উদার সুগতকে নমস্কার করি।

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতায় বুদ্ধজন্ম নামক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

> হসতি সকললোকালোকসর্গায় ভানুঃ
> পরমমমৃতবৃষ্টৌ পূর্ণতামেতি চন্দ্রঃ।
> ইয়তি জগতি পুজ্যং জন্ম গৃহ্নাতি কশ্চিৎ
> বিপুলকুশলসেতুঃ সত্ত্বসন্তারণায়॥

সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত সূর্য্য উদিত হন ; পরম অমৃত বর্ষণ করিবার জন্য চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেন ; এই জগতে জীবগণের উদ্ধারসাধনের অভিপ্রায়ে পুণ্যসেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য পূজনীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন।

অবদানকল্পলতার মহাকাশ্যপাবদান নামক ত্রিষষ্টিসংখ্যক পল্লবের প্রারম্ভে ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> শক্রবায়ুবরুণাদয়ঃ সুরাঃ
> বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ যৎকৃতে।
> যান্তি তৎ স্মরসুখং তৃণায়তে
> যস্য কস্য ন স বিস্ময়াস্পদম্॥

ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও প্রধান প্রধান মুনিগণ যে কামসুখের নিমিত্ত বিকৃত-চিত্ত হইয়া পড়েন, সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতে পারেন, তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন !

বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রারম্ভে অশ্বঘোষ বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া লিখিয়াছেন :—

> শ্রিয়ং পরার্ধ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ
> তমো নিরস্যন্নভিভূতভানুভৃৎ।
> নুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমাঃ
> স বন্দ্যতেঽর্হন্ ইহ যস্য নোপমা॥

যিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়া বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া যিনি সহস্ররশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন, লোকের শোকসন্তাপ নিবারণ করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ জগতে যাঁহার উপমা নাই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করি।

এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে ও সর্ব্বভাষায় বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। ললিতবিস্তর সূত্র, বুদ্ধচরিত কাব্য, লঙ্কাবতার সূত্র, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ; মহাবংস, মহাপরিনিব্বান সুত্ত, মহাবগ্গ, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রন্থ ; Fo-pan-hhing-tsi-cin প্রভৃতি চীন গ্রন্থ ; Shaka-jitsu-roku প্রভৃতি জাপানী গ্রন্থ ; মললংগয় বত্থু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ ; গ-ছের-রোল-প ( ক্যাঙ্‌গুরের সূত্র

[...]পিটকের খ অধ্যায়) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ; ইত্যাদি গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

পরলোকগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ললিতবিস্তর গ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটীর ব্যয়ে মুদ্রিত করেন। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই, ই, ও পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ অবদানকল্পলতার কিয়দংশ বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত করেন। লঙ্কাবতারসূত্র আমি ও রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটীর গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত করিতেছি। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ই, বি, কাউএল্ ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বুদ্ধচরিত কাব্যের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ফরাসীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সেনার্ট সুবিপুল মহাবস্তু গ্রন্থের শেষ খণ্ড সংপ্রতি সমাপ্ত করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত জর্জ টার্ণার মহাবংশ নামক পালি গ্রন্থের প্রথম সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায় মুদ্রিত করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন; তদনন্তর সিংহলদেশীয় পণ্ডিত সুমঙ্গল মহাথেরো ঐ গ্রন্থের অবশিষ্ট ত্রিষষ্টিসংখ্যক অধ্যায়ের মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অধ্যাপক চাইল্ডার্স মহাপরিনির্ব্বানসুত্ত নামক প্রাচীন পালি গ্রন্থের সংস্করণ কার্য্য রোমান্ অক্ষরে সম্পাদন করেন, এবং ঐ গ্রন্থ লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। যাঁহার সুগভীর প্রাচ্য ভাষাভিজ্ঞতায় সমগ্র ইউরোপ গৌরবান্বিত, ডেন্মার্ক দেশীয় সেই জগদ্বিখ্যাত পালিপণ্ডিত ডাক্তার ফজ্-বৌল্ জাতক নামক পালিগ্রন্থ রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন।

Fo-pan-hhing-tsi-cin নামক চীন গ্রন্থ, Shaka-jitsu-roku নামক জাপানী গ্রন্থ, ও মল্লাংগরবত্থু নামক ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ, বহুবার চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। ক্যাজ্যুর নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ধর্ম্মগ্রন্থনিচয়ের সূত্রপিটকের খ অধ্যায়ে গ-ছের্-রোল্-প নামে যে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, উহা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে উপরে যে কয়েক খানি গ্রন্থের নাম লিখিত হইয়াছে, উহাদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উহাদের মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের রচনাকাল নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। গ্রীস, সিংহল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশীয় প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের লিখিত বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় কবি ও দার্শনিকগণের আবির্ভাবকাল কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হয় এবং ঐ সময় হইতে ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ চীন দেশে গমন করিয়া যে সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত করিতেন এবং চীন অক্ষরে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া দিতেন, অথবা চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যে সকল সংস্কৃতগ্রন্থ লইয়া যাইতেন, ঐ সকল গ্রন্থ চীন সম্রাট্গণ অতি যত্নের সহিত গ্রহণ

করিতেন; এবং ঐ গ্রন্থসমূহের সংগ্রহকর্ত্তা ও অনুবাদকর্ত্তার নাম ধাম ও সময় রাজকীয় পুস্তকের তালিকায় লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দ্বাদশ শতবর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক প্রয়োজনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ চীন দেশে নীত হয়। সংপ্রতি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির আদেশে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের তত্ত্বাবধানে জাপানদেশীয় Hongwanzi বিহারের ধর্ম্মাধ্যক্ষ Bunyin Nanjio ঐ সকল গ্রন্থের চীনদেশে আনয়নকাল, উহাদের অনুবাদকাল, সংগ্রাহক ও অনুবাদকের নাম ধাম ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া এক সুবৃহৎ Catalogue প্রস্তুত করিয়াছেন। Bunyin Nanjio র উক্ত Catalogue এ ১৬৬২ খানি অতি প্রয়োজনীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই Catalogue এ লিখিত আছে, ললিতবিস্তর গ্রন্থ চারিবার চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। শেষ হান্ বংশের রাজত্বকালে ২২১—২৬৩ খৃঃ অব্দ মধ্যে উহা একবার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। Kai-yuen-shi-kian-mu-lu নামক চীন গ্রন্থের মতে প্রথম হান্ বংশীয় Wing-hing নামক রাজার রাজত্বকালে ৬৯ খৃঃ অব্দে ললিতবিস্তরের চীন-ভাষায় প্রথম অনুবাদ হয়। মূল সংস্কৃত ললিতবিস্তর অবশ্য ভারতে তাহার পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল।

বুদ্ধচরিত কাব্য উদীচ্য Liang বংশের রাজত্বকালে ৫১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৪২১ অব্দ মধ্যে ধর্ম্মরক্ষ নামক পণ্ডিতকর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, যে চারিটী সূর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, বুদ্ধচরিত কাব্যপ্রণেতা অশ্বঘোষ উহাঁদের অন্যতম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে বুদ্ধচরিতপ্রণেতা অশ্বঘোষ রাজা কনিষ্কের ধর্ম্মোপদেষ্টা ও তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ব্ব সুঙ্ বংশের রাজত্বকালে ৪৪৩ খৃঃ অব্দে গুণভদ্র নামক পণ্ডিত লঙ্কাবতারসূত্র চীন ভাষায় অনুবাদিত করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তীর্থপর্য্যটনকালে লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে অতি প্রাচীন কালে লঙ্কামলয়শিখরে আসীন হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ লঙ্কাবতারসূত্রের উপদেশ করেন।

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ পূর্ব্ব Tsing বংশের রাজত্বকালে ৩১৭ হইতে ৪২০ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র একবার চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

জাতক-নিদান নামক গ্রন্থ পশ্চিম Tsing বংশের রাজত্বকালে ২৮৫ খৃঃ অব্দে চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়।

৪১০-৪৩২ খৃঃ অব্দ মধ্যে মহানাম নামক পণ্ডিত পালি মহাবংশের পূর্ব্ব খণ্ড বিরচন করেন।

অভিষিক্ত করুন; আপনার মৃত্যুর পর যাহাতে আমার পুত্র শাকেত মহানগরের রাজা হইতে পারে তাহার বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। জেন্তী তাহাই করিল রাজা সুজাত জেন্তীর এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ছূর্ঘ্ণায়মান হইলেন। তিনি তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; উহাদিগকে কিরূপে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ জেন্তীর প্রার্থিত বর প্রদান না করিলে তাহার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হয়। তখন রাজা জেন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—তোমাকে প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিতেছি; নগর ও জনপদের প্রজাপুঞ্জ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে যে আমি আমার পঞ্চ পুত্রকে নিষ্কাশিত করিয়া তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। নগর ও জনপদের লোকসকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহারা আমার পঞ্চ পুত্রের সহ বনে গমন করিবে। রাজা প্রজাগণের অভিপ্রায় পূর্ণ করিলেন। প্রজাগণ বলকায়সমন্বিত হইয়া যথার্থই উক্ত পঞ্চকুমারের সহ গমন করিল। তাহারা শাকেত নগর হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইল। কতিপয় দিবসের পর কাশিকোশলের রাজা উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় রাজ্যে লইয়া গেলেন। উহারা কিয়ৎকাল কাশিকোশল রাজ্যে অবস্থিতি করিল। অনন্তর কাশিকোশলের রাজা ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাজনকায় এই পঞ্চকুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, ইহারা যদি দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস করে, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাণ সংহার করিয়া পঞ্চকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। এইরূপে ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া রাজা ঐ মহাজনকায় ও পঞ্চকুমারকে কাশিকোশল রাজ্য হইতে বিপ্রোষিত করিলেন।

অনন্তর উহারা হিমালয় পর্ব্বতের প্রত্যন্তপ্রদেশে শাকোটবনখণ্ডস্থিত ঋষি কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিল। সেখানে উহারা পরস্পরের ভগিনী, ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহ পরস্পরের পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত করিল। রাজা সুজাত মন্ত্রিগণের মুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্রগণ অন্তর্হিমবৎ প্রদেশে শাকোট বনখণ্ডে ঋষি কপিলের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে, এবং উহারা ঐ স্থানে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। তখন রাজা স্বীয় পুরোহিত ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণ যেরূপ প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছে, উহা শক্য অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? পুরোহিতপ্রমুখ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বলিলেন, কুমারেরা এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ঐরূপ বিবাহাদি শক্য অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত। ব্রাহ্মণগণ ঐরূপ কার্য্য শক্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া কুমারগণের নাম শাক্য হইল। তদবধি কুমারগণ শাক্য নামে পরিচিত হইলেন। তদনন্তর ঐ শাক্যকুমারগণ ঋষি কপিলের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এক মহানগর নির্ম্মাণ করিলেন। কপিল ঋষি উহাঁদিগকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নগর কপিলবাস্তু নামে প্রসিদ্ধ হইল। উক্ত পঞ্চকুমারের মধ্যে ওপুর জ্যেষ্ঠ। তিনি কপিলবাস্তু নগরের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর,

তাঁহার পুত্র করকণ্ডক, করকণ্ডকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষ; হস্তিকশীর্ষের পুত্র সিংহহনু। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন, ও অমৃতোদন নামক চারি পুত্র ও অমিতানাম্নী একটী কন্যা জন্মে।

অমিতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ আলেপন, প্রত্যালেপন, বমন, বিরেচন ইত্যাদি বহুপ্রকার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু ব্যাধির প্রশান্তি হইল না। ক্রমে অমিতার সর্ব্বশরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইল ও তিনি জনগণের ঘৃণাস্পদ হইলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যানে আরোপণ পূর্ব্বক হিমালয়ের উৎসঙ্গপর্ব্বতে গুহামধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে এক সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া অমিতাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাঁহারা গর্ত্ত মধ্যে প্রভূত খাদ্য, উদক, উপাস্তরণ, প্রাবরণ ইত্যাদি রাখিয়া আসিলেন। মহাপাংশুরাশি দ্বারা গর্ত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা কপিলবাস্তু নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। চতুর্দিক সংরুদ্ধ থাকায় গর্ত্ত অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল। ঐ আবৃত স্থানে বাস করিয়া ও ঐ স্থানের উষ্ণতা সেবন করিয়া অমিতা কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইলেন। তাঁহার শরীর নির্ব্রণ হইল। তিনি আমানুষিক সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন। মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া একটী ব্যাঘ্র সেখানে উপস্থিত হইল। সে পাদ দ্বারা পাংশুরাশি অপসারিত করিল।

সেই স্থানের সন্নিধ্য কোল নামে এক রাজর্ষি বাস করিতেন। তিনি পঞ্চপ্রকার অভিজ্ঞা ও চতুর্বিধ ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও পানীয় ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ ও বিভূষিত। সেই ঋষি আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া ব্যাঘ্র ভয়ে পলায়ন করিল। ঋষি ঐ গর্ত্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া উহার দ্বার অপাবৃত করিলেন। সেখানে সেই পরমরমণীয়া শাক্যকন্যাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? অমিতা তখন সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিলেন। পরমসৌন্দর্য্যশালিনী অমিতাকে দর্শন করিয়া ঋষির অন্তঃকরণে উৎকট অনুরাগ উৎপন্ন হইল। তিনি ভাবিলেন:—

কিং চাপি তাবচ্চিরব্রহ্মচারী
ন চাস্ত রাগানুশয়ো সমুহতো।
পুনোঽপি সো রাগবিষো প্রকুপ্যতি
তিষ্ঠং যথা কাষ্ঠগতন্ অনুহতন্।

সংসারে এমন কি কেহ আছেন যিনি চিরব্রহ্মচারী এবং যাঁহার হৃদয়ে আসক্তির লেশমাত্র বিদ্যমান নাই। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণের হৃদয়েও অনুরাগরূপ বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। অবসর প্রাপ্ত হইলেই সেই অনুরাগরূপ আশীবিষ প্রকুপিত হয়।

তখন সেই রাজর্ষি শাক্যকন্যার সাহচর্য্যে ধ্যান ও অভিজ্ঞা হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। তিনি

শাক্যকন্যাকে আহ্বান করিয়া আশ্রমপদে লইয়া গেলেন। উক্ত কোল ঋষির ঔরসে ও শাক্যকন্যা অমিতার গর্ভে দ্বাত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহাদের আকৃতি অতি মনোহর এবং উহারা সকলেই অজিন জটা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর অমিতা তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন, তোমাদের মাতামহ কপিলবাস্তুনগরের রাজা, অতএব তোমরা সেই স্থানে গমন কর। পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কুমারগণ কপিলবাস্তু নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কপিলবাস্তু নগরের শাক্যগণ ঋষিকুমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কোথা হইতে এখানে আগত হইয়াছে? তাহারা বলিল, অনুহিমবৎ প্রদেশে কোল নামে যে রাজর্ষি বাস করেন আমরা তাঁহার পুত্র ও শাক্যরাজ সিংহহনুর দৌহিত্র। আমাদের মাতা সিংহহনুর দুহিতা। শাক্যগণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে যে কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অমিতাকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন, তিনি রোগ হইতে নির্মুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভে ঋষিকুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিল না। তাঁহারা ঐ কুমারগণকে প্রভূত দান করিলেন ও শাক্যকন্যাগণের সহ উহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। কোল নামক ঋষির ঔরসে কুমারগণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া উহাদের বংশ কোলির বংশ নামে অভিহিত হইল।

শাক্যগণের দেবদহ নামে একটী জনপদ ছিল। সেখানে সুভূতি নামে এক সমৃদ্ধশালী শাক্যরাজ বাস করিতেন। পূর্ব্বোক্ত কোলিয়বংশীয় কোন কন্যার সহিত সুভূতির বিবাহ হয়। সুভূতির মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চূলীয়া, কোলীসোবা ও মহাপ্রজাবতী নামে সাতটী কন্যা জন্মে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সিংহহনু কপিলবাস্তুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, ধৌতোদন ও অমৃতোদন নামক চারি পুত্র ও অমিতানাম্নী কন্যা জন্মিয়াছিল। সিংহহনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন কপিলবাস্তুর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেবদহের রাজা সুভূতির যে পাঁচটী কন্যা জন্মিয়াছিল, শুদ্ধোদন উহাদের মধ্যে দুইটীকে বিবাহ করেন। এই দুই কন্যার নাম মায়া ও মহাপ্রজাবতী। শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা নামক গ্রন্থে শাক্যোৎপত্তি ও বুদ্ধজন্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন :—

পূর্ব্বে বসুন্ধরা ঘোরতমসাবৃত ও জলমগ্ন ছিল। ক্রমে জলভাগ ঘনীভূত হইতে লাগিল ও স্থলভাগের উৎপত্তি হইল। অন্ধকার বিলুপ্ত হইলে পৃথিবী প্রাণিগণের আবাসযোগ্য হইল। ক্ষত্রিয়বংশে মহাসম্মত নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসম্মতের উপোষধ নামে পুত্র জন্মে। উপোষধের পুত্র রাজা মান্ধাতা। মান্ধাতার বংশে বহুসহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ বংশে কৃকি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। কৃকির বংশে কাশ্যপ ও কাশ্যপের বংশে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকুর বংশে বিরূঢ়কের জন্ম হয়। বিরূঢ়ক কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ অপর পুত্রগণকে নির্ব্বাসিত করেন। তখন তাহারা

স্বদেশের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ঋষি কপিলের আশ্রমে গমন করেন। ঋষি ঐ কুমারগণের আবাসের নিমিত্ত কপিলবাস্তু নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। কিছুকাল গত হইলে রাজা বিরূঢ়ক অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি কুমারদিগকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন। তখন মন্ত্রিগণ বিজ্ঞাপন করিলেন মহারাজ, কুমারগণ উৎকৃষ্ট নগরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে উঁহাদের প্রত্যানয়ন করা অশক্য। রাজা বিরূঢ়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কুমারগণের প্রত্যানয়ন করা শক্য কি অশক্য। তিনি এইরূপে শক্যাশক্য বিচিন্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কুমারগণ শাক্য নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের বংশ শাক্যনামে খ্যাত হয়। এই বংশে ক্রমে পঞ্চবিংশতি সহস্র নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। পরিশেষে ঐ বংশে রাজা দশরথের জন্ম হয়। দশরথের বংশে সিংহহনু জন্মগ্রহণ করেন। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র ও শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃতা নামে চারি কন্যা জন্মে। শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মহামায়ার গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম হয়।

অবদানকল্পলতায় বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সম্বন্ধে অপর যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, উহার সহিত ললিতবিস্তর গ্রন্থে বর্ণিত বৃত্তান্তের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। দুই একটী স্থলে সামান্য কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। অবদানকল্পলতার মতে বুদ্ধের পত্নীর নাম যশোধরা, কিন্তু ললিতবিস্তরের মতে উহাঁর নাম গোপা।

সিংহলের ইতিহাস মহাবংস নামক পালি গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধজন্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

কল্পের প্রারম্ভে মহাসম্মত নামে এক রাজা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার বংশে রোজ, বররোজ, কল্যাণ, বরকল্যাণ, উপোষধ, মান্ধাতা, বরমান্ধাতা, চরক, উপচরক, চৈত্য, মুচল, মহামুচল, মুচলিন্দ, সগর, সাগরদেব, ভরত, অঙ্গীরস, রুচি, সুরুচি, প্রতাপ, মহাপ্রতাপ, প্রণাদ, মহাপ্রণাদ, সুদর্শন, মহাসুদর্শন, নেরু এবং মহানেরু নামে রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তদ্বংশীয় ১০০, ৫৬, ৬০; ৮৪০০০, এবং ৩৬ জন রাজা বিভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর ৩২, ২৮, ২২, ১৮, ১৭, ১৫, ১৪, ৯, ৭, ১২, ২৫, ২৫, ১২, ১২ এবং ৯ জন রাজা বিভিন্ন রাজধানীতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের শেষ রাজার নাম ওক্কাহ (উল্কাহ)। ওক্কাহের পুত্র ওক্কামুখ (উল্কামুখ)। উল্কামুখের বংশে নিপুর, চন্দোমান, চন্দোমুখ, শ্রীসঞ্জয়, বেশ্বান্তর, চামি, সিংহবাহন ও সিংহস্বর নামক রাজা প্রাদুর্ভূত হন। সিংহস্বরের বংশে ৮২০০০ রাজা যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ রাজার নাম জয়সেন। শাক্যরাজ জয়সেন কপিলবাস্তু নগরে রাজত্ব করিতেন। জয়সেনের পুত্রের নাম সিংহহনু ও কন্যার নাম যশোধরা।

দেবদহ নগরে দেবদহ নামে এক শাক্যরাজ বাস করিতেন। দেবদহের অঞ্জন নামে এক পুত্র ও কাঞ্চনা নামে এক কন্যা জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সিংহহনুর সহ কাঞ্চনার বিবাহ

হয় এবং অঞ্জন পূর্ব্বোক্ত যশোধরার পাণিগ্রহণ করেন। অঞ্জনের মায়া ও মহাপ্রজাবতী নামে দুই কন্যা এবং দণ্ডপাণি ও সুপ্রবুদ্ধ নামে দুই পুত্র জন্মে।

সিংহহনুর শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন ও অমৃতোদন নামক চারিপুত্র এবং অমিতা ও প্রমিতা নামে দুই কন্যা জন্মে।

সুপ্রবুদ্ধ অমিতার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রকাঞ্চনানাম্নী কন্যা ও দেবদত্ত নামক পুত্র জন্মে।

শুদ্ধোদনের সহ মায়া ও মহাপ্রজাবতী উভয়েরই বিবাহ হয়। শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থই পরিশেষে বুদ্ধ এই নামে পরিচিত হন।

খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

সিদ্ধার্থের সহ পূর্ব্বোক্ত সুভদ্রকাঞ্চনার বিবাহ হয়। তাঁহাদের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে।

মগধ-রাজ বিম্বিসারের সহ সিদ্ধার্থের অকপট বন্ধুত্ব উৎপন্ন হয়। বিম্বিসার অপেক্ষা সিদ্ধার্থ পাঁচ বৎসর বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। উনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আশয়ে গৃহ হইতে অভিনিক্রমণ করেন। ছয় বৎসর কাল অবিশ্রান্তভাবে জ্ঞানোপার্জন করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তদনন্তর বুদ্ধ বিম্বিসারের নিকট গমন করেন। পোনের বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিম্বিসার মগধের সম্রাট্ হন। ষোল বৎসর রাজত্ব করিবার পর অর্থাৎ একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সাতষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিম্বিসার স্বীয় পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। অজাতশত্রুর রাজ্যগ্রহণের আট বৎসর পরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সিদ্ধার্থ উনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহত্যাগ করিয়া ছয় বৎসর-কাল ধ্যান, সমাধি ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে মগধরাজ্যে উরুবেল নামক স্থানে বোধিদ্রুমমূলে বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তদনন্তর সপ্তাহ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া বারাণসী নগরীতে গমন করেন। সেখানে ষাটি জন লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিয়ৎকাল পরে ত্রিশ জন রাজা তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদনন্তর মহাকাশ্যপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ দার্শনিককে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মগধরাজ্যে পুনরাগমন করেন। সেখান হইতে তিনি লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন এবং ঐ দ্বীপের অসংখ্য লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ৪।৫ বৎসর পরে তিনি নাগদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর ৪৫ বৎসর কাল তিনি এইরূপে বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারিত করেন। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরের কোন শালবৃক্ষমূলে জগতের এই উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ নির্ব্বাণ লাভ করেন।

জাতক নামক সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু নগরে

শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ যে লুম্বিনীবনে জন্ম গ্রহণ করেন, উহা কপিলবাস্তু ও দেবদহ এই দুই নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। জাতক গ্রন্থে বর্ণিত অন্যান্য বৃত্তান্তের সহ ললিতবিস্তরে বর্ণিত বৃত্তান্তসমূহের কোনই প্রভেদ নাই। জাতকে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। তিনি এক রাত্রিতে তিন রাজ্য অতিক্রম করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হন। সেখানে আম্রবনমধ্যে এক সপ্তাহ বাস করেন। তদনন্তর প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ পদ-ব্রজে গমন করিয়া রাজগৃহ নগরে উপনীত হন। তিনি রাজগৃহে রুদ্রক নামক ব্রাহ্মণের নিকট কিয়ৎকাল কিছু শিক্ষা করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে গমন করেন। তিনি নৈরঞ্জনা নদীর যে স্থানে স্নান করিয়াছিলেন, উহা পরিশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত নামক প্রধান তীর্থ পরিণত হয়। নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুমমূলে তিনি ছয় বৎসর কাল তপস্যা করেন। ছয় বৎসরের পর সূর্য্য অস্তগত হইবার পূর্ব্বে তিনি মারসেনাকে পরাজিত করেন। তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে পূর্ব্ব জন্মসমূহ তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হয়। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগৎ-প্রবাহের কার্য্যকারণ ভাব মনোমধ্যে চিন্তা করেন। এই সময়ে তিনি বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্য-সমুৎপাদ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

মহাবগ্গ নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহার সহ ললিতবিস্তরে বর্ণিত বৃত্তান্তের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। মহাবগ্গে বর্ণিত আছে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পরও সাত দিবস নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুমমূলে অবস্থান করেন। তিনি যে রাত্রি বুদ্ধত্বলাভ করেন, ঐ রাত্রির প্রথম মধ্যম ও শেষ যামে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের আবিষ্কার করেন। জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি ও ধ্বংস হয়, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ঐ সময়ে তিনি মনোমধ্যে আলোচনা করেন।

অশ্বঘোষ স্বীয় বুদ্ধচরিত কাব্যে বুদ্ধদেবের আদ্যোপান্ত জীবনচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার সহ বুদ্ধচরিত কাব্যে বর্ণিত ঘটনার বিশেষ প্রভেদ নাই। বুদ্ধচরিত কাব্যের দ্বাদশ সর্গের নাম অরাড়দর্শন। রাজগৃহ নগরে অরাড় নামক উপাধ্যায়ের সহ সিদ্ধার্থের যে সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল, এই সর্গে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ অরাড়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক রাজগৃহ নগরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। তিনি অরাড়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, লোক সকল কি উপায়ে জরামরণ, দুঃখ ইত্যাদি হইতে চির নির্মুক্ত হইতে পারে? অরাড় স্বীয় শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক বলিলেন, প্রকৃতি ও বিকার এই দুইএর প্রভেদ অবগত হওয়া উচিত। বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, বিষয়, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি প্রকৃতির বিকার মাত্র। এই প্রকৃতিকে যিনি জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা বলে। অজ্ঞান, কর্ম্ম ও তৃষ্ণা এই তিন দ্বারা লোকসকল সংসারে বদ্ধ হয়। যিনি প্রকৃতি হইতে বিভক্ত, অহঙ্কারশূন্য, নির্গুণ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি

[illegible] হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপে অরাড় [illegible] মতের বিবরণ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সিদ্ধার্থ ঐ রাজগৃহ নগরে রুদ্রক নামক ব্রাহ্মণ দার্শনিকের আশ্রমে গমন করেন। রুদ্রক স্বীয় দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা এতদুভয়ের অতিক্রম দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।

বুদ্ধচরিত কাব্যের চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, সিদ্ধার্থ যে দিন বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, সেই দিন তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি আরসৈন্যকে পরাভূত করিয়া পরম নিবৃত্তি লাভ করেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সংসার কদলীগর্ভের ন্যায় নিঃসার। রাত্রির দ্বিতীয় যামে তাঁহার দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হয়। যেমন নির্ম্মল আদর্শে বস্তুসকল সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপে তিনি দিব্য চক্ষুর সাহায্যে নিখিল বিশ্বের গূঢ় রহস্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। প্রাণিগণ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা উচ্চগতি এবং অসৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের ফল বিচিত্র। জীব সকল অহরহঃ জন্ম জরা মরণ দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করিতেছে। তখন তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, জরা মরণের কারণ জন্ম। জন্ম না হইলে জরা মরণ হয় না। [illegible] ফল [illegible] নিমিত্ত [illegible] জন্ম হয়। সংসারে উপাদান বা আসক্তি না জন্মিলে ভবের উৎপত্তি হয় না। কোন পদার্থের প্রতি তৃষ্ণা না জন্মিলে উপাদান অর্থাৎ আসক্তি প্রাদুর্ভূত হয় না। সুখ দুঃখ ও অদুঃখা-সুখ এই ত্রিবিধ বেদনাই তৃষ্ণার কারণ। ইন্দ্রিয়ের [illegible] বিষয়ের সম্বন্ধই বেদনার হেতু। চক্ষুঃ কর্ণ ইত্যাদি ষড়ায়তন ও রূপরস ইত্যাদি বিষয়ই উক্ত সম্বন্ধের হেতু। দর্শন শ্রবণাদি বিজ্ঞানসমূহ ঐ ষড়ায়তন ইত্যাদির ব্যঞ্জক। পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ এই ষড়্‌বিধ বিজ্ঞানের হেতু। অবিদ্যা হইতে সংস্কার সমূহের উৎপত্তি হয়। এইরূপে তিনি দেখিলেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের সর্ব্ব দুঃখের কারণ ও সংসার বিষবৃক্ষের মূল। দুঃখের কিরূপে উৎপত্তি ও নিরোধ হয়, এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী নাম লাভ করেন। ঐ দুঃখতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। এই দুঃখতত্ত্ব বা প্রতীত্যসমুৎপাদের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে। বুদ্ধ যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, বুদ্ধচরিত কাব্যের মতে ঐ ধর্ম্মের নাম মহাযান। নির্ব্বাণ লাভের উহাই উৎকৃষ্ট উপায়। নির্ব্বাণ শিখরে উপনীত হইবার সোপান স্বরূপে তিনি চতুরার্য্য সত্যের ও আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ করেন। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ ধ্বংসের উপায় এই চারি প্রকার সত্যকে চতুরার্য্য সত্য বলে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ইত্যাদি সমস্তই দুঃখস্বরূপ। তৃষ্ণাই দুঃখোৎপত্তির কারণ। তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটিকে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। ইহাদের অবলম্বনে দুঃখনিরোধের উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব গৃহ ত্যাগ করিবার পর যে সকল দূত-প্রযোজনে

পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অতিক্রম করেন। দশম সর্গে বর্ণিত আছে, যখন তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা দ্বারা আহার সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহের রাজা বিম্বিসার বহুলোক সমভিব্যাহারে বোধিসত্ত্বের নিকটে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলেন :—

> আদিত্যপূর্ব্বং বিপুলং কুলং তে নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুশ্চ।
> কস্মাদিয়ং তে মতিরক্রমেণ ভৈক্ষাক এবাভিরতা ন রাজ্যে॥
> গাত্রং হি তে লোহিতচন্দনার্হং কাষায় সংশ্লেষমনর্হমেতৎ।
> হস্তঃ প্রজাপালনযোগ্য এষ ভোক্তুং ন চার্হঃ পরদত্তমন্নম্॥

হে বোধিসত্ত্ব আপনি সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার এক্ষণে যৌবনকাল উপস্থিত এবং আপনার দেহ দীপ্তিশালী। আপনার এক্ষণে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিল কেন? আপনি ভিক্ষায় অভিরত আছেন, কিন্তু রাজ্যে আপনার অভিলাষ নাই, ইহার কারণ কি? আপনার সুকোমল দেহ লোহিত চন্দন দ্বারা রক্ষিত হইবার যোগ্য, কাষায় বস্ত্র পরিধান করা আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আপনার হস্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার যোগ্য, কিন্তু পরদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে।

রাজা বিম্বিসারের কথায় বোধিসত্ত্বের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও বিষয়-বাসনা উৎপন্ন হয় নাই।

বুদ্ধচরিত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে মারবিজয় বর্ণিত হইয়াছে :—

> তস্মিংশ্চ বোধায় কৃতপ্রতিজ্ঞে রাজর্ষিবংশপ্রভবে মহর্ষৌ।
> তত্রোপবিষ্টে প্রজহর্ষ লোকস্তত্রাস সদ্ধর্ম্মরিপুস্তু মারঃ॥
> যং কামদেবং প্রবদন্তি লোকে চিত্রায়ুধং পুষ্পশরং তথৈব।
> কামপ্রচারাধিপতিং তমেব মোক্ষদ্বিষং মারমুদাহরন্তি॥
> তস্যাত্মজা বিভ্রমহর্ষদর্পাস্তিস্রো রতিপ্রীতিতৃষশ্চ কন্যাঃ।
> পপ্রচ্ছুরেনং মনসো বিকারং স তাংশ্চ তাশ্চৈব বচো বভাষে॥
> অসৌ মুনির্নিশ্চয়বর্ম্ম বিভ্রৎ সত্ত্বায়ুধং বুদ্ধিশরং বিকৃষ্য।
> জিগীষুরাস্তে বিষয়ান্ মদীয়ান্ তস্মাদয়ং মে মনসো বিষাদঃ॥
> যদি হ্যসৌ মামভিভূয় যাতি লোকায় চাখ্যাত্যপবর্গমার্গম্।
> শূন্যস্ততোঽয়ং বিষয়ো মমাদ্য বৃত্তাচ্চ্যুতস্যেব বিদেহভর্ত্তুঃ॥
> তদ্ যাবদেবৈষ ন লব্ধচক্ষুর্মদ্গোচরে তিষ্ঠতি যাবদেব।
> যাস্যামি তাবদ্ ব্রতমস্য ভেত্তুং সেতুং নদীবেগ ইবাভিবৃদ্ধঃ॥
> ততো ধনুঃ পুষ্পময়ং গৃহীত্বা শরাংস্তথা মোহকরাংশ্চ পঞ্চ।
> সোঽশ্বত্থমূলং সসুতোঽভ্যগচ্ছদস্বাস্থ্যকারী মনসঃ প্রজানাম্॥
> অথ প্রশান্তং মুনিমাসনস্থং পারং তিতীর্ষুং ভবসাগরস্য।
> বিষজ্য সব্যং করমায়ুধাগ্রে ক্রীড়ন্ শরেণেদমুবাচ মারঃ॥

রাজর্ষিবংশোদ্ভূত মহর্ষি বোধিসত্ত্ব পরমজ্ঞান লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিদ্রুমমূলে আসীন হইলে সংসারের সকল লোকেই হর্ষ প্রকাশ করিল; কিন্তু সদ্ধর্ম্মের

শত্রু মার ভীত হইল। লোকে যাহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্পশর নামে অভিহিত করে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজ্যের অধিপতি, মুক্তির বিরোধী মার নামে অভিহিত করেন। বিলাস, হর্ষ ও দর্প নামক তিন পুত্র এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা—মারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পিতঃ আপনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? তখন মার উক্ত পুত্র ও কন্যাদিগকে বলিল:—শাক্যমুনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূপ বর্ম্ম, সত্ত্বরূপ আয়ুধ এবং বুদ্ধিরূপ বাণ ধারণ পূর্ব্বক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া বোধি-দ্রুমমূলে আসীন আছেন; সেই হেতু আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছে। যদি উনি আমাকে পরাজিত করিয়া সংসারে মোক্ষ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমি সমগ্র রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কন্দর্পের বৃত্তি লোপ পাইল। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত শাক্য মুনি দিব্যচক্ষুঃ লাভ না করেন এবং যে কাল পর্য্যন্ত তিনি আমার রাজ্যে অবস্থান করেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিব। যেমন নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া সেতু ভেদ করে, আমিও সেইরূপে উঁহাকে ভেদ করিব। তদনন্তর লোকহৃদয়ের অস্বাস্থ্যকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্রকন্যাসমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হইল। অনন্তর মার ধনুর অগ্রভাগে বাম হস্ত সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে, যোগাসনে আসীন এবং ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলিল। বোধিসত্ত্বের সহ মারের প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ হইল। অনন্তর মার ও তাহার পুত্র, কন্যা এবং অসংখ্য সৈন্য একত্র সমবেত হইয়া বিবিধ উপায়ে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল। মারসেনার সহ বোধিসত্ত্বের যে তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত বুদ্ধচরিত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

বুদ্ধচরিত কাব্যের পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত আছে যে মার সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অতি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে স্বগৃহে প্রতিগমন করিয়াছিল। তদনন্তর রতি, তৃষ্ণা ও আরতি নামধেয়া তিন কন্যা মারকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, হে পিতঃ, আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমরা কৌশলপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে আপনার অধীন করিয়া দিতেছি। অনন্তর উহারা যুবতীর রূপ ধারণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল।

> রতিস্তত্রেন্দুবদনা মোহবিদ্যাহলংকৃতা।
> মোহয়ামাস তৈস্তৈস্তং গার্হস্থ্যসুখলোভনৈঃ॥
> চক্রবর্ত্তিসুখং ত্যক্ত্বা কিং দীনং সুখমাশ্রয়ে।
> ত্যক্ত্বা সংপৎ কথং মোক্ষ ইত্যাশান্ সমুপাশ্রয়॥
> নোচেৎ ত্বং নিপ্রতিসাক্ষী ভ্রষ্টো মম ভবিষ্যসি।
> নিদ্রালুরিব তস্থৌ তাং নাশৃণ্বন্ ধ্যানমীলিতঃ॥

ইন্দুবদনা ও মোহরূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা রতি সংসারের নানা প্রকার সুখের কথা বলিয়া বোধিসত্ত্বকে বিমোহিত করিতে লাগিল। সে বলিল হে বোধিসত্ত্ব, তুমি সাম্রাজ্য

সুখ ত্যাগ করিয়া কেন দীনভাবে কালযাপন করিতেছ? সম্পৎসমূহ ত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা কাহার নিকট শুনিয়াছ? তুমি আমাদিগের আশ্রয়ে আগমন কর; যদি তুমি বিপথগামী না হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদের নিকটে আইস। নিদ্রালু লোক যেমন কাহারও কথা শুনিতে পায় না; ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বও সেইরূপ রতির বাক্য শুনিতে পাইলেন না।

রতির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তৃষ্ণা ও আরতি আসিয়া বোধিসত্ত্বকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। অনন্তর উহারা বৃদ্ধার রূপ ধারণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট আসিল এবং নানা উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিল।

এক সময়ে রতি, তৃষ্ণা ও আরতি বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল:—

প্রব্রজ্যাং দেহি ভগবন্ ভবচ্ছরণমাগতাঃ ॥
বার্ত্তামাকর্ণ্য ভবতাং আয়াতাঃ কাঞ্চনাৎ পুরাৎ।
গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য নমুচেরাত্মজা বয়ম্ ॥
পংচশতানাং ভ্রাতৄণাং শিক্ষাসংবরণোৎসুখাঃ।
যথা ত্বমসি বৈরাগ্যো বয়ং চ ভর্ত্তৃবর্জ্জিতাঃ ॥

হে ভগবন্, আমরা আপনার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম প্রদান করুন. আপনার কথা শুনিয়া আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুবর্ণপুর হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আমরা কন্দর্পের দুহিতা। আমাদের পাঁচ শত ভ্রাতা। তাহারাও সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছে। আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব আমি ও আমার ভগিনীগণ, আমরা সকলেই আজ বিধবা হইলাম।

নির্লজ্জ মারও যথাসাধ্য সর্ব্বশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব কন্দর্পের বিজয় সাধন করিয়া মহাপ্রীত্যাহারব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন।

রাক্ষসপতি রাবণের প্রার্থনা অনুসারে বুদ্ধদেব লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়া রাক্ষসদিগকে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, লঙ্কাবতারসূত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অভিনিষ্ক্রমণসূত্রে বোধিসত্ত্বের প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

Fo-pan-shin-tsi-cin নামক চীন গ্রন্থে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, উহার সহ বুদ্ধচরিত কাব্যের ঘটনার কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। মল্লালংকারবত্থু নামক ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও ললিতবিস্তরের বৃত্তান্ত প্রায় একরূপ।

হুয়েন্সাঙ্ ও তাঁহার সমসামরিক চীন গ্রন্থকারগণের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৮৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন

শক-জিন্নু-রোকু নামক জাপানী গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক

ঘটনা বিবৃত আছে। উহার কতক অংশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না। অন্যান্য অংশ ললিতবিস্তরের অনুরূপ। শক-জিঙ্গ-রোকু গ্রন্থের রচয়িতা লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেব গৌতম গোত্রে, ইক্ষ্বাকুকুলে ও শাক্য বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যথাক্রমে গৌতম, ইক্ষ্বাকু ও শাক্য নামে প্রসিদ্ধ হন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন সুপ্রবুদ্ধের গৌতমী ও মায়া নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। মায়াদেবীর গর্ভের সঞ্চার হইলে গৌতমী ঈর্ষ্যার বশে তাঁহার নানা প্রকার অপকার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় ও তিনি অনুতপ্ত হইয়া মায়াদেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মায়াদেবী লুম্বিনীবনমধ্যে সিদ্ধার্থ নামে একটী পুত্র প্রসব করিয়া সাত দিন পরে পরলোক গত হন। [ খৃঃ পূঃ ১০২৭ অব্দে ঐ পুত্রের জন্ম হয়। ] অনন্তর উক্ত শিশুর প্রতিপালনের ভার গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়। যখন সিদ্ধার্থের বয়স আট বৎসর, তখন তিনি বিশ্বামিত্র নামক কোন উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হন। উদয়ী নামক কোন বালক সিদ্ধার্থের সহচর নিযুক্ত হয়। সিদ্ধার্থ বাল্যকালেই পশুহিংসা প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবদত্তপ্রভৃতি সহচরগণ মৃগয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। সিদ্ধার্থ তাহাদিগকে বলিতেন:—পশুপক্ষিপ্রভৃতি প্রাণীর বধ করা অত্যন্ত নৃশংসের কার্য্য। যশোধরা নাম্নী শাক্যকন্যার সহ সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। তাঁহাদের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে। জাপানী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন; যে যদি সিদ্ধার্থ বিবাহ না করিতেন ও তাঁহার পুত্র না জন্মিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে সংসার দুঃখবহুল। কোটি কোটি মানবকে বিবাহের দুঃখবাহুল্য বুঝাইবার জন্য সিদ্ধার্থ স্বয়ং পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। বুদ্ধ আদেশ করিয়াছিলেন যে যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার দশজন প্রধান শিষ্য ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই দশজন শিষ্যের নাম কাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, সুভূতি, পূর্ণ, কাত্যায়ন, উপালি এবং রাহুল। শ্রাবস্তীর সুদত্ত নামক কোন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে জেতবন বিহার প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ঐ স্থানে স্বীয় ধর্ম্মের প্রচার করেন।

গ-ছের-রোল্-প ইত্যাদি তিব্বতীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মারকে বিজয় করিয়া সিদ্ধার্থ অর্হন্ এই নাম লাভ করেন। অর্হন্ শব্দ অরিহন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অরিহন্ শব্দের অর্থ শত্রুবিজয়ী। জীবের মহাশত্রু মার বা কন্দর্পকে জয় করিয়া সিদ্ধার্থ অর্হন্ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিব্বতীয় ভাষায় অর্হন্‌কে ড-চোম্-প বলে। ড শব্দের অর্থ শত্রু এবং চোম্-প শব্দের অর্থ বিজেতা। অনেক তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫১৪ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থ হইতে বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়:—

কপিলবাস্তু মহানগরে শুদ্ধোদন নামে এক সুপ্রসিদ্ধ শাক্যরাজ বাস করিতেন। তিনি শাক্যাধিপতি সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়াদেবীকে বিবাহ করেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভের সঞ্চার হয়। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে মায়াদেবী কপিলবাস্তু নগরের সান্নিধ্যে লুম্বিনীনামক পরম রমণীয় উদ্যানমধ্যে একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্র জাতমাত্রই শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের সর্ব্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এই নাম রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাত দিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু রাজধানীতে আনীত হন। কুমারের প্রতিপালনের ভার উহার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়।

হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে অসিত নামে এক মহর্ষি বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভাগিনেয় নরদত্তের সহিত কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। সিদ্ধার্থের দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন * দেখিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট বিজ্ঞাপন করেন, যে যদি ঐ বালক সংসারাশ্রমে অবস্থান করে, তাহাহইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, আর যদি গৃহত্যাগী হয়, তাহাহইলে সম্যক্ সম্বুদ্ধি লাভ করিবে। অনন্তর ঋষি অসিত স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট নানাদেশীয় লিপি শিক্ষা করেন। গুরুগৃহে গমনের পূর্ব্বেই তিনি

---

* দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ যথা :—

সিদ্ধার্থের মস্তকে উষ্ণীষের চিহ্ন ; তাঁহার কেশসমূহ কৃষ্ণবর্ণ ও দক্ষিণদিকে আকুঞ্চিত ; তাঁহার ললাট দেশ সমতল ও বিপুল, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ উর্ণালঙ্কৃত ; তাঁহার নেত্র নীলবর্ণ এবং চত্বারিংশৎ দন্তই তুল্যাকৃতি ; দন্তসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট ও শুক্লবর্ণ ; তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ; রসনায় অগ্রে রসাভিষিক্ত ; জিহ্বা বৃহৎ ও কৃশ ; তাঁহার হনু সিংহের হনুর ন্যায় ; তাঁহার স্কন্ধদেশ বর্ত্তুলাকৃতি ও উন্নত ; তাঁহার কান্তি সুবর্ণের ন্যায় ; তিনি স্থির ; তাঁহার ভুজদণ্ড অনবনত ও প্রলম্বিত ; শরীরের পূর্ব্বভাগ সিংহের ন্যায় ; কটিদেশ ন্যগ্রোধ তরুর ন্যায় পরিমণ্ডল ; শরীরের ঘন রোমরাজি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ; উরুদেশ সুগোল ; জঙ্ঘাদেশ এণ মৃগের ন্যায় ; তাঁহার অঙ্গুলি সমূহ দীর্ঘ ; তাঁহার পাণি ও পাদ আয়ত ও কোমল ; হস্ত ও পদতল রেখাজালসমন্বিত ; পাদদ্বয়ের তলদেশ চক্রাঙ্কিত, বিচিত্র ও শুভ্র ; পাদদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমান।

অশীতি অনুব্যঞ্জন যথা —

সিদ্ধার্থের নখসকল উন্নত, তাম্রবর্ণ ও স্নিগ্ধ ; তাঁহার অঙ্গুলি সকল বর্ত্তুলাকৃতি ও ক্রমশির ; গুল্ফ ও শিরা সকল অদৃশ্য ; দেহের সন্ধি সকল দৃঢ় ; পাদদ্বয় অবিষম ; পাদদ্বয়ের পার্শ্বদেশ আয়ত, হস্তের রেখা সকল স্নিগ্ধ, তুল্যাকৃতি, গম্ভীর, অবক্র ও ক্রমানুগ ; ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় আরক্ত ; তাঁহার শব্দ অনুচ্চ ; জিহ্বা কোমল ও রক্তবর্ণ ; তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর, গম্ভীর ও সুস্পষ্ট ; বাহুদ্বয় প্রলম্বিত ; দেহ পবিত্র, মৃদু, বিশাল, অদীন, অনুন্নত, সুসমাহিত ও সুবিভক্ত। জানুমণ্ডল বিপুল ও সুপরিপূর্ণ ; গাত্র বৃত্তাকৃতি, সুমার্জিত, অজিহ্ম ও অনুপূর্ব্ব ; নাভি গম্ভীর, অজিহ্ম ও অনুপূর্ব্ব ; তাঁহার আচার পবিত্র, দেহ প্রসন্ন ; দেহপ্রভা সুবিশুদ্ধ, তিনি গজের ন্যায় মন্থরগতি ; তাঁহার প্রদক্ষিণগামিতা ; তাঁহার কুক্ষি বৃত্তাকৃতি ও অজিহ্ম ; উদর ধনুর ন্যায় ; শরীর অনুন্নত, দন্ত বৃত্তাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও অনুপূর্ব্ব ; নাসিকা তুঙ্গ ; নয়ন পবিত্র সুবিমল, প্রহসিত, আয়ত, বিশাল ও নীল কুবলয়দলের সদৃশ ; ভ্রূদ্বয় সংযুক্ত, বিচিত্র, সংগত, অনুপূর্ব্ব, কৃষ্ণবর্ণ ; গণ্ডদেশ পীন, অবিষম, অপগতদোষদুষ্ট ; কুক্ষি অনুপহত ; ইন্দ্রিয় সকল তীক্ষ্ণ ও সুপরিপূর্ণ মুখ ও ললাট পরস্পর সংগত ; মস্তক পরিপূর্ণ ; কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ঘন, পরস্পর সুসংগত, সুরভি, অপরুষ, অনাকুল, অনুপূর্ব্ব, সুকুঞ্চিত ও নন্দ্যাবর্ত্ত।

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসারি, অঙ্গ লিপি, বঙ্গ লিপি, মগধ লিপি, মাঙ্গল্য লিপি, মনুষ্য লিপি, অঙ্গুলীয় লিপি, শকারি লিপি, ব্রহ্মবল্লী লিপি, দ্রাবিড় লিপি, কিনারী লিপি, দক্ষিণ লিপি, উগ্র লিপি, সংখ্যা লিপি, অনুলোম লিপি, অর্দ্ধধনুর্লিপি, দরদ লিপি, খাস্য লিপি, চীন লিপি, হূন লিপি, মধ্যাক্ষরবিস্তর লিপি, পুষ্প লিপি, দেব লিপি, নাগ লিপি, যক্ষ লিপি, গন্ধর্ব্ব লিপি, কিন্নর লিপি, মহোরগ লিপি, অসুর লিপি, গরুড় লিপি, মৃগচক্র লিপি, চক্র লিপি, বায়ুমরুলিপি, ভৌমদেব লিপি, অন্তরীক্ষ দেব লিপি, উত্তরকুরুদ্বীপ লিপি, অপর গৌড়াদি লিপি, পূর্ব্ব বিদেহ লিপি, উৎক্ষেপ লিপি, নিক্ষেপ লিপি, বিক্ষেপ লিপি, প্রক্ষেপ লিপি, সাগর লিপি, বজ্র লিপি, লেখপ্রতিলেখ লিপি, অনুদ্রুত লিপি, শাস্ত্রাবর্ত্ত লিপি, গণনাবর্ত্তলিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপি, অধ্যাহারিণী-লিপি, সর্ব্বরুতসংগ্রহণী লিপি, বিদ্যানুলোমা লিপি, বিমিশ্রিত লিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণীপ্রেক্ষণ-লিপি, সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা, সর্ব্বসারসংগ্রহণী, ও সর্ব্বভূতরুত গ্রহণী, এই চতুঃষষ্টি প্রকার লিপি অবগত ছিলেন।

ক্রমে তিনি নানা বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও উপনিষদ্ বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইল ও তিনি কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রত্যানীত হইলেন। শুদ্ধোদন দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা গোপার সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। সিদ্ধার্থ বিবাহের সময়ে বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, শিক্ষা, গণিত, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যখন তিনি বর্ণমালা শিক্ষা করেন, তখনই অকার উচ্চারিত হইবামাত্র "অনিত্যাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ" এই বাক্য তাঁহার কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করে। এক দিন তিনি কৃষিগ্রাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটী বৃক্ষ দেখিয়া উহার মূলে নির্জনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকেন।

অনন্তর এক দিন তিনি স্বীয় সারথিকে বলিলেন, সারথে, রথযোজনা কর, আমি উদ্যান ভূমি দর্শন করিব। সারথি রথ যোজনা করিলেন। সেখানে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোককে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ দুর্ব্বল অল্পস্থাম

উচ্ছুষ্ক মাংস রুধিরত্বচ স্নায়ু নদ্ধঃ।

শ্বেতশিরো বিরলদন্ত কৃশাঙ্গরূপ

আলম্ব্য দণ্ড ব্রজতেঽসুখং স্খলন্ত।

হে সারথে, এই লোকটী দণ্ডধারণ পূর্ব্বক অতি কষ্টে স্খলিত গতিতে গমন করিতেছে কেন? ইহার শরীর দুর্ব্বল ও স্থৈর্য্যবিহীন, এবং মাংস, রুধির, ত্বক্ সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহের স্নায়ু সকল প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্ত বিরল, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি কৃশ, ইহার কারণ কি?

সারথি উত্তর করিল,—

এষো হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ দুঃখিতো বলবীর্য্যহীনঃ।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দারু।

হে দেব এই ব্যক্তি জরা দ্বারা অভিভূত, দুঃখিত ও বলবীর্য্যবিহীন। ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এ ব্যক্তি এখন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকাষ্ঠ যেমন পড়িয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া কালযাপন করিতেছে।

সিদ্ধার্থ সারথিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্ত হি বং ভণাহি
অথবাপি সর্ব্বজগতোঽস্ত ইয়ং অবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সচিন্তয়িষ্যে।

এইরূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি এইব্যক্তির কুলধর্ম্ম অথবা সংসারের সকল লোকেরই ঈদৃশী অবস্থা? তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর প্রদান কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ইহার যথাভূত কারণ চিন্তা করিব।

তখন সারথি বলিল :—

নৈতস্তদেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্ত জরযৌবন ধর্ষয়াতি।
তুভ্যং পি মাতৃ পিতৃ বান্ধব জ্ঞাতিসংঘো
জরয়া অমুক্তং নহি অন্যগতির্জনস্ত।

হে দেব, ইহা এ ব্যক্তির কুলধর্ম্ম বা রাষ্ট্র ধর্ম্ম নহে। সংসারের সকল লোকেরই যৌবন জরা কর্ত্তৃক অভিভূত হয়। আপনিও আপনার পিতা, মাতা, বান্ধব, ও জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই জরার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন না। লোকের অন্য গতি নাই।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

ধিক্ সারথে অবুধবালজনস্ত বুদ্ধি—
র্যদ্ যৌবনেন মদমত্ত জরাং ন পশ্যেৎ।
আবর্ত্তয়াপিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
কিং মহ্য ক্রীড়রতিভির্জরয়াশ্রিতস্ত।

হে সারথে, লোক সকল নির্ব্বোধ। তাহাদের বুদ্ধিকে ধিক্ যে তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। তুমি রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি এই জরাশ্রিত ব্যক্তিকে

পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়াসুখে প্রয়োজন কি?

অপর একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ দ্বার দ্বারা উদ্যানভূমি প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ রূপবিবর্ণগাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক উদরাকুল প্রাপ্তকৃচ্ছ্রে।
মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে।

হে সারথে, এই লোকটী স্বকীয় কুৎসিত মূত্র ও পুরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে কেন? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয়সকল বিকল ও সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক। এব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি?

সারথি উত্তর করিল :—

এষো হি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো
ব্যাধীভয়ং উপগতো মরণান্ত প্রাপ্তঃ।
আরোগ্য তেজ রহিতো বলবিপ্রহীনো
অত্রাণদ্বীপ শরণো হ্যপরায়ণশ্চ।

হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন ও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার বল হীন হইয়াছে। রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া এ ব্যক্তি অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

আরোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্ন ক্রীড়া
ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপম্।
কো নাম বিজ্ঞ পুরুষো ইম দৃষ্ট্ব অবস্থাং
ক্রীড়ারতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা।

আরোগ্য স্বপ্ন ক্রীড়ার ন্যায় অলীক; ব্যাধি সমূহ অতি ভয়ঙ্কর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা জগতে সুখ আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন?

অন্য সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দ্বারা উদ্যান ভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন একটী মৃত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ মঞ্চোপরি গৃহীতো
উদ্ধূত কেশ নখ পাংশু শিরে ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব 'বহরন্ত্যুরস্তাড়য়ন্তো
নানাবিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ।

হে সারথে, এই লোকটী মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন? ইহার চতুর্দ্দিকের লোক সকল কেশ ও নখ কম্পন করিতেছে ও মস্তকে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে। ঐ সকল লোক ইহাকে বেষ্টিত করিয়া বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, ইহার কারণ কি?

সারথি বলিল :—

এষো হি দেব পুরুষো মৃতু জম্বুদ্বীপে
ন হি ভুয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্র দারম্।
অপহায় ভোগ গৃহমাতৃপিতৃমিত্রজ্ঞাতিসংঘং
পরলোক প্রাপ্ত ন হি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিন্।

হে দেব জম্বুদ্বীপে এই লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি পুনরায় পিতা, মাতা, পুত্র ও পত্নী প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে না। গৃহ, পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া এ ব্যক্তি পরলোক গমন করিতেছে; জ্ঞাতিপ্রভৃতি আর এ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

ধিগ্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য ধিগ্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসংগৈঃ।
যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু
তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্।

যৌবনে ধিক্, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। জীবনে ধিক্, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যে তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকেন।

যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলেও লোকের পঞ্চ স্কন্ধ ধারণ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে হইত। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া দুঃখমোচনের উপায় চিন্তা করিব।

অন্য সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের উত্তর দ্বার দ্বারা উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটী শান্ত, দান্ত, সংযত ও ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ শান্তপ্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।
কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতো বা॥

হে সারথে, এই লোকটী কে? এ ব্যক্তি শান্তশীল ও প্রশান্তচিত্ত, ইহার চক্ষুর্দ্বয় স্থির ও কাষায় বস্ত্র পরিধানীয়। ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। ইনি ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়া শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অন্তকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইনি কে?

সারথি বলিল :—

এষো হি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষু নামা
অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্যা প্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো
সংরাগদ্বেষবিগতো ভিক্ষতি পিণ্ডচর্য্যা॥

হে দেব, এই ব্যক্তির নাম ভিক্ষু। ইনি কামসুখ ত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন এবং আসক্তি-হীন ও বিদ্বেষবিহীন হইয়া সামান্ত আহার সংগ্রহ করিতেছেন।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

সাধু সুভাষিত মিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্য নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরং মৃতং ফলঞ্চ।

তুমি যে বিষয়ের কথা বলিলে, উহা অতি সুন্দর ও সৎ। উহাতে আমার রুচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই প্রব্রজ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিজের হিত ও অন্য জীবের হিত সাধন করিতে পারা যায় এবং জীবন সুখে যাপন করিতে পারা যায়। সুমধুর অমৃত অর্থাৎ মুক্তিই ঐ আশ্রমের ফল।

শুদ্ধোদন স্বীয় পুত্রের এইরূপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নানাবিধ উপায়ে উঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিদ্ধার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি নিশীথ সময়ে শুদ্ধোদনের শয়নাগারে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, পিতঃ, অদ্য আমি গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিব।

সিদ্ধার্থের চিত্ত তখন চারি প্রকার প্রণিধানে নিমগ্ন হইয়াছিল। সংসারমহাচারক বন্ধনপ্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের বন্ধনমোচনের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম প্রণিধান জন্মিল। সংসার মহাবিদ্যান্ধকারগহনপ্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের প্রজ্ঞাচক্ষুঃ উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্মিল। তিনি তৃতীয় প্রণিধানে অহংকারমমকারাভিনিবিষ্ট

লোকসমূহকে আর্য্যমার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ প্রণিধানে তাঁহার মনে উদিত হইল, যে জীব সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে ধাবমান হয় এবং পুনরায় পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই অলাতচক্রসমারূঢ় সংসারী লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্ত তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশিত করিবার মানস করিলেন।

নগর হইতে নির্গত হইবার জন্ত তিনি ছন্দক নামক স্বীয় সারথিকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। ছন্দক সিদ্ধার্থকে বলিল দেব, আপনার সংপ্রতি একটী পুণ্যলক্ষণ পুত্র জন্মিয়াছে। সে চতুর্দ্বীপের অধিপতি হইবে। আপনি বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্তু রাজ্য সুসমৃদ্ধ ও রমণীয়। হে দেব, মুনিগণ জন্মান্তরে ঈদৃশ সম্পদ্ ভোগ করিতে পাইবেন বলিয়াই কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? দেখুন আপনার পত্নী অতি রমণীয়া।

ইমাং বিবুদ্ধাম্বুজপত্রলোচনাং
বিচিত্রহারাং মণিরত্নভূষিতাম্।
ঘনপ্রমুক্তামিব বিদ্যুতাং নভে
নোপেক্ষসে শয়নগতাং বিরোচনাম্॥

বিকসিত পদ্মের স্থায় লোচনবিশিষ্টা, বিচিত্রহারশোভিতা, মণিরত্নভূষিতা ও মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে সমুদিত বিদ্যুতের স্থায় প্রভাশালিনী এবং মনোহরা ও শয়নগতা এই পত্নীকে উপেক্ষা করিবেন না।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

অপরিমিতানন্তকল্পা ময়া ছন্দক
ভুক্তা কামাবিমাং রূপাশ্চ শব্দাশ্চ।
গন্ধা রসা স্পর্শতা নানাবিধা
দিব্য যে মানুষা নো চ তৃপ্তিরভুৎ॥
বজ্রাশনি পরশুশক্তি শরাশ্চবর্ষ
বিদ্যুৎপ্রতানজ্বলিতং কথিতঞ্চ লোহং।
আদীপ্ত শৈলশিখরাঃ প্রপতেয়ুঃ মূর্দ্ধি
নো বা অহং পুনর্জনেয় গৃহাভিলাষম্॥

হে ছন্দক, আমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি নানাবিধ কাম্য বস্তু ইহলোকে ও দেবলোকে অনন্ত কল্পকাল ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎপ্রভার স্থায় প্রজ্বলিত লৌহ, আদীপ্তগিরিশিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতে গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাষ জন্মাইতে পারিবে না।

সিদ্ধার্থের এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ছন্দক রথ সজ্জিত করিল। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পুষ্যানক্ষত্রযোগে সিদ্ধার্থ গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন।

তিনি ক্রমে শাক্য, কোড্য, মল্ল ও মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিলেন। ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি তখন শরীর হইতে সমস্ত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ছন্দককে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। ছন্দক যেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটি চৈত্য সংস্থাপিত হয়। সেই চৈত্য অদ্যাপি ছন্দকনিবর্ত্তন নামে প্রসিদ্ধ।

তদনন্তর তিনি মস্তক হইতে চূড়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যে স্থানে তাঁহার চূড়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়। উহা অদ্যাপি চূড়াপ্রতিগ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তিনি কাষায়বস্ত্রপরিহিত একটী ব্যাধকে দেখিতে পাইয়া উহার কাষায় বস্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের কৌষিক পট্টবস্ত্রের বিনিময় করিলেন। যে স্থানে তিনি কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়; উহা অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ।

ছন্দক সিদ্ধার্থের আভরণসমূহ লইয়া কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রতিগমন করিল। তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শুদ্ধোদন মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি সকলেই গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সিদ্ধার্থের গৃহ প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত আভরণ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি আভরণ-পুষ্করিণী নামে খ্যাত।

গোপা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার স্বামী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন।

গোপা শয্যাতো ধরণীতলে নিপতিতা
কেশাং লুনাতি অবশিরি ভূষণানি।
অহো সুভাষ্ট মম পরিনায়কেন
সর্ব্বপ্রিয়েভি ন চিরে তু বিপ্রযোগঃ।

গোপা শয্যা ত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি কেশগুচ্ছ ছেদন করিতে লাগিলেন ও গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত করিলেন। হায় আমার পরিণায়ক অপগত হইয়াছেন। আমি জীবনের সমস্ত প্রকার প্রিয়বস্তু হইতে অদ্য বিযুক্ত হইলাম।

গোপা প্রভৃতি সকলেই এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যথাক্রমে শাক্যা ও পদ্মা নাম্নী দুই ... স্থানে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। পরিশেষে তিনি বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে আরাড় কালাম

নামক কোন উপাধ্যায়ের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আরাড় কালামের তিন শত শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তদুপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আরাড় কালাম স্বীয় শিষ্যদিগকে আকিঞ্চন্যায়তন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। এই মতে বিষয়বাসনাবিরহিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হওয়াই পরম মুক্তি। বোধিসত্ত্ব এই শিক্ষার বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

অনন্তর তিনি মগধের অন্তর্গত পাণ্ডব-পর্ব্বতরাজ-সমীপে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। রাজগৃহের লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের নিকট যাইয়া বলিল, মহারাজ, স্বয়ং ব্রহ্মা, দেবরাজ, চন্দ্র অথবা সূর্য্য আপনার নগর মধ্যে ভিক্ষা করিতেছেন। বিম্বিসার প্রাতঃকালে মহাজনকায়-সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-পর্ব্বতরাজ পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

পরমপ্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
অবচিষু চ মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্।
ভব হি মম সহায় সর্ব্বরাজ্যং
অহং তব দাস্যে প্রভূতং ভুংক্ষ কামান্॥
মা চ পুনর্বনে বসাহি শূন্যে
মা ভূয়ু তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসম্।
পরমসুকুমার তুভ্য কায়ঃ
ইহ মম রাজ্যি বসাহি ভুঙ্ক্ষ কামান্॥
প্রভণতি গিরি বোধিসত্ত্বঃ শ্লক্ষ্ণং
অকুটিলপ্রেমণীয়াং হিতানুকম্পী।
স্বস্তি ধরণীপাল তেঽস্তু নিত্যং
ন চ অহং কামগুণেভিরর্থিকোঽস্মি॥
কামং বিষসমা অনন্তদোষা
নরকে প্রপাতন প্রেততির্য্যগ্যোনৌ।
বিদুভির্বিগর্হিতা চাপানার্য্যকামাঃ
জহিত ময়া যথ পক্কখেটপিণ্ডম্॥

মগধরাজ বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম [illegible] হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন, আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত কাম্য-বস্তু ভোগ করুন।

উপকারী ও দয়ার্দ্রচিত্ত বোধিসত্ত্ব মধুর, অকুটিল ও প্রেমপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, হে [illegible] পাল, আপনার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক, আমি কোন কাম-সুখের প্রার্থী নহি। কাম[illegible] তুল্য ও [illegible]আকর। কামের বশে লোক নরক, প্রেত, তির্য্যগ্ ইত্যাদি [illegible]

জন্ম গ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই কামনার সতত নিন্দা করিয়াছেন। আমি উহা শ্লেষ্মা পিণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি কোন্ দেশ হইতে আগত হইয়াছেন ? আপনার কোথায় জন্ম ? আপনার পিতা মাতা কোথায় বাস করেন ?

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, হে ধরণীপাল, শাক্যগণের সুসমৃদ্ধিশালী কপিলবাস্তু নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগরের রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব লাভের আশয়ে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার বলিলেন :—আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমরা আপনার পিতার শিষ্য। হে স্বামিন্, যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব। এই কথা বলিয়া বিম্বিসার বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিয়া রাজ-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে রুদ্রক নামক কোন উপাধ্যায় রাজগৃহে অধ্যাপনা করিতেন। রুদ্রক স্বীয় শিষ্যগণের নিকট নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির উপায় ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বলিতেন শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটী অবলম্বন করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তিলাভ হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়। বোধিসত্ত্ব রুদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি মগধের গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিন প্রকার আধ্যাত্মিক উপমা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, যাঁহার কাম্য-বস্তুবিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই, তিনি কখনই আন্তরিক ও শারীরিক দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া আর্দ্র কাষ্ঠ জল মধ্যে সংস্থাপন করেন এবং ঐ কাষ্ঠ আর্দ্র অরণি দ্বারা সংঘর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উহা হইতে কখনই অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না, সেইরূপ যাঁহার চিত্ত রাগাদি দ্বারা আর্দ্র রহিয়াছে, তিনি কখনই জ্ঞান-জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপমা বোধিসত্ত্বের চিত্তে প্রথমে উদিত হয়। তদনন্তর তিনি ভাবিলেন, যিনি আর্দ্র কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক আর্দ্র অরণি দ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনিও উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না। সেইরূপ যাঁহাদের হৃদয় রাগাদি দ্বারা অভিষিক্ত, তাঁহারাও জ্ঞান-জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারেন না। ইহাই দ্বিতীয় উপমা। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক শুষ্ক অরণি দ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনি উহা হইতে অনায়াসে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারেন। সেই রূপ যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, তিনিই কেবল জ্ঞানাগ্নি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতীয়তঃ এই উপমা বোধিসত্ত্বের মনে উপস্থিত হয়।

অনন্তর তিনি গয়াপ্রদেশে উরুবিল্ব গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জনা [illegible] পান।

সেই রমণীয় নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বর্তমান যুগে জম্বুদ্বীপ পঞ্চবিধ পাপ দ্বারা কলুষিত। একণে আমি জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণকে কিরূপে ধর্মকার্য্যে অভিনিবিষ্ট করিব, ইহাই আমার চিন্তনীয়। বোধিসত্ব এইরূপ চিন্তা করিয়া ষড়্বর্ষব্যাপিনী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আস্ফানক ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলেন। যেমন বলবান্ লোক দুর্ব্বল লোককে অনায়াসে শাসন করিতে পারে, সেইরূপ বোধিসত্বের চিত্ত দেহকে সংযত করিতে লাগিল। যখন বোধিসত্ব আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার মুখ-বিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। তাঁহার কর্ণছিদ্র হইতে মহাশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্রও রুদ্ধ হইল। মুখ নাসিকা ও কর্ণ সংরুদ্ধ হওয়ায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি উর্দ্ধাভিমুখী হইল। শিরঃপিণ্ড ভেদ করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহির্গত হইল। ক্রমে তিনি আহার সংযত করিলেন; পরিশেষে প্রতিদিন একটী মাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি যথাবিহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া ললিতব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন। বোধিসত্ব যখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন বলিয়াছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক এবং আমার ত্বক্, অস্থি ও মাংস এই স্থানে বিলীন হউক; কিন্তু সুদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না।

যখন বোধিসত্ব নানাপ্রকার কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামলোকের অধিপতি মার স্বীয় সহস্র পুত্র কন্যা ও অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হয়। মারপুত্রগণের মধ্যে যাহারা বোধিসত্বের প্রতি অতিপ্রসন্ন, তাহারা মারের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। আর যাহারা বোধিসত্বের প্রতি বিমুখ ও মারের পক্ষাবলম্বী, তাহারা মারের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তদনন্তর মারসৈন্যগণ বোধিসত্বের তপোভঙ্গের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। বোধিসত্বও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া তপশ্চর্য্যা হইতে বিরত হইবেন না। এই হেতু উভয় পক্ষে তুমুল সমর সংঘটিত হইল।

দক্ষিণ দিকে সার্থবাহ নামক মারপুত্র স্বীয় পিতাকে বলিল :—

সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি পন্নগেন্দ্রং
সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি যো গজেন্দ্রম্।
সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি যো মৃগেন্দ্রং
সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি সো নরেন্দ্রম্।

যে ব্যক্তি সুপ্ত পন্নগেন্দ্র, গজেন্দ্র বা মৃগেন্দ্রকে জাগরিত করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই কেবল ধ্যাননিমগ্ন বোধিসত্বকে ধ্যান হইতে ভ্রষ্ট করিতে অভিলাষ করে।

তখন মারের বাম পার্শ্ব হইতে দুর্ম্মতি নামক মারপুত্র বলিল :—

সম্প্রেক্ষণেন হৃদয়াম্ভিদংক্ষুটন্তি
লোকেষু সারমহতামপি পাদপানাম্।
কা শক্তিরস্তি মম দৃষ্টিহতস্য তস্য
সঞ্জীবিতুং জগতি মৃত্যুহতস্য বাস্য॥

এই সংসারে আমার দৃষ্টিতে সারবান্ বৃক্ষসমূহেরও অভ্যন্তর ভাগ বিদীর্ণ হয়। যে আমার দৃষ্টিতে আহত হইয়াছে, জগতে এমন কে আছেন যিনি তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন।

দক্ষিণে মধুরনির্ঘোষ বলিল :—

যঃ সাগরং তরিতুমিচ্ছতি বৈ ভুজাভ্যাম্
তোয়ঞ্চ তস্য পিবিতুং সমুদ্রেষসত্ত।
শক্যং ভবেদিহমতস্তু বদামি সত্যং
যস্তস্য বক্ত্রমভিতোপামলং নিরীক্ষেৎ॥

যিনি ভুজদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, অথবা যিনি সমুদ্রের সমগ্র তোয় নিঃশেষরূপে পান করিতে অভিলাষ করেন, তিনিই কেবল বোধিসত্বের নির্ম্মল মুখমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন।

বামদিকে শতবাহু মারকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

মমেহ দেহেস্মি শতং ভুজানাং
ক্ষিপামি চৈকেন শতং শরাণাম্।
ভিনদ্মি কায়ং শ্রমণস্য তাত
সুখী ভব ত্বং ব্রজ মা বিলম্বম্॥

আমার এই দেহে শতবাহু বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক বাহু দ্বারা আমি শতসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করি। হে পিতঃ, আমি বোধিসত্বের দেহ ভেদ করিব। আপনি সুখী হউন, বিলম্ব করিবেন না।

দক্ষিণদিকে সুবুদ্ধি বলিল :—

শতং ভুজানাং যদি কো বিশেষো
ভুজা বিমর্দং ন ভবন্তি রোমাঃ।
ভুজৈকমেকেন চ তৈর্ব্বশরা-
স্তেষ্বাপি কুর্য্যান্নহি তস্য কিংচিৎ॥

তোমার শত বাহুই থাকুক অথবা শরীরে যত রোম আছে তাবৎসংখ্যক বাহুই থাকুক, তাহাতে কি? তুমি প্রত্যেক বাহু দ্বারা বাণসমূহ নিক্ষেপ কর, তাহাতেই বা কি? উহাতে বোধিসত্বের কোনই ক্ষতি হইবে না।

অনন্তর বামদিকে উগ্রতেজাঃ বলিল, আমি বোধিসত্ত্বের শরীরে প্রবেশ করিব ; দাবাগ্নি যেমন শুষ্কবৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, ঐরূপে দগ্ধ করিব। তৎক্ষণাৎ সুনেত্র নামক সৈন্য দক্ষিণদিক্ হইতে বলিয়া উঠিল, তুমি সুমেরু পর্ব্বতকে দগ্ধ করিতে পার, সমগ্র মেদিনী তোমার তেজে ভস্মীভূত হইতে পারে ; কিন্তু বোধিসত্ত্বের শরীর দগ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে ; উঁহার বুদ্ধি ও প্রতিজ্ঞা বজ্রের ন্যায় স্থির। বাম দিকে দীর্ঘবাহু গর্ব্বিতভাবে বলিল, হে তাত, আমি আপনার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রপ্রভৃতিকে উহাদের আলয় হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারি ; অবলীলাক্রমে সমুদ্রচতুষ্টয়কে জলশূন্য করিতে পারি। সেই বোধিসত্ত্বকে সমুদ্রের পরপারে নিক্ষেপ করিতে পারি। হে পিতঃ, আপনার সৈন্যসকল অপেক্ষা করুক ; আপনি শোকার্ত্ত হইবেন না। আমি এই হস্তে সেই বোধিবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দশ দিকে প্রক্ষেপ করিতেছি।

দক্ষিণদিকে প্রসাদপ্রতিলব্ধ নামক সৈনিক বলিল—হে দীর্ঘবাহু, তুমি মদগর্ব্বিত হইয়া দেবাসুরগন্ধর্ব্বপরিবৃত সাগরসহিত পর্ব্বতমালাপরিশোভিত মহীমণ্ডলকে বিধ্বস্ত করিতে পার, কিন্তু তোমার অবগত হওয়া উচিত যে তোমার ন্যায় সহস্র ব্যক্তিকে সেই বোধিসত্ত্ব গঙ্গাবালুকার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করেন ; সেই ধীমান্ বোধিসত্ত্বের একটি কেশও সংচালিত করার ক্ষমতা তোমার নাই। এইরূপে বামদিক হইতে অসংখ্য মার-সৈন্য বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল ; ঐ সকল সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর, অবতারপ্রেক্ষী, অনুপশান্ত, ভুক্তিলোল, বাতজব, ব্রহ্মমতি, সর্ব্বচণ্ডাল, দুশ্চিন্তিতচিন্তী প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু বোধিসত্ত্বের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার দক্ষিণ দিক হইতে একাগ্রমতি, পুণ্যালঙ্কৃত, স্বর্গকাম, সিদ্ধার্থ, ধর্ম্মরতি, অচলমতি, সিংহমতি, সিংহনাদী, সুচিন্তিতার্থ প্রভৃতি কয়েক জন সবল সৈন্য আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিল। ঐ কয়েক জন সৈনিকের সহকারিতায় বোধিসত্ত্ব মারপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। সিদ্ধার্থ নামক সৈনিক বোধিসত্ত্বকে সাহায্য করিতে যাইয়া মারপক্ষকে সতেজে বলিয়াছিল :—

বিষাণমুগ্র ত্রিভবেহ যশ্চ
রাগশ্চ দোষশ্চ তথৈব মোহঃ।
তে তস্য কায়ে চ তথৈব চিত্তে
নভে যথা পংকরজো ন সন্তি॥

ত্রিসংসারে যে উগ্রতম বিষ অথবা অত্যুৎকট রাগ দ্বেষ ও মোহ বিদ্যমান আছে, তাহা বোধিসত্ত্বের শরীরে বা চিত্তে কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারে না। দেখুন আকাশে পঙ্ক বা রজঃ কিছুই স্থান পায় না।

সিংহনাদী নামক সৈন্য মারপক্ষকে স্পষ্টই বলিয়াছিল :—

বহবঃ শৃগালা হি বনান্তরেষু
নদন্তি নাদান্ ন সতীহ সিংহে।

তে সিংহনাদং তু নিশম্য ভীমং
ত্রস্তা পলায়ন্তি দিশো দশায়ু॥

বহু শৃগাল বনে চীৎকার করিয়া বেড়ায়, কিন্তু ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলেই উহারা ভয়ে দশদিকে পলায়মান হয়।

এইরূপে যে কয়েক জন সৈন্য বোধিসত্ত্বের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা সকলেই তেজস্বী, ধীর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

তখন মারসৈন্যগণ পরাভূত হইয়া সকলেই মারের সমীপে স্বীয় পরাক্রম ও পরাজয়ের বিষয় বর্ণন করিল। মারপক্ষের প্রধান সেনাপতি ভদ্রসেন পাপাত্মা মারকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

হে মার! ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালগণ এবং অসুর কিন্নর প্রভৃতি সকলেই আপনার অনুগত। কিন্তু উঁহারা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিতেছেন। আপনার পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা প্রজ্ঞাবান্ ও মেধাশালী, তাঁহারাও বোধিসত্ত্বকে আন্তরিক নমস্কার করিতেছেন। বোধিসত্ত্বের শরীরে পুণ্য, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, কান্তি, বীর্য্য ইত্যাদি বহুবিধ বল বিদ্যমান আছে। সেই অমিতবলশালী বোধিসত্ত্ব মারসেনাকে সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল করিয়াছেন। হস্তী যেমন পদদ্বারা ভূমিকে প্রমর্দ্দিত করে, সিংহ যেমন শৃগালসমূহকে ব্যতিব্যস্ত করে, আদিত্য যেমন স্বীয় তেজে খদ্যোতসমূহকে পরাভূত করেন, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ মারসেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও তাড়িত করিবেন।

প্রধান সেনাপতির মুখে এই কথা শুনিয়া মারের কোন পুত্র অতীব ক্রুদ্ধ হইল। সে রোষের বশে আরক্তলোচন হইয়া বলিল :—

একস্তু বর্ণয়সি অপ্রমেয়া
প্রজ্ঞায়সে তস্য ত্বমেককস্য।
একো হি কর্ত্তুং খলু কিং সমর্থো
মহাবলং পশ্যসি কিং ন ভীমান্॥

আপনি একমাত্র বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা বলিতেছেন। এক ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনি এত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। একব্যক্তি কি করিতে পারে? আপনি এই মহাবল ভীষণ মারসৈন্যগণকে কি দেখিতে পাইতেছেন না?

তখন দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে একটী সৈন্য বলিয়া উঠিল :—

সূর্য্যস্য লোকে ন সহায়কৃত্যং
চন্দ্রস্য সিংহস্য চ চক্রবর্ত্তিনঃ।
বোধৌ নিষন্নস্য চ নিশ্চিতস্য
ন বোধিসত্ত্বস্য সহায়কৃত্যম্॥

এই জগতে সূর্য্যদেব কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন না। চন্দ্র, সিংহ ও রাজচক্রবর্ত্তীরও

কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য যিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই স্থিরযোগী বোধিসত্ত্বেরও কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না।

প্রবল সমরের অবসানে পাপাত্মা মার খড়্গ, ধনু, কুঠার, মুষল, গদা, চক্র, বজ্র, মুদ্গর ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া বোধিসত্ত্বের শরীরে ও চিত্তে নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের শরীরে বা চিত্তে কোথাও ঐ সকল অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। মার পরাজিত হইয়া দুঃখিত, লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইল। সে পুরোভাগে গমন করিতে পারিলনা, পশ্চাদ্ভাগে নিবৃত্ত হইল না এবং পার্শ্বদিকেও পলায়ন করিতে পারিল না। তখন পশ্চান্মুখ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে বলিল, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া কিছুকাল অবস্থান কর; আমি দেখিব যদি অনুনয় করিয়া বোধিসত্ত্বকে যোগাসন হইতে উত্থাপন করিতে পারি। এরূপ ব্যক্তিকে সহসা বিনাশ করিতে পারা যায় না।

অনন্তর মার স্বীয় দুহিতা অপ্সরোগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে দুহিতৃগণ, তোমরা বোধিসত্ত্বের সমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি সরাগ কি বীতরাগ, তিনি মূর্খ কি প্রাজ্ঞ, তিনি দীন কি ধীর। অপ্সরোগণ বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া দ্বাত্রিংশৎ-প্রকার স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা বিম্বফলোপম ওষ্ঠ, অর্দ্ধবিকসিত দন্তাবলী, অর্দ্ধনির্মীলিত নয়ন ইত্যাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের মুখমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তখন অনুপম স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রশান্তভাবে যোগাসনে আসীন থাকিলেন। তাঁহার মুখ রাহুবিনির্মুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুদ্ধ ও বিমল, উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী, স্বর্ণময় যূপের ন্যায় উজ্জ্বল, বিকসিত সহস্রপত্রের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, ঘৃতাভিষিক্ত অনলের ন্যায় দীপ্তিময়, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্থির, চক্রবাড় পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত এবং তিনি গুপ্তেন্দ্রিয় হস্তীর ন্যায় শান্ত দেখাইতে লাগিল।

মারদুহিতৃগণ নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলিল। কিন্তু তাঁহাকে যোগাসন হইতে উত্তোলিত করিতে পারিল না। তাহারা অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহাতেও বোধিসত্ত্বের চিত্ত বিচলিত হইল না। তখন মারদুহিতৃগণ মারকে বলিল :—

> লজ্জা মধুরং চ ভাষতে ন চ রজ্যো
> গুহ্যগুহ্যং চ নিরীক্ষতে ন চ হৃষ্টঃ।
> ঈর্য্যাং চ প্রেক্ষতে ন চ দুষ্টকায়ঃ
> সর্ব্বে পশ্যেতি আশয়ো সুগম্ভীরঃ॥
> নিঃসংশয়েন বিদিতাঃ পৃথু ইন্দ্রিয়দোষাঃ
> কামৈর্বিমুক্তমনসো ন চ রাগরক্তঃ।
> নৈবাত্তাসৌ দিবি ভুবীহ নরঃ সুরো বা
> যস্তস্য চিত্তচরিতং পরিজানয়াতে॥

যা ইন্দ্রিয়াঃ উপদর্শিত তত্র তস্য
প্রচলীষু তস্ত হৃদয়ং ভবিয়ঃ সরাগঃ।
তন্দৃষ্ট একমপি কম্পিতু নাস্ত চিত্তং
শৈলেন্দ্ররাজ ইব তিষ্ঠতি সোঽপ্রকম্পঃ।
নিঃসংশয়েন বিনিহত্য স মারসৈন্যং
পূর্বকং জিনানুমত প্রাপ্স্যতি অগ্রবোধিং।
তাতা ন রোচতি হি মনোঽপি রণে বিবাদো
বলবৎসু বিগ্রহ সুকৃচ্ছ্র অয়ং প্রয়োগঃ।

হে পিতঃ, এই বোধিসত্ত্ব ধীরে ও মধুরভাবে কথা বলেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হন না। স্থির ও দৃঢ় ভাবে নিরীক্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত দূষিত নহে। ঈর্ষার সহ অবলোকন করেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত বিমুগ্ধ হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণ গম্ভীর এবং তাঁহার মনের ভাব বহিঃ প্রকাশিত হয় না। নিশ্চয়ই তিনি জানেন যে স্ত্রীসঙ্গে সকদোষ ঘটে। তাঁহার চিত্ত কামসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত এবং তিনি কিছুতেই আসক্ত হন না। স্বর্গে বা পৃথিবীতে এমন কোন দেব বা মনুষ্য নাই, যিনি তাঁহার চিত্তবৃত্তির অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন। হে তাত, আমরা তাঁহার সমীপে নানা প্রকার প্রেমময়ী প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম তাঁহার হৃদয়ে আসক্তির উদ্রেক হইবে ও তিনি ধৈর্যচ্যুত হইবেন। কিন্তু পিতঃ, সেই সকল দেখিয়া বোধিসত্ত্বের চিত্ত বিন্দুমাত্রও কম্পিত হইল না; তিনি পর্ব্বতরাজের ন্যায় স্থির থাকিলেন। নিশ্চয়ই তিনি মারসৈনাগণকে নিহত করিয়া জ্ঞানিগণের অনুমোদিত বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। হে তাত, সেই বোধিসত্ত্বের সহ বিবাদ করিতে আমাদের মনেও রুচি হয় না। বস্তুতঃ প্রবল লোকের সহ বিরোধ দুঃখে পর্য্যবসিত হয়।

পরিশেষে তাহারা মারকে বলিল :—

শ্রেয়ো ভবেৎ প্রতিনিবর্ত্তিতুমদ্য তাত।

হে তাত অদ্য প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই আমাদের শ্রেয়ঃ হইবে।

সেই সময়ে শ্রীবৃদ্ধি, তপা, প্রেয়সী, বচ্ছু, ওজঃ, বলা, সত্যবাদিনী, সমঙ্গিনী এই আটটী বোধিবৃক্ষদেবতা বোধিসত্ত্বের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক তেজস্বিতা দেখিয়া পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

মার পরাজিত হইয়া পরিশেষে বোধিসত্ত্বকে বলিল :—

আমি কামরাজ্যের অধিপতি। ইহ সংসারে দেব, দানব, মনুষ্য ও তির্য্যক্ সকলেই আমার বশীভূত। আমি সংসার ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি। সংসারের সকল পদার্থই আমার বশে চলিতেছে। অতএব হে বোধিসত্ত্ব, তুমি যোগাসন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও এবং তোমার মনকে বিষয় কামনায় রত কর।

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন :—

হে মার তুমি কামনা সমূহের অধিপতি, তোমার আত্মসংযম নাই; সুতরাং কোন

বিষয়ের উপরই তোমার প্রভুত্ব নাই, তুমি দেখিবে আমি তোমার সমক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করিব।

এইরূপে মারসৈন্যগণ, মারপুত্রগণ, মারদুহিতৃগণ ও মার স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। তখন মার অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিল :—

দুঃখং ভয়ং ব্যসনশোকবিনাশনঞ্চ
ধিক্কারশব্দমবমানগতঞ্চ দৈন্যম্।
প্রাপ্তোঽস্মি অদ্য অপরাধা শুভশুদ্ধসত্ত্বে
অশ্রুত্ব বাক্য মধুরং হিতমাত্মজানাম্॥

শুদ্ধসত্ত্ব বোধিসত্ত্বের অনিষ্ট সাধন করিতে যাইয়া আজ আমি দুঃখ, ভয়, ব্যসন, শোক, অপমান, দৈন্য, ধিক্কার ইত্যাদি বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হইলাম। আমার নিজের কন্যাগণের হিতকর ও মধুর বাক্য না শুনিয়া আজ আমার এই ফল লাভ হইল।

পূর্ব্বোক্ত তপা, ওজঃ, শ্রেয়সী প্রভৃতি দেবগণ তখন মারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ভয়ঞ্চ দুঃখং ব্যসনঞ্চ দৈন্যং
ধিক্কারশব্দং বধবন্ধনঞ্চ।
দোষাননেকান্ লভতে হ্যবিদ্বান্
নিরপরাধেষপাপরাধাতে যঃ॥

হে মার, যে ব্যক্তি নিরপরাধ লোকের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষ করে, সেই অজ্ঞান ব্যক্তি ভয়, দুঃখ, ব্যসন, দৈন্য, ধিক্কার, বধ, বন্ধন ইত্যাদি অনেক প্রকার যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মারসেনাকে পরাভূত করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল এবং তাঁহাতে রাগ ধ্যান সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ সবিতর্ক, দ্বিতীয়তঃ অবিতর্ক, তৃতীয়তঃ নিষ্প্রীতিক, এবং চতুর্থতঃ অদুঃখাসুখধ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের মধ্যে সদ্‌বৃত্তিসমূহই মঙ্গল-দায়ক এইরূপ বিচার করিয়া তিনি সবিতর্কধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধ উপশান্ত হওয়ায় তিনি অবিতর্ক সমাধি লাভ করিলেন। যখন প্রীতি ও অপ্রীতি এতদুভয়ের প্রতি তাঁহার উপেক্ষা জন্মিল, তখন তিনি নিষ্প্রীতিক ধ্যান লাভ করিলেন। সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত ক্রমে সুনির্ম্মল হইল। তখন তিনি অদুঃখাসুখ ধ্যান লাভ করিলেন।

তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্ত্বের দিব্য চক্ষুঃ উৎপন্ন হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার পূর্ব্বতন বিষয়সমূহ মনে পড়িল। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের দুঃখের কারণ ভাবিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়াপ্রবাহের মধ্যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যকারণভাবের অখণ্ড নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনাদি সংসারের যাবতীয় বস্তুসমূহ উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ লাভ করি-

তেছে। আধ্যাত্মিক জগতেও কুশল এবং অকুশল চৈতসিকবৃত্তি সমূহ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিতেছে। এইরূপে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মসমূহের বশে সমগ্রসংসার ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিরত আবর্ত্তন করিতেছে।

জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহা চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ, সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং, বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং নামরূপং, নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং, ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ, স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্ণাপ্রত্যয়মুপাদানম্, উপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ, ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতিপ্রত্যয়া জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াসাঃ সম্ভবন্ত্যেব কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ো ভবতি সমুদয়ঃ।

অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি,ও জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যা শব্দের অর্থ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়াছি। ঘট, পট, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের জ্ঞান হউক না কেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞান মাত্র। এই অজ্ঞান অনাদি এবং উহা কিরূপে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। এই অজ্ঞানসমূহ আমাদের মনোমধ্যে যে চিহ্ন রাখিয়া যায় তাহাকে সংস্কার বলে। আমরা অতীতকালে যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, উহারা যদিও এক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, তথাপি ঐ সকল পদার্থের আকৃতি ও প্রকৃতি আমাদের মনোমধ্যে সংস্কাররূপে বিদ্যমান আছে। এই সংস্কার সমূহ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কাহারও মতে বিজ্ঞান ষড়্‌বিধ এবং কেহ বলেন উহা পঞ্চবিধ ; দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার বিজ্ঞান সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন মনোবিজ্ঞান বা আন্তরবিজ্ঞান নামক ষষ্ঠ বিজ্ঞানও কোন কোন গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি সংস্কারসমূহ আমাদের মনোমধ্যে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত না। এই জ্ঞানসমূহ আবার রূপরসাদি পঞ্চ বিষয় ও চক্ষুঃ কর্ণাদি ষড়িন্দ্রিয় এতদুভয়ের সহ দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, উহাকে স্পর্শ বলে। ঐ স্পর্শই সুখ, দুঃখ ও অদুঃখাসুখ এই ত্রিবিধ বেদনার হেতু। বেদনা হইতে তৃষ্ণা জন্মে এবং তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলোপভোগের নিমিত্তই জীবগণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। জন্ম লাভ করিলেই জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ইত্যাদি ভোগ করিতে হয়।

অতএব অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের দুঃখের কারণ। তিনি রাত্রির শেষ যামে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অবিদ্যার কিরূপে নিবৃত্তি হইতে পারে এবং লোকসকল কিরূপে

দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে পারে। বহু চিন্তা করিয়া তিনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখসমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুদ্ধ এই নাম ধারণ করেন। যে তত্ত্বের অধিগম দ্বারা তিনি বুদ্ধ এই নাম লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরও এক সপ্তাহকাল তিনি বোধিদ্রুম মূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ নাগরাজ ভবনে এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে অজপালের ন্যগ্রোধমূলে অবস্থিতি করেন। সপ্তম সপ্তাহে তথাগত তারায়ণমূলে বিহার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুই বণিক্ সহোদর বহু লোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথে গমন করিতেছিলেন। তাঁহারা অতি ভক্তিসহকারে বুদ্ধকে আহার প্রদান করিয়াছিলেন। তদনন্তর তথাগত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বারাণসী মহানগরীতে মৃগদাব নামক স্থানে গমন করেন। বারাণসী গমন কালে আজীবক নামক কোন দার্শনিকের সহ বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন হে গৌতম, তুমি কোথায় যাইবে?

বুদ্ধ বলিলেন:—

বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীং।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্॥

আমি বারাণসীতে গমন করিব। কাশিকা পুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।

তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, হে গৌতম, আমি প্রস্থান করিলাম, তোমার গন্তব্য পথ এখনও অনেক দূরে আছে।

অনন্তর গয়া প্রদেশে সুদর্শন নামক নাগরাজ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধ গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহাকাশ্যপ, আনন্দ, মৈত্রেয় ও কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি পাঁচ জন শিষ্যের নিকট নির্ব্বাণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায় এই চারিটীকে আর্য্যসত্য বলে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগ ইত্যাদি সমস্তই দুঃখশব্দবাচ্য। সংক্ষেপতঃ তৃষ্ণাই দুঃখোৎপত্তির কারণ এবং তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যগ্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীকে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে এবং ঐ আটটীর অনুসরণেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপে ঐই সময়ে বুদ্ধদেব নানা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐ সকলের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

অনন্তর বুদ্ধদেব বারাণসী নগরীতে অসংখ্য লোক মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বারাণসী নগরীতেই বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। নির্ব্বাণ লাভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধদেব মহাকাশ্যপ, আনন্দ ও মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মহাসত্ত্বগণ, জগতের অসংখ্য কোটী লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্ম তোমাদের হস্তে নিহিত থাকিল।

ললিতবিস্তরসূত্রে বুদ্ধের শেষ জীবন সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় নাই। মহাপরিনিব্বান সুত্ত নামক পালি গ্রন্থে বুদ্ধের শেষ জীবনের ঘটনা সমূহ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মহাপরিনিব্বান সুত্তের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, বুদ্ধদেব কয়েক বৎসর রাজগৃহ নগরে বিহার করিয়া অম্বলম্বিকা নগরীতে উপস্থিত হন এবং তদনন্তর তিনি নালন্দ ও পাটলী গ্রামে গমন করেন। পরিশেষে তিনি পাবা নামক স্থানে চুন্দ নামধেয় শিষ্যের গৃহে ভোজন করিয়া আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে হিরণ্যবতী নদী তীরে উপস্থিত হন। উক্ত নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মল্লদিগের নিবাসভূমি কুশীনগরে উপস্থিত হন। এই স্থানে একটী শালবৃক্ষমূলে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ হয়। তদানীন্তন মগধরাজ অজাতশত্রু ঐ স্থানে একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

# ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত।

বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রজনীকান্তের অকালমৃত্যুতে একজন একান্ত অনুরক্ত সেবক হারাইয়াছেন। বর্ত্তমানসংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইবে এইরূপ তিনি ভরসা দিয়াছিলেন; বর্ত্তমানসংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহার মরণের সংবাদ বহন করিতেছে।

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ কমলাকান্ত দাসগুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ। রজনীকান্তের তিন ভ্রাতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি পেন্‌শন ভোগ করিতেছেন।

সাত আট বৎসর বয়সে রজনীকান্তের কঠিন পীড়া হয় ও তাহার ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি চির দিনের জন্য দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই দৌর্ব্বল্যের জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ে অধিকদূর পর্যন্ত অধ্যয়ন ও উপাধিলাভাদি ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত

শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন চাকরি গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরি কিছুই তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড ষ্টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য চর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতি কষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্যগণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সংকল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কি না জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেব বাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করেন। অর্থাভাবে ইতিহাস লিখিয়াও মুদ্রিত করিতে পারিতেন না। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম গণিত হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বল্প তিনি [illegible]

বিদ্যালয় কর্ত্তৃক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এণ্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্টবুক কমিটির অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত দুইবৎসর মধ্যে তাঁহার বহুমূত্র রোগের আশঙ্কা জন্মে; নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই-একজন বন্ধু ভিন্ন অন্যের নিকট সেই আশঙ্কার বিষয় প্রকাশ করেন নাই; এমন কি তাঁহার পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি এই আশঙ্কার বিষয় জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যহানির কোন বাহ্য লক্ষণই প্রকাশ না পাওয়ায় তাঁহার সেই বন্ধুগণও এবিষয়ে বিশ্বাস করিতেন না; তিনিও কোন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। তবে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভ্রমণ ও মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান অভ্যাস করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। গতবৎসর পূজার পর গয়াধাম গিয়া পিতৃকৃত্য সম্পাদন করিয়া আসেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের শেষভাগ গত শীতকালে রচনা করিয়া তাহার মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কথায় কথায় বলিতেন, নিজের ছাপাখানার কারবারের দেনাপাওনা মিটাইয়া ফেলিয়া ও স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের একটা সু ব্যবস্থা করিয়া কাশীবাস করিবেন।

গত ২ রা বৈশাখ শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তপ্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমিপ্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহার হাতে গোটা দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখমাসটা কিছু কষ্ট পান। চিকিৎসকেরা পিঠের ব্রণকে কার্বঙ্কল স্থির করায় তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে সিপাহীযুদ্ধের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় বিধবা পত্নী দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান

কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্র স্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্পসময়ের জন্য তাহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জন কর্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকালমরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিবেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনী বাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্যপরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনী বাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎপত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ খ্যাতিলাভের প্ররোচনায় তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্যপরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এপর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে [illegible] স্থাপনার প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible]

বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালারচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারের সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উহার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন। রাজ-নীতি বিষয়ে তিনি কংগ্রেস মতাবলম্বী ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে, সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলনাদিতে তিনি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতির ত্রুটী ছিল না। কটন সাহেবের নিউইণ্ডিয়া প্রচারিত হইবামাত্র তিনি ঐ গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গসমাজে প্রচার করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহেরই বিষয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটী কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারত-বর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ইংরাজ ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার আগ্রহ হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্রভাগ হইতে

সিপাহী যুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীন ভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্ত বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যে তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝাঁসীর রাণী ও কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের পক্ষ হইয়া তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। এবং তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। আজিকার দিনে এইরূপ নির্ভীকতা প্রভুশক্তির কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করে। রজনীকান্তের প্রতিও সেই দৃষ্টির কটাক্ষ যে একবারে পড়ে নাই তাহা নহে। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাঁহার মনের আবেগ ও ভাষা সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই উপদেশ তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে নাই। দরিদ্র বাঙ্গালী গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্ত কথা নহে।

জাতীয় ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। সবল সর্ব্বগ্রাসী প্রভুশক্তির সমীপে দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার অন্ত উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মসম্মান বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন একদিকে বৈদেশিকের মমতাশূন্যহস্তপ্রলিপ্ত আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া সজাতির গৌরব খ্যাপনের দ্বারা জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জনসাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই তেমন

নাই। "আমাদের জাতীয়ভাব" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" "হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয়" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয় ভাবের ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই এস্থলে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজ কাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সাধারণের নিকট প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল; তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কিনা জানিনা। কিন্তু বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবল মাত্র ভাব প্রকাশের উপায় স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্য মধ্যে তাহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কিনা সন্দেহ স্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই।

তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কিনা জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল-মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন তাহাতে সংশয় নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

---

## বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

### ১। মহাভারত বিরাট পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—পুরাতন কাগজে লেখা। পত্র সংখ্যা ৫৮, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

শেষ—

মুনিগণ ঋষিগণ বিদায় হইলা।
কৃষ্ণাসহ মৎস্য দেশে পাণ্ডব রহিলা॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
পাণ্ডবের উদয় শুনিয়ে জেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার ব্যাসের বচন॥
সেই কথা কহি আমি পাঁচালির মত।
এত দুরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥
জে জন শ্রবণ করে তারে কর দয়া।
উদ্ধার করহ প্রভু দিয়া পদছায়া॥
চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥
ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।

পুঁথির তারিখ।—"সন ১২২৬ সাল তারিখ ২৯ ফাল্গুন সকাব্দা ১৭৩৭ বারে মঙ্গলর তিথি দ্বাদসি শ্রীশ্রী৺ গোপিনাথ ঠাকুরের মৎস্যদের দিবস পোনে চারি প্রহর বেলা গতে।"

মন্তব্য। ১২২৬ সাল ১৭৪১ শকাব্দের সহিত অভিন্ন; ১৭৩৭ শকাব্দ কিরূপে হইল বুঝা গেল না। সালের অঙ্ককে সম্ভবতঃ ঠিক্ ধরিলে শকাব্দ গণনায় ভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই পুঁথির শেষ দুই ছত্র বিশেষরূপ অবধানযোগ্য। কাশীদাসী মহাভারতের কোন হস্তলিপিতে এ পর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনার তারিখ পাওয়া গিয়াছে শুনি নাই। অন্য কোন রূপেও কাশীদাসী মহাভারত রচনার তারিখ নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। গত বৎসর শ্রাবণ

মাসের পরিষৎপত্রিকায় কাশীরাম দাসের সময়নির্ণয়বিষয়ক প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে, কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ১০৫৫ সালে উৎকলখণ্ড অবলম্বন করিয়া জগন্নাথ-মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথমঙ্গলের অন্যান্য হস্তলিপি যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ঐ তারিখ নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করে। কাশীরাম দাস তৎপূর্ব্বেই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ জগন্নাথমঙ্গলেই দেখা যায়।

চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু—অঙ্কের বামগতি নিয়মানুসারে ৬২৫১ হয়; কিন্তু উলটাইয়া লইলে ১৫২৬ হয়। ১৫২৬ শকাব্দ বাঙ্গলা ১০১১ সাল, ইংরাজী ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ।

জগন্নাথমঙ্গলের নির্দ্দেশানুসারে অনুমিত তারিখের সহিত এই তারিখের বিরোধ নাই। এই তারিখ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কাশীদাসী মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। যাহাই হউক, কাশীদাসী মহাভারতের হস্তলিপির এদেশে অভাব নাই। বিভিন্ন হস্তলিপি অনুসন্ধান করিলে এবিষয়ে শেষ মীমাংসায় বিলম্ব না হইতে পারে।

২। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লিখিত। পত্র সংখ্যা ৫৫।

শেষ—

শরশয্যা শয়নে রহিলা ভীষ্মবীর।
বীরভাগ চলি গেল আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
ভীষ্মপর্ব্ব শ্রবণে নির্ম্মল শুদ্ধি হয়।
শুনিতে শুনিতে হয় জ্ঞানের উদয়॥
অশ্বমেধ বাঞ্ছে যেবা অতি মোক্ষ ফল।
সে সকল সিদ্ধি হয় শ্রবণে নিশ্চল॥
দান ধ্যান তীর্থ আদি জত পুণ্য ফল।
অনায়াসে সিদ্ধি হয় না হয় চঞ্চল॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
অবিরত রহু মন গোবিন্দ চরণে॥
"ইতি মহাভারতের ভিস্মপর্ব্বনি ভিস্মপতনং
সরসয্যা সয়ন কথাদি ভিস্মপর্ব্ব সমাপ্তং।"
ভারতের পুণ্য কথা পাপের বিনাশ।
ভীষ্মপর্ব্ব কহিলেন কাশীরাম দাস॥
"ইতি ভিস্মপর্ব্ব সমাপ্ত।"

পুঁথির তারিখ। "ইতি সন ১২২৮ বার আটাস সাল তারিখ ৫ কার্ত্তিক সকাব্দা সাতাস সৌ-২৭৬৮ আটসট্টী বারে সুক্রবার তিথি দ্বাদসি কৃষ্ণপক্ষের দিবস দুই দণ্ড বেলা থাকতে।"

মন্তব্য। সন ১২২৮ সালে শকাব্দ ১৭৪৩। পুঁথিতে শকাব্দের অঙ্ক কোনরূপ সাঙ্কেতিক হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকিবে।

## ৩। মহাভারত দ্রোণ পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—পত্র সংখ্যা ৪৭, দুই পৃষ্ঠে লেখা, দুই রকমের কাগজে দুই বা ততোধিক হস্তের অক্ষরে লিখিত।

শেষ—

রত্নসিংহাসনে বৈশেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃগণ সহ হইল আনন্দিত মন॥
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় শুনে।
এত দুরে দ্রোণ পর্ব্ব হইল সমাধানে॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
অন্তকালে দিবেন প্রভু পাদপদ্মে স্থান॥

পুঁথির তারিখ। "সন ১২৪২ সাল তারিখ ৪ ফাল্গুন বারে সমবার তিথি শিব চোতুর্দশির রাত্র সওা প্রহর রাত্র গতে পুথি পুন্ন হইল শ্রীহরি লিপিতং শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষ সাং মাহাদিয়া।"

[মাহাদিয়া জেমোকাঁদির সংলগ্ন ক্ষুদ্র গ্রাম]

## ৪। মহাভারত গদাপর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পত্র সংখ্যা ১৫।

শেষ—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিদের স্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
এতদূরে গদাপর্ব্ব হৈল সমাধান॥
ইতি শ্রীমহাভারতে গদাপর্ব্বে দুর্য্যোধন রাজার উরুভঙ্গ।
গদাপর্ব্ব সমাধান পঞ্চদশ পাতে।
শকাব্দা সতের পোঁইত্রিশ ভাদ্রের সাতিশাতে॥
রাত্রে শুক্রবার তিথি পুর্ণিমা।
ধৃতি যোগ হয় ভাই নক্ষত্র শতভিষা॥
সেরস্তার মতে ভাই বার শত বিশ সনে।
মোকাম দুর্গাপুর ফত্তেসিংহ পরগনে॥
আদর্শ বাক্ষর মম শুনহ সভায়।
লিখিল পুস্তক শ্রীগৌরিশঙ্কর রায়॥
পুর্ব্ব বার ঘরে দেড় প্রহর সময়ে।
মবলগে পোনের পাতে পুঁথি সমাপ্ত হয়ে॥

## ৫। মহাভারত সৌপ্তিক পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পত্র সংখ্যা ১৯। শকাব্দ ও সালের অঙ্কে এখানেও মিল নাই।

শেষ—

ভারতের পুণ্য কথা শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান॥

বিজয় পাণ্ডব কথা শুনে যেই জন।
ইহলোকে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন॥
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় স্থানে।
এত দূরে সৌপ্তিক পর্ব্ব হৈল সমাধানে॥

"তারিখ ২৮ আশ্বীন, সকাব্দা ১৭৩৭ বারে বৃহস্পতিবার তিথি ত্রিয়োদসির দিবস পৌনে তিন প্রহর বেলা থাকতে। ইতি সন ১২২১।"

৬। চম্পক-কলিকা—

পুঁথির বিবরণ—গ্রন্থকারের নাম নাই। পুঁথির তারিখ নাই। লেখকের নাম রসময় দাস—নিবাস নাই। পত্র সংখ্যা ৮, প্রথম পত্রের এক পিঠে লেখা। পয়ারের চরণ সংখ্যা প্রায় চারি শত। মাঝে কিয়দংশ গদ্য। এই পুঁথি খানির বিশেষ বিবরণ পরিষৎপত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। স্মরণ মঙ্গল—রাধাবিল্লভ দাস।

আরম্ভ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পুরণ॥
অন্ধতা ঘুচয়ে যার করুণা সম্বন্ধে।
অজ্ঞান তিমির নাশ করে জেই জনে॥
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব জার নাম।
এ তিন লোকের পুজ্য দয়া ভগবান॥
তবে বন্দো ভক্তগণ রসিক জার হিয়া।
নিকাইনু রাঙ্গা পাং পদরেণু পাঞা॥
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দো পুজ্য তিন লোকে।
যাহার করুণায় লোক চৈতন্য গায় সুখে॥ ইত্যাদি।

শেষ—

যুগলকিশোর লীলা অমৃতের সিন্ধু।
হেন প্রেম সেবা মোরে না মিলিল এক বিন্দু॥
উদ্দেশ করিয়ে মাত্র সেবা অনুসারে।
শ্রীলারে করিল স্তুতি দয়া কর মোরে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সূত্ররূপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান॥
শ্রীরূপমঞ্জরী চরণ করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে রাধাবল্লভ দাস॥ ইতি স্মরণমঙ্গল সমাপ্ত।

পুঁথির বিবরণ—মোটা কাগজ, মোটা হরপ, পত্র সংখ্যা ১৭, প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। পয়ারের চরণসংখ্যা প্রতি পত্রে প্রায় পঁচিশ। পয়ার ব্যতীত দীর্ঘ ছন্দ (ত্রিপদী) আছে। পুঁথির তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

৮। অমৃতরসাবলি—গ্রন্থকারের নাম নাই।

আরম্ভ—

শ্রীগুরুচরণারবিন্দ, সাবধান হঞা বন্দ
যাহা হইতে তিমির বিনাশে।
করুণা করি নিজ গুণে মহিমা দেখুক জগজনে
এই নিবেদন করো দাসে।
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
সভে কর বাঞ্ছিত পূরণ।
নাহি মোর ভক্তি লেশ সভে দেহ পাত্রশেষ
এই ভিক্ষা মাগে মোর মন।
বন্দো রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথচরণ
সভে মেলি মোরে কৃপা কর।
ইত্যাদি।

শেষ—

শ্রীমুকুন্দ পাদপদ্ম করিয়া সহায়।
অনেক পরিশ্রম করি গ্রন্থ কৈল সার।
রসিকগণের কাছে গ্রন্থ কৈল সমর্পণ।
জোড় হাত করি করো এই নিবেদন।
এই রাগ ভক্তি ইথে নাহি বৈধী গন্ধ।
সহজ ইহার নাম রাগের সম্বন্ধ।
বৈষ্ণব বৈরাগী এই প্রাণ বৈধী ধর্ম্ম।
তাহারে অনেক ব্যাধি এই রস মর্ম্ম।
বৈরাগোর ভিন্ন এই বৈষ্ণবের আকরণ।
অন্তের স্বধর্ম্ম নহে অন্তের যাজন।
সদা ব্রজে বাস যার রসিক ভক্তগণ।
সতসিদ্ধ মানুষ এই তাহার করণ।
শ্রীমুকুন্দ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
অমৃতরসাবলি গ্রন্থ কৈল সমাপন।
ইতি শ্রীঅমৃতরসাবলি গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
"শ্রীকাঙ্গালী দাস ইদং গ্রন্থং।"

"লিখিতং শ্রীমোনহর দাস সাং প্রেমনগর সন ১২৫৮ সাল তা ২৯ ফাল্গুন।"

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ, পত্র সংখ্যা ১১, প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা। গ্রন্থকার আপনাকে মুকুন্দদাস গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, ও গ্রন্থারম্ভে ও গ্রন্থশেষে গ্রন্থোৎপত্তির ও সহজ ভজন প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছেন; কিন্তু আপনার নাম দিতে ভুলিয়াছেন। এই গ্রন্থ খানি প্রকাশের যোগ্য।

৯। রাগময়ী কণা—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ।
যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব গোসাঞি।
কৃষ্ণপ্রেম ধন দিতে আর কেহ নাঞি।

শেষ—

এতেক লক্ষণ কহিল শ্রীজীব গোস্বামী।
শ্রীরূপচরণ বিনু যার গতি নাই।
গ্রন্থ রাগময়ী তার চুম্বক কহিলা।
ইহাতে সাধক কিছু বুঝিতে পারিলা।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
রাগময়ী কণা কহে কৃষ্ণদাস।
ইতি রাগময়ীকণা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ—পত্র সংখ্যা ৭। লেখকের নাম বা পুঁথির তারিখ নাই। অধিক দিনের নকল নহে।

১০। আত্মজিজ্ঞাসা—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—অথ আত্মজিজ্ঞাসা।

তুমি কে আমি জীব কোন্ জীব তটস্থ জীব থাক কোথা তাতে তাও কিরূপে হইল তত্ববস্তু হইতে হইল। ইত্যাদি।

শেষ—

রসের মরম জানি প্রভুরে ভজিবে।
প্রভু সুখের সুখী হয়ে ব্রজেতে রহিবে॥
অবশ্য মিলিবে তারে নিত্য বৃন্দাবন।
আনন্দে সেবিবে সেই প্রভুর চরণ॥
সহচরী সঙ্গে আস্বাদে তোমার চরণ আশ।
আত্মজিজ্ঞাসা সারাৎসার কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি আত্মজিজ্ঞাসা সারাৎসার গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পুঁথির বিবরণ—পত্রসংখ্যা ৫। বেশী দিনের নকল নহে। লেখকের নাম বা পুঁথির তারিখ নাই।

## ১১। পদ্মশৃঙ্গার গ্রন্থ—নরসিংহ দাস।

আরম্ভ—

রাগাশ্রয় বস্তু তত্ত্ব এই নিরূপণ।
সামান্য বিশেষরূপ কহি এই ক্রম॥
ভূত আত্মার আশ্রয় স্থিতি হয় যেই কাম।
অনুক্ষণ জীব তাহা করয়ে বিশ্রাম॥
উদ্দীপন ঋতু সূর্য্য ভ্রমণ সংযোগে।
তিন দিন পূর্ব্বে হয় আশ্রয় অনুরাগে॥

শেষ—

নরসিংহ বলি যারে ভাগবতে গায়।
সেই প্রভু অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥
কবিরাজ গোসাঞি যেই লিখিল সিদ্ধান্ত।
যাথে বর্ত্তে সেই বুঝে সিদ্ধান্তের অন্ত॥
আশ্রয় আচার যার কি বুঝিবে সেই।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি ইহা নিতে পারে যেই॥
সেই এবে অবতীর্ণ পুরুষ আর নারী।
শৃঙ্গার মাধুর্য্য হয় রূপের ভিকারী॥
এই চব্বিশ চন্দ্র যে জন করয়ে বিশ্বাস।
পদ্মশৃঙ্গার গ্রন্থ কহে নরসিংহ দাস॥
নির্জ্জনে বসিয়া ইহা আস্বাদ করিবে।
আপন সগণ বিনা অন্যে নাহি দিবে।
ইতি শ্রীপদ্মশৃঙ্গার গ্রন্থ সমাপ্ত।

পুঁথির বিবরণ—পত্রসংখ্যা ৫, অল্প দিনের লেখা, লেখকের নাম বা লেখার তারিখ নাই।

## ১২। নরোত্তম বিলাস—নরহরি দাস

সম্পূর্ণ গ্রন্থ—পত্রসংখ্যা ১১০, শকাব্দ ১৮১৩ (সন ১২৯৮) ১৬ই ফাল্গুন তারিখে লেখা শেষ।

১ হইতে ৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুঁথির ঠিকানা জেমো নূতন বাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। ৬ হইতে ১২ পর্য্যন্ত পুঁথির ঠিকানা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ, জেমো বিশ্বাসপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

পত্রিকা-সম্পাদক।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

## দশম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৬শে চৈত্র, ৮ই এপ্রেল, রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময় ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে উহার দশম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( সভাপতি )
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ ( সহকারী সভাপতি )
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ আনন্দনাথ রায়
„ কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ
„ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
„ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
„ চারুচন্দ্র ঘোষ
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ হেমেন্দ্রমোহন বসু
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ
„ প্রমথনাথ দত্ত এম্, এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল
„ বৈদ্যনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ এম্, ডব্লিউ, হোসেন
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল
„ ললিতমোহন ঘোষাল
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ
„ ডাক্তার রসিক[illegible]মোহন চক্রবর্ত্তী
„ মন্মথনাথ চ[illegible]
„ অনাথনাথ বসু
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ কালিদাস নাথ
„ বিনোদবিহারী বসু বি, এ
„ মন্মথমোহন বসু
„ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল ( সম্পাদক )
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীপাঠ।

২। সভ্যনির্ব্বাচন।

৩। প্রদর্শন—( ক ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রায় ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ। ( খ ) বিশ্বকোষসঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রায় ১৫০০ বৎসরের প্রাচীন হিন্দুরাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ।

৪। প্রবন্ধ পাঠ,—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক "অপরা প্রকৃতি" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। প্রস্তাব—(ক) পরিষদের শাখাসমিতিসমূহের পুনর্গঠন সম্বন্ধে শাখাসমিতি-গুলির সাধারণ অধিবেশনে নির্দ্ধারিত প্রস্তাব। (খ) প্রাচীনগ্রন্থাবলী ত্রৈমাসিক পত্রের আকারে প্রকাশ জন্য সম্পাদকের প্রস্তাব।

৬। বিবিধ।

অতঃপর সভাপতির অনুমতি অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনু-মোদিত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত নুতন সভ্যগণের নাম যথাক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া নির্ব্বা-চিত হইল,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, বি, এল্। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার রায় ১ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত নরনাথ মুখোপাধ্যায় বেনিয়াপুকুর। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, ৬ নং বস্থপাড়া লেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার ৩ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীযুক্ত কুমার সত্যবাদী ঘোষাল কাশীপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এম, টি, এস "কৃষিতত্ত্ব" সম্পাদক, ৪ নং উইলিয়মস্ লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ উকীল, "খুলনা" সম্পাদক, খুলনা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মল্লিক, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩।২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মাহেশ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী খাজুরা, নাটোর। শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩ নং ঘোড়া বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় কুঞ্জঘাটা রাজবাটী খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু হানিমান হল, ২।১ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মেসার্স ডিক্সনের আপীষ ৭ নং নুতন চিনাবাজার। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ হালদার, ৬১ নং গার্ডেন রিচ, খিদিরপুর। শ্রীযুক্ত নীলমণি দে বি, এ, এসিস্‌টাণ্ট সেটেল-মেণ্ট অফীসার মজঃফরপুর। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট ৩৯ সার্পেণ্টাইন্ লেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউ, পলিকস্ লেন, খালধার। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পায়ন শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন লোয়ার চিৎপুর রোড।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় বাহাদুর দক্ষিণেশ্বর। শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র

বর্দ্ধন A. D. C. আগরতলা রাজধানী, স্বাধীন ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত ব্রজাপ্রসন্ন ঘোষ, রামনগর। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু ১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, সমর্থক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট ; ১৩ নং সিমলা ষ্ট্রিট। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বি, এল উকীল, হাইকোর্ট ২৬ নং সিমলা ষ্ট্রিট। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় Personal Assistant, Presy. Commor. রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ১২ নং ব্রজলাল মিত্রের লেন, কাঁসারিপাড়া। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল উকীল, খাওয়া, সুকিয়া ষ্ট্রিট। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জমিদার, ১৫ নং বীডনষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বসু, বি, এ, ৬৫ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রিট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় জমিদার, উত্তরপাড়া। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী ৫ নং শ্রীনাথ রায়ের লেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, কড়িয়াপুকুর লেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সান্যাল, জমিদার কেদারপুর, টাঙ্গাইল। কালীপ্রসন্ন দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মল্লিক, জমিদার ৩৫ নং পঞ্চানন্দ তলা লেন। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ। শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ। শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ, ২ নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে ২৮।৩ দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিদ্ধান্ত চক্রবর্ত্তী বেলঘরিয়া, পাটুল পোঃ, নাটোর। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ঘোষ ৭৫ বীডন্ ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, উকীল, তমলুক। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার বি, এল, উকীল, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত ডাঃ শরচ্চন্দ্র রাহা নওয়াপাড়া, যশোহর। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, এম্, এ মুন্সেফ, চুঁচুড়া। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু ১৫ নং তেলীপাড়া লেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়, প্রাইভেট্ সেক্রেটারি মহারাজ, দিনাজপুর। মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর, সুসঙ্গ, দুর্গাপুর। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় চৌধুরী জমিদার চেয়ারম্যান্, বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি। শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় চৌধুরি জমিদার বারুইপুর। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি,এ ১২।১।৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ১২।১।৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ১২।১।৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন ৭৮, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, শিবনারায়ণপুর, আড়ংঘাটা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ বঙ্গবাসী কলেজ। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ জেঃ এঃ ইনষ্টিটিউসন্। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার উত্তরপাড়া। শ্রীযুক্ত বিজয়েন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মজুমদার, এম্, এ, বি, এল Inspector of Schools, Presy. Circle. শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সেন, এম্, এ, Dy. Inspector of Schools

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ বি, এল—শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মিত্র ১৮।১।১ আপার সর্কুলার রোড্। শ্রীযুক্ত যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ( ব্যারিষ্টার ) ১১৯।১২৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় হেল্ ওয়েলস্ লেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু ১ মদনমোহন দত্তের লেন, সিমলা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্, এ ১ সিনকমলে রোড, গার্ডেনরীচ্। শ্রীযুক্ত রায় নীরদকৃষ্ণ দত্ত বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বসু, ১১২ বীডন্ ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীর সেপাড়। শ্রীযুক্ত [illegible] লাহা ৩০ [illegible] মজুমদারের ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল রায়, জমিদার চকদিঘী, বর্দ্ধমান। শ্রীযুক্ত রায় [illegible] জমিদার ৬৫, বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, ( ব্যারিষ্টার ) ৫২ [illegible] রোড্। শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] ঘোষ, [illegible], ইটালি। শ্রীযুক্ত [illegible]

বালীগঞ্জ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, জমিদার ১২ ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। শ্রীযুক্ত চুনিরালাল শীল ৮৫, আপার চিৎপুর রোড। শ্রীযুক্ত কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া রাজবাটী। শ্রীযুক্ত কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া রাজবাটী। শ্রীযুক্ত এস্. পি, সিংহ, (ব্যারিষ্টার) ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সরকার বিডন্ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত যদুনাথ বরাট, এঞ্জিনিয়ার শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৫।২ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাদুড়বাগান। শ্রীযুক্ত এন্, হালদার, ব্যারিষ্টার। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সব্ ওবারসিয়ার পালামৌ। শ্রীযুক্ত ডাঃ, জে, এন মজুমদার এন্, ডিঃ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী বি, এ, এষ্টেট্ রায় ধনপত সিং বাহাদুর বালুচর, মুর্শিদাবাদ। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ সরকার, উকীল, পুরুলিয়া।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী—শ্রীযুক্ত ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্,বি ৯, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস ২৫, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২০ বীডন্ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত জে, এম্ ঘোষ, এম্, ডি ৬৫।২ বীডন্ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস, B. Sc. অধ্যাপক, পাটনা কলেজ। শ্রীযুক্ত রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেঃ মাঃ, মাগুরা, যশোহর। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল, গাইবান্ধা, রংপুর।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক ২, শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন। আনন্দময় মিত্র ৩২, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে পঞ্চম কার্য্য প্রথমেই গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,বি,এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে শাখা সমিতি সমূহের সাধারণ অধিবেশনে নির্দ্ধারিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল :—

(১) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ বলেন—পরিষদের সংশ্রবে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশটি ক্ষুদ্র শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার কতকগুলি প্রাচীন, কতকগুলি নূতন হইলেও কোনটীরই কার্য্য যে বড় বেশী হইয়াছে, তাহা নহে। এমনও কয়েকটি সমিতি আছে যে একে অন্যের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে লইয়া স্বতন্ত্র এক সমিতিরূপে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন, অথচ এ পর্য্যন্ত অনেকে কিছুই কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে আমার মতে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট শাখাসমিতিগুলি একত্রিত করিয়া একটি মূলসমিতি গঠিত করা হউক। এইরূপ নব গঠিত চার পাঁচটি সমিতি দ্বারা কার্য্য ভাল হইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস; অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি—গ্রন্থপ্রকাশসমিতির ও প্রাচীনসাহিত্যসমিতির উদ্দেশ্য প্রায়ই এক; এই দুই সমিতি একত্রিত হউক এবং নবগঠিত সমিতির নাম গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিই হউক। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থের অনুসন্ধান, সংগ্রহ, রক্ষা ও প্রকাশ ইহার উদ্দেশ্য হউক। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ইহার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ইহার সহকারী সম্পাদক হউন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির ও প্রাচীন সাহিত্য সমিতির সভ্যগণ ইহার সভ্য হউন।—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ বলেন,—নিম্নলিখিত শাখা সমিতিগুলি (কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি, কাশীদাসী মহাভারত সমিতি) কবিকঙ্কণ চণ্ডী সমিতি, রামমোহন রামায়ণ সমিতি) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, বা প্রাচীন সাহিত্য সমিতির অংশমাত্র। গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে এক একখানি বিশেষ গ্রন্থপ্রকাশের জন্য এই সকল সমিতির সৃষ্টি। যদি প্রত্যেক প্রাচীন পুস্তক প্রকাশের জন্য এইরূপ এক একটি স্বতন্ত্র সমিতির সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে মূল গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির কার্য্য থাকে না, অতএব আমি প্রস্তাব করি,—উপরি উক্ত চারিটি শাখাসমিতিও নবগঠিত গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অন্তর্ভুক্ত হউক; প্রাচীনগ্রন্থপ্রকাশ সমিতি প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহাদের স্বতন্ত্র কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করিয়া প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ বলেন,—ঐতিহাসিক সমিতির উদ্দেশ্য বড় সঙ্কীর্ণ, এই উদ্দেশ্যের কতকাংশ প্রাচীন শব্দ সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, অতএব আমি প্রস্তাব করি যে ঐতিহাসিক সমিতি উঠাইয়া দেওয়া হউক; উহার উদ্দেশ্যের মধ্য হইতে ঐতিহাসিক নামাদির বর্ণযোজনার ভার প্রাচীন শব্দ সমিতির হস্তে দেওয়া হউক, এবং কাল নিরূপণের অংশটুকু বর্জ্জন করা হউক। আর প্রাচীন শব্দ সমিতির নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া, উহার কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইয়া, কেবল শব্দ সমিতি করা হউক। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ উহার সম্পাদক ও বর্ত্তমান প্রাচীন শব্দ সমিতির এবং ঐতিহাসিক সমিতির সভ্যগণ উহার সভ্য নিযুক্ত হউন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ বলেন,—পরিভাষাসমিতি যখন, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ভূগোল প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই পরিভাষা প্রণয়নে নিযুক্ত, তখন উদ্ভিৎ পরিভাষা সমিতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিয়া ফল কি? অতএব আমি প্রস্তাব করি,—ঐ উভয় সমিতি একত্রিত করা হউক এবং প্রণয়ন কালে নবগঠিত পরিভাষা সমিতি অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পরামর্শানুসারে বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা প্রণয়ন করিবেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ ইহার সম্পাদক এবং উভয় সমিতির বর্ত্তমান সভ্যগণ ইহার সভ্য হউন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ বলেন,—ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির যে উদ্দেশ্য, তাহা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করা দুরূহ। বাঙ্গালা ভাষার সে অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই; অতএব আমি প্রস্তাব করি,—এই সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক বিভিন্নতা এবং ঐতিহাসিক ক্রম অনুসন্ধান ও আলোচনা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাবিজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ হউক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ,

বি, এল্ ইহার সম্পাদক হউন।—ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির মতামত পড়িয়া শুনাইয়া, প্রথমে এই সমিতি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, বি, এল্ এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রজনী বাবুর প্রস্তাবের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৬) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেন,—নবগঠিত গ্রন্থপ্রকাশসমিতির সহিত পার্থক্য রক্ষার্থ বর্ত্তমান 'গ্রন্থ সমিতির' নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, "গ্রন্থরচনাসমিতি" করা হউক এবং উহারই হস্তে পরিষদের নিয়মাবলীর ২য় ও ৩য় ধারা অনুসারে কার্য্য করিবার ভার দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ইহার সম্পাদক হউন।—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এলের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৭) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন,—এই সকল প্রস্তাব পরিষদের আগামী দশম মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থিত করা হউক। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এর সমর্থনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে ৬ (খ) প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী উত্থাপিত করিলেন,—"প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং প্রকাশই সাহিত্য পরিষদের একটী অন্যতম প্রাচীন উদ্দেশ্য। পরিষদ্ হইতে উক্ত কার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু উহা রীতিমত এবং প্রণালী পূর্ব্বক যাহাতে হয় আমার তাহা একান্ত ইচ্ছা। এ বিষয়ে আমি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে পরিষৎ পত্রিকার ন্যায় অপর একখানি পত্রিকায় রীতিমত ভাবে প্রাচীন পুঁথি প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। প্রাচীনবাঙ্গালাগ্রন্থাবলী নামে অনূন ৮ ফর্ম্মা করিয়া ত্রৈমাসিক পুস্তকাকারে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদি প্রকাশিত হউক এবং গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত নিম্নলিখিত নিয়মাদি গৃহীত হউক।

(১) "প্রাচীনবাঙ্গালাগ্রন্থাবলী" নামে অনূন ৮ ফর্ম্মা করিয়া ত্রৈমাসিক পুস্তকাকারে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ ২০ পাউণ্ড কাগজে প্রতি সংখ্যা ১০০০ করিয়া ছাপা হইবে।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সর্ব্বপ্রধান সম্পাদক হইবেন।

(৩) গ্রন্থাবলীতে প্রতি সংখ্যায় একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হইবে, এবং প্রত্যেক পুস্তকের জন্য প্রয়োজন হইলে স্বতন্ত্র সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) সমস্ত গ্রন্থের শেষ মুদ্রণাদেশ সর্ব্বপ্রধান সম্পাদক দিবেন। এবং তাঁহার পরামর্শ মত সমস্ত গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে।

(৫) বিভিন্ন পুস্তকের সম্পাদকেরা প্রত্যেকে ১০ খণ্ড স্বসম্পাদিত পুস্তকাংশ বিনা-মূল্যে পাইবেন।

(৬) ১৩০৭ সালে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আপাততঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তত্তৎ পুস্তকের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন :—

১। গোবিন্দচন্দ্র গীত। ৺ দুর্লভ মল্লিক কৃত (বাঙ্গালার প্রাচীন যৌদ্ধধর্ম্মমূলক গ্রন্থ)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

২। মনসামঙ্গল। ৺ বিষ্ণু পাল কৃত (সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মনসামঙ্গল)। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

৩। চৈতন্য মঙ্গল। ৺ জয়ানন্দ মিশ্র কৃত (চৈতন্যজীবনী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ পূর্ণ গ্রন্থ)। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ।

৪ বিদ্যাপতির পদাবলী। (নেপাল রাজের পুস্তকাগারে প্রাপ্ত ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি ও ২৭৫টী নূতন পদযুক্ত)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ।

৫। কালিকা মঙ্গল। (বিদ্যাসুন্দরের উপন্যাস ৺ কৃষ্ণরাম দাস প্রণীত)। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।

৬। বাসু ঘোষের পদাবলী। (চৈতন্য দেবের বাল্যলীলা গানে রচিত)। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

৭। জৈমিনি ভারত। (ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী প্রণীত)। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

৮। জয়দেব চরিত। (জয়দেব জীবনী সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ)। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

৯। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। (৺ ভাগবতাচার্য্য কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন পদ্যানুবাদ)। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

(৭) কোন পুস্তক এক ফর্ম্মার কম প্রকাশিত হইবে না এবং প্রত্যেক পুস্তকের স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া হইবে।

(৮) পরিষদের সভ্যগণ এই গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে পাইবেন, কিন্তু যিনি পরিষদের মাসিক চাঁদা নিয়মিতরূপে না দিবেন তিনি উহা বিনা মূল্যে পাইবেন না। পুস্তকালয় প্রভৃতিতে বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে না।

(৯) পরিষদের সভ্য ব্যতীত সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থাবলীর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ২৲ টাকা।

এতৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ মহাশয় বলিলেন,—এই প্রস্তাব অতি উৎকৃষ্ট। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বৎসরে উহার ব্যয় আনুমানিক ৫০০৲ টাকা পড়িবে। ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় আমাদের সহৃদয় বিদ্যোৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, বি, এল্ মহাশয় দিবেন বলিতেছেন, এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন। বাকি অর্দ্ধেক ব্যয় ৷১০ পয়সা ফর্ম্মা বা ২৲ টাকা বার্ষিক ব্যয় করিয়া ১২৫ জন গ্রাহক করিতে পারিলেই এত বড় একটা কাজ করিতে পারা যায়। আর পরিষদের অপর কোন হিতৈষী বন্ধু যতীন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে পরিষৎকে কিছু উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে এই কার্য্যের সম্পাদনের ভার ন্যস্ত থাকায় সে পক্ষেও সফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন,—ইহা এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার অনুকরণ করা হইতেছে না, বস্তুতঃ তিনি যাহা করিতে অনুরোধ করিতেছেন, আমরাও তাহাই করিতেছি। তিনি ঠিক অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই, আমি তাঁহাকে জানাইব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা পরিচালনের ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাপতির পুঁথি প্রদর্শন করিয়া বলেন,—এই পুঁথিখানি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত। ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষরে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এই পুঁথির অক্ষর দেখিয়া অনুমান করা গিয়াছে, এই পুঁথিখানি ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। গ্রিয়ারসন সাহেবও ইহা ঐরূপ পুরাতনই বলিয়া অনুমান করেন। অধ্যাপক বেণ্ডল এবং আমি নেপাল রাজের পুস্তকাগারে গিয়াছিলাম। সেখানে তাল-পাতে লেখা খৃষ্টীয় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত পুঁথিও আছে। তাহারই মধ্য হইতে এই পুঁথিখানি পাইয়া মহা আনন্দ বিস্ময় এবং কৌতূহল জন্মিল। এপর্য্যন্ত যতগুলি বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিতে এত গান নাই। টেলিগ্রাম করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাপতির সমস্ত পুঁথি লইয়া গেলাম, মিলাইয়া দেখিলাম, সমস্ত প্রচারিত গানের মধ্যে আটটী পদ এই পুঁথিতে আছে, বাকী ২৫৭ টী নূতন। গ্রিয়ারসন্ সাহেবকে টেলিগ্রাম করিলাম, তিনিও বিস্মিত হইয়া পুঁথিখানি দেখিতে চাহিলেন। আমাদেরও লোভ হইল, কিন্তু সংগ্রহ হয় কিরূপে? নেপাল রাজের নিকট চাহিতে হইলে Foreign Officeএর মধ্যস্থতায় ভারত গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রার্থনা করাইতে হয়। তাহার পর কত দিনে সে প্রার্থনার কিরূপ ফল হইবে কে জানে? যাহাহউক যেখানে উপযুক্ত পথ দিয়া কোন কার্য্য না হয় সেখানে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা অনেক সময় কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে। আমাদেরই একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী কৌশলে আমাদের অভিপ্রায় রাজার ভ্রাতাকে জানাইল। তিনি দিতে সম্মত হইলেন, তবে আসল পুঁথিখানি আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। আমরা আকাশের চাঁদ পাইলাম। পুঁথিখানি আনিয়া পড়িবার চেষ্টা করা গেল। মৈথিল অক্ষর সমস্ত বুঝা গেল না। ৮।১০ দিনে ৮।১০ টি গান পড়া গেল। গ্রিয়ারসন সাহেবের "কামিনী করই সিনান" গানটি ইহাতে আছে। এইরূপ কিছু পড়া গেলে এশিয়াটীক সোসাইটী ইহা ছাপিবার ভার আমার উপর দিলেন। আমি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। গ্রিয়ারসন সাহেবের সহিত চিঠি পত্রাদি লেখালিখি হইতে লাগিল। পুঁথির সকল কথা নিঃসন্দেহে পড়িবার জন্য দ্বারভাঙ্গার রাজপণ্ডিত কবীশ্বর চণ্ডা ঝার সহিত দেখা করিলাম। তিনি এই পুঁথি দেখিয়া যেন অমূল্য রত্ন পাইলেন। তিনি পড়িয়া দিলেন, তাঁহারও ঠেকিতে লাগিল, তবে আমাদের অপেক্ষা অনেক কম। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই মহৎ লোক। তিনি স্বীকার করিলেন, কলিকাতায় আসিয়া আমা-

দিগকে এজন্য বিধিমত সাহায্য করিবেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিলে দেখা করিলাম। তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর, তথাপি তিনি প্রত্যহ ৫। ৬ ঘণ্টা করিয়া আমাদের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ক্রমে পাঠোদ্ধার হইল। এক্ষণে ইহা মুদ্রণের উপযুক্ত হইয়াছে, এশিয়াটীক সোসাইটী ইহা প্রকাশ করিবেন। এ পুঁথিতে গান কয়টী ছাড়া আর কোন কথা নাই। হাতের লেখা বা পেলিওগ্রাফি দেখিয়াই ইহার প্রাচীনত্ব স্থির হইয়াছে। ডাঃ বুহ্‌লারের পর ডাঃ বেণ্ডল ভারতীয় পেলিওগ্রাফি সম্বন্ধে প্রধান অভিজ্ঞ পণ্ডিত; তিনি দেখিয়াও ইহাকে ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং যে শতাব্দীতে বিদ্যাপতির জন্ম, পুঁথিখানিও সেই শতাব্দীতে লিখিত। এখন জিজ্ঞাস্য এই; মৈথিল কবির পুঁথি মিথিলায় পাওয়া যায় নাই, অথচ নেপালে পাওয়া গেল, ইহার কারণ কি? মল্লরাজ যখন মৈথিল ব্রাহ্মণ আনাইয়া নেপালে বাস করান, তখন সেই সকল ব্রাহ্মণের সহিত সংস্কৃত ও মৈথিল পুস্তক প্রচুর পরিমাণে নেপালে প্রবেশ করে। সে সময়ে ভাতগাঁওয়ে এত অধিক পরিমাণে মৈথিল ব্রাহ্মণ বাস করিয়াছিল যে, আজিও তাহাদের নেপালীদিগের সহিত মিশিতে হয় নাই। আজিও তাহারা মিথিলার ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করে। বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষা ও পদাবলী ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের কথা এত দিন জানা ছিল না; কিন্তু নেপালরাজের পুস্তকাগারে তাঁহার রচিত কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তিপতাকা নামে আরও দুইখানি প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের দর্শন পাওয়া গিয়াছে। কীর্ত্তিলতার কথা চণ্ডা ঝা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চণ্ডা ঝা, গঙ্গাধর ঝা, কীর্ত্তিধন মিশ্র প্রভৃতি মৈথিল পণ্ডিতপ্রধানেরা কেহই ইহার একখানিও দেখেন নাই। ফিরিয়া আসিবার সময় আমাদের সহকারী ছাপরায় আসিয়া আর একখানি কীর্ত্তিপতাকা সন্ধান করিয়া বাহির করেন। কীর্ত্তিপতাকার অন্ততঃ দুইখানি গ্রন্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। এই দুই পুস্তকে শিবসিংহকীর্ত্তি বর্ণিত আছে। আরও অনুসন্ধান করিলে হয়ত আরও গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবে। নেপাল লাইব্রেরী অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে বিদ্যাপতি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশতের কম হইবে না, অধিকাংশ সেখানে আছে। তিনি প্রথমে মৈথিলীতে পদাবলী লিখিতেন, শেষ দশায় সংস্কৃতে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল লিখিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহার জীবদ্দশায় মিথিলার সিংহাসনে অনেকগুলি রাজা হন। তিনি প্রত্যেকের রাজত্বকালেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় একশত হইয়াছিল এবং মৃত্যুকালে ভবসিংহ রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই বংশে বিশ্বাসদেবীও সিংহাসনে আরোহণ করেন। গেয়াসুদ্দীন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনবংশ ধ্বংস হইলে শিবসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র কামেশ্বর বংশ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলিলেন,—পুরুষপরীক্ষার ভূমিকায় চন্দ্র পণ্ডিত লিখিয়াছেন, কামেশ্বর শিবসিংহের ভাইপো নহেন, বৃদ্ধ প্রপিতামহ। তাহার পর দেবসিংহ, তৎপুত্র ভবসিংহ, তৎপুত্র শিবসিংহ। বিদ্যাপতি বিশ্বাসদেবীর সময় জীবিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তরাজগণের সময়ের একটী সুবর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বলেন,—মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটীর পূর্ব্বনাম কর্ণসুবর্ণ। এই কর্ণসুবর্ণ কালে "কানসোণা" নামে খ্যাত হয়। বঙ্গীয় রাঢ়ীয় কায়স্থকুলের দে-গণের প্রধান সমাজ এই কানসোণায় অবস্থিত ছিল। হিউয়েন্ সাঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তে কর্ণসুবর্ণের বর্ণনা আছে। ইহারই নিকট "রাজবাড়ী ডাঙ্গা" নামে একটা স্থান আছে। এই স্থানে ক্ষেত্রকর্ষণ কালে লোকে প্রাচীন দ্রব্যাদি ও মুদ্রা পাইয়া থাকে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় উহার পার্শ্বস্থ যদুপুর গ্রামের এক কৃষকপত্নীর নিকট এই মুদ্রাটী পাইয়াছিলেন। ইহাতে একপার্শ্বে গুপ্তবংশীয় সম্রাট স্কন্দগুপ্ত নববালাদিত্যের মত ধনুর্দ্ধারী রাজমূর্ত্তি আছে এবং কমলা মূর্ত্তিও আছে। অপর পার্শ্বে "রবি গু প স" এই কয়টি অক্ষর আছে। এ পর্য্যন্ত গুপ্ত সম্রাটগণের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রবিগুপ্তের নাম দেখা যায় না। কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। বুহ্লারের প্রাচীন অক্ষর লিপির যে তালিকা আছে, তাহার সহিত এই মুদ্রার অক্ষর মিলাইলে ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং এই রবিগুপ্ত শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—গুপ্ত নরপতিগণের রাজধানী পাটলিপুত্রে ছিল, পশ্চিমে শতদ্রু উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। তাঁহারা পঞ্জাব প্রবেশ করেন নাই। হূনদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল; স্থানে স্থানে তাঁহাদের অধীন প্রত্যন্তপ্রদেশের রাজধানী ছিল। আবুল ফজেল ৭ ম। ৮ ম শতাব্দীতে যে আদিত্যশূরের উল্লেখ করিয়াছেন তিনিই আদিশূর। কর্ণসুবর্ণে গুপ্তবংশের ৫। ৬ পুরুষ রাজা হন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ যে দুইটী বিষয় প্রদর্শিত হইল, ঐতিহাসিক তত্ত্বের হিসাবে তাহারা অমূল্য। বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত আরও ২৭[illegible]টী গান পাইয়া আমাদের যে কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার উপর বিদ্যাপতির রচিত শতগ্রন্থের সংবাদ আমরা পাইলাম, এজন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তাহার অধিকাংশ আবার ভারতেরই একস্থানে সুরক্ষিত আছে, ইহাও বড় অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। যখন বাঙ্গালা ভাষার আকৃতি ও মৈথিলীয় ভাষার রূপ প্রায় অভিন্ন ছিল, বিদ্যাপতি সেই সময়ের মৈথিলী ভাষার কবি এবং তাঁহার অনেক রচনা আজকাল বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই আমাদের কাছে বিদ্যাপতির এত আদর, আর আমরা বিদ্যাপতির জন্য এতটা আগ্রহান্বিত। আমি প্রস্তাব করি এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে বিদ্যাপতির এই নবপ্রাপ্ত পদাবলী মুদ্রিত হইতেছে, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তেই যখন ইহার প্রকাশের ভার আছে, তখন পরিষৎ হইতেও

তিনিই বাঙ্গালা অক্ষরে ইহার একটা সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার লউন। নব প্রস্তাবিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীতে ইহা প্রকাশিত হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সভা অতি আহ্লাদসহকারে গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—নগেন্দ্র বাবুর মুদ্রা সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব, এই একটী সামান্য ক্ষুদ্র মুদ্রার সাহায্যে গুপ্তরাজত্বের আর একটী অধ্যায় লোক-সমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এখন চেষ্টা করিলে রবিগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা অনায়াসে বাহির হইবে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতে অবলীলাক্রমে পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও সাহিত্যের উন্নতি হইবে। মুদ্রাসংগ্রহকর্ত্তা নিখিল বাবু এবং প্রদর্শক নগেন্দ্র বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দুইটী প্রকৃতির উল্লেখ দেখা যায়। "ভূমিরাপ" ইত্যাদি শ্লোকে যে আট রকম ব্যাপারের কথা উল্লেখ আছে, তাহার সমষ্টিই অপরা প্রকৃতি, ইংরাজীতে ইহাই matter নামে অভিহিত হয়। এতদতিরিক্ত প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতি বলে। আজ অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। গত কল্য সভাপতি মহাশয় যে synthesis এর কথা বলিয়াছিলেন, সেই synthesis অনুসারে এই দুই প্রকৃতি মিলিয়া কিরূপে চিন্ময় ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাহা দেখাইবার ইচ্ছা আছে। আজ অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে কি বলে তাহারই আলোচনা করিব; তাহার পর অন্যদিন পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষে উভয়ের মিলন দেখাইব। এই বলিয়া হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—আমার স্মরণ হয় ক্যারাঙ্কে এবিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। চণ্ডীপাঠে আমরা যে heterogeneous mass এর কথা জানিতে পারি, অব্যক্ত প্রকৃতি unknowable বলিয়া বিদেশী দর্শনে যাহার উল্লেখ আছে, এই উভয় বোধ হয় এক। এইরূপ চেষ্টা হইতেই এই সকল গম্ভীর তত্ত্বের সন্দেহের নিরসন হয়। আমার বহুদিন হইতে সন্দেহ আছে সাংখ্যের প্রকৃতি আর বেদান্তের মায়া এক কি না, মায়া ও অবিদ্যা একই পদার্থ কিনা? হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমার অনেক উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন,—হীরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ অতি রমণীয় হইয়াছে। প্রবন্ধে বিস্তর চিন্তাশীলতা ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন ঘাঁটিয়া যে অপূর্ব্ব উৎকৃষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার শিক্ষা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা যে কত আহ্লাদকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমি তাঁহাকে তাঁহার এই অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতেছি। হীরেন্দ্র বাবু যাহাকে অপরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহার সহিত ব্রহ্মের কি প্রকার সম্বন্ধ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি তাহা দেখান নাই। আশা করি আগামী বারে তিনি এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে নানা প্রকার মতভেদ আছে। হীরেন্দ্র বাবুর ন্যায় উভয় প্রকার দার্শনিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এ সম্বন্ধীয় মীমাংসা শুনিবার জন্য আমরা সকলেই উৎসুক থাকিব।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমার আশা পুরিয়াছে, আমি এমন সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ ইতি পূর্ব্বে শুনি নাই। গত কল্য আমার বক্তৃতায় সভাপতি হইয়াও হীরেন্দ্র বাবু যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও এমন সুন্দর কথা শুনি নাই। আজ দেখিলাম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব দুইদিক্ দিয়াই মিলান যায় আর হীরেন্দ্র বাবু তাহা অতি সুন্দররূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। Spencer শিথিলভাবে এইরূপ দু এক কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু ঝিঙ্গে ভাজিয়া পটোল বানিয়া ফেলিয়াছেন। সত্ত্বরজস্তমঃ তিন পরিচ্ছিন্ন শক্তির সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। হীরেন্দ্র বাবু দর্শনে ও বিজ্ঞানে মিশাইয়া তুবড়ী বাজীর মধ্যে সাপ বাহির করার ন্যায় এক অতি কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের সন্ধিস্থানে তিনি একটী ভূতের উল্লেখ করিয়া আমায় ... ছাড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি এইরূপ মিল করিয়া না যাইতেন, তবে তাঁহার সহিতও আমার আজ লড়াই হইত। যাহা হউক হীরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া আমরা অতিশয় প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি, তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে গ্রন্থরক্ষক গ্রন্থোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। নিম্নে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক ও উপহারদাতাদিগের নাম লিখিত হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

| গ্রন্থোপহারদাতার নাম। | উপহার। |
| --- | --- |
| শ্রীযুক্ত রামলাল চক্রবর্ত্তী | হরিসঙ্গীত; হরিসঙ্কীর্ত্তন। |
| শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী | প্রীতি উপহার; মালতীমালা। |
| শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুন্সী | প্রেমগাথা। |
| শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ | মুকুর। |
| শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায় | বরিসল ক্রসোর চরিত্র। |
| শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ | রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড; মহাভারত আদিপর্ব্ব ইত্যাদি |
| শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ | গ্রন্থাবলী ৫ খানা। |

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

## বার্ষিক অধিবেশন ও সম্মিলন।

গত ২৪ বৈশাখ ( ৬ই মে ১৯০০ ) রবিবার অপরাহ্ণে পরিষদগৃহে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ও সম্মিলন হইয়াছিল। সভ্য ও নিমন্ত্রিত প্রায় তিনশতাধিক ভদ্রলোকের সমাগমে গৃহ ও এই অধিবেশনোপলক্ষে অস্থায়িরূপে আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়াছিল গৃহ বিদ্যুদালোকে উদ্ভাসিত ও পত্র পুষ্পে সজ্জীকৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকিশোর মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী ধরের যত্নে পরিষদ গৃহ সুন্দর শ্রীধারণ করিয়াছিল।

সভায় শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত, "প্রতিবাসী" "বসুমতী" ও "আনন্দবাজার" সম্পাদক প্রভৃতি বহু সভ্য ও অধ্যাপকের সমাগম হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রিবণ অরচেষ্ট্রা কোম্পানির একতানবাদন হয়। পরে পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র এম্, এ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু পরিষদের অন্যতর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক এতদুপলক্ষে রচিত নিম্নলিখিত গানটী গীত হয়—

বাণী-চরণ-কমল-ভৃঙ্গ স্বাগত বাণীভবনে।<br>
আজি উচ্ছ্বাসিত প্রীতি-উৎস উৎসারিত জীবনে;<br>
আজি জাগিছে হৃদয়ে নব উৎসাহ নবীন পুলক হিল্লোলে;<br>
আজি বিকশি উঠিছে হৃদয়পদ্ম নবীন আশার কিরণে;<br>
আজি মঙ্গলগীত উঠিছে জগতে পুলকে পূরিছে বিশ্ব;<br>
আজি জননীর শুভ আশীষ বচন ভাসিয়ে আসিছে পবনে।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সভার ইচ্ছানুসারে গত অধিবেশনের বিবরণ এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে গতবৎসরের বিবরণ ও আয়ব্যয় হিসাব অনুমোদিত হয়। কার্য্যবিবরণ বিবৃতিকালে সম্পাদক বলেন, আমি সমবেত সভ্যদিগকে একটী অতি আনন্দের সংবাদ দিবার এই শুভ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষের যত্নে কাশীমবাজারের মহারাজ কলিকাতায় পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ জন্যে ভূমিদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মণীপুরের রাজা বাহাদুর, লালগোলার রাজ

সাহেব বাহাদুর, অনারেবল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের নিকটেও সাহায্যের আশা পাওয়া গিয়াছে। শুনিয়া সভা বিপুল আনন্দ প্রকাশ করেন।

ইহার পর নিম্নলিখিত সভ্যগণের নির্ব্বাচন হয়,—

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিশ্বাস, উকীল; শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী উকীল; শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, উকীল; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, উকীল; শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার উকীল; শ্রীযুক্ত হরকুমার মিত্র, উকীল; শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল উকীল; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উকীল; শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস উকীল; শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় উকীল; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল; শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র উকীল; শ্রীযুক্ত ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ উকীল; শ্রীযুক্ত বাবু নন্দনপ্রসাদ উকীল; শ্রীযুক্ত যামিনীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রগোপাল মিত্র উকীল; শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু উকীল; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র উকীল; শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ মিত্র উকীল।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, সমর্থক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার এম, এ বি, এল, বহরমপুর, খাগড়া; শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ রায় বি, এল, বহরমপুর খাগড়া; শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মৌলিক এম্ এ. বি এল, বহরমপুর গোরাবাজার; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত বি, এল, বহরমপুর গোরাবাজার; শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন সেন এম্, এ, বি, এল, বহরমপুর, খাগড়া; শ্রীযুক্ত সরোজমোহন দাস গুপ্ত বি, এল, বহরমপুর, খাগড়া; শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার বি,এল, বহরমপুর খাগড়া; শ্রীযুক্ত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, বহরমপুর, খাগড়া; শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস সাহা বি, এল, বহরমপুর ঘাটবন্দর; শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষাল, বি, এল, বহরমপুর, ঘাটবন্দর; শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন, জমিদার, বহরমপুর, খাগড়া; শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশচরণ সেন জমিদার, বহরমপুর খাগড়া; শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সিংহ জমিদার, বহরমপুর, খাগড়া; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, প্রফেসর, বহরমপুর, খাগড়া; শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বহরমপুর খাগড়া; শ্রীযুক্ত দিবাকরচন্দ্র সেনগুপ্ত, খাগড়া; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বাগচী, বি, এল, খাগড়া; শ্রীযুক্ত অনারেবল বৈকুণ্ঠনাথ সেন বহরমপুর; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, বহরমপুর; শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, বহরমপুর।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, মুরাপাড়া, ঢাকা; শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ বসু এম্, এ বি, এল, ১৩, নন্দরাম সেনের গলি; শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র, গোকুল মিত্রের গলি; শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন বসু ৭৭।৫, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সমর্থক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন, C/o Hon'ble Baikuntha Nath Sen বহরমপুর; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ১১৪, আপার সার্কুলার রোড্; শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৩, ফার্ডাইসের লেন; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, উকীল, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন গুপ্ত, ৩২, বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রাণধন বসু, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসু, ২০।১ টাম্যার্স লেন; শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ বসু, শ্যামাচরণদের ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, ১৬ বীডন্ ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, সি, রায়, ৯১ আপার সার্কুলার রোড্, C. C. Dutt. Esq. C. S. Ahmedabad, Bombay; A. K. Shere Esq. Baroda; শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, পাবনা; শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায়, উকীল, পাবনা; শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ, ৬৩, সিমলা ষ্ট্রীট্; R. Mookerji Esq. কাশ্মীর; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন; শ্রীযুক্ত রায় অমূল্যনাথ চৌধুরী, ৩৫।২ বীডন্ ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী, জমিদার, শ্রীরামপুর; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ গোস্বামী C/o Babu Kisorilal Goswami, জমিদার, শ্রীরামপুর।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,—শ্রীযুক্ত বামনদাস দাস, এম্, এ,

হেড্‌মাষ্টার, বাযুটিয়া স্কুল, যশোহর; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, ৭৫, বীডন্ ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ, ৭৫ বীডন্ ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ভড়, ৪৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, সমর্থক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ, বলরাম দের ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্; রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার সাহেব, কটক; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এল্, ৬৫।২ পার্ব্বতীঘোষের লেন; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত, রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট্; আশুতোষচন্দ্র নিয়োগী, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্; কবিরাজ অঘোরচন্দ্র শর্ম্মা, জ্যোতীরত্ন শাস্ত্রী; ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, বীডনষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, সমর্থক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১৩১, রসারোড, ভবানীপুর; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৭ সুকিয়াষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, সমর্থক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী;—শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ২৯ বনমালী সরকারের গলি।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন পাল, সমর্থক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এটর্ণী সিমলা।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী,—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনবাগান; শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, উকীল, ৪, শঙ্কর ঘোষের লেন; শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র, উকীল, ৯০, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালাচাঁদ দে, ৪৯, বাগবাজার ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, রামকান্ত বসুর লেন; শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার মৈত্র, asst. settlement officer, সারণ; শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বেলগেছিয়া; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়, ৩২, ট্রাণ্ডরোড, নিমতলা; শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বসু, ডেঃ মাঃ, আপার চিৎপুর রোড্; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্, কাটমুণ্ড, নেপাল; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরি, জমিদার, রায়ের কাঠী, পিরোজপুর; শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুপাড়ালেন; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র বসু, বসুপাড়ালেন; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, টাকী শ্রীপুর; শ্রীযুক্ত চৈতন্যপ্রসাদ রায়, কটক; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১, আনন্দ চাটুর্য্যের লেন; শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, "ধরণী" সম্পাদক, মলুটী রাজবাটী, সাঁওতাল পরগণা।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস সমর্থক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ,—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র অষ্টপতি, মুন্সির বাটী, লাতু, শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত জমিদার, কায়স্থ কোনা শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারি দাস, কানাইঘাট শ্রীহট্ট। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ শর্ম্মা, জমিদার, খাজানসীর বাটী, শ্রীহট্ট।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করেন যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্ত পরিষদের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হউন:—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু এম, এ, ডি, এস সি, রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পত্রিকাসম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

আয়ব্যয়পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত কার্য্য করিয়াছেন, এমন সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। যোগ্যতর ব্যক্তিকে ঐ পদে বরণ করিলেই ভাল হয়। শিবাপ্রসন্ন বাবুর প্রস্তাব শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ যুক্তি সহ সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্পাদক ১৩০৭ সালের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন ফল সভায় জানাইলেন—১৩০৬ সালের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত :—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র।

নির্ব্বাচিত প্রথম আট জন সভ্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ধন-রক্ষকের পদে ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের স্থান শূন্য হইল। সুতরাং নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা নবম দশম ও একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শূন্য পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ কুমার শরৎকুমার রায়।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ গোবিন্দলাল দত্ত।
„ চারুচন্দ্র ঘোষ।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
„ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসরের কর্ম্মচারী-

দিগকেও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয়ের কথায় তিনি বলেন,—কেবল তাঁহার নামের গৌরবই যে কোন সাহিত্যসভার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা গত তিন বৎসর তাঁহার মানসিক ও শারীরিক শ্রমের ফল পাইয়াছি। তিনি অসুস্থ শরীরেও পরিষদের জন্য প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

ইহার পর প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীত ও প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক হারাণ বাবুর বেহালা বাদন হয়। তৎপরে বীণাপাণি নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক সংস্কৃত উত্তর চরিতের প্রথম দৃশ্যের ও পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রের একাংশের অভিনয় হয়। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনয়ার্থ সজ্জাদি দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধুর হারমোনিয়ম বাদনে ও শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়েন্দ্রনাথ দত্তের গ্রাফোফোন প্রদর্শনে সকলেই সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় সমাগত ভদ্র ব্যক্তিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যাঁহারা এই অধিবেশনে ও সম্মিলনে নানা প্রকারে পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলেন।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

## ১৩০৭ সালের প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ( ইংরাজী ২০মে ১৯০০ ) রবিবার অপরাহ্ন ৫॥ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( সভাপতি )
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" আনন্দনাথ রায়
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" অতুলচন্দ্র গোস্বামী
" অনাথনাথ পালিত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ
" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
" সরসীলাল সরকার
" উপেন্দ্রনাথ নাগ
" যোগেন্দ্রনাথ সেন
" সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু
" প্রমথনাথ মিত্র
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" গোবিন্দলাল দত্ত
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" হেমেন্দ্রমোহন বসু
" রমেশচন্দ্র বসু
" সুরেশচন্দ্র বসু
" যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" মন্মথমোহন বসু
" বিনোদবিহারী বসু
" রমণীমোহন ঘোষ
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক
ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ }

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ—২। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। প্রবন্ধপাঠ। (ক) শ্রীযুত রায় শরচ্চন্দ্র দাশ সি আই ই বাহাদুরের লিখিত "ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় লিখিত "লালা জয়নারায়ণ" নামক প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ২১৩ নং অপার সারকিউলার রোড। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬ নং মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ২০।৫ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ৫০ নং অপার চিৎপুর রোড। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ তর্ক সিদ্ধান্ত B. A. ২৯ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রিট। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুকীয়া ষ্ট্রিট। শ্রীযুক্ত সরলচাঁদ মিত্র মাণিকতলা ষ্ট্রিট। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল প্লীডার জামলালপুর C. P. শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বি এল প্লীডার জামলালপুর C. P.

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ৫০ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার। শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ দত্ত M. A. ৩২ নং রামমোহন দত্তের লেন ভবানীপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীযুক্ত রসময় লাহা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রিট। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় দেওয়ান বাড়ী হিল চট্টগ্রাম। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় জমাদার পত্রকোরা চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন নিকলার কোম্পানী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। নূতন সভ্যের নাম। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু B. L. প্লীডার কালিপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। নূতন সভ্যের নাম।—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ডেপুটী কালেক্টার উলুবেড়িয়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। নূতন সভ্যের নাম। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ কবিরত্ন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের গলি বাহিরেন জাজা। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রিট ওঁড়ো।

৩ (ক) শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসু মহাশয় পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন বিষয় দুরূহ, ইহাতে অনেক বিষয়ে আপাততঃ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে না; লেখক মহাশয় উপস্থিত থাকিলে সে সকল বুঝাইতে পারিতেন। তিনি যখন উপস্থিত নাই, তখন আজ বোধকরি এ বিষয়ের আলোচনা না হইলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ কি এবং হিন্দু দার্শনিকগণ তাহা কি ভাবে বুঝিয়াছেন প্রবন্ধলেখক তাহাই লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ একাংশ মাত্র। লেখক পরে বিশেষ আলোচনা করিবেন। অনেকের নিকট বিষয়টী নূতন। আর কেহ যে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ গ্রহণ করেন না এমন নহে। ইহা বিলুপ্ত হয় নাই। একদল পাশ্চাত্য দার্শনিক (মিল প্রভৃতি) এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এ দেশের শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বিজ্ঞানবাদ চলিত ছিল; কিন্তু সে এ বিজ্ঞানবাদ নহে। সেই জন্যই কেহ কেহ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন। শঙ্কর গৌড়পাদের কারিকার ভাষ্য করিয়াছেন। গৌড়পাদ শঙ্করের গুরু। তাহাতে এইরূপ কথা অনেক আছে। এই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের ও শঙ্করাদির বিজ্ঞানবাদের প্রভেদ এই যে বৌদ্ধগণ বলেন বিজ্ঞান ক্ষণিক; শঙ্করাদি তাহা স্বীকার করেন না। দেখা যায় বৌদ্ধদের আলয় বিকাশ ও হিন্দুর ব্রহ্ম একই রূপ। ইহার আলোচনায় প্রচলিত বেদান্তবাদ বুঝিবার সুবিধা হইবে। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, মিলের সহিত বিজ্ঞানবাদের সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক নহে। তিনি বলেন বাহ্য পদার্থ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সম্ভাবনা। বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মত প্রধানতঃ ক্ষণিকবাদ বিজ্ঞানবাদ, তাঁহারা বলেন জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ নাই। মিল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ মানেন; ও তাহার কারণ মানেন, কিন্তু কি তাহা ঠিক বলিতে পারেন না। ফিক্‌টের অনেকটা বিজ্ঞানবাদ আছে। মীমাংসাদি দর্শনের একটী কারিকা দ্বারা ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে "কোন প্রমাণকে যদি পরাপেক্ষ বল, তবে তাহার আর প্রমাণ হয় না।"

সভাপতি মহাশয় বলেন,—সভার পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে স্বীয় আলোচনার ফল দ্বারা আমাদিগকে বাধিত করুন। বৌদ্ধ শাস্ত্র বাঙ্গালায় আনা অনেক সাধনাসাপেক্ষ। সে পক্ষে পালি-শিক্ষা প্রভৃতি দুরূহ বাধা আছে। শরৎ বাবু সে কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। তিনি স্বীয় লব্ধ জ্ঞান আমাদিগকে দিন। বুদ্ধ আত্মা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে transmigration কিরূপে সম্ভবে, ইত্যাদি অনেক দুর্ব্বোধ বিষয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু তাহার অনেক অংশ আবার আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি। ওলডেন্‌বার্গ, রিজ্‌ ডেভিড্‌ প্রভৃতি অনেকে ইংরাজীতে বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিয়াছেন। শরৎ বাবু স্বয়ং মূলের আলোচনা করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করি। আশা করা যায় তিনি প্রবন্ধ শেষ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

(খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় স্বয়ং তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায়

যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া বলেন, প্রবন্ধের আলোচ্য কবি লেখকের পূর্ব্বপুরুষ; তথাপি যে তিনি নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

৪। অতঃপর গ্রন্থরক্ষকের প্রস্তাবে পরিষৎ নিম্নলিখিত উপহার স্বরূপে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ দিলেন ;—

| উপহারপ্রদাতার নাম। | উপহার পুস্তকের নাম। |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী | (১) বিবিধ প্রবন্ধ, (২) মানবস্মৃজন (৩) বিনয়পত্রিকা, (৪) রত্নপরীক্ষা (৫) জন্মনিরাস (৬। ৭) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান ১ম ও ২য় ভাগ। |
| শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | (১) বঙ্গভাষা ও সাধুভাষা ব্যাকরণ সারসংগ্রহ। (২) বেদান্তসংজ্ঞাবলী (৩) চাঁদসুন্দর (৪) উপন্যাসক (৫) Guide to the transliteration of Hindu and Mahomedan names in the Bengal Army- (৬) Dictionary of Mahomedan words. |
| শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় | (১) Life of Chaitanya |
| শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য | (১) কবি বিদ্যাপতি, (২) পাঠমালা ১ম ভাগ। (৩) ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা ১ম ভাগ। |
| শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ দত্ত | (১) বঙ্গে সামাজিকতা। |
| পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র | (১) সর্পাঘাত চিকিৎসা (হিন্দী) (২) প্রভাসমিলন (হিন্দী) (৩) বিদ্যামুকুল (হিন্দী) (৪।৫) চারুপাঠ ১ম ও ২য় ভাগ (৬) লক্ষ্মীশ্বরচম্পূ (সংস্কৃত) (৭) কাশ্মীরকীর্ত্তি (৮) লক্ষ্মীবাই (৯) কলির মেয়ে ও নবা বাবু (বাঙ্গালা) (১০) পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (বাঙ্গলা) (১১) সন্ন্যাসী। |
| শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী | (১) বিলজ্জন্দন (২) বিরক্ত জীবন। |

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সভাপতি।

৩রা আষাঢ়, ১৩০৭।

## ১৩০৭ সালের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ৩ রা আষাঢ় (১৭ ই জুন ১৯০০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ টার সময় পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)

" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল,

" রমেশচন্দ্র বসু

" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর | শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত |
| „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, | „ অক্ষয়কুমার বড়াল |
| „ নগেন্দ্রনাথ বসু | „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি |
| „ কিরণচন্দ্র দত্ত | „ নলিনীভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, |
| „ কানাইলাল ঘোষাল | „ প্রমথনাথ দত্ত এম্, এ, |
| „ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী | „ জগদীশচন্দ্র বসু বি, এল, |
| „ রামগোপাল সেনগুপ্ত | „ রমণীমোহন ঘোষ বি, এ, |
| „ বাণীনাথ নন্দী | „ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় |
| „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী | „ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, |
| „ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় | „ ব্যোমকেশ মুস্তফী |
| „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল (সম্পাদক) | „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, সহঃ সম্পাদক। |

যথা সময়ে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল, মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শিবাপ্রসন্ন বাবু আসন গ্রহণের পূর্ব্বেই বলিলেন,—আপনারা অদ্য অযোগ্য পাত্রে সভাপতিত্বের সম্মান অর্পণ করিতেছেন; যাহা হউক সভার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা বাধ্য। অদ্য সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আমি একটী অতি শোকের সংবাদ দিব। আমাকেই যে আজ গুরুতর শোকসংবাদ উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। সর্ব্বজনসম্মানিত বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রজনীকান্ত গুপ্ত আর নাই। রজনীকান্ত পরিষদের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও তিনি অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে পরিষদের জন্য বিদেশে গিয়া যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রজনী বাবুর নিকট বঙ্গসাহিত্য যে কত ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি এখন কেবল শোকসংবাদ দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিশ বৎসরের অমায়িক ভাব, সদা সহাস্য আনন—সে সব কথা যখন মনে পড়ে তখন সবই ভুলি।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়,—বঙ্গের কৃতী সন্তান, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, তেজস্বী লেখক, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রথম হইতেই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ ছিলেন। পরিষদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ প্রযুক্ত তিনি নানা প্রকারে ইহার হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ বন্ধু ও উপদেষ্টাকে হারাইয়া পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর স্থির হইল, এই প্রস্তাবটী ৺রজনীবাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত রায় বাহাদুরের নিকট পাঠান হউক।

ইহার পর সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্য আরম্ভ হইল। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই সভার আলোচ্য ছিল,—( ১ ) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ। ( ২ ) নূতন সভ্যনির্ব্বাচন। ( ৩ ) প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক বাইশ প্রকার মহাভারত প্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ। ( ৪ ) প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক "৺ কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ৺ কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ( ৫ ) বিবিধ বিষয়।

( ১ ) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

( ২ ) অতঃপর নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নির্ব্বাচন হইল,—

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমর্থক শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।—সভ্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডেঃ মাঃ হুগলী। শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ গুহ, কেশিয়ার, লেমুলি কোঃ, চৌরঙ্গী। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নির্ম্মাল্য সম্পাদক ৬৭ নং ডকৃটস্ লেন। তালতলা। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজ। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সমর্থক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী;—মহারাজকুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, প্রাসাদ, পাথুরিয়াঘাটা; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার বি, এল্, ৪২ গ্রে ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ৬ রাজার বাগান ষ্ট্রীট।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাইশ খানি মহাভারত উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যবদ্বীপে ইহার অনুবাদ হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রধান ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের অভাব নাই। আমাদের সুপরিচিত কাশীরাম দাসই মহাভারত রচয়িতা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকেই মহাভারত লিখিয়াছেন। দীনেশ বাবু ছয়খানি মহাভারতের পরিচয় দিয়াছেন। এখন বোধ হইতেছে ইহার সংখ্যা বাঙ্গালায় বোধ হয় শতাধিক। অদ্য যে বাইশ খানি স্বতন্ত্র মহাভারত আপনাদের দেখাইবার জন্য উপস্থিত করিয়াছি, ইহার প্রত্যেকের গ্রন্থকার স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তন্মধ্যে একুশ জনের নাম এই,—

(১) বিজয় পণ্ডিত (২) সঞ্জয় (৩) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ( ইহার গ্রন্থ পরাগলী মহাভারত নামে খ্যাত ) (৪) শ্রীকর নন্দী ( ইহার গ্রন্থ ছুটিখাঁর মহাভারত নামে খ্যাত ) (৫) কবিচন্দ্র (৬) কাশীরাম দাস (৭) দ্বৈপায়ন দাস (৮) নন্দরাম দাস (৯) নিত্যানন্দ ঘোষ (১০) কৃষ্ণানন্দ বসু (১১) সারণ দাস (১২) ষষ্ঠীবর (১৩) গঙ্গাদাস (১৪) রাজেন্দ্র দাস (১৫) রামচন্দ্র খাঁ (১৬) দ্বিজ কৃষ্ণরাম (১৭) ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী (১৮) দ্বিজ অভিরাম (১৯) অনন্ত মিশ্র (২০) বল্লভ দেব (২১) রামেশ্বর নন্দী।

এই পর্য্যন্ত সভার কার্য্য অগ্রসর হইলে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন।

নগেন্দ্র বাবু তৎপরে বাইশ জন মহাভারতকারের অল্প বিস্তর পরিচয়, গ্রন্থগুলির বিশেষত্বের পরিচয় ইত্যাদি আলোচনা করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নগেন্দ্র বাবুর গবেষণা, অনুসন্ধিৎসা এবং অদ্ভুত সংগ্রহের জন্য বিশেষরূপে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিলেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, নগেন্দ্র বাবুর কথিত রামচন্দ্র খাঁর উপাধি যখন লস্কর দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মহাভারত সম্বন্ধে আজ অনেক কথা জানা গেল। ব্যাসের এরূপ সুমহান্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কালে আমাদিগের দেশে যে এতগুলি কবি ও কাব্য হইয়া গিয়াছে ইহা জানিতে, শুনিতে, বলিতে বড়ই প্রীতিকর। বিশেষতঃ নগেন্দ্র বাবুর সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য আমরা সেই আনন্দ আরও সুন্দররূপে উপভোগ করিলাম; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তবে তিনি যে ২১৷২২ খানা মহাভারত লইয়া এই একটা প্রবন্ধে হট্টগোল করিয়াছেন, ইহা তত সুবিবেচনা সঙ্গত হয় নাই। উহার এক এক খানি লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করুন, বিভিন্ন মহাভারতের বিষয়ে আরও বিশদ করিয়া বলুন, আমরা আরও তৃপ্ত হইয়া শুনিব। তিনি যেরূপ যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে আজ এই বাইশ খানি মহাভারতের কথা আমাদিগকে শুনাইলেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং রাত্রির আধিক্য বশতঃ কিরণ বাবুর প্রবন্ধ এই অধিবেশনে স্থগিত রহিল।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, মহাশয় নগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—অদ্য যে কবিবর ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক অদ্য সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, আশা করি অতঃপর যে দিন ঐ প্রবন্ধ পঠিত হইবে, সেই দিনও তিনি আসিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার দাতাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় উহার সমর্থন করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল,—

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি— | ( ১ ) বিবেক বিলাস নাটক। |
| | ( ২ ) ত্রিদিব-বিজয়। |
| „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর— | ( ১ ) ধ্যান ভঙ্গ। |
| | ( ২ ) হঠাৎ নবাব। |
| | ( ৩ ) অলীক বাবু। |
| | ( ৪ ) উত্তর চরিত। |

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল— (১) কনকাঞ্জলি।
(২) প্রদীপ।

„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর— (১) মেঘদূত।
(২) বোম্বাই চিত্র।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষৎকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, বিশেষজ্ঞদিগের উপর অধ্যায় বিশেষ রচনার ভার দেওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার নিয়মাদি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা হউক। বাঙ্গালা ভাষার আকার কিরূপ হইলে ভাল হয় তাহার আলোচনা হউক। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সহিত ইহার সম্বন্ধ বা ঐক্য নির্ণীত হউক। সখারামবাবু মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সহিত ব্যাকরণ ও ভাব মিলাইয়া আলোচনা করিতে পারেন। এজন্য প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে শব্দকোষ সংগৃহীত হওয়াও আবশ্যক। আমি জানি না পরিষৎ এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিয়াছেন কি না।

সম্পাদক যতীন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে পূর্ব্ববৎসরের ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যাদি বিবৃত করিলেন এবং জানাইলেন, এই সমিতি হইতে ব্যাকরণ ও পদন্যাস প্রকরণ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন প্রেরিত হইয়াছিল ও তাহাদের যে সকল উত্তর আসিয়াছে সংক্ষেপে তাহা শুনাইলেন। তৎপরে ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি যে কারণে যে রূপে ও যে উদ্দেশ্যে গত বৎসরের শেষাংশে ভাষাবিজ্ঞানসমিতি নামে পুনর্গঠিত হইয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং যাহাতে এই সমিতির কার্য্য এ বৎসর অগ্রসর হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলেন।

অবশেষে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটী বিশেষ সভার অনুষ্ঠান প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সমর্থন করিয়া বলিলেন, আগামী ১৭ই আষাঢ় রবিবারেই এই বিশেষ সভা হউক, কারণ এ বিষয়ে কালবিলম্ব না করাই প্রশস্ত। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। হীরেন্দ্র বাবু তৎপরে আরও প্রস্তাব করিলেন, ঐ দিন পরিষদের সুবিধার্থ বিশেষাধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনও হউক, তাহা হইলে কবি বিহারিলাল ও সুরেন্দ্রনাথ নামক প্রবন্ধটীও শুনিতে আমাদের অধিক বিলম্ব করিতে হইবে না। এই প্রস্তাবও সমর্থিত ও গৃহীত হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,
সভাপতি।
১৭ই আষাঢ়, ১৩০৭।

সপ্তম ভাগ ] [ তৃতীয় সংখ্যা।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

## কমলাকর ভট্ট।

কমলাকর ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী নগরের প্রসিদ্ধ ভট্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ও মাতার নাম উমা দেবী। তিনি বিশ্বামিত্রগোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম নারায়ণ ভট্ট। এই নারায়ণের পিতার নাম রামেশ্বর এবং পিতামহের নাম গোবিন্দ ভট্ট। গোবিন্দ ভট্ট হইতে কমলাকর চারি পুরুষ অন্তর। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রীয় ভট্ট ব্রাহ্মণ কুলে গোবিন্দের জন্ম হয়। গোবিন্দ ভট্ট পুনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দ পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত আপনার জন্মস্থান পুনা নগর পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বারাণসীতে আগমন করেন। সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের উপদ্রবে গোবিন্দ ভট্ট জন্মভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া কাশীতে উপনিবিষ্ট হন। গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত ভট্টবংশে অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবির্ভূত হন। গোবিন্দ ভট্টের রচিত "বৃহস্পতি-সব-প্রয়োগ" নামে স্মৃতি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভট্টবংশ বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ও স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

"বৃহস্পতিসবস্থাস্য কৃতঃ সংক্ষেপতো ময়া।
অভ্যধায়ি প্রয়োগোঽয়ং গোবিন্দেন মনীষিণা॥"

কমলাকর ভট্ট অতি বিখ্যাত স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। তিনি বহুতর স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত "নির্ণয়সিন্ধু" ও "বিবাদতাণ্ডব" অদ্যাপি বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত রহিয়াছে। কমলাকর ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র নীলকণ্ঠ ভট্ট উভয়েই সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। উভয়েই স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিবিধ পুস্তক রচনা করিয়া, আপনাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, গবেষণা ও লিপি-চাতুর্য্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। উভয়ের প্রণীত গ্রন্থই বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে অতি প্রামাণিক বলিয়া অদ্যাপি প্রতি হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত রহিয়াছে। নন্দ পণ্ডিত, মিত্র মিশ্র এবং বালকৃষ্ণ ভট্ট—কমলাকর ও নীলকণ্ঠ ভট্টের সমসাময়িক গ্রন্থকার। আমরা বহু

আয়াসে কমলাকর ও নীলকণ্ঠ ভট্টের যে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রদান করিয়া, কমলাকর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের রচিত গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করিব। এই বংশাবলীর সাহায্যে পরবর্ত্তী বিবরণ সুখবোধ্য হইবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশাবলীতে পৌর্ব্বাপর্য্য বিষয়ে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা হইতে বৈবাহিক সম্পর্কে সম্বদ্ধ সমসাময়িক দুইটী বিভিন্ন ভট্টবংশের বিবরণ জানা যাইতেছে। নীলকণ্ঠের দুহিতা গঙ্গাদেবী ভরদ্বাজগোত্রীয় বালকৃষ্ণ ভট্টের পুত্র মহাদেব ভট্টের সহিত পরিণীতা হয়েন। মহাদেব ভট্টের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ ও অধস্তন দুই পুরুষের নাম সংগৃহীত হইয়া এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এবংবিধ বংশাবলী যত অধিক সঙ্কলিত হইবে, সেই পরিমাণে ঐতিহাসিক জ্ঞান সমধিক বিস্তারিত হইলে, সাহিত্যের অন্ধকারাবৃত অংশ আলোকিত করিবে। এরূপ বংশমালা সংস্কৃত সাহিত্যে বড়ই বিরল ও দুষ্প্রাপ্য।

গোবিন্দ ভট্টের পুত্র রামেশ্বর 'ধর্ম্মরত্নাকর' নামক গ্রন্থে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় যাবতীয় কার্য্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি শৈব ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামেশ্বর বারাণসী নগরে আবির্ভূত হন। মৈথিল স্মার্ত্ত চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের স্মৃতি গ্রন্থের অনুকরণে রামেশ্বর 'রত্নাকর' নাম দিয়া থাকিবেন।

"নত্বা গৌরীশ্বরীং দেবীং হরং বিঘ্নহরং তথা।
রামেশ্বরেণ ক্রিয়তে ধর্ম্মরত্নাকরো মুদে॥

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় ভট্ট-শ্রীরামেশ্বরবিরচিতো ধর্ম্মরত্নাকরঃ সমাপ্তঃ।" ( ধর্ম্মরত্নাকর )

রামেশ্বর ভট্টের পুত্র নারায়ণ ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারাণসী নগরে

বর্ত্তমান ছিলেন। "তত্ত্বকমলাকরে" কমলাকর ভট্ট স্বীয় পিতামহ নারায়ণ ভট্টকে 'মীমাংসক'ও 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। স্বপ্রণীত "জলাশয়োৎসর্গবিধি" গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট আপনার পূর্ব্বতন স্মৃতিকার লক্ষ্মীধর ও শূলপাণি ভট্ট এবং মৈথিল স্মার্ত্ত হরিনাথ উপাধ্যায়ের জলাশয়োৎসর্গ সম্পর্কে অভিমতের সমালোচনা করিয়া তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে হরিনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর ও অনিরুদ্ধ ভট্ট সমসাময়িক গ্রন্থকার। চণ্ডেশ্বরের শিষ্য রুদ্রধর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। রুদ্রধরের পর ও হরিনাথের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীদত্ত মিথিলায় আবির্ভূত হন। হরিনাথের পর বাচস্পতি মিশ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মলাভ করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মিশরু মিশ্র, বর্দ্ধমান মিশ্র, মহেশ ও দেবনাথ ঠক্কুর মিথিলায় আবির্ভূত হন। সোম ভট্টের ছাত্র দেবনাথ ঠক্কুর তর্কপঞ্চানন স্বপ্রণীত "অধিকরণ কৌমুদী" নামক মীমাংসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থে পূর্ব্বতন মৈথিল স্মার্ত্ত গ্রন্থকারদিগের উল্লেখ করিয়াছেন।

"পুরাণমজরং দেবং কামদং কামরূপিণম্।
অনিদানং নিদানস্তং যোগিনং ভোগিনং নুমঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেঽধিকরণং বিচারেষূপকারকম্।
বিদুষা দেবনাথেন নির্ব্বন্ধেন নিবধ্যতে॥
রত্নাকরে কল্পতরৌ শ্রীদত্ত-হরিনাথয়োঃ।
বাচস্পতৌ নিগূঢ়ং যৎ তন্ময়বক্ষি গুরুক্রমাৎ॥
সোমভট্টোপদিষ্টেন পথা সঞ্চরতো মম।
মীমাংসা-বিষয়ারণ্যে শরণং বত ভারতী॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়দেবনাথঠক্কুরনির্ম্মিতা অধিকরণকৌমুদী সমাপ্তা।"

নারায়ণ ভট্ট স্বরচিত "জলাশয়োৎসর্গবিধি" গ্রন্থের আরম্ভে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'ত্রিস্থলীসেতু' নামে তীর্থযাত্রা বিষয়ক গ্রন্থের আরম্ভে এই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে *। 'গয়াকৃত্য' নামক পুস্তক উক্ত ত্রিস্থলীসেতুরই অন্তর্ভুক্ত।

"সরস্বতীং নমস্যামঃ প্রত্যূহব্যূহ-হানয়ে।
যদেকজ্ঞানচিন্তানাং স্থিতেঃ সঞ্চিতিরুত্তমা॥

* Dr. R L. Mitras '*Notices of Sanskrit Mss*,' V. 146, VII. 50, and II. 202 IV. 166.

বিঘ্নাধিপং নমস্তভ্যং বিঘ্নসঙ্ঘ-বিঘাতয়ে।
প্রবন্ধং রচয়াম্যুচ্চৈর্বুদ্ধিশুদ্ধিং বিধেহি মে ॥
বিশ্বামিত্রকুলোদধৌ বিধুরিবাখণ্ডঃ কলানাং নিধিঃ
বাগ্‌গুম্ফে নিখিলেঽপি যস্ত বসুধা শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈশ্চিতা।
বিদ্যাপদ্ম-বিকাশনৈক-তরণিঃ শ্রীভট্টগোবিন্দজঃ
সংখ্যাবদ্-গণনাগ্রণীর্বিজয়তে শ্রীভট্টরামেশ্বরঃ ॥
শ্রিতা বারাণসী তেন নগরী ন গরীয়সী।
যতোঽস্তনগরী হেমনগরীতিমুপেয়ুষী ॥
শাস্ত্রেষধীতী পিতুরেব যঃ শ্রুতীঃ
স্মৃতীঃ সমালোক্য চ দেশরীতীঃ।
নারায়ণস্তত্তনয়োঽ বিমুক্তে
জলাশয়োৎসর্গবিধিং বিধত্তে ॥
যদ্যপীহ বুধোম্নীতা গ্রন্থাঃ সন্তি পরঃ শতাঃ।
তথাপীহ বিশেষো যঃ পণ্ডিতৈঃ স বিবিচ্যতাম্ ॥

ইতি ভট্টরামেশ্বরসূনু নারায়ণভট্টবিরচিতো জলাশয়োৎসর্গবিধিঃ সমাপ্তঃ।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই নারায়ণ ভট্টকে "বেণীসংহার-নাটক" প্রণেতা শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্ট নারায়ণের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। * ভট্ট নারায়ণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা আদিশূরের সভায় অবস্থিতি কালে "বেণীসংহার-নাটক" রচনা করেন। তিনি কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনীত ও উপনিবিষ্ট হন। ভট্ট নারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পুত্র। এই নারায়ণ ভট্ট বিশ্বামিত্রগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বরের পুত্র। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারাণসী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ধর্ম্মরত্নাকর' ও 'প্রয়োগরত্ন' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

"ভট্ট-রামেশ্বরসুতো ভট্টনারায়ণঃ সুধীঃ
নত্বা শিবৌ সংবিচার্য্য কুরুতেঽন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিম্ ॥"
"ভবানীশঙ্করৌ নত্বা ভট্টরামেশ্বরাত্মজঃ।
ভট্ট-নারায়ণঃ কাশীং বিবিনক্তি সদুক্তিভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিদ্বন্মুকুটমাণিক্যমাণিক্যালঙ্কারশ্রীমদ্ভট্টরামেশ্বরসূরি-সূনু-নারায়ণ-ভট্ট-বিরচিতে ত্রিস্থলীসেতৌ কাশীপ্রকরণে তন্মরণমুক্তিবিচারঃ।"

---

* *Ibid.* III. 334.

নারায়ণ ভট্টের রচিত স্মৃতি গ্রন্থের সাধারণ নাম 'পদ্ধতি'। তাঁহার রচিত 'অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতি', 'রুদ্রপদ্ধতি', 'ঔর্দ্ধদেহিক পদ্ধতি', এবং 'শ্রীমচ্ছাস্ত্রপ্রয়োগ পদ্ধতি' পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ তাঁহার রচিত 'প্রয়োগরত্নে'র অন্তর্গত।

"ভট্টরামেশ্বরসুতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
প্রণম্য রামং তনুতে রুদ্রানুষ্ঠানপদ্ধতিম্॥
রামেশ্বরভট্টাত্মজ-নারায়ণসূরিণা কাশ্যাম্।
কর্ম্মঠসজ্জন-তুষ্ট্যৈ রুদ্রানুষ্ঠানপদ্ধতী রচিতা॥
গ্রন্থাননেকানালোচ্য বিচার্য্য সদসচ্চ যঃ।
কৃতঃ শ্রমস্তেন বিভুঃ শঙ্করঃ প্রীয়তাং মম॥"

রুদ্রপদ্ধতি।

"ভট্টরামেশ্বরসুতো ভট্টনারায়ণঃ সুধীঃ।
ব্যধত্ত রুচিরাং কাশ্যামৌর্দ্ধদেহিকপদ্ধতিম্॥
আশ্বলায়নমার্গেণ সন্তি পদ্ধতয়ঃ শতম্।
তাভ্যস্তস্য বিশেষো যঃ পণ্ডিতৈঃ সোঽবধার্য্যতাম্॥

ইতি শ্রীমদ্বিদ্বন্মুকুটমাণিক্যহীরাঙ্কুরশ্রীমদ্রামেশ্বরভট্টসূনু-শ্রীমদ্ভট্টনারায়ণ-কৃতে প্রয়োগরত্নে ঔর্দ্ধদেহিকপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।"

অপর এক নারায়ণ ভট্ট শত অধ্যায়ে 'সাধনদীপিকা' রচনা করেন। প্রতি অধ্যায়ের নাম 'প্রকাশ'। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। এই নারায়ণ ভট্ট বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত বহুতর উপনিষদের 'দীপিকা' নামে ভাষ্য বিদ্যমান আছে। তিনি কান্যকুব্জাগত শাণ্ডিল্যগোত্রজ বল্লালী কুলীন মহেশ্বরের বংশধর সঙ্কেতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অনুমিত হয় না। এই নারায়ণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য হইতে অষ্টম ঊর্দ্ধতন পুরুষ।

শাণ্ডিল্যগোত্রজ অপর এক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনন্দনের সময়ে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই নারায়ণই 'সাধনদীপিকা' রচনা করেন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি চৈতন্যদেবের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। নারায়ণের পিতার নাম শঙ্কর।

"শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দং সচ্চিদানন্দরূপিণম্।
বন্দে গুরুং কৃপাসিন্ধুং বৈষ্ণবাচারসিদ্ধয়ে॥
সদাচারাবিরোধেন মন্ত্রশাস্ত্রানুসারতঃ।
সাধনস্য হি ভাবস্য দীপিকেয়ং —ভ্যতে॥

শঙ্করং শঙ্করং নত্বা সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিনম্।

সেবিনং সর্ব্বধর্ম্মাণাং কান্তকুব্জকুলোদ্ভবম্॥

বক্ষ্যে প্রকাশ এতস্মিন্ গুরুশিষ্যাদিলক্ষণম্॥

ইতি নারায়ণভট্টবিরচিতায়াং সাধনদীপিকায়াং সমুচ্চয়ো নাম সপ্তমঃ প্রকাশঃ।"

এই নারায়ণের পুত্র কৃষ্ণদেব স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের অনুকরণে "কৃত তত্ত্ব", "শুদ্ধিসার" এবং "প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী" রচনা করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের শেষভাগে কৃষ্ণদেব আপনার বৈষ্ণবত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চৈতন্য দেবের বিখ্যাত উক্তি 'প্রায়শ্চিত্তকৌমুদীর' শেষভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে কৃষ্ণদেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন।

নমস্কৃত্যাখিলৈর্ব্বেদৈর্ব্বন্দ্যং শ্রীপরমেশ্বরম্।

তন্যতে কৃষ্ণদেবেন প্রায়শ্চিত্তস্য কৌমুদী॥

অত্র চ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

প্রায়শ্চিত্ত-কৌমুদী।

"বেদান্তবেদ্যং শ্রীরামং প্রণম্য সম্মুদে ময়া।

বালানাং সুখবোধায় শুদ্ধিসারো বিতন্যতে॥

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকৃষ্ণদেবস্মার্ত্তবাগীশভট্টাচার্য্যকৃতৌ শুদ্ধিসারঃ সমাপ্তঃ।"

স্বরচিত কৃত্যতত্ত্বে কৃষ্ণদেব রঘুনন্দনের প্রণীত তিথিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

"বেদান্তবেদ্যং শ্রীরামং প্রণম্য সম্মুদে ময়া।

ক্রমাৎ দ্বাদশমাসেষু কৃত্যতত্ত্বং প্রচক্ষতে॥

নারায়ণো বন্দ্যকুলাগ্রজন্মা

তস্যাত্মজঃ শ্রীযুতকৃষ্ণদেবঃ।

প্রণম্য রামস্য পদারবিন্দং

প্রয়োগসারং কুরুতেঽব্দসম্ভবম্॥

তিথিতত্ত্বেষু সন্দেহং প্রমাণজ্ঞাস্তু কোবিদৈঃ।

বৈশাখাদিক্রমেণৈব প্রয়োগোঽত্র নিবধ্যতে॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদেবস্মার্ত্তবাগীশকৃতে কৃত্যতত্ত্বে প্রয়োগসারে দোলযাত্রাপদ্ধতিঃ। সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।" (কৃত্যতত্ত্ব)

মহাদেব নামে নারায়ণভট্টের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই মহাদেবের পুত্র দিবাকর-ভট্ট "স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। অন্য এক দিবাকর নীলকণ্ঠের "দানচন্দ্রিকায়" তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম গঙ্গা ও পিতার নাম মহাদেব। রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ ও শঙ্কর নামে নারায়ণ ভট্টের তিন পুত্র জন্মে। নারায়ণভট্টের পত্নীর নাম লক্ষ্মী। বঘেলবংশীয় রাজা ভাবসিংহের আদেশে লক্ষ্মণভট্ট "হোত্রকল্পদ্রুম" নামে বৈদিক যাগযজ্ঞ বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক পাঁচ কুসুমে বিভক্ত।

নত্বা হেরম্বমীশং গিরিবরতনয়াং ক্ষেমহেতু গুরূ তৌ
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যাবপি নিজপিতরৌ লক্ষ্মণঃ শাস্ত্রদর্শী।
প্রীত্যার্থং হোত্রকল্পদ্রুমমিহ বিবুধস্বান্তবৃন্দৈর্বিধত্তে
লব্ধানুজ্ঞাং বঘেলান্বয়-জলধি-বিধোর্ভাবসিংহস্য রাজ্ঞঃ॥
প্রণম্য শারদাং দেবীং পিতৃব্যচরণৌ তথা।
বিচার্য্য সূত্ররত্নাদি কুর্ব্বে হোত্রস্য সংগ্রহম্॥

ইতি শ্রীমদবঘেলবংশাবতংস-সিদ্ধি-শ্রীভাব-সিংহদেবকারিতে ষড়্‌দর্শনবিন্নারায়ণভট্টাত্মজ-লক্ষ্মণভট্টকৃতে হোত্রকল্পদ্রুমে অগ্নিষ্টোমে সুত্যাকাণ্ডং নাম পঞ্চমং কুসুমম্।

নারায়ণভট্টের অন্যতম পুত্র শঙ্কর ভট্ট নীলকণ্ঠ ভট্টের পিতা। পার্থসারথি মিশ্রের কৃত মীমাংসাশাস্ত্রীয় 'শাস্ত্রদীপিকা' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে শঙ্কর ভট্ট 'প্রকাশ' নামে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি আপনার জনক নারায়ণভট্টকে পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ ও মীমাংসা-দ্বৈতনির্ণয়াবিৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্রিমল্লভট্ট বৈদ্যের পুত্র অপর এক শঙ্কর ভট্ট পাঁচ পরিচ্ছেদে 'রসপ্রদীপ' নামে খণ্ডকাব্য রচনা করেন।

ত্রিমল্লভট্টবৈদ্যস্য তনুজঃ শঙ্করঃ কৃতী।
বিবিধান্ গ্রন্থান্ সমালোচ্য তনোতি রসদীপকম্॥

(রসদীপক)

নারায়ণের পুত্র শঙ্করভট্টের রঙ্গনাথ, দামোদর, নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠ নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। নৃসিংহ ভট্ট দত্তকপুত্র গ্রহণ সম্পর্কে 'দত্তকপুত্রবিধান' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ডাক্তার জলির মতে শঙ্কর ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বারাণসী নগরে আবির্ভূত হইয়া "দ্বৈতনির্ণয়" নামে মীমাংসাগ্রন্থ রচনা করেন।

আশ্বলায়নের গৃহ্য সূত্র অবলম্বনে রামকৃষ্ণভট্ট 'বাস্তুশান্তি' মীমাংসা শাস্ত্রীয় অধিকরণ কৌমুদী' ও স্মৃতিশাস্ত্রীয় 'জীবৎপিতৃকর্ত্তব্যসংগ্রহ' রচনা করেন। কমলাকর ভট্ট 'কার্ত্তবীর্য্যার্জুনদীপদানপ্রয়োগ' রচনা করেন।

শ্রীভট্টরামেশ্বরসূরিসূনু-শ্রীভট্টনারায়ণসূরিসূনুঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণঃ স্বধিয়া ব্যধত্ত, জীবে পিতর্য্যাত্মজকার্য্যশুদ্ধিম্ ॥

( জীবৎপিতৃকর্ত্তব্যসঞ্চয় )

শ্রীমন্নারায়ণাখ্যাৎ সমজনি বিবুধো রামকৃষ্ণাভিধানঃ
তৎ-সূনুঃ সর্ব্ববিদ্যাম্বুধিনিজচুলুকীকারতঃ কুম্ভজন্মা।
দৃষ্ট্বা নানা-নিবন্ধান্ ব্যরচয়দতুলং গ্রন্থমজ্ঞাকরাখ্যং
পিত্রোঃ পাদাব্জসঙ্গো রঘুপতিপদয়োঃ স্বাশ্রয়ং প্রার্থয়ংশ্চ ॥

( কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনদীপদানপ্রয়োগ )

নন্দসূনুং নমস্কৃত্য সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরম্।
নিরূপ্যতেঽধিকরণং রামকৃষ্ণেণ বিশ্রুতম্ ॥

কমলাকর ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম দিনকর ভট্ট। দিনকর 'দিনকরোদ্যোত' নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই পুস্তক তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বিশ্বেশ্বর ভট্টের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। বিশ্বেশ্বরের অপর নাম গাগাভট্ট। তিনি মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত নরপতি ছত্রপতি শিবাজীর (১৬২৭—৮০ খৃঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'দিনকরোদ্যোতের' অন্তর্গত 'অশৌচকাণ্ডে' বিশ্বেশ্বরভট্ট এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম প্রভাদেবী।

মীমাংসৈকধুরন্ধরঃ শ্রুতিধরঃ ন্যায়েঽপি বাগীশ্বরঃ।
সাহিত্যামৃতসাগরঃ সুজনতাবল্লী-রসালদ্রুমঃ।
যং বিদ্বচ্ছিখরো দিনকরঃ প্রাসূত বিশ্বেশ্বরং
তেনাশৌচনিবন্ধনো দিনকরোদ্যোতোঽধুনা পূর্য্যতে ॥
অথাপদ্যসভাধ্যক্ষ নিবহানন্দদায়িনী।
শিব-ছত্রপতের্ভূয়াচ্ছিবদ্যুমণিদীপিকা ॥

ইতি শ্রীমদ্-বিদ্বৎকুটমণিক-মরীচি-মঞ্জরীপুঞ্জ-পিঞ্জরিত-পদদ্বন্দারবিন্দ-শ্রীনারায়ণভট্টসূরিসূনু-রামকৃষ্ণভট্টাত্মজ-ভট্টদিনকর-তনয়-গাগাভট্টাপরনামক-বিশ্বেশ্বরভট্টপরিপূরিতে দিনকরোদ্যোতে অশৌচকাণ্ডে দ্রব্যশুদ্ধিবিচারঃ শুদ্ধ্যোদ্যোতঃ সমাপ্তঃ।

মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসা সূত্র অবলম্বনে, বিশ্বেশ্বর ভট্ট "মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি" রচনা করেন।

"উমামহেশসদৃশৌ লক্ষ্মীনারায়ণাবিব।
প্রভাদিবাকরসমৌ পিতরৌ সমুপাস্মহে॥
মীমাংসাকুসুমানামঞ্জলিরেষোঽঙ্কল্যা দত্তঃ।
শ্রীরামপাদলগ্নো বাসেন দিশঃ কৃতার্থয়তু॥
বিশ্বেশ্বরাপরাখ্যস্ত গাগাভট্টমনীষিণঃ।
কৃতিঃ করোতু কৃতিনাং হৃদয়ে বাসমাদরাৎ॥"

(মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি)

ভট্ট নীলকণ্ঠের পুত্র দিনকর ভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দিনকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ। দিনকর ভট্ট সতীদেবীর গর্ভে জন্মলাভ করেন দিনকরের ভগিনী গঙ্গাদেবী ভরদ্বাজ গোত্র মহাদেব ভট্টের সহিত পরিণীতা হন। দিনকর ভট্ট 'ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীদীপিকা' রচনা করেন। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের প্রণীত 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ও তাহার ভাষ্য 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' অবলম্বনে, দিনকরের 'দীপিকা' রচিত হয়। নৈয়ায়িক সমাজে ইহা 'দিনকরী টীকা' নামে পরিচিত।

"ভানুং প্রণম্য পরিভাব্য চ শাস্ত্রসারং
মুক্তাবলীকিরণ এব পিতৃপ্রদিষ্টঃ।
সদ্ব্যক্তিভির্দিনকরেণ করেণ সোঽয়ং
নীতঃ প্রকাশপদবীং সুধিয়াং মুদেঽস্তু॥
মুক্তাবলীপ্রকাশোঽয়মজ্ঞানতিমিরাপহঃ।
তেন সন্তোষমায়াতু নীলকণ্ঠঃ সতীপ্রিয়ঃ॥"

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কমলাকর ভট্টের রচিত "নির্ণয়সিন্ধু" ও "বিবাদতাণ্ডব" অদ্যাপি বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত ও সম্মানিত রহিয়াছে। এই সকল পুস্তকে বিজ্ঞানেশ্বরের প্রণীত সুবিখ্যাত 'মিতাক্ষরা'র মত গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। কমলাকর আপনার সমসাময়িক স্মার্ত্ত বারাণসীবাসী নন্দ পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ করিয়া তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'সংস্কারপদ্ধতি' গ্রন্থে কমলাকর ভট্ট হরদত্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণতনয়ঃ কমলাকরসংজ্ঞিতঃ।
শ্রীরামং পিতরৌ নত্বা সংস্কারান্ বক্তি সাম্প্রতম্॥"

(সংস্কার পদ্ধতি)

"প্রণম্য রামং পিতরং কমলাকরশর্ম্মণা।
রামকৃষ্ণাত্মজেন শূদ্রধর্ম্মো বিতন্যতে॥"

( শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব )

"শ্রীরামং পিতরৌ নত্বা কমলাকরশর্ম্মণা।
অর্থশব্দৌ নিরূপ্যাথ শাস্ত্রতত্ত্বং নিরূপ্যতে॥"

"ইতি শ্রীজগদ্গুরু-মীমাংসক-নারায়ণভট্ট-সূনু-রামকৃষ্ণভট্টাত্মজ-কমলাকরভট্টকৃতে তত্ত্বকমলাকরে প্রথমোঽধ্যায়ঃ। শুভমস্তু। সংবৎ ১৬৯৪ সময়ে চৈত্র সুদি ৪বার শুক্রে বারণস্যাং।" (তত্ত্বকমলাকর)। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ১৬৯৪ সংবৎ (১৬৩৮ খৃঃ) চৈত্রী শুক্ল চতুর্থীতে শুক্রবারে ইহা লিখিত হয়।

"নারায়ণাত্মজশ্রীমদ্রামকৃষ্ণস্য সূনুনা।
কমলাকরসংজ্ঞেন পূর্ত্তং সম্যগিহোচ্যতে॥"

( পূর্ত্তকমলাকর )

'শান্তিরত্নে' কমলাকর ভট্ট চণ্ডীপাঠ ও দেবীর পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি স্ব-প্রণীত "নির্ণয়সিন্ধু"র উল্লেখ করিয়াছেন।

"নত্বা সীতাপতিং রামং ভবাব্ধিতরণে তরিং।
গৃহস্থানাং হিতার্থায় শান্তিরত্নং বিতন্যতে॥
শ্রীমন্নারায়ণাখ্যাৎ সমজনি বিবুধো রামকৃষ্ণাভিধানঃ
তৎসূনুঃ সর্ব্ববিদ্যাজলনিধিনিচুলীকারতঃ কুম্ভজন্মা।
দৃষ্ট্বা নানানিবন্ধান্ ব্যরচয়দতুলং গ্রন্থমস্তাকরাখ্যং
পিত্রোঃ পাদাব্জভৃঙ্গো রঘুপতিপদয়োঃ সংশ্রয়ং প্রাপ্য যত্নাৎ॥
যো ভাট্টতন্ত্রগহনার্ণবকর্ণধারঃ
শাস্ত্রান্তরেষু নিখিলেষু চ মর্ম্মবেত্তা।
সোঽত্র শ্রমোঽস্তি বিহিতঃ কমলাকরেণ
প্রীতোঽমুনাস্তু সুকৃতী বুধরামকৃষ্ণঃ॥"

( শান্তিরত্ন )

"শ্রীরামকৃষ্ণপিতরং নত্বোমাখ্যাঞ্চ মাতরম্।
কমলাকরসংজ্ঞেন তীর্থযাত্রা বিবিচ্যতে॥"

( তীর্থকমলাকর )

এই তীর্থকমলাকরে 'দানকমলাকরের' উল্লেখ আছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে কমলাকর রামকৃষ্ণের ঔরসে ও উমাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'তত্ত্বকমলাকরের' শেষভাগে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে উহা লিখিত হয়। ইহা হইতে কমলাকর ভট্টের অধস্তন আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। কমলাকর ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন না, এই সত্য ইহা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে।

হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের রচিত স্মৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে, কমলাকর ভট্ট 'নির্ণয়সিন্ধু' বা 'নির্ণয়কমলাকর' রচনা করেন। ইহাতে বিস্তারিত ভাবে তিনি আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে 'মিতাক্ষরা'র মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে কমলাকর এক শ একত্রিশ জন প্রাচীন স্মৃতিকার ঋষির মতামত আলোচনা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর সংহিতায় বিশ জন স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষির নাম দেখা যায়।

শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা চৌশনশাঃ শ্রুতাঃ॥
অত্রেবিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষাদঙ্গিরসস্তথা॥
শাতাতপাচ্চ হারীতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যাত্তথৈব চ।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসান্মুনেঃ।
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ॥

(পরাশর সংহিতা)

পরাশরের নির্দ্দিষ্ট কশ্যপ, গর্গ ও প্রচেতার পরিবর্ত্তে, যাজ্ঞবল্ক্য যম, ব্যাস ও বৃহস্পতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো-
যমাপস্তম্ব-সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ॥
পরাশরো ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি)

পৈঠীনসি ছত্রিশ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

তেষাং মন্বঙ্গিরো-ব্যাস-গোতমাত্র্যুশনো-যমাঃ।
বশিষ্ঠো দক্ষ-সংবর্ত্ত-শাতাতপ-পরাশরাঃ ॥
বিষ্ণ্বাপস্তম্ব-হারীতাঃ শঙ্খঃ কাত্যায়নো ভৃগুঃ।
প্রচেতা নারদো যোগি-বৌধায়ন-পিতামহাঃ ॥
সুমন্তুঃ কাশ্যপো বভ্রুঃ পৈঠীনো ব্যাঘ্র এব চ।
সত্যব্রতো ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কার্ষ্ণাজিনিস্তথা ॥
জাবালির্জমদগ্নিশ্চ লৌগাক্ষিব্রহ্মসম্ভবঃ।
ইতি ধর্ম্মপ্রণেতারঃ ষট্‌ত্রিংশদৃষয়স্তথা ॥

পদ্মপুরাণে অত্রির নাম পাওয়া যায় না। মরীচি, পুলস্ত্য, প্রচেতা, ভৃগু, নারদ, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দেবল, ঋষ্যশৃঙ্গ, গর্গ, বৌধায়ন, পৈঠীনসি, জাবালি, সুমন্ত, পারস্কর, লৌগাক্ষি ও কৌথুমীর নাম দেখা যায়। 'সংস্কার কৌস্তুভ' নামক স্মৃতি গ্রন্থে কমলাকর ভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী অনন্তদেব এক শ চারি জন স্মৃতিকার ঋষির নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থে কমলাকর ভট্ট এক শ একত্রিশ জন স্মৃতি-প্রণেতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬৬৮ সংবৎ অব্দে ( ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ) কমলাকর ভট্ট কর্ত্তৃক "নির্ণয়সিন্ধু" তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ১৫৭২ খৃঃ ( ১৬২৯ সংবৎ ) এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর মতে ১৬৬৮ সংবৎ ( ১৬১১ খৃঃ ) কমলাকর ভট্টের নির্ণয়-সিন্ধু রচিত হয়। এই উভয় মতই ভ্রমাত্মক ও অমূলক। 'নির্ণয়সিন্ধু'র নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে জানা যাইতেছে যে কমলাকর ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী নগরে মহারাষ্ট্রীয় বিশ্বামিত্র-গোত্রজ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ এবং মাতার নাম উমা দেবী। 'নির্ণয়সিন্ধু' হইতে কমলাকর ভট্টের বিস্তারিত পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ ও সপ্তম পুরুষ অদ্যাপি বারাণসী নগরে বাস করিতেছেন।

*কারুণ্যৈকনিকেতং রামং সীতালতাযুক্তং।
বিশ্বামিত্রান্বয়ব্রততি-সমালম্বশাখিনং বন্দে ॥
বেদার্থধর্ম্মরক্ষার্থৈ মায়ামানুষরূপিণম্।
পিতামহং হরিং বন্দে ভট্টনারায়ণাহ্বয়ম্ ॥

* Dr. R. L. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. X. 323. Raj kumar Sarvadhikari's *Tagore Law Lectures*, p. 406-408.

যৎপাদসংস্মৃতিঃ সর্ব্বমঙ্গলপ্রাপ্তিভূর্মতা।
তান্ ভট্টরামকৃষ্ণাখ্যান্ শ্রীতাতচরণান্নুমঃ॥
সর্ব্বকল্যাণ-সন্দোহ-নিদানং যৎপদদ্বয়ম্।
ধ্যানদীসোদরামম্বাম্নুমাখ্যাং নৌমি সাদরম্॥
বিন্দুমাধব-পাদাব্জমালম্বীকৃতবিগ্রহম্।
জ্যায়াংসং ভ্রাতরং ভট্টদিবাকরমুপাস্মহে॥
হেমাদ্রি-মাধব-মতে প্রবিচার্য্য সম্যগ্-
আলোচ্য তত্ত্বমথ তীর্থকৃতাং পরেষাম্।
শ্রীরামকৃষ্ণতনয়ঃ কমলাকরাখ্যঃ
কালে যথামতি বিনির্ণয়মাতনোতি॥
সোঃ ভাট্টতন্ত্রগহনার্ণবকর্ণধারঃ
শাস্ত্রান্তরেষু নিখিলেষপি মর্ম্মবেত্তা।
যোঽত্র শ্রমঃ কিল কৃতঃ কমলাকরেণ
প্রীতোঽমুনাস্তু সুকৃতী বুধরামকৃষ্ণঃ॥
শ্রীভট্টরামেশ্বরসূরিসূনু-
শ্রীভট্টনারায়ণসূরিসূনোঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণস্য সুতঃ কৃতীমং
ব্যধান্নিবন্ধং কমলাকরাখ্যঃ॥
নানানির্ণয়বত্ত্বান্নির্ণয়সিন্ধুঃ প্রোচ্যতাং বিবুধাঃ॥
নির্ণয়সরোজবত্ত্বান্নির্ণয়কমলাকরোঽপ্যস্তু॥
বসু-ধাতু-ঋতু-ভূ-মিতে গতেঽব্দে ( = ১৬৩৮ )
নরপতি-বিক্রমতোঽথ যাতি রৌদ্রে।
তপসি শিবতিথৌ সমাপিতোঽয়ং
রঘুপতিপাদসরোরুহেঽর্পিতশ্চ॥'

( নির্ণয়সিন্ধু )

রাজকুমার বাবু শেষোদ্ধৃত শ্লোকটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া, 'ধাতু' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ঋতু' শব্দ পাঠ করিয়াছেন। এই ভ্রান্ত পাঠের উদ্ধার দ্বারা, তিনি ১৬৬৮ সংবতে কমলাকর ভট্টের 'নির্ণয়সিন্ধু' রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোম্বের বিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় বিশ্বনাথ মাণ্ডলিকের প্রকাশিত সটীক মনুসংহিতার ভূমিকা অবলম্বনে রাজকুমার বাবু অতঃপর

কমলাকর ভট্টের বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে কমলাকরের বিস্তারিত বিবরণ সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বিবরণ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কমলাকর ভট্টের পিতৃব্যপুত্র নীলকণ্ঠ ভট্টের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

# বৈদিক সমালোচনা।

**তিন বেদ কি চারি বেদ।**—বেদের সংখ্যা চারিটি, অর্থাৎ ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এই চারি বেদে পদ্য, গদ্য এবং গান এই তিন প্রকার রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্য রচনার প্রাচীন নাম ঋক্, গদ্য রচনার প্রাচীন নাম যজুঃ, এবং গান রচনার প্রাচীন নাম সাম। সাম ত্রিবিধ—লেশগান, আবির্গান, ছন্নগান। যে সকল সামের মূল কেবল ঋক্ অর্থাৎ পদ্যমন্ত্র, অর্থাৎ কোন একটি পদ্যমন্ত্র গানে বাঁধিয়া যে সাম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে লেশগান বলে। যে সকল গানের মূল যজুঃ অর্থাৎ গদ্যমন্ত্র, তাহাদিগকে আবির্গান বলে। যে সকল সামের মূল ঋক্ ও যজুঃ মিশ্রিত, তাহাদিগকে ছন্নগান বলে। ঋক্ ও যজুঃ হইতে সাম উৎপন্ন করিবার বিস্তৃত নিয়মাবলী আছে। উক্ত তিন প্রকার রচনা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার রচনা পূর্ব্বকালেও ছিল না, এবং ইদানীন্তন কালেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং চারি বেদে যত মন্ত্র আছে, তাহাদের একটিও ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণাতিরিক্ত নহে। এই ত্রিবিধ রচনাবিশিষ্ট বলিয়াই বেদের আর একটি নাম ত্রয়ী; যথা শতপথ ব্রাহ্মণ (৪, ৬, ৭, ১):—ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি"; মীমাংসাদর্শন (২।১।৩২, ৩৩, ৩৪):—তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃশব্দঃ। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বেদের মন্ত্র ভাগেরই ত্রয়ীত্ব মুখ্য, ব্রাহ্মণ ভাগের ত্রয়ীত্ব গৌণ।

জ্ঞানার্থ বিদ্ ধাতু হইতে বেদশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং বেদ ও বিদ্যা একার্থবোধক। যথা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ (১, ১৭, ১-১০):—প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ * * * অগ্নেরৃচো বায়োর্যজূংষি সামাত্মাদিত্যাৎ। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ"। আদি সভ্য কালে এই ভারতবর্ষে যে সকল ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিবিধ বিদ্যার আধার ছিলেন; এই জন্য তাঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্রগুলি তৎকালে বেদনামে উক্ত হইয়াছিল। কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আবির্ভাব হইল, উহাদের ঋগাদিলক্ষণ না থাকিলেও বৈদিকমন্ত্র সকলের যাগাদিতে বিনিয়োগের অভিধায়ক বলিয়া উহারাও বেদনাম বাচ্য

হইল যথা যজ্ঞপরিভাষাসূত্র (৩৪) :— মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্। "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ (২।১৬৫)" এই মনুবচনে বেদশব্দে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বুঝাইতেছে।

বেদের আর একটি নাম শ্রুতি। বেদ চিরকাল গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসিতেছে, কেহ কখনও একটি মন্ত্রেরও প্রণয়নকাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। ব্রাহ্মণগ্রন্থের আবির্ভাবের পূর্ব্বের মন্ত্রসংহিতায় শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ কালের পর শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আম্নায়, ছন্দঃ, স্বাধ্যায়, আগম ও নিগম, এই সকল শব্দ বেদের অপর পর্য্যায়।

এই বেদগ্রন্থ ত্রিবিধ রচনাত্মক বলিয়া ত্রয়ীনামে প্রসিদ্ধ হইলেও যাগাদি কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ কালক্রমে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি নাম লাভ করিয়াছে। অথর্ব্বা নামক ঋষিই যজ্ঞাদি প্রক্রিয়ার প্রথম প্রকাশক এবং তিনিই পূর্ব্বোক্ত চারি নামে বেদকে বিভাগ করেন। যথা ঋক্‌সংহিতা (১।৮৩।৫) :—"যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্ততে"; ঋঃ সঃ (৭।৭৮।৫) :—"অগ্নির্জাতো অথর্ব্বণা", অথর্ব্বসংহিতা (৭।১।২) :— "অথর্ব্বাণং পিতরং দেববন্ধুং মাতুর্গর্ভং পিতরস্সুং যুবানম্। য ইমং যজ্ঞং মনসা চিকেত প্র ণো বোচস্তমিহেহ ব্রবঃ"। বৈদিক যজ্ঞে চারিজন প্রধান ঋত্বিক্ বৃত হইয়া থাকেন, যথা, হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা। হোতার ব্যবহার্য্য মন্ত্র সকল প্রায় সমস্তই ঋক্ অর্থাৎ পদ্যময়; দুই তিনটি যজুঃ অর্থাৎ গদ্যমন্ত্রও আছে; উক্ত ঋক্ সকল একত্রে নিবদ্ধ হইয়া যে গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে ঋক্‌সংহিতা বলে। উক্ত মন্ত্র সকলের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থের নাম ঋগ্‌ব্রাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থই এক্ষণে ঋগ্বেদ নামে প্রসিদ্ধ। অধ্বর্য্যুর ব্যবহার্য্য মন্ত্র সকল অধিকাংশই যজুঃ; কতকগুলি ঋক্‌ও আছে; ঐসকল ঋক্ ও যজুঃ একত্রে নিবদ্ধ হইয়া যজুঃসংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে; এবং উহাদের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থ যজুর্ব্রাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থই এক্ষণে যজুর্ব্বেদ নামে প্রসিদ্ধ। উদ্গাতার ব্যবহার্য্য মন্ত্র সকল ত্রিবিধ; সাম এবং ঐ সকল সামের মূলীভূত ঋক্ ও যজুঃ। উক্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম একত্র নিবদ্ধ হইয়া সামসংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উহাদের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থ সামব্রাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থই সামবেদনামে প্রসিদ্ধ। যাহারা কেবল ঋগ্বেদমাত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে ঋগ্বেদী বলে। যাঁহারা কেবল যজুর্ব্বেদমাত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে যজুর্ব্বেদী বলে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যজুঃ সংহিতাতে ঋক্‌ও আছে; সুতরাং যজুর্ব্বেদীদিগকে ঋক্‌ও জানিতে হয়, এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে দ্বিবেদী বা ভাষায় দবে বলে। যাঁহারা সামবেদমাত্র অধ্যয়ন অধ্যাপন ও ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে সামবেদী বলে। সামসংহিতায় সামের মূলীভূত ঋক্ ও যজুঃ উভয়ই আছে; সুতরাং সামবেদীদিগকে ঋক্ এবং যজুঃ ও জানিতে হয়, এবং সেই জন্য তাঁহাকে ত্রিবেদী বা ভাষায় ত্রিবাড়ী অথবা তিবারী বলে। হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার ব্যবহার্য্য ভিন্ন

আরও অনেকগুলি মন্ত্র আছে ; উহারা একত্র নিবদ্ধ হইয়া অথর্বসংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবিধ মন্ত্রই আছে। উহাদের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থই গোপথব্রাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থ অথর্ববেদ নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞে ব্রহ্মা নামে যে ঋত্বিক্ নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকে যজ্ঞের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়, অর্থাৎ হোতাদি অপর তিনজন ঋত্বিকের কার্য্য যথাবিধানে হইতেছে কি না দেখিতে হয় ; এবং তাঁহার নিজের বিশেষ কার্য্যও আছে। সুতরাং সমস্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম তাঁহার জানা আবশ্যক ; অতএব ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই সমস্তই তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হয় ; অথর্ববেদ ব্যতিরেকে ব্রহ্মার কার্য্য হইতে পারে না। যথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ( ৫।৫।৮ ) :—"ঋচৈব হোত্রং ক্রিয়তে যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদ্গীথং ব্যারব্ধা ত্রয়ী বিদ্যা ভবত্যথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়তে ইতি ত্রয্যা বিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ।" এস্থলে ত্রয্যা বিদ্যয়া বলাতে সমস্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম বুঝাইতেছে। যাস্কীয় নিরুক্ত ( ১।৩।৩ ) :—"ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুমর্হতি।" যেরূপ হোতৃবেদ ঋগ্বেদের নামান্তর, অধ্বর্য্যুবেদ যজুর্বেদের নামান্তর, ও উদ্গাতৃবেদ সামবেদের নামান্তর, সেইরূপ ব্রহ্মবেদ অথর্ববেদের নামান্তর। যথা গোপথব্রাহ্মণ ( ১।২।১৭ ):—"চত্বারো বা ইমে বেদা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো ব্রহ্মবেদ ইতি। চতস্রো বা ইমে হোত্রাঃ হৌত্রমাধ্বর্য-বমৌদ্গাত্রং ব্রহ্মত্বমিতি।" অথর্ববেদীদিগের ঋক্, যজুঃ ও সাম তিনেরই জ্ঞান আবশ্যক ; সেই জন্য অথর্ববেদীদিগকে চতুর্ব্বেদী বা ভাষায় চৌবে বলে।

কি কারণে বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং কি জন্য বেদকে ত্রয়ী বলে এ সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিলাম, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত নহে। তাঁহারা বলেন, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ এই তিনটিই প্রাচীন এবং অথর্ববেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ; সেই জন্য প্রাচীন কালে বেদের ত্রয়ীনাম প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম গ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ দেখা যায়, যথা ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে (৬।১৭),—অগ্নের্ঋচো বায়োর্যজূংষি সামান্যাদিত্যাৎ। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ ; মনুসংহিতা ( ১।২৩ ),—'অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্। দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ-সামলক্ষণম্'। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রন্থেই অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ দেখা যায়, যথা বৃহদারণ্যকে ( ৪।৪।১০ ) :—'অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ;' মহাভারতে ( আদিপর্ব্ব ১৬৮, ২৬৯ শ্লোক ) :—একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতঞ্চৈতদেকতঃ। পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্ ॥ চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোহ্যধিকং যদা। তদা-প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে ॥' অতএব ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ এই তিনটিই ত্রয়ী শব্দবাচ্য, এই মত কোনক্রমেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ঋগ্বেদে কেবল ঋঙ্‌মন্ত্র, যজুর্বেদে কেবল যজুর্মন্ত্র ও সামবেদে কেবল

সামমন্ত্র আছে। এরূপ সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। সামবেদে সামমূলক ঋক্ ও যজুঃ সকলের ঋকৃত্ব ও যজুষ্ট্ব অবশ্য স্বীকার্য্য, এবং এরূপ স্বীকার করিলে তাহার সামবেদত্ব অব্যাহত থাকে। সেইরূপ অথর্ব্বা ঋষির নামে অথর্ব্ব বেদের নামকরণ হইলেও তাহাতে যে সকল ঋক্, যজুঃ ও সাম আছে, তাহাদের ঋকৃত্ব, যজুষ্ট্ব ও সামত্ব স্বীকার্য্য হইবে না কেন, এবং অথর্ব্ববেদ ত্রয়ীপদ বাচ্য হইবে বা না হইবে কেন? প্রাচীনতম গ্রন্থে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ নাই এ কথাটি কেবল একদেশদর্শিত্বের পরিচায়ক। ছান্দোগ্যে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ আছে যথা:—"ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণঞ্চতুর্থম্ (৭।৭); মনুসংহিতাতেও অভিচারেষু ও কৃত্যাস্থ এই দুই শব্দের উল্লেখ থাকায় অথর্ব্ববেদ মনু কর্ত্তৃক স্বীকৃত ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে যেরূপ চারিবেদের উল্লেখ আছে, সেইরূপ তিন বেদের এবং ত্রয়ী শব্দেরও উল্লেখ আছে, যথা:—"ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত" শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৫।৮); "অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী বিদ্যা" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০০ অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক); "কচ্চিদ্ধর্ম্মে ত্রয়ীমূলে" (মহা সভা ৫অ ৯৮ শ্লোক)। সুতরাং গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও অর্ব্বাচীনত্বের সহিত বেদের ত্রয়ীত্ব ও চতুষ্ট্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে পাণিনি অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং উহা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। একথাও একদেশদর্শিত্বের পরিচায়ক মাত্র। অথর্ব্ববেদীয় শৌনক সংহিতাদির উল্লেখ পাণিনিতে আছে, যথা "শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি" (৪।৩।১০৫)। চতুরধ্যায়ী কৌশিক কল্পসূত্র অথর্ব্ববেদীয়; উক্ত কৌশিক সূত্রের উল্লেখ পাণিনিতে আছে, যথা—"কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং ণিনিঃ" (৪।৩।১০৩)। ছান্দোগাদিগের ধর্ম্ম বা আম্নায় এই অর্থে পাণিনি যেরূপ ছান্দোগ্য পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ "আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ" (৪।৩।১৩৩) এই সূত্রদ্বারা আথর্ব্বণিকদিগের ধর্ম্ম বা আম্নায় এই অর্থে আথর্ব্বণ শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অথর্ব্ব বেদ পাণিনির বিদিত ছিল।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বোক্ত চারি বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত; যথা যজ্ঞপরিভাষা সূত্র:—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্"। যাস্কের মতে যাহা মনন করা করা যায় তাহা মন্ত্র, "মন্ত্রা মননাৎ" (৭।৩।৬)। বেদের মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা; বেদের যে ভাগে যজ্ঞের বিধি উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন বিশেষ যজ্ঞে সংহিতাভাগের মন্ত্র সকল কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণ; যথা "কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি" (যজ্ঞপরিভাষাসূত্র, ৩৫ সূত্র)। বিধি দ্বিবিধ; অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তক ও অজ্ঞাতজ্ঞাপক। যে সকল বিধি কর্ম্ম[illegible] তাহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; [illegible] বা ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি [illegible] বাক্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

এইরূপ বাক্যকে অর্থবাদও বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনেক স্থলে বিধি ও অর্থবাদ এক বাক্যে সন্নিবেশিত আছে; যথা "বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" এই বাক্যের প্রথমাংশ বিধি ও দ্বিতীয়াংশ অর্থবাদ। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনেক স্থলে মন্ত্রও আছে; ঐ সকল মন্ত্র সংহিতা ভাগে নাই। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বৈদিকমন্ত্রের বিধান কালে অনেক স্থলে নানা প্রকার গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ গল্প লিখিবার কারণ এই যে কেবল ক্রমাগত বিধি লিখিলে অত্যন্ত নীরস হইবে, গল্পচ্ছলে বিধান করিলে সহজেই স্মরণ থাকিবে। ঐ সকল গল্পের মধ্যে কতকগুলিতে নীতি, কতক গুলিতে চিকিৎসা, কতকগুলিতে বিজ্ঞান ও রীতি পাওয়া যায়।

বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ দ্বিবিধ:—নির্ভুজ সংহিতা বা আর্চীসংহিতা এবং প্রতৃণ্ণ সংহিতা। নির্ভুজ সংহিতায় মন্ত্র সমূহের যথাবথ প্রসিদ্ধ পাঠ সকল থাকে, যথা ঋক্-সংহিতার "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি। প্রতৃণ্ণ সংহিতা আবার দ্বিবিধ—পদসংহিতা ও ক্রমসংহিতা। "অগ্নিম্ ঈলে, পুরঃ হিতম্" এইরূপ পদবিশ্লেষ করিয়া পাঠ করিলে পদসংহিতা পাঠ হইল। "অগ্নিম্ ঈলে; ঈলে পুরোহিতম্; পুরো হিতমিতি পুরঃ হিতম্" এইরূপ পাঠকে ক্রমসংহিতা পাঠ বলে। এই ক্রমসংহিতা অবলম্বন করিয়া জটাদি অষ্টবিধ বিকৃতি সংহিতার হইয়াছে; যথা বিকৃতিবল্লী নামক বৈদিক গ্রন্থে (১।৫):—"জটা মালা শিখা রেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ। অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্ব্বা মনীষিভিঃ।" এতদ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রের একাদশ প্রকার সংহিতা পাঠ আছে। অতি প্রাচীনকালে এই সকল গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসিত; পুঁথি লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল না। মন্ত্রগুলি যাহাতে অবিকৃত ভাবে পরিরক্ষিত হয়, উহাদের মধ্যে কেহ কোন শব্দ প্রক্ষেপ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই জটাদি পাঠের সৃষ্টি হইয়াছিল।

**বেদের শাখা।** বৈদিক সংহিতা সকলের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হওয়ায়, উচ্চারণ ভেদ, পাঠভেদ ও পাঠের ন্যূনাতিরিক্ততা উৎপন্ন হইয়াছে; এবং আচার্য্যদিগের প্রকৃতি বৈষম্য ও স্ব স্ব দেশ ও কালাদির অনুরোধ হেতু বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য বেদের অনেক শাখা হইয়াছে। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে পস্পশাহ্নিকে ঋগ্বেদের একবিংশতি শাখা, যজুর্ব্বেদের একশত শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা এবং অথর্ব্ব বেদের নব শাখা কথিত আছে। চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের পঞ্চশাখা, যজুর্ব্বেদের ষড়শীতি শাখা, সামবেদের ষোড়শ শাখা, ও অথর্ব্ব বেদের নব শাখা কথিত আছে। উক্ত সমস্ত শাখা এক্ষণে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের শাকল ও শাঙ্খ্যায়ন এই দুইটি প্রধান শাখা। শাকল্য নামক আচার্য্যের পাঁচ শিষ্য ছিলেন; [illegible]দের দ্বারা অধ্যাপিত হইয়া এই শাকল [illegible], শৈশিরীয়া, বাস্কলী, সাঙ্খ্যা, বাৎস্যা ও [illegible]য়নী এই পঞ্চ শাখা উৎপন্ন করিয়াছে [illegible] শাঙ্খ্যায়ন শাখা হইতে ষোড়শ প্রকার [illegible]

হইয়াছে। এইরূপ যজুর্ব্বেদের প্রথমে তিনটি প্রধান শাখা ছিল, চরকাধ্বর্য্যু, বাজসনেয়, তৈত্তিরীয়। কালক্রমে প্রথমটি হইতে উনবিংশতি, দ্বিতীয় হইতে সপ্তদশ ও তৃতীয় হইতে ছয় শাখা হইয়াছে। সামবেদের তিন শাখা এক্ষণে প্রচলিত আছে, কৌথুমী, জৈমিনীয় ও রাণায়ণীয়া।

এক বেদের অনেক শাখা হইলেও, কোন একটি শাখা অধ্যয়ন করিলেই সেই বেদ সমগ্র অধ্যয়ন করা হয় ; কারণ শাখা সকলের স্বরূপতঃ কোন বিভিন্নতা নাই। এই জন্য সায়ণাচার্য্য বেদের এক একটি শাখারই ভাষ্য করিয়াছেন। যদি প্রত্যেক বেদে সমুদয় শাখা অধ্যয়ন স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ" (২।১৬৫) "ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্" (৩.১) এবং "বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্" (৩।২) ইত্যাদি মনুবচনের কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদের শাখাভেদ মন্বাদি স্মৃতির অধ্যায়ভেদ নহে ; কিন্তু ভিন্নকালে ও ভিন্নদেশে লিখিত একই গ্রন্থের আদর্শ পুস্তক সমূহে যেরূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, বেদের শাখাভেদও অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় শাখার মধ্যে পরস্পর এত অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যে উহাদিগের শুক্ল ও কৃষ্ণ নাম হইয়াছে। জাবালাদি সপ্তদশ বাজসনেয় শাখাকে শুক্ল যজুঃ এবং ঔখ্যাদি ছয় তৈত্তিরীয় শাখাকে কৃষ্ণ যজুঃ বলে। শুক্ল যজুঃ ও কৃষ্ণ যজুঃর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, অন্য কোন বেদের কোন দুইটি শাখার মধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। শুক্ল যজুঃর দুইটি মাত্র শাখা এক্ষণে পাওয়া যায়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কৃষ্ণ যজুরও দুইটি শাখা পাওয়া যায়। চরকাধ্বর্য্যুর কেবল মৈত্রায়ণীয় নামে এক শাখা পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্যের নিজের শাখা তৈত্তিরীয়। কাণ্বশাখা উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। সায়ণ এই কাণ্ব শাখারও ভাষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু উহা সমগ্র পাওয়া যায় না। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট কাণ্ব শাখার প্রথম বিংশতি অধ্যায়ের মাত্র ভাষ্য আছে।

সংহিতা সমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঋগাদি সংহিতার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঋক সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় মণ্ডল অপেক্ষাকৃত নূতন এবং দশমমণ্ডল তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ। [illegible] ঋক্ সকল ঋক্ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত। শুক্ল যজুঃসংহিতা সামসংহিতা [illegible] অথর্ব্বসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। এইমত আমাদের নিকট যুক্তি[illegible] [illegible] না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অথর্ব্বা ঋষি যজ্ঞাদির সৌ[illegible] [illegible] সকল চারিভাগে বিভক্ত করেন ; তাঁ[illegible] [illegible] [illegible]ছে। অতএব তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য কি[illegible] [illegible] এক সময়ে উৎ[illegible]

যে সামবেদের ঋক্ গুলি পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত [illegible]। উক্ত মন্ত্রে ছন্দাংসি শব্দের অর্থ সামবেদীয় ঋক্ সমূহ। যাহারা সামগান করে [illegible] তাহাকে ছন্দোগ বলে, ঋগ্গ কখনও বলে না। সাম বেদে এখন অনেক গুলি ঋক্ আছে [illegible] ঋগ্বেদে নাই। যজ্ঞ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ যে সময়ে বিকীর্ণ ঋক্ সকল চয়ন করিয়া ঋগ্বেদে [illegible] সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সময়েই সামবেদীয় ঋক্ সকল সংগৃহীত হইয়া দশৎ আদিতে বিভক্ত হইয়াছে।

বিভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণ।—ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বেদের প্রত্যেক শাখায় যে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ আছে তাহা নহে; এবং সকল শাখাতে [illegible] ব্রাহ্মণ তাহাও নহে। ঋগ্বেদের শাকল নামে প্রসিদ্ধ যে পাঁচটি শাখা আছে [illegible] বা বহ্বৃক্ নামে প্রসিদ্ধ একই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। কৌষীতকী আদি অপর ষোড়শ [illegible] ব্রাহ্মণ কৌষীতক বা শাঙ্খায়ন নামে প্রসিদ্ধ। যজুর্বেদের চরকাধ্বর্য্যু নামে উনবি[illegible] একটি ব্রাহ্মণ মৈত্রায়ণ বা অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ বাজসনেয় শাখা[illegible] ব্রাহ্মণ বাজসনেয়ক বা শতপথ নামে প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় ছয় শাখার একই তৈত্তিরীয় [illegible] সামবেদের যে তিনটি শাখা এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলেরই ছান্দোগ্য [illegible] নামক একটি ব্রাহ্মণ ইদানীং অধীত হইয়া থাকে। উক্ত ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চবিংশ অধ্যায় প্রৌঢ় নামে প্রসিদ্ধ; তাহার পরবর্ত্তী পঞ্চাধ্যায়কে অদ্ভুত বা ষড়্বিংশ বলে; তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়দ্বয় গোভিলগৃহ্যসূত্রোক্ত মন্ত্রগুলির পেটিকাস্বরূপ, এজন্য ঐ দুই অধ্যায়কে মন্ত্রব্রাহ্মণ বলে; অবশিষ্ট অষ্টাধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। সায়ণাচার্য্য কর্তৃক উল্লিখিত সামবিধান, আর্ষেয়, দৈবত, সংহিতোপনিষৎ ও বংশ এই পাঁচ খানি গ্রন্থ প্রকৃত ব্রাহ্মণগ্রন্থ নহে; এইজন্য ইহাদিগকে অনুব্রাহ্মণ বলে এবং এই জন্যই পাণিনি— "অনুব্রাহ্মণাদিনিঃ" (৪।২।৬২) সূত্রটি করিয়াছেন। অথর্ববেদের কেবল গোপথ নামে একখানি ব্রাহ্মণ দেখা যায়।

আরণ্যক।—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরণ্যক নামে বেদের আর একটি ভাগ আছে। এই ভাগ অরণ্যে অধীত হইত বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক। যে সকল মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না, কেবল যাহাদের উপাসনায় প্রয়োজন হয়, তাহারাই আরণ্যক। আরণ্যকাংশ সংহিতা ভাগেও থাকিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ভাগেও থাকিতে পারে। আরণ্যকের [illegible] উহাকে স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে; উহা বস্তুতঃ স্বতন্ত্র অংশ নহে। পাণিনির [illegible] শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থে ব্যবহার ছিল না; কিন্তু আরণ্যকান্তর্গত মন্ত্র [illegible] [illegible] বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেদের উৎপত্তি নির্ণয়।—বৈদিক মন্ত্র সকলের উৎপত্তি [illegible] করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মীমাংসকেরা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন। [illegible] বাক্ স্পষ্ট। [illegible]" "অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু" ইত্যাদি বচন দ্বারা [illegible] উপলব্ধি

হইতেছে। [illegible] যাস্ক বলিয়াছেন, "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুঃ, তেঽবরে-ভ্যোঽসাক্ষা[illegible]ভ্যঃ উপদেশেন মন্ত্রান্তসম্প্রাদুঃ উপদেশেন গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্মগ্রহণায়ে[illegible]গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ (নিরুক্ত ১৷৬৷৫)"। ইহা দ্বারা বেদের [illegible] ও আর্ষত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু আম্নাত শব্দের অর্থ কৃত নহে; উহার অর্থ অভ্যস্ত। যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে, তাহারই অভ্যাস হইতে পারে; এইজন্য অমুক [illegible] বা অমুক যজুঃ বা অমুক সাম অমুক ঋষি কর্ত্তৃক আম্নাত বা দৃষ্ট বলা যায়, 'কৃত' বলা [illegible] সুতরাং বৈদিক গ্রন্থ সকল তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, দৃষ্ট, প্রোক্ত এবং [illegible] রচয়িতা এবং উৎপত্তি কাল দ্বয়ের কিছুই নির্ণয় করা যায় না, তাহাকে দৃষ্ট [illegible] বৈদিকমন্ত্র সকল সমস্তই দৃষ্ট। যাহার রচয়িতা নির্ণয় করা যায় কিন্তু উৎপত্তিকাল [illegible] যায় না, তাহাকে প্রোক্ত বলে; ঋগাদি সংহিতাগুলি সমস্তই প্রোক্ত। [illegible] ও উৎপত্তিকাল উভয়ই নির্ণয় করা যায়, তাহাকে কৃত বলে; পাণিনির সময় হইতে [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। মন্ত্ররচনা বহুযুগ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং কোন বিশেষ [illegible] রচয়িতা বা কাল নির্ণয় কিরূপে সম্ভব? যদি কেহ বলেন যে ব্যক্তি নির্ণয় হইলেই [illegible] হইতে পারে, ইহার উত্তরে আমরা বলি যে বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিনির্ণয়ও [illegible]। অমুক ঋষি অমুক মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এরূপ কুত্রাপি লিখিত নাই। যদি দৃষ্ট শব্দ রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্যক্তি নির্ণয় সহজ নহে; কারণ ঋষিদিগের নাম অনেক স্থলে কল্পিতমাত্র, যথা অগ্নি, বায়ু, প্রজাপতি ইত্যাদি। এরূপ নাম হইতে ব্যক্তি নির্ণয় সম্ভবপর নহে। যদি কোন মন্ত্রে বসিষ্ঠ বা ভৃগু নামের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে এই বসিষ্ঠ বা ভৃগু কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? অতি প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্ক ঋগ্বেদের কেবল পাঁচ শাখার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার পূর্ব্বে ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক শাখা বিলুপ্ত হইয়াছিল। মন্ত্রকালের কীদৃশ প্রাচীনত্ব তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থসকলেরও কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা বৃথা। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে মন্ত্র ভাগের পরে ব্রাহ্মণ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮৷৪৷৭) এক বচন আছে "এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ তুরঃ কাবষেয়ো জনমেজয়ং পারি[illegible]ভিষিষেচ" এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে আছে "জনমেজয়শ্চার্বুদো গ্রাবঃ" [illegible] এই [illegible] বচন দ্বারা যদি কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে অর্জ্জুন প্রপৌত্র জন[illegible] [illegible] বহুদিন প[illegible]ষ্ঠিরের রাজ্য কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যূন দ্বিতীয় শতাব্দীতে, উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থদ্বয় [illegible] হইয়াছিল, তাহা হইলে সে সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ উক্ত [illegible] গ্রন্থসম্বন্ধে [illegible] ব্রাহ্মণ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ পাণিনির সমকালিক হইয়া পড়ে; কিন্তু পাণিনি ব্রাহ্মণ [illegible] স্বীকার করিয়াছেন; সমকালিক গ্রন্থের প্রোক্তত্ব [illegible]

কিরূপে সম্ভব? বস্তুতঃ অতি প্রাচীন কালে পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় নামে [illegible] ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহাদেরই নামানুসারে অভিমন্যু পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ ও পরীক্ষিৎ পুত্রের নাম জনমেজয় রাখা হইয়াছিল। সেইরূপ বেদে ভোজ নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ঋকসংহিতা (৮।৬।৪।৫) "ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম"; ঐতরেয় [illegible] (৮।৪,৩) "ভোজং ভোজপিতরম্"। এই ভোজ যে আধুনিক ভোজরাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে? এইরূপ শতপথব্রাহ্মণপ্রবক্তা যাজ্ঞবল্ক্য কোন ক্রমেই বার্ত্তিককার কাত্যায়ন কিম্বা পাণিনির সমকালিক নহেন, প্রত্যুত তাঁহাদের বহুযুগ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেইরূপ তৈত্তিরীয় প্রথমারণ্যকের "সহোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ" (১।৯।২) এই বচনোক্ত ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ব্যাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্যাস এই নামটি বংশের নাম, পূর্ব্বকালে আর্য্যেরা বংশের নামই ব্যবহার করিতেন। এইরূপ সামবেদীয় বংশ ব্রাহ্মণে অনেক গোভিলের উল্লেখ আছে। কৌথুমী-শাখাবলম্বীদিগের যে গৃহ্য সূত্র গোভিলপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, উহা বংশব্রাহ্মণোক্ত বহু গোভিলের মধ্যে কোন্ গোভিল প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? অতএব নাম দেখিয়া কাল নির্ণয় করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

অথর্বসংহিতাতে ঊনবিংশকাণ্ডীয় সপ্তম সূক্তে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। কোন কোন কালনির্ণেতা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যৎকালে অথর্ব বেদ রচিত হইয়াছিল তখন কৃত্তিকা রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র ছিল, এবং তাহা হইলেই জ্যোতিষের গণনানুসারে প্রায় সার্দ্ধ তিন সহস্র বা সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অথর্ব্ব বেদ রচিত হইয়াছিল। এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না; কারণ অয়ন গতির নিয়মানুসারে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র বৎসর অন্তর কৃত্তিকা রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র হইবে। অথর্ব বেদ রচিত হইবার পর এইরূপ যে কতবার হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে অথর্ব বেদের রচনা কাল সার্দ্ধ তিন বা চারি সহস্র বৎসরের কম নহে; তাহা অপেক্ষা যে কত অধিক, তাহার কোন নির্ণয় নাই। অথর্বসংহিতাতে এইরূপ আর একটি বচন আছে, "ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘামে"। ইহা হইতে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে অথর্ব বেদ প্রণয়ন কালে অশ্লেষার শেষে বা মঘার প্রথমে অয়নারম্ভ হইয়াছিল, তাহা হইলেও অথর্ব বেদ প্রণয়নের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইতে পারে না।

বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়:—প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে চারিটী জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, যথা, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ বা বিনিয়োগ। "অমুক মন্ত্রের অমুক ঋষি" বলিলে কি বুঝায় তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাদ ও অক্ষর সংখ্যানুসারেই বৈদিক ছন্দ নির্ণীত হইয়া থাকে। যে মন্ত্রে যাহার স্তুতি বা বর্ণন করা যায় অথবা যাহার নিকট কোনরূপ প্রার্থনা বোধিত হয়, সেই মন্ত্রের উহাই দেবতা। যে মন্ত্র যে কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তাহাই

উহার বি[illegible]। মন্ত্র ব্রাহ্মণের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ গোভিল গৃহ্য সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

**বৈদিক মন্ত্রের অর্থ।**—অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্রেরই তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে:—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অর্থ; অধিদৈবিক অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অর্থ, এবং অধিযজ্ঞীয় অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অর্থ। সায়ণাচার্য্য এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, এবং দুই এক স্থলে মন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল অধিযজ্ঞীয় ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যে সকল বৈদিকাচার্য্য উদাত্তাদি স্বর সংযোগে ঋক্ ও যজুর আবৃত্তি এবং সামগান শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই বৈদিক ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি এবং মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিতে পারেন না। যাঁহারা ব্যাকরণাদি ও মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দেন, তাঁহারা আবৃত্তি ও গান শিক্ষা দিতে পারেন না।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# কবি লালা জয়নারায়ণ।

যাঁহারা মনে করেন শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব বঙ্গে কোন যশস্বী কবি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বিরচিত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" নামধেয় উপাদেয় গ্রন্থখানা পাঠ করিলে তাঁহাদের সেই ভ্রম অনেক তিরোহিত হইতে পারিবে। এমন কি দেখা যায় ফুল্লশ্রীগ্রামনিবাসী বিজয় গুপ্তের পূর্ব্বে অল্প সংখ্যক বঙ্গীয় কবি যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। বিজয় গুপ্ত প্রণীত মনসামঙ্গল গ্রন্থ ১৪০০ শকে বিরচিত হয়। সেই হিসাবে সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব বঙ্গে কবিত্বের সূচনা দেখা যায়। তৎপূর্ব্বে যে এতদ্রূপ আরও দুই চারিটী কবি জন্ম গ্রহণ না করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না; তবে তাঁহাদের নাম আজি পর্য্যন্তও কেহ ততটা পরিজ্ঞাত নহেন।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জপসানিবাসী লালা কবি মহোদয়গণের নাম ও জীবন-বৃত্তান্ত অনেকটা পরিজ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভা হইতে "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" নামধেয় আধ্যাত্মিকভাবপরিপূর্ণ একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা আজিও সাধারণের নেত্রবর্ত্তী না হইয়া সভার পুস্তকাধারে নিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ও তদীয় সুযোগ্য মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মনোযোগ করিলে এই গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের গোচর হইতে পারে।

আমরা এস্থলে যে মহোদয়ের নাম লইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম, মায়াতিমির-চন্দ্রিকা গ্রন্থপ্রণেতা লালা রামগতি রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। কবি জয়নারায়ণ

সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; শারদার বিপুল অনুগ্রহে কবিতা বিরচনে ও সমস্যা পূরণে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

হরিলীলা ও চণ্ডিকামঙ্গল নামক দুইখানা কাব্যগ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক বিরচিত হয়। হরিলীলা প্রচলিত সত্যনারায়ণের পাঁচালির বিষয় লইয়া লিখিত। কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র পাঁচালির সীমা অতিক্রম করিয়া একখানা বৃহৎ কাব্যাকারে সুগঠিত হয়। চণ্ডিকামঙ্গল কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্যের অনুসরণে বিরচিত। কিন্তু তাহাতে মাধব সুলোচনার উপাখ্যানটী সংযোজিত করা হইয়াছে।

মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা প্রত্যাদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথার্থই এইরূপে অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া কবি কাব্য রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কি ঐ কথাটা তৎ সময়ের কৈফিয়তের কার্য্য ছিল, তাহা আলোচনা করিবার আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগর প্রভৃতির মূল বিবরণ কোন গ্রন্থে আছে কি না পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদের কবি জয়নারায়ণ কিন্তু এতদ্বিষয়ের প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রত্যাদেশের স্থানে "পুরাণের" দোহাই দিয়াছেন।

মাননীয় ৺রামগতি ন্যায়রত্নমহাশয় "বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে, কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীর সমালোচনা স্থলে বলিয়াছেন 'এই গ্রন্থস্থ কালকেতুব্যাধ ও ধনপতি সদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত কি ইহার কোনরূপ পৌরাণিক মূল আছে, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। আমরা শুনিয়াছিলাম পদ্মপুরাণে কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান এবং কল্কি পুরাণে শ্রীপতি সদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা এই দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, কোথাও তাহা দেখিতে পাইলাম না। আমরা কিন্তু চণ্ডী কাব্যের মূল সূত্র কি তাহা জয়নারায়ণের কাব্যে স্পষ্ট উল্লিখিত দেখিতে পাই। চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থ হইতে সেই অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

যেরূপে প্রকাশ হৈল চণ্ডীর এ কথা।  
পূর্ব্বাচার্য্য প্রসঙ্গ যে মত আছে গাঁথা॥  
সেই অনুসারে শুন নূতন রচন।  
আছয়ে যে মত কথা পুরাণ বচন॥  
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডেতে।  
লিখা মহামায়া প্রতি বিষ্ণুর স্তবেতে॥  
অবতীর্ণ হৈয়া তুমি যশোদার গর্ব্ভে।  
কংস ছলি বিন্ধ্যবাসী হবে নিজ গর্ব্বে॥

এইরূপ স্তবে আছে বিস্তর কথন।
তাতে এক শ্লোক এই রূপেতে লিখন॥
ভারতভূমেতে চণ্ডী-লীলা প্রকাশিয়া।
কালকেতু উদ্ধারিবে গোধিকা হইয়া॥
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ।
সম্বরণে করিবর করিবেন গ্রাস॥
বণিক সুতকে ফেলি ঘোর সঙ্কটেতে।
উদ্ধার করিবে নৃপ শালবান হাতে॥

বলা বাহুল্য বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত শ্লোকগুলি মূল চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি। যে শ্লোকের তাহাতে উল্লেখ আছে, জয়নারায়ণ তাহাও গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। বঙ্গবাসী পত্রিকার আপিস হইতে যে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, উহার উত্তরখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে (২১০ পৃষ্ঠায়) এই শ্লোকটী আমরা পাইয়াছি যথা—

ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনোঃ
রক্ষে হস্মুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

জয়নারায়ণ স্বয়ং কোন গ্রন্থ না দেখিয়া বা পাঠ না করিয়া কিছু লিখিতে প্রয়াস পান নাই। তাঁহার বহুশাস্ত্রদর্শিতার পরিচয় নানা পদাবলিতে বিশেষতঃ দেব দেবীর বন্দনায় স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এস্থলে সংক্ষেপে তাহার একটুকু পরিচয় প্রদান করা হইল। যথা—

"পার্ব্বতীর কোলে হর্ষে বসি বাল্যকালে।
শুণ্ডে শিবশির হতে আনি গঙ্গাজলে॥
ধৌত করি মাতৃস্তন দুগ্ধ পান কৈলা।
ষড়ানন মুখের উচ্ছিষ্ট না খাইলা॥"
"পক্কবিম্ব ওষ্ঠাধর, ভুজ চারি মনোহর
সুললিত মৃণাল বলনি।
তরুণ পল্লববর, সুললিত শোভাকর
চড় চড় চুয়ায় লাবনি॥
দ্বিকর বীণাতে রত, সপ্ত তন্ত্রে পরিমিত
ধ্বনি পরিবাদিনী ললিত।

নানা সুমিলের তানে, মধুর মধুর গানে
স্বীয় ভাবে আপনি মোহিত ॥
শ্বেত পদ্ম সূত্র আর, দ্বিকরেতে শোভে যার
গলে শোভে গজমতি হার।
কুচভারে কটি নত, মেখলাতে সুরঞ্জিত
বিনিন্দিত কেশরি মাঝার ॥"
কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, গৌর অশেষ বরণে।
চতুর্ভুজা দ্বিভুজাদি কতেক কারণে ॥
একবক্ত্রা দ্বিবক্ত্রা ত্রিবক্ত্রা ত্রিনয়নে।
অসংখ্য স্বরূপে হর গৌরীর বিধানে ॥
নানা কারণেতে নানারূপপ্রকাশিনী।
শিবকৃষ্ণ-ক্রোড়া মাতা গণেশজননী ॥

কবি প্রথমতঃ হরি-লীলা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তৎপশ্চাৎ চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থ বিরচিত হয়। হরিলীলা রচনায় শাকের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

অত্রি পুত্র হর নেত্র ষড়াননানন।
বসুমতী শাকে পুথি হল সমাপন ॥
নারায়ণ প্রভুপদে করি দৃঢ় মন।
ষোড়শ চৌরাশী শাকে পুস্তক লিখন ॥

অতএব জানা গেল ১৬৯৪ শাকে হরি-লীলা বিরচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে কবি তাঁহার মাতার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

সুমতিসুতের বাক্য, শুন হে পুণ্ডরীকাক্ষ
লক্ষ্য নাই তুমি পরে ভবে ॥

পিতার পরিচয় তদগ্রজ রামগতি রায় কৃত মায়াতিমির চন্দ্রিকাগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার ॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্জ্ঞানী বিস্তর ॥

বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ শ্রেণীর বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালা খ্যাতি যাঁর নিজাগতে॥
জপসা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়।
রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয়॥

জয়নারায়ণ আপনার ও ভ্রাতৃগণের বিরচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় মাধবসুলোচনার উপাখ্যানে ছদ্মবেশী সুলোচনার মুখ হইতে সুন্দর কৌশলে বাহির করিয়াছেন। নায়িকা বিরহাতুর মাধবকে রমণীর প্রেম হইতে বিমুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে উপদেশ ছলে বলা হইয়াছে; যথা—

বিধিমত করয়ে যে একাদশী ব্রত।
নারায়ণে ডাকি শুন হরিলীলামৃত॥
নারায়ণ অগ্রজের নূতন রচন।
মন দিয়া তাহা যে যে করহ শ্রবণ॥
লিখিয়াছে পুথি ভবকলহ-ভঞ্জিকা।
বোধ হেতু শুন মায়াতিমির-চন্দ্রিকা॥
অনুজ তাহার দিব্য সুকাব্য রচিছে।
পার্ব্বতীর পরিণয় নাম রাখিয়াছে॥
মহাভক্তিসার গ্রন্থ করেছে রচনা।
সে রহস্য শুনিলে ভুলিবে সুলোচনা॥

রামগতি জয়নারায়ণের অগ্রজ এবং রাজনারায়ণ তাঁহার অনুজ ছিলেন। তাঁহারা কে কি গ্রন্থ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় এস্থলে পাওয়া গেল। এতদ্ভিন্ন রামগতিসংগৃহীত "যোগ-কল্পলতিকা" ও রাজনারায়ণ কৃত "কালীকল্পলতিকা" নামে আরও দুইখানা সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বোধ হয় চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থ বিরচনের পর এই গ্রন্থদ্বয় বিরচিত হওয়ায় তন্মধ্যে উহাদের নামের উল্লেখ হয় নাই। কবির কনিষ্ঠ অপর ভ্রাতা কীর্ত্তিনারায়ণ কৃত একখানা সংক্ষিপ্ত সত্য নারায়ণের পুঁথির কথা শুনা যায়। হরিলীলা পাঠ করিয়া সত্যনারায়ণের "সিন্নি" পূজা ইত্যাদি হইতে প্রায় দিনমান অতিবাহিত হইয়া যাইত, এইজন্য বোধ হয় কীর্ত্তিনারায়ণ উহার সংক্ষেপ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুঁথির ভণিতায় এইরূপ ছিল। যথা—

কবি নারায়ণের অনুজ নারায়ণ।
সংক্ষেপে রচিল পুথি ক্রিয়ার কারণ॥

কবি তৎকৃত চণ্ডিকামঙ্গলের একস্থলে লিখিয়াছেন—

গৌড় রাজ্য পূর্ব্ব ভাগে বিক্রমপুরেতে।
রচিলাম এই গ্রন্থ ধর্ম্ম-প্রসঙ্গেতে ॥
গঙ্গা দয়াময়ী অনুরোধে এতদূর।
শুনিলে কলুষ খণ্ডে এ কথা মধুর ॥

গঙ্গামণি কবির ভাগিনেয়ী, দয়াময়ী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে মাধবসুলোচনার উপাখ্যানটী ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থে সংযোজিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গঙ্গাদেবীর প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া লিখিয়াছেন "বিক্রমপুর অঞ্চলে গঙ্গানাম্নী এক রমণী কবি এক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি এখনও এ দেশে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে।" আমরা ১৩০৬ সনের বৈশাখ মাসের "[illegible]" পত্রিকায় আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে গঙ্গাদেবীর প্রকৃত পরিচয় ও তৎকৃত একটী গানের নমুনা প্রদান করা হইয়াছে। গঙ্গা ও আনন্দময়ী উভয়ে বিদুষী ললনা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। দীনেশবাবু আনন্দময়ী সম্বন্ধে বিস্তর লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে একস্থলে "আনন্দময়ী শুল্বের যেরূপ রচনার পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে [illegible]ক।" আমি ১৩০৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতী পত্রিকাতে আনন্দময়ী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে তাহার একটি সুন্দর কবিতা ও জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ হয়। নিম্নে তাঁর বিরচিত একটি গান প্রকাশ হইল। সভ্য মহোদয়গণ এই উভয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই এই বিদুষী ললনাদ্বয়ের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন। কবি জয়নারায়ণ তৎকৃত "হরিলীলা" গ্রন্থে আনন্দময়ী রচিত দুইটী কবিতা সন্নিবেশিত করায় তাঁহার গুণের পরিচয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কবি আপন গুণবতী ভ্রাতুষ্পুত্রীর কথা বিস্মৃত হন নাই। চণ্ডিকামঙ্গলের একস্থলে ললনার মাতার মুখ হইতে আশীর্ব্বাদ বাণী ছলে বাহির করিয়াছেন। যথা—

সুরধুনী সুনন্দার তীরেতে রহিয়া।
তারা দক্ষিণার পদ বিস্তর সেবিয়া ॥
ভাগ্যে এ আনন্দময়ী উদরেতে ধরি।
এস প্রাণ সুধামুখী আঁখি ভরে হেরি ॥

এই আনন্দময়ী শব্দটী বস্তুতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এইরূপ পরিবারস্থ সজ্জন সুধীগণের নাম ও তাঁহাদের গুণের পরিচয় তৎকৃত গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্পষ্টতঃ দেখা যায়।

যে মহান্ বংশে বহু মনী পণ্ডিতের জন্ম হওয়ায় বঙ্গভূমির গৌরব যথেষ্ট সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, যে বিনায়ক বংশে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক, চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সেন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশের পরিচয় জানিতে অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে। ১৩০৬ সালের তৃতীয়সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে। অতএব উহার বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের লালা পরিবারও বিনায়ক কুলোৎপন্ন। অতএব সংক্ষেপে তাঁহাদের বংশ পরিচয় এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

রাজা শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র বিমল সেন, তৎপুত্র ধন্বন্তরি সেন, তৎপুত্র গণ্ডারী সেন, তৎপুত্র হিঙ্গু সেন, রাঢ়ী বৈদ্যগণের মধ্যে এই মহাত্মা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গে আগমন করিয়া সেনহাটীতে বাস করিতে থাকেন। যথা—

ষণ্ণাং মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ কৌলীন্যে খ্যাতিমীয়িবান্।
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরীমধ্যবাস সঃ॥
কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা।

তাঁহার যথাক্রমে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠদ্বয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়; অবশিষ্ট উচনী, ডমন, বিকর্ত্তন, বলভদ্র বংশপ্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হন। বলভদ্র সেনের পুত্র অনিরুদ্ধ সেন সেনহাটি পরিত্যাগ করিয়া ইটনা গ্রামে বাস করিতে থাকেন। অনিরুদ্ধের পুত্র অর্জ্জুন, তৎপুত্র বাচস্পতি, তৎপুত্র হৃষীকেশ সেন, তৎপুত্র যশশ্চন্দ্র সেন, তৎপুত্র গোবিন্দ সেন। এই মহাত্মার নাম পর্য্যন্ত কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকায় দেখা যায় যথা—

যশশ্চন্দ্রাচ্চ গোবিন্দঃ সেনঃ শ্রীপতিজাস্সুতঃ।

এই গোবিন্দ সেনের পুত্র বেদগর্ভ সেন, ইটনা পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর দায়নীয়া গ্রামে বাস স্থাপন করেন। বেদগর্ভের প্রথম পুত্র নীলকণ্ঠের বংশে জপসার লালা ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বংশে রাজনগরের রাজবংশের উদ্ভব হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল কবির জীবনঘটিত কথা লইয়াই সময় ক্ষেপণ করিলাম, কিন্তু তৎকৃত কবিতার রসাস্বাদন করাইয়া শ্রোতৃগণকে উহার গুণাগুণ নির্ব্বাচনের সময় দেওয়া হয় নাই; এজন্য চণ্ডিকামঙ্গল ও হরিলীলা গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার নমুনা দেওয়া গেল।

কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডীকাব্য সহিত জয়নারায়ণের চণ্ডীর তুলনা করা আমাদের সাধ্য নয়। তবে এইমাত্র বুঝিতে পারি বৃদ্ধ কবি যেমন স্বপ্রণীত কাব্যে নানা রসের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; জয়নারায়ণ ততটা সমর্থ হন নাই। কবি হরিলীলা প্রণয়ন কালে নানা রসের সমাবেশ করিয়া যেমন ভারতচন্দ্র

সমকক্ষতা লাভের অভিলাষী হইয়াছিলেন; আবার চণ্ডীকাব্য রচনাকালে সেই চপলতা পরিত্যাগ করিতে যথেষ্ট যত্ন পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই পথ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

নাভি কূপে যেতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥

অমনি জয়নারায়ণ লিখিলেন—

নাভিকূপে ছিলরে নবীন ভুজঙ্গিনী।
ঊর্দ্ধে উঠেছিল হতে পবনভোজিনী॥
খগপতি চঞ্চু সম দেখি তার নাসা।
কনকগিরির মাঝে করিলেক বাসা॥

পাঠক মহোদয়গণ ভারতচন্দ্রের কামভস্মবর্ণনার সহিত এই কবির বর্ণনা একত্র সমাবেশ করিয়া তুলনা করুন।

একবার নাহি পারে, পুনশ্চ সন্ধান করে
স্মর নিজ শরে চুম্ব দিয়া।
ছোয়ায়ে রতির বুকে, ধনুকে পুনশ্চ তাকে
যুড়িলেক সাবধান হৈয়া॥
নিরখে শঙ্কর পানে, করিয়া জন লোকনে
দেখে যেন রজত অচল।
তেজ শত সূর্য্য প্রায়, শত চন্দ্র সম তায়
রত্নবেদি পরে ঝলমল॥
বিমুদ্রিত ত্রিলোচন, ব্রহ্মেতে অর্পিত মন
স্পন্দহীন সকল শরীর।
স্থির বায়ু পরে যেন, শুভ্র জলধর তেন
জলশূন্য না পড়িছে নীর॥
জটাতে মণ্ডিত শির, ভালে আধ শশধর
বিভূতি রাজিত সর্ব্ব গায়।
গলে নাগ রাজ মালে, কালকূট কণ্ঠে জ্বলে
নিত্যানন্দ ঢড় ঢড় কায়॥

দেখি হেন ত্রিপুরারি, মার বলে মরি মরি
ব্যস্তভাবে দুই হস্ত কাঁপিল।
হাত হতে ছুটি শর, মহাদেব হৃদিপর
স্পর্শমাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
ছিল মন ব্রহ্মযোগে, সে মনে মদন যাগে
প্রভু মনে বিচার করিল।
কেন হেন হল মন, অকস্মাৎ কি কারণ
পাষাণেতে কর্দম হইল ॥
সকলি জানিল ধ্যানে, আপনি আপন জ্ঞানে
দেবচক্রে যা কৈল মদন।
অন্তরে জন্মিল রোষ, জানিয়া মদনদোষ
মেলিলেক ললাট লোচন ॥
কামাগ্নি বিদ্যুত হৈল, হুঙ্কারে পবন বৈল
পৈল যেয়ে মদনের অঙ্গে।
পরশে পুড়িল তেন, অগ্নিতে আহুতি যেন
দাবানলে যেমন পতঙ্গে ॥
দহনে পতঙ্গ হৈল, হুতাশনে হবি পাইল
হল বাদ দীপে ঝঞ্চাবাতে।
গরুড় অহিতে রণ, সিংহ মৃগে হনাহন
মুষিক যুঝিল করিসাতে ॥
নিরখিয়া দেবগণ, ঘন ডাকে ত্রিলোচন
রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ।
যাবৎ এ দেববাণী, শিব কর্ণে হল ধ্বনি
তাবৎ মদন ভস্মশেষ ॥

বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তৎকৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জয়নারায়ণের রতি-বিলাপটি ভারতচন্দ্রের রতি-বিলাপ হইতে সুন্দর, আমরা উহার কতকাংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

বলে ওহে দেবরাজ, কৈলে কি দারুণ কাজ
সভে মিলি কি কাম সাধিলে।

যম হতে ডাক দিয়া, প্রকারে পতি পুড়িয়া
ছাই দিলে রতির কপালে ॥
ও বসন্ত কুলনাশা, কোকিল কুরব ভাষা
সর্ব্বনাশা সমীরণ ওরে।
সকলে সহায় হলি, শিব রণে নিয়া এলি
কেবল আমারে মজাবারে ॥
অন্য নায়িকার ঘরে, নিশিতে বঞ্চিয়া ভোরে
মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
খণ্ডিকা অধীর ধৈয়া, মন রাগে নাহি লইয়া
মন্দ কাজ করেছিনু আমি ॥
বকুলের মালা দিয়া, গলাতে বন্ধন কইরা
কর্ণ উতপলে বেঁধেছিলে।
সেই অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে
রস রঙ্গ সকলি ত্যজিলে ॥
আর দুঃখ মনে রইলে, একদিন নৃত্যকালে
পদের নুপুর খসেছিল।
ত্বরা তুমি দিলে পায়, বিলম্ব হইল তায়
দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হইল ॥
তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি
বসিয়া রহিনু মৌনী হইয়া।
যত সাধ্য কৈলে তুমি, পুন না নাচিনু আমি
তাতে আছ বিরসে শুইয়া ॥

কবির কোমল ও প্রাঞ্জল রচনার আর একটি অংশ হরিলীলা গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়া আমরা এই প্রস্তাব শেষ করিব।

পাখীগণ ইতি উতি নিজ বাসা ছাড়ে।
বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে পাছি পড়ে ॥
চন্দ্রভান করযুগ ধরি মুনেন্দ্রার।
যাই বলি বিদায় মাগিছে বার বার ॥

উষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভান।
সজল নয়নে ধনী পাছেতে পরান॥
যতদূর আঁখি চলে রহে দাঁড়াইয়া।
সুধাকর যায় ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া॥
নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকী আছিল।
রবি আলাপনে মুখ মলিন হইল॥

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

---

# ভাষাতত্ত্ব।

**মন্তব্য—এই প্রবন্ধের লেখক ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনাকার্য্যে দশবৎসর যাবৎ নিযুক্ত। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ ইংরাজী ছাঁচে ঢালা। ইহা পরিহার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষার অনুরক্ত পাঠকগণ ক্ষীরগ্রাহী নীরত্যাগী হইয়া বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সেই গুলির দিকেই দৃষ্টি করিবেন।—লেখক**

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রায়ই শুনা যায় যে ইংরাজী ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে পরস্পরের মধ্যে কোনও নিয়মের ঐক্য নাই। এই বৈষম্যই ভিন্নজাতীয় শিক্ষার্থীর ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বিষয়ে প্রধান অন্তরায়। বাস্তবিক, উভয় ভাষার ভিতর অনেক প্রভেদ।

(১) বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়াই এই বৈষম্য ভাষার সকল অঙ্গেই দেখা যায়। ইংরাজী f, s, v, z এই চারিটী অক্ষরের অনুরূপ কোনও অক্ষর বাঙ্গালা বর্ণমালায় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য 'স' এর উচ্চারণ ঠিক s এর অনুরূপ বটে; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে দন্ত্য 'স' এর ঐ উচ্চারণ প্রচলিত নাই, কেবল 'স্ত' 'স্থ' প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণে অবিকল সংস্কৃত উচ্চারণ শুনা যায়। v ও 'ভ'য়ে এক উচ্চারণ নহে, তাহা বোধহয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা। z এর অনুরূপ বর্ণ আরবী ও পার্সীতে আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় নাই। (২) ইংরাজীতে পদ-বিন্যাস প্রণালী বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাঙ্গালায় কর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে, ইংরাজীতে পরে বসে; বাঙ্গালায় *preposition* বিশেষ্য পদের পরে যায়, ইংরাজীতে পূর্ব্বে যায়; ইংরাজী I have, I had, I met him, প্রভৃতি পদের বাঙ্গালায় অনুরূপ অনুবাদ হয় না। (৩) এতদুভয় ভাষার আচার (*idiom*) গত বৈষম্য আরও অধিক। বাঙ্গালায় বলিব 'সূতা ছেঁড়া', ইংরাজীতে বলিবে 'breaking a thread;' বাঙ্গালা 'হাওয়া খাওয়া' 'ঔষধ খাওয়া' ইত্যাদির ইংরাজীতে অনুরূপ অনুবাদ চলিবে না।

বিভিন্ন জাতির ভাষায় এরূপ বৈষম্য থাকা কোনও প্রকারেই বিস্ময়জনক নহে। কিন্তু জাতি ও ভাষা বিভিন্ন হইলেও মানবজাতির দাঁড়াইবার একটা সাধারণ ভূমি আছে।

সকল ভাষাতেই কতকগুলিভাব একই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং সেই সেই ভাব প্রকাশের ভাষাও একই নিয়মে গঠিত হইয়াছে। ভাষা গঠনের এই সাধারণ উপাদান গুলি প্রণিধান করিয়া দেখিলে বিভিন্ন জাতীয় ভাষার মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইতে হয়। আমরা নিম্নে এই সৌসাদৃশ্যের কতকগুলি উদাহরণ দিব।

(১) উচ্চারণ-গত সৌসাদৃশ্য। বাঙ্গালায় school, steel, scheme প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে ইস্কুল, ইষ্টিল, ইস্কিম প্রভৃতি হইয়া পড়ে। ইহা বিদেশীয় জাতির নিকট বিকৃত উচ্চারণ বলিয়াই বিবেচিত হয়। অবশ্য এ শব্দগুলি ইংরাজী নিয়মেও উচ্চারণ করা যায়, এবং শিক্ষিত লোকে করিয়াও থাকেন। কিন্তু সেরূপ করিতে আয়াস লাগে। বাস্তবিক. সকল জাতির মধ্যেই শব্দের প্রথমে স্ক, স্প প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ লাগিলে উচ্চারণের কষ্ট হয়। এই কষ্ট নিবারন উদ্দেশ্যেই ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি *doublets* দেখা যায়; যথা—special, especial ; scape, escape ; spy, espy ; ইংরাজী ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে পূর্ব্বোক্ত কারণেই এই বিকল্পিত পদগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

(২) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধনা পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম 'হিম আঁখি তুলি' এই কবিতাংশের সমালোচনায় সমালোচক বলিয়াছিলেন যে ইহা ইংরাজী ভাব ও ভাষার অবিকল অনুবাদ. এদেশের ভাষায় উহা চলিতে পারেনা। তাহার কারণও অতি সহজবোধ্য; শীত-প্রধান দেশে উষ্ণ বস্তু মাত্রই মনোহর। ইংরেজের দেশে warm welcome, cold reception বলিলে যে ভাব আসিবে, বাঙ্গালা দেশে তাহা হইতে পারেনা, ইহা যথার্থ। উল্লিখিত সমালোচনা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু একটী স্থলে বিপর্য্যয় দেখা যায় 'হিম [illegible] থাকা' একটী চলিত কথা; ইংরাজী cold বলিলে ইংরেজের মনে যে ভাবের উদয় [illegible] [illegible] কথায় ত সেই ভাব রহিয়াছে। ইহা বিস্ময়জনক নহে কি? *

(৩) সকল ভাষাতেই শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা ভাষামধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম। প্রাচীন কবিগণ যে অর্থে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আধুনিক ভাষায় তাহার সে অর্থ নাই, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। এ বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় একই ভাবে অর্থের ব্যতিক্রম হইয়াছে, ইহাতে একটু কৌতুক আছে। (ক) ইংরাজী force এবং power শক্তি বুঝায় [illegible] Elizabethan English এবং পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্যে 'সৈন্য' বুঝায়; সংস্কৃত 'বল' শব্দের ঠিক এই দুই অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। (খ) ইংরাজীতে metal ও mettle আদৌ একই শব্দ; পরে metal ধাতু ও mettle প্রকৃতি অর্থে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালা-ভাষায় ধাতু বলিতে metal বুঝি। 'নরম ধাতের' 'চড়া ধাতের' 'সব ধাতে সহেনা' ইত্যাদি লৌকিক বাক্যে ধাত (ধাতুর অপভ্রংশ) ঠিক mettle অর্থে বসিল না কি? (গ) ইংরাজী error অর্থে ভুল; Elizabethan English এ error শব্দ কোনও কোনও

* সংস্কৃত হিম শব্দে বরফ বুঝায়। শৈত্য ভিন্ন হিমের আর একটী গুণ কাঠিন্য বা rigidity উদাহরণে rigid, stiff [illegible] আসিতেছে না কি?—পঃ সঃ।

স্থলে 'ঘোরা' অর্থে পাওয়া যায়; লাটিন হইতে উৎপন্ন knight-errant শব্দে ভ্রমণশীল বুঝায়। বাঙ্গালায় (সংস্কৃতে) ভ্রম, ভ্রান্তি এবং ভ্রমণ একই ধাতুর বিভিন্ন অর্থ। (ঘ) ইংরাজী lust শব্দ প্রথমে ইচ্ছা অর্থে (যথা—lust of gold) ব্যবহৃত ছিল, পরে ইহার কদর্থ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালায় (সংস্কৃতে) অর্থকাম, মাতৃকাম, পুত্রকাম, কামনা ইত্যাদি স্থলে কাম শব্দের ইচ্ছা অর্থ; কাম শব্দের অপর অর্থ সকলেরই বিদিত আছে।

(৫) উভয় ভাষার সৌসাদৃশ্য প্রবাদ বাক্যে অধিকতর দেখা যাইবে। কেননা এ সকল স্থলে সকল জাতির জ্ঞানিজন একই ভাবের জ্ঞান একরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। To rob Peter, to pay Paul গরু মেরে জুতো দান; The wearer best knows where the shoe pinches দেদোর মর্ম্ম দেদোয় জানে; mare's nest ঘোড়ার ডিম; ইত্যাদি স্থলে একই শিক্ষা, যদিও দৃষ্টান্তে বিভিন্নতা আছে। একটী স্থলে দৃষ্টান্তও উভয়ত্রই এক; যথা,—'The cat would eat fish and would not wet her feet' ধরি মাছ না ছুঁই পানি। ঠিক এই প্রবাদ বাক্য লাটিন ও ফরাসী ভাষায়ও প্রচলিত আছে।

(৬) ইংরাজীতে কতকগুলি *phrase* এবং প্রবাদ বাক্য আছে, তাহাদের চমৎকারিতার একটা নিদান, অনুপ্রাস। যথা—fret and fury, storm and stress, stock and stone, might and main; fat, fair and forty; plundering and blundering (রাজনীতি); where there is a *will*, there is a *way* ইত্যাদি। কুতূহলী পাঠক মহাশয় Rowe-Webb এর Hints নামক গ্রন্থ দেখিলে অনেক উদাহরণ পাইবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

ইংরাজী penny-wise, pound-foolish প্রবাদ বাক্যের অনুবাদ হইয়াছে 'কড়ায় কড়া কাহনে কানা'। এটী কবির লেখনীপ্রসূত, সুতরাং আসল অপেক্ষা নকল অধিকতর মনোহর হইয়াছে। আসলে উভয় বাক্যাংশে অনুপ্রাস (p, p) ছিল, এবং penny ও pound এর মধ্যে অসঙ্গতি বা বিরোধ ছিল; নকলে তদপেক্ষাও শ্রুতি সুখদ হইয়াছে। কিন্তু এটা নকল। 'দেশের জন্য ও দশের জন্য' একটা বাক্য আজ কাল দেখা যায়, কিন্তু ইহাও হাতগড়া। নিম্নের উদাহরণগুলি নৈসর্গিক নিয়মে স্বতঃই ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

(ক) প্রবাদ বাক্য যথা—

রাম ভজি কি রহিম ভজি।
রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে।
হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না।
বুড়াবয়সে চূড়াকরণ।
পেটে খেলে পিঠে সয়।
পেঁয়াজও গেল, পয়জারও গেল।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
কাযের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।
উড়ে এসে, যুড়ে বসে।
তিলকে তাল করা (make a Mountain of a mole-hill)
ভয়ও নাই, ভরসাও নাই।

পিঁড়েয় ( দাওয়ায় ) বসে, পেঁড়োর খবর দেওয়া।

সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ( স্বস্তি ) ভাল।

লাগে তীর না লাগে তুকো।

সাধুভাষা ( সংস্কৃত )।

ক্রিয়া কাণ্ড।
দোল দুর্গোৎসব।
দেব দ্বিজ।
ঘট পট।
ডিত্থ ডবিত্থ।
দয়া মায়া।
দয়া দাক্ষিণ্য।
মান মর্যাদা।
মান অপমান।
সু ও কু।
ছায়া ও কায়া ( কার )।
সত্য মিথ্যা।
গদা পদা।
বাগ্‌বিতণ্ডা।

শিশিরে সমুদ্র।
জীবন যৌবন।
গয়া গঙ্গা।
নিদ্রা তন্দ্রা।
শান্তি স্বস্ত্যয়ন।
ধ্যান ধারণা।
দীন হীন।
দীন দুঃখী।
গজ জীব রুদ্র শিব।
কৃষ্ণ বিষ্ণু।
সভা সমিতি।
আশা ভরসা।
জ্ঞান গোচর।
শ্রাদ্ধ শান্তি।

গ্রাম্য ভাষা।

( ১ )

ধুম ধাম
ধুম ধারাক্কা
ছেলে পিলে
ফাটকি লাটকি
সো সো
যোড়া তাড়া
আশে পাশে
পাকে প্রকারে
মিলে জুলে
নিকাশ প্রকাশ
হিসেব কিতেব
অসুখ বিসুখ
কাজ কর্ম্ম
করা কর্ম্মা

কাপড় চোপড়
বিষয় আশয়
চেয়ে চিন্তে
ফের ফাঁপর
তরী তরকারি
লোহা লক্কড়
লোক লস্কর
ফাই ফরমাশ
গণ্ড গোল
( গোবর গণেশ )
( গোঁসাই গোবিন্দ )
মাথা মুণ্ড
[illegible] বিপদ

| | |
|---|---|
| ভয় ভীত | পীর প্যাগম্বর |
| ভুল ভ্রান্তি | ফুটো ফাটা |
| চালাক চতুর | ফুটো চটা |
| মিলে মিশে | ফুটো ফাটা |
| জীব জন্তু | ধর পাকড় |
| মাল মসলা | ভাই ভায়াদ |
| বাছ বিচার | চিঠি চপাটি |
| বাছ গোছ | তাড়া হুড়ো |
| আচার বিচার | মাঝে মিশেলে |
| ঘোর ফের | হাসি খুসি |
| তত্ব তল্লাস | পাল পার্ব্বণ |
| দলীল দস্তাবেজ | পূজা পার্ব্বণ |
| জোর জবরদস্তি | ধরম করম |
| ছেলে ছোকরা | জর জারি |
| দাঙ্গা হাঙ্গামা | জর জ্বালা |
| মামলা মোকদ্দমা | জ্বালা যন্ত্রণা |
| হাঙ্গামা হুজ্জুত | ভয় ভাবনা |
| খোঁজ খবর | দায় দৈব |
| বর্ষা বাদল | খুন খারাপী |
| জ্ঞাত গোষ্ঠি | মারা ধরা |
| চোর ছেঁচড় | সাড়া শব্দ |
| মুটে মজুর | ছোট খাট |
| পাড়া পড়শী | রাজা রুজি ( উজীর ) |

( ৩ )

| | |
|---|---|
| দোল দুর্গোৎসব | মাঝি মাল্লা |
| অতিথ অভ্যাগত | ধোপা নাপিত |
| ব্রাহ্মণ বষ্টম | ডুলি মালী |
| তিলী মালী | নাম ধাম |
| তিলী তামুলী | কড়া ক্রান্তি |
| মুচি মুসলমান | পশু পাখী |
| মুচি মুদ্দফরাস | গেঁড়ি গুগলি |
| জেলে মাল্লা | কচু ঘেঁচু |

লতা পাতা
শাক সবজি
ক্ষীর সর
শাক শুক্তনি
পায়েস পিঠে
খাজা গজা
লুচি কচুরি
দুধ দই
মণ্ডা মেঠাই
ঝাল ঝোল
ফুল ফল
জাতি যূথী
মশা মাছি
মেষ মহিষ
কচু কুমড়ো
কাণা কুঁজো
নাকে মুখে
চোখে মুখে
নাক কাণ
কাগে বগে
কাকে কোকিলে
মাছ মাংস
মদ মাস
শাদা সিধে
গণা গাঁথা
নাড়ি ভুঁড়ি
বিড়ে বাড়ন
চুয়া চন্দন

ছাতা ছড়ি
জুতো ছাতা
কাপড় চাদর
খড়া চূড়া
সোণায় সোহাগা
শাঁখা সাড়ি
শাঁখা সিন্দূর
ঢাক ঢোল
গাড়ু গামছা
হুকো কলকে
ঘটি বাটী
ঘাট মাঠ
ভিটে মাটি
চড় চাপড়
ঘর বর
ছেলে ছুলে
দশ বিশ
হরু ভারু
রাম শ্যাম
যাদু মাধু
ভাই ভগ্নী
পিতা মাতা
মা মাসী
মাসী পিসী
মায়ে ছায়ে
মায়ে পোয়ে
বাপে বেটায়

( ৪ )

মেয়ে মরদ
মাগী মিন্‌সে
সদর অন্দর

ঘরে বাইরে
নরম গরম
উত্তম মধ্যম

| | |
|---|---|
| দুখে সুখে | ঠাকুর কুকুর |
| মিছে সাঁচা | কালা ধলা |
| আগা গোড়া | রাজা প্রজা |
| তেলে জলে | রাজা রায়ত |
| সাঁঝ সকাল | বিল খাল |
| সকাল বিকাল | ডেঙ্গা ডহর |

পুনশ্চ—

কবির কাব্যে অনেক সুন্দর অনুপ্রাস দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি কাব্য হিসাবে সুন্দর, ভাষাতত্ত্বে তাহাদিগের কোনও মূল্য নাই। কেন না সেগুলি কবির হাত গড়া, ভাষার স্বভাব গুণে স্বতঃ উদ্ভূত হয় নাই। এই কারণে বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক শব্দগুলিরও তত আদর নাই; গ্রাম্য ভাষায় যে সকল শব্দ আপনা হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেইগুলিই বিশেষরূপে কৌতূহলকর ও শিক্ষাপ্রদ।

যদ্ ও তদ্ শব্দের নিষ্পন্ন পদগুলির মধ্যে এই অনুপ্রাসগত মিল আছে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই তাহা দেখা যায়; ইংরাজিতেও then—when, thence—whence, ইত্যাদিতেও ঐ মিল রহিয়াছে। এগুলির স্বতন্ত্র উদাহরণ দেওয়া গেল না।

অপর কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বতন্ত্র শব্দ নহে। শব্দের বাঁকা করিয়া অপভ্রংশে তাহাদের সৃষ্টি। ভাত টাত, জল টল, ইহার উদাহরণ। এই জাতীয় শব্দের একটী তালিকা এবং তাহাদের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে একটী চিন্তাশীল প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় পূর্ব্ব এক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

[ লেখক মহোদয়ের প্রদত্ত শব্দযুগ্মের তালিকাটি আমরা চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এইরূপ বিভাগে বিভিন্নশ্রেণীর অন্তর্গত শব্দের সম্বন্ধ নির্ণয়ে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। লেখক মহাশয় কেবল মাত্র উচ্চারণগত অনুপ্রাস অবলম্বন করিয়া শব্দযুগ্মগুলির নির্ব্বাচন করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর প্রসঙ্গে "জল টল" "ঘর টর" "ছাতা টাতা" প্রভৃতি যে সকল শব্দযুগ্মের উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক সেগুলিকে এই তালিকায় স্থান দেন নাই। কিন্তু দেখিতে গেলে ঐ শ্রেণীর শব্দযুগ্মের সহিত এই শ্রেণীর শব্দযুগ্মের মৌলিক প্রভেদ বড় একটা নাই। 'জল টল' অর্থে জল এবং তৎসদৃশ অন্য পদার্থ; 'ছাতা টাতা' এখানে 'টাতা' অর্থে ছাতা জাতীয় অন্য পদার্থ; সেইরূপ বর্ত্তমান তালিকান্তর্গত 'ছেলে পিলে' অর্থ ছেলে ও তৎশ্রেণীস্থ মনুষ্য; 'কাপড় চোপড়' এখানে 'চোপড়' অর্থে কাপড় জাতীয় পদার্থ; এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট সজাতিক বা সশ্রেণীক পদার্থের উল্লেখের জন্য সাধারণ নিয়ম আদ্য অক্ষরে 'ট' বসান। ছেলে পিলে, কাপড় চোপড় প্রভৃতি স্থলে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম

হইয়া কেবল 'ট' বদলে অন্য একটা বর্ণ বসিয়াছে মাত্র। 'জল টল'. এর 'টল', 'ছাতা টাতা'র 'টাতা' যেমন অভিধানে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়া স্থান পায় না, সেইরূপ 'পিলে' 'চোপড়' শব্দেরও অভিধানে স্বতন্ত্র স্থান নাই। ছেলে ও কাপড়ের পার্শ্বে বসিয়া উহাদের যা কিছু অর্থব্যক্তি। 'আশে পাশে' 'পাকে প্রকারে' 'নিকাশ প্রকাশ' প্রভৃতি প্রত্যেকস্থলে প্রত্যেক যুগ্মের দ্বিতীয় শব্দটির ('পাশে' 'প্রকারে' 'প্রকাশ') অভিধানে স্থান আছে বটে, কিন্তু এটাও যেন আকস্মিক ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে। উহাদের খাতির কেবল অনুপ্রাসের অনুরোধে, তাহাদের স্বতন্ত্র অর্থ থাকার জন্য নহে। তালিকার মধ্যে প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের অনুরোধ বলবান্; দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগ্মকের অন্তর্গত দুইটি শব্দই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশিষ্ট আভিধানিক শব্দ, কিন্তু যুগ্মক মধ্যে তাহাদের স্থান মুখ্যতঃ অনুপ্রাসের, গৌণতঃ অর্থগত সম্বন্ধের অনুরোধে। এই অর্থগত সম্বন্ধ ক্রমশঃ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সহজেই বুঝা যাইবে।

প্রথম শ্রেণী—

কাপড় চোপড়=কাপড় ও তজ্জাতীয় অন্য পদার্থ।

হিসেব কিতেব=হিসাব ও তৎসদৃশ অন্য ব্যাপার।

লোহা লক্কড়=লোহা ও অন্যান্য লোহানির্ম্মিত পদার্থ।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

'কাজ কর্ম্ম' 'মাথা মুণ্ড' 'ছেলে ছোকরা' 'পূজা পার্ব্বণ' 'ছোট খাট' 'ভাই ভায়াদ' এই সকল স্থলে উভয় শব্দই তুল্যার্থক বা প্রায় তুল্যার্থক। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন প্রভেদ নাই। কেবল প্রথম শ্রেণীর 'চোপড়' ও 'কিতেব' আভিধানিক শব্দ নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 'কর্ম্ম' 'মুণ্ড' প্রভৃতি স্বাধীন আভিধানিক শব্দ।

তৃতীয় শ্রেণী—

'শ্রাদ্ধ শান্তি' 'মশা মাছি' 'ফুল ফল' 'ফুলি মালী' প্রভৃতি স্থলে উভয় শব্দ সমান জাতি, সম শ্রেণী, সম ব্যবসায়, একত্র অবস্থিতি প্রভৃতি বিবিধ সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। এই একত্র অবস্থিতি বা এক কার্য্যে বিনিয়োগ প্রভৃতি association এর সম্পর্ক ক্রমশঃ বিরোধ বা contrast এর সম্পর্কে পরিণত হইয়াছে। 'ভাই ভগ্নী' 'মায়ে পোয়ে' 'ঘাট মাঠ' প্রভৃতি স্থলে এই বিরোধের ভাবটাই যেন প্রবল।

চতুর্থ শ্রেণী—'ঘরে বাহিরে' 'সদর অন্দর' 'তেলে জলে' 'রাজা প্রজা' প্রভৃতি স্থলে এই বিরোধ বা contrast এর সম্পর্কটাই প্রবল দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে তুল্যার্থকতা অথবা স্বজাতীয়ত্ব সম্বন্ধ প্রবল ছিল, এক্ষণে তাহা বিপরীতার্থকতার ও বিরোধী ভাবের ব্যাপক সম্পর্কে দাঁড়াইয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদক।

---

# ভৌগোলিক পরিভাষা।

যে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়ন করিতে সাহিত্য পরিষৎ সন ১৩০৩সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ১৩০৬ সালের শেষভাগে তাহার সংস্কার হইয়াছে। অবশ্য ইহাও শেষ সংস্কার নহে। সেই পরিভাষার কতকগুলি দোষ দেখাইয়াছিলাম। সুখের বিষয় নূতন পরিভাষায় সে দোষগুলির পরিহার হইয়াছে। ভৌগোলিক পরিভাষা ছিল না বা এক্ষণে চলিত নাই, এমন নহে। অনেক দিন হইতে বঙ্গবিদ্যালয়ে ভূগোল পঠিত হইতেছে। ভাল হউক, মন্দ হউক, সেই পরিভাষা একেবারে বর্জনীয় নহে। কোন্ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দোষ কি, অগ্রে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পরে নূতন নির্বাচিত শব্দ যোগ করিলে বিচারের পক্ষে সুবিধা হইত।

এবারে শব্দগুলির এক একটা স্থূল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, এবং কোন্ শব্দ সংস্কৃত এবং কোন্ শব্দ দেশজ হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্থল বিশেষে দেশজ শব্দ গ্রহণ করায় কেবল শব্দ সঙ্কলনে সুবিধা, তাহা নহে; শব্দ প্রয়োগ কালেও সুবিধা। কিন্তু এরূপ শব্দ গ্রহণ করিবার সময় দেশের প্রচলিত শব্দ অন্বেষণ করা আবশ্যক। নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকেরা নদী নালা সম্বন্ধীয় অনেক শব্দ নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকে। সেইরূপ, যাহারা পাহাড়ে দেশে বাস করে, তাহারা পাহাড় পর্ব্বত সম্বন্ধীয় বহু শব্দ অবগত আছে। ভারতের নানা স্থানে পরিষদের সভ্য আছেন। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে পরিভাষা সমিতির কার্য্য লাঘব হইবে, এবং পরিভাষাও অনেকটা ব্যবহারযোগ্য হইয়া চলিত হইতে পারিবে।

আর একটি কথা আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় ভাল মন্দ পরিভাষা হইয়াছে। যাহাতে পারিভাষিক শব্দ সর্ব্বত্র কতকটা এক হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। হিন্দি, বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আরবী ভাষার মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃতমূলক শব্দের ত কথাই নাই, অনেক প্রাকৃত বা দেশজ শব্দও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রায় একরূপ দাঁড়াইয়াছে। এই সকল ভাষার শব্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে পরিভাষা সঙ্কলনে যেমন সুবিধা, তেমনই অন্ততঃ পারিভাষিক শব্দের ঐক্য স্থাপন দ্বারা দেশের উপকার হইবে। দুই একটি দৃষ্টান্ত পরে দেওয়া যাইতেছে।

নির্ব্বাচিত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। সমুদয় শব্দ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম না। বিচারের সুবিধার নিমিত্ত এক এক বিদ্যার শব্দসমূহ একত্র আলোচনা করিলাম।

Meteorology = অন্তরিক্ষ বিদ্যা, air = বায়ু, wind = বাতাস, breeze = হাওয়া, ইত্যাদি। আমরা বাতাস ও হাওয়ার মধ্যে কি প্রভেদ করি? এখানে একটুও বাতাস নাই = এখানে একটুও হাওয়া নাই। আবার, climate অর্থে জল বায়ুও বলি, আর হাওয়াও বলি। যদি breeze = হাওয়া, তবে sea-breeze = সমুদ্র সমীর কেন হইল? "কটকে সমুদ্রসমীর

পাওয়া যায়," বলিলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা সমুদ্র-বাতাস সহজে বুঝিবে। যদি বাতাস শব্দটা একান্ত বর্জ্জনীয় হয়, তবে সমুদ্রপবন বলিলে চলিতে পারে। বস্তুতঃ ওড়িয়া চলিত ভাষায় পবন শব্দটি আমাদের বাতাসের স্থান অধিকার করে। এইরূপ, storm অর্থে ওড়িয়া চলিত শব্দ 'বা'; 'বা' বাত্যার সংক্ষেপ। Typhoon শব্দকে ভাঙ্গিয়া 'তুফান' করা ঠিক নহে। বাঙ্গালায় তুফান শব্দ চলিত আছে; cyclone অর্থে তুফান শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা করিবার সময় একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। Typhoonকে টাইফুন বা তাইফুন, কিংবা হিন্দী ভাষার প্রকৃতি অনুসারে তৈফুন করিলেও চলে।

Whirl-wind = ঘূর্ণী। কিসের ঘূর্ণী? 'জলের ঘূর্ণী' বিলক্ষণ চলিত আছে। এজন্য whirl-wind = 'ঘূর্ণী বাতাস' করা আবশ্যক এবং এই শব্দই চলিত। 'ভ্রমি' শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা। বাঙ্গালায় বায়ু, বাতাস, ঝড়—এই তিনটি শব্দ দ্বারা air, wind, breeze, gale, storm, cyclone প্রভৃতি সমুদয় বুঝিয়া থাকি। অবশ্য ভাষা অসম্পূর্ণ। সংস্কৃত ভাষায় বাত্যা, বাতচক্র, এই দুই শব্দ চলিত। বাত্যা অর্থে storm বুঝি; বাতচক্রের অবিকল ইংরাজি cyclone। কিন্তু আধুনিক কালে চক্র শব্দটিতে আপত্তি আছে। তদ্ভিন্ন, বাতাবর্ত্ত শব্দটি প্রায় চলিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও যখন বাতাবর্ত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন উহার চলন হইবার সম্ভাবনা আছে। Whirl-wind = ঘূর্ণী বাতাস, tornado = ঘূর্ণী ঝড় করিলে চলিত কথার সহিত ঐক্য থাকিবে। Monsoons = মৌশুমী বাতাস; তবে trade-winds = বাণিজ্য সমীর কেন? বাণিজ্য বাতাস বলিলে দোষ কি? Thunder-storm = ঝঞ্ঝা। কিন্তু ঝঞ্ঝা অর্থে ঝড়ের বা বৃষ্টির বা উভয়ের শব্দ। অতএব ঝঞ্ঝা শব্দ দ্বারা thunder-stormএর দুইটি অঙ্গ lightning and thunder মনে আসে না। ঝঞ্ঝা-বাত = stormy gale or squall। Cyclone এর একটি বিশেষ লক্ষণ ঝঞ্ঝা। কিন্তু thunder-storm = a series of electrical discharges between cloud and cloud, or between clouds and the earth—সুতরাং ঝঞ্ঝা শব্দটি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

Atmosphere = অন্তরীক্ষ মণ্ডল, অন্তরীক্ষ। কিন্তু অন্তরিক্ষ বলিলে বায়ুর অস্তিত্ব আদৌ মনে হয় না। বস্তুতঃ অন্তরিক্ষ শব্দের অর্থ আকাশ, space বিশেষ। "দিব্য, আন্তরিক্ষ, ও ভৌম, এই ত্রিবিধ কেতু আছে"—অর্থ দিব্য স্থানে (যেখানে গ্রহনক্ষত্রাদি আছে), ভূমি বা পৃথিবীতে, এবং অন্তরিক্ষে অর্থাৎ দিব্য ও ভৌমস্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে। এই তিন প্রদেশে এগারটি করিয়া তেত্রিশটি বৈদিক দেবতা ছিলেন। Atmosphere অর্থে সংস্কৃত জ্যোতিষে ও পুরাণে ভূ-বায়ু ও আবহ শব্দের প্রয়োগ আছে। আবহ যে atmosphere, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। লল্ল, শ্রীপতি, ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতিষীরা আবহের উচ্চতা ১০।১২ যোজন অর্থাৎ প্রায় ৫০।৬০ মাইল নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে ইহাতেই মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইয়া থাকে। যথা শ্রীপতি,

নির্ঘাতোল্কাঘনস্তুরধনুর্বিদ্যুদস্তঃ ক্ষুবায়োঃ
সংদৃশ্যন্তে খনগরপরীবেষপূর্ব্বং তথান্তৎ।

লিঙ্গপুরাণ লিখিয়াছেন, যতদূর পর্য্যন্ত মেঘের সঞ্চার হয়, পৃথিবী হইতে ততদূর পর্য্যন্ত আবহ। [illegible] বৎসর হইতে আমি atmosphere = আবহ, আবহমণ্ডল এবং স্থান বিশেষে [illegible] লিখিয়া আসিতেছি। এপর্য্যন্ত কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। Meteoro-[illegible] আবহবিদ্যা, meteorologist = আবহবিৎ, ইত্যাদি।

[illegible]ud = মেঘ, ইত্যাদি। আমাদের পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে কয়েক প্রকার মেঘের নাম [illegible] যায়। বাছিয়া [illegible] সেই সকল শব্দ সজীব হইতে পারে। বৃহৎসংহিতা, [illegible] ও লিঙ্গাদি পুরাণে কতকগুলি মেঘের বর্ণনা আছে। যথা, অভ্র—যে মেঘ হইতে [illegible] না। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ বলেন, চন্দ্রের দগ্ধ হইতে পৃথিবীর [illegible] হইয়া যাহা বায়ুদ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হয়, তাহাই অভ্র। এই মেঘের সহিত stratus [illegible] দেখা যায়। "Stratus is a fine weather cloud, and looks like [illegible]e of lifted fog." [illegible] অভ্র (mica) যেমন স্তরাকারে দেখা যায়, stratus [illegible] সেইরূপ দেখায়। জীমূত নামক মেঘ সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণ বলেন, "উহা জলের [illegible] পৃষ্ঠ হইতে অর্দ্ধক্রোশ মাত্র ঊর্দ্ধে থাকে।" বায়ুপুরাণ বলেন, জীমূত মেঘ বিদ্যুৎ [illegible] জলধারাবলম্বী, মূক, মহাকায়, ক্রোশমাত্রে বা ক্রোশার্দ্ধে বর্ষণ করে, পর্ব্বতাগ্রে [illegible] বর্ষণ করে, এবং বলাকার গর্ভ প্রদান করে, ইত্যাদি। এই বর্ণনার সহিত nimbus cloud এর সাদৃশ্য আছে। অতএব জীমূত মেঘকে nimbus cloud বলিতে পারি। এই [illegible] প্রকার মেঘের বর্ণনা যেমন বিস্তৃত, পুষ্কর, আবর্ত্তক, সম্বর্ত্ত মেঘের বর্ণনা তেমন নহে। তবে [illegible] যায়, পুষ্কর মেঘের [illegible] যেন cumulus এর সাদৃশ্য আছে। আবর্ত্তকের পৃথক্ বর্ণনা পাই[illegible] আবর্ত্ত অর্থে [illegible] ও অলকা আছে। সুতরাং অলক মেঘ নূতন [illegible] না করিয়া পুরাতন আবর্ত্তককে cirrus cloud অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আরও দেখা যায়,

আবর্ত্তো নির্জ্জলো মেঘঃ সম্বর্ত্তশ্চ বহূদকঃ।
পুষ্করো দুষ্করজলো দ্রোণঃ শস্যপ্রপূরকঃ॥

দ্রোণ ও জীমূত [illegible] বোধ হয়। সকলে এই সকল পুরাতন নাম গ্রহণ করিতে হয়ত সম্মত হইবেন না। [illegible], জীমূত ও আবর্ত্তক, এই তিনটি নাম গ্রহণ করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। Cumulus cloud এর বাঙ্গালা নাম স্তূপ মেঘ করা অপেক্ষা ঊর্ণমেঘ করিলে ভাল হয়। স্তূপ মেঘ বলিবার সময় ঐ নামের উৎপত্তি বুঝাইতে হইবে। বলিতে হইবে, স্তূপ অর্থাৎ তুলা স্তূপ; তুলা স্তূপের ন্যায় আকার বলিয়া নাম স্তূপমেঘ। Cumulus এর চলিত ইংরাজি নাম wool-pack cloud। তবে নামগুলি এই রূপ দাঁড়াইল,

stratus—অভ্র মেঘ
cumulus=পুষ্কর বা ঊর্ণমেঘ
cumuls-stratus=ঊর্ণাভ্রমেঘ
nimbus=জীমূত মেঘ
cirrus=আবর্ত্তক মেঘ
cirro-stratus =আবর্ত্তকাভ্র মেঘ
cirro-cumulus=আবর্ত্তকোর্ণ মেঘ

climate—জলবায়ু। Weather অর্থে আমরা দিন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। "আজ দিনটে খারাপ" "যে দুর্দ্দিন, তাতে কেনা বেচা ভার," ইত্যাদি। Bad weather=দুর্দ্দিন, good weather=সুদিন। বায়ু পুরাণে "শীতদুর্দ্দিনবাতা"।

Aurora=উষা। সকল স্থলে ইংরাজির অনুবাদ চলিবে না। Aurora অর্থে উষা, তেমনই dawn অর্থেও উষা। ইংরাজিতে দুটী শব্দ আছে, আমাদের সম্বল একটী। এজন্য কেহ কেহ মেরুজ্যোতিঃ, কেহবা আরও অধিক গিয়া কেন্দ্রীয় উষা করিয়াছেন। কোনটাই ভাল বোধ হয় না। অপর কোন শব্দও স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের গন্ধর্ব্বনগর নামক ব্যাপার আলোচনা করিয়া এক একবার মনে হইয়াছে যেন তদ্দ্বারা প্রাচীনেরা aurora বুঝিতেন। সকল স্থলে নহে। কোথাও গন্ধর্ব্বনগর দ্বারা "looming" বুঝিতেন, কোথাও বা যেন aurora। বস্তুতঃ গন্ধর্ব্বনগর (অন্য নাম খপুর) যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার সদৃশ ব্যাপার aurora প্রায় মনে আসে। আমার অনুমানের হেতু নির্দ্দেশ করিবার অবকাশ এখানে নাই। অনুমান মিথ্যা হইলেও ঐ শব্দটী aurora অর্থে গ্রহণ করিতে বলিতে পারি। গন্ধর্ব্ব নগরের বিবরণ বৃহৎ সংহিতায় দ্রষ্টব্য।

Astronomy—জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বলাই শ্রেয়ঃ। Azimuth=আশাংশ। কেন? দিগংশ, দিগংশ যন্ত্র বহু চলিত। Geometry=জ্যামিতি। উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে মাত্র, অন্য গুণ নাই, বরং দোষ আছে। ক্ষেত্রতত্ত্ব করাই উচিত। Chord=জ্যা। ঠিক বটে, কিন্তু সংস্কৃত জ্যোতিষে জ্যা শব্দে sine of an angle বুঝায় *। Sine=জ্যার্দ্ধ ছিল, অর্দ্ধটুকু লোপ পাইয়া কেবল জ্যাতে দাঁড়াইয়াছে, তেমনই যোজনার্দ্ধ, মাসার্দ্ধ ইত্যাদির অর্দ্ধ লোপ পাইয়া বিলক্ষণ গোলযোগ ঘটিয়াছে। Tangent অর্থে স্পর্শিনী শব্দ চলিত আছে। উহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখি না। বাঙ্গালা ত্রিকোণমিতিতে জ্যা (sine) অর্থ শিঞ্জিনী, কোটি জ্যা (cosine) অর্থে কোটি শিঞ্জিনী, এবং উহাদের সংক্ষেপে শিন্ ও কোশিন্ হইয়াছে। ইংরাজি শব্দের সহিত উচ্চারণ সাদৃশ্য রক্ষা নিমিত্ত বোধ হয়

---

* সিদ্ধান্তশিরোমণিতে

অর্দ্ধজ্যাগ্রে খেচরো মধ্যসূত্রাৎ তির্য্যক্ [illegible] জ্যাগ্রে যেন [illegible]।

অর্দ্ধজ্যাভিঃ কর্ম্মসর্ব্বং গ্রহাণামর্দ্ধৈ[illegible]

জ্যা পরিবর্ত্তে শিঞ্জিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। জ্যা ও শিঞ্জিনীর অর্থ এক এবং sine অর্থে শিঞ্জিনী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু sine A = sine of A অনুকরণ করিতে গিয়া শিন্ অ লেখা বা বলা আমাদের ভাষার রীতির অনুযায়ী নহে। আমরা বলি, অ কোণের শিঞ্জিনী। সুতরাং 'শিন্ অ' না বলিয়া 'অ শিন্' বলা উচিত। এইরূপ সংস্কৃত জ্যোতিষে ত্রিরাশির জ্যা = ত্রিজ্যা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই।

Horizontal = ক্ষিতিজগামী। ভাল শুনায় না। ক্ষিতিজসম করিলে বোধ করি ভাল শুনায়। Horizontal অর্থে জলসম শব্দ পাইয়াছি। Make the surface horizontal = পৃষ্ঠভাগ জলসম কর। Level = লেবেল করিবার কারণ বুঝিলাম না। বোধ হয় জলসম শব্দটি level অর্থে রাখা যাইতে পারে।

Vertical = উল্লম্বী। ভাল বোধ হইতেছে না। Vertical diameter = ঊর্দ্ধ রেখা, transverse diameter = তির্য্যক্ রেখা, জ্যোতিষে আছে। এইরূপে, vertical line = ঊর্দ্ধ রেখা, vertical plane = ঊর্দ্ধাধঃ তল।

Day, solar = সৌর দিবস। সংস্কৃত জ্যোতিষে সৌর দিবসের পারিভাষিক অর্থ আছে। ৩৬০ সৌর দিবসে ঠিক এক সৌর বৎসর। কিন্তু প্রায় ৩৬৫।০ কু-দিনে (কু = পৃথিবী), পৃথিবীর দিনে (পৃথিবীর আবর্ত্তনজ দিনে) এক সৌর বৎসর। সুতরাং আমাদের কুদিবস ফলে ইংরাজি solar day। চলিত কথায় সৌরদিবসই বোধ হয় চলিবে।

Leapyear = পরিবৎসর। বৃদ্ধি বৎসর করিলে দোষ কি? বৃদ্ধি তিথি, বৃদ্ধি নক্ষত্র যেমন আছে, তেমনই বৃদ্ধি বৎসর বা বৃদ্ধিবৎসর হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, কেবল ইংরাজি অব্দ গণনার সময় বৃদ্ধি বৎসর শব্দটী আবশ্যক হইবে।

Meteor, detonating = নির্ঘাত। উল্কা সম্বন্ধীয় শব্দ সকল পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এখানে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই। ফলে নির্ঘাত detonating meteor নহে। উহা a sudden clap of thunder বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে। নির্ঘাত-সম্ভব সম্বন্ধে বৃহৎ সংহিতা—পবনঃ পবনাভিহতো গগনাদবনৌ যদা সমাপততি ভবতি তদা নির্ঘাতঃ।

নির্ঘাতের কেবল ভৈরব গর্জ্জন শব্দ স্মরণ করিলে চলিবে না।

Fire ball = বহ্নিগোলক। বাঙ্গালায় বহ্নি-গোলক পারিভাষিক হইতে পারিবে কি? এই শব্দের পরিবর্ত্তে পুরাতন শব্দ গ্রহণ করিলে চলে। প্রহরণার্থক বজ্রের দ্বিবিধ আকার বর্ণিত আছে। এক আকার বিষ্ণুর চক্রের ন্যায়। উহা globular lightning বা fireball মাত্র। অন্য আকার × এইরূপ। বজ্র = হীরক; হীরকের আকার এই প্রকার। ইন্দ্রের বজ্র অশ্মময় বা আয়স ছিল। তাহা lightning tubes or fulgurites বলিয়া বোধ হয়। আন্তরিক্ষ জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে উল্কা একটি। উল্কা সামান্য নাম; ধিষ্ণ্যা, উল্কা, অশনি,

বিদ্যুৎ ও তারা,—উল্কার পাঁচ প্রকার। বৃহৎ সংহিতা পাঠ করিলে জানা যায় যে, তারাগুলি shooting stars। "তারা খসিয়া পড়িতেছে"—আমরা এখনও বলিয়া থাকি। দিক্ষা ও উল্কা meteors; কিন্তু উল্কা পড়িবার সময় শব্দ করে, ধিষ্ণ্য করে না। সুতরাং উল্কা যাহা প্রাচীনেরা detonating meteors or bolides বুঝিতেন। অশনি ও বিদ্যুৎ এক নহে। অশনি অর্থে উৎপল "অশ্মবর্ষণমুক্তাভেদো বা" বলিয়া সন্দেহ নিরাকৃত করিয়াছেন। অতএব এগুলি meteorites or aerolites বলিয়া বোধ হয়। "অশনি উল্কা মহাশব্দে ভূমি বিদারণ করে, মনুষ্য-গজ-অশ্ব-মৃগ-প্রস্তর-গৃহ-তরু-পশুর উপর পতিত হয়, অশনি উল্কার সংস্থান চক্রাকার।" অবশ্য অশনির আর এক অর্থ বজ্র আছে। উপরে তাহা বলা গিয়াছে। উল্কা সম্বন্ধে তবে এইরূপ দাঁড়াইল

Meteor = উল্কা

Meteorites = অশনি উল্কা

Shooting stars = তারা উল্কা

Detonating meteors = উল্কা

Fireball = বজ্র গোলক

Nadir = অধঃস্বস্তিক। শব্দটি কিছু দীর্ঘ, তেমনই উর্দ্ধ স্বস্তিক। Zenith = খ-মধ্য আছে, কিন্তু nadir এর তেমন ছোট শব্দ নাই। উর্দ্ধ বিন্দু, অধোবিন্দু করিলে চলে না?

Rotation = আবর্তন। ঠিক। কিন্তু revolution = ভগণগতি, ভ্রমণ; শব্দ দুটি general নহে। Revolution = পরিবর্ত্ত শব্দটি কেবল জ্যোতিষে নহে, পুরাণেও প্রসিদ্ধ। তেমনই আর একটি শব্দ প্রদক্ষিণ করা। যথা, বায়ু পুরাণে (৩২ অঃ) আকাশগঙ্গা সম্বন্ধে

পরিবর্ত্তত্যহরহো যথা সূর্য্যস্তথৈব সা।
বেগেন কুর্বতী মেরুং সা প্রযাতা প্রদক্ষিণম্॥

Constellation = তারা প্রকোষ্ঠ। ইহার প্রতিশব্দ লইয়া পূর্ব্বে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। নক্ষত্র শব্দ ব্যবহার করিলে দোষ কি? বৈদিক সময়ে নক্ষত্র অর্থে ঠিক constellation ছিল। ক্রমে অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি চন্দ্র পথের সাতাশটি কাল্পনিক ভাগ বুঝাইতে নক্ষত্র শব্দের ব্যবহার ঘটে। কিন্তু এখনও নক্ষত্র শব্দের অর্থে a group of stars বুঝায়। রোহিণী নক্ষত্র বলিলে একটি তারা বুঝায় না। অবশ্য নক্ষত্র অর্থে ক্রমে তারাও বুঝাইয়াছে। কিন্তু প্রায়ই কতকগুলি তারাসমষ্টি বুঝায়। Constellationও তাই। তবে, মেষবৃষাদিকে নক্ষত্র বলা যায় না, তাহাদের পৃথক্ নাম রাশি আছে। সুতরাং সাবধানে নক্ষত্র শব্দ ব্যবহার করিলে constellation বুঝাইতে পারা যায়। Star = তারা; star-cluster = নক্ষত্রপুঞ্জ না করিয়া তারাপুঞ্জ বলা উচিত। আর একটি শব্দ পুরাণে দেখিতে পাই। মৎস্য ও বায়ু পুরাণে নক্ষত্রবূহ শব্দ ঠিক না থাকিলেও ব্যূহাকারে সংস্থিত এরূপ প্রয়োগ আছে।

এত বিচারে প্রয়োজন নাই, তারাপুঞ্জ যথেষ্ট। নক্ষত্র শব্দের তিনটি অর্থ প্রচলিত আছে, সুতরাং ঐ শব্দটি ব্যবহার সময়ে অসাবধান হইলে বিভিন্ন অর্থ আসিতে পারে। যদি অন্য শব্দ একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তারা গৃহ (তারাময় গৃহ) করিতে বলি; নক্ষত্র সমূহ দেবতার গৃহ, এই ভাব বৈদিক সাহিত্য হইতে পুরাণে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। এই ভাব রক্ষা করিয়া তারাগৃহ বা নক্ষত্রগৃহ করা চলে।

Zodiacal light = ভচক্রভা। ইংরাজির অনুবাদ বটে, কিন্তু ভাল শুনায় না। Zodiacal light প্রাচীনেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি নাম দিয়াছিলেন, এতদ্বিষয় আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি। একটি শব্দ 'পরিঘ' পাইয়াছি। উহা ঠিক Zodiacal light কি না, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। তবে, অন্য শব্দের অভাবে এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণে এক একবার মনে হইয়াছে যেন পরিঘ অর্থে Zodiacal light। যাহাই হউক, উহাকে Zodiacal light এর প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহার করিলে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দেখি না। বৃহৎসংহিতায় উহার বর্ণনা আছে।

Geology = ভূবিদ্যা।

Archaean = আর্কিক। আদিম করিলে একটা অর্থ পাওয়া যায়। Carboniferous = অঙ্গারবহ। আঙ্গারিক করিলে কাম্ব্রিক, ডিভনিক প্রভৃতির মত ইক ভাগান্ত হয়, অথচ অর্থবোধেও কষ্ট হয় না। ডিবনিক, না ডিভনিক? কেহ কেহ ভিক্টোরিয়া না লিখিয়া বিক্টোরিয়া লেখেন। কিন্তু বাঙ্গালা ব কি ইংরেজি v বর্ণের উচ্চারণ আনিয়া থাকে? পরিষদের শব্দনিৎ পণ্ডিতগণকে ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করি।

Moraine = গ্রাবরেখা। গ্রাবমালা ভাল বোধ হয়। কিন্তু রেখাই হউক, মালাই হউক, গ্রাবশব্দ যোগে পারিভাষিকত্ব আনা দুষ্কর।

Seismograph = স্পন্দনমান যন্ত্র। আধুনিক অধিকাংশ যন্ত্রের নামে graph, scope ও meter দৃষ্ট হয়। এই তিনটির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা করিলে সুবিধা হইতে পারে। Graph = লেখ, scope = দর্শন বা বীক্ষণ, meter = মান করিলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবশ্যক বাঙ্গালা নাম রচনা করিবার সময় সুবিধা হইতে পারে। যথা,

Seismograph = ভূস্পন্দলেখন। (ভূ শব্দ যোগ করা আবশ্যক)

Sphygmograph = নাড়ীস্পন্দলেখন

Barograph = বায়ুচাপলেখন

Electroscope = তাড়িদর্শ

Microscope = অণুদর্শন বা অণুবীক্ষণ

Laryngoscope = কণ্ঠবীক্ষণ

Electrometer = তাড়িতমান

Manometer = চাপমান

Thermometer = উষ্ণতামান ইত্যাদি।

Alluvium = পলল ; silt, sediment = পলি।

পশ্চিম বঙ্গে পলি শব্দটা যত চলিত, পূর্ব্ববঙ্গে তত নহে। আমার প্রাকৃত ভূগোলে আমি পলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু চট্টগ্রামের কোন পণ্ডিত মহাশয় আমাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শেষে পলি শব্দের পর পলল শব্দ যোগ করিতে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে নাকি পলি নামক পদার্থটি নাই, থাকিলেও কাদা বা পাঁক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য বোধ হয় পলল ও পলি পৃথক্ রাখা সহজ হইবে না। বড় একটা আবশ্যকতাও নাই। Mould = কর্দ্দম। কর্দ্দম বলিলে কাদা বুঝি, সুতরাং হইতে পারে না। তদ্‌ভিন্ন, clay, clayey আছে। আমার মতে mould = মাটি বা মৃত্তিকা রাখিলেই চলে। Vegetable mould = পাতা পচা মাটি, black mould = কাল মাটি চলিত আছে। Coal পাতর কয়লা নহে, বোধকরি পাথর বা পাথুরে কয়লা হইবে।

Fossil = জৈবাশ্ম। অনুবাদ ঠিক হইলেও আধুনিক বিস্তৃত অর্থসূচক হইল না। জীবাস্ত বা জীবশেষ করিলে বরং অর্থ রক্ষা হইতে পারে। Metamorphic = পরিণত। বিকৃত করিলে কেমন হয়? Plutonic = পাতালজ। পাতালিক করা চলে না?

River = নদী। Affluent, tributary = শাখা। Branch এর বাঙ্গালা কি হইবে? একটি শব্দ, উপনদী, আছে। Cascade = নির্ঝর?

Physics = পদার্থ বিজ্ঞান। নামটা চলিত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ ভূতবিজ্ঞান বা শক্তি-বিজ্ঞান করিতাম।

Gas = অনিল। ভাল বোধ হইল না। পুরাতন অথচ প্রচলিত শব্দের পারিভাষিকত্ব আসিতে বহু বিঘ্ন। Air is a gas—বায়ু এক প্রকার অনিল, বলিলে কি বুঝিব? Air = ভূ-বায়ু করিলে বরং বলা চলে, ভূবায়ু এক প্রকার বায়ু। সে যাহা হউক, গ্যাস শব্দটাকে তাড়ান বড় সহজ হইবে না। গ্যাসের আলো হওয়া অবধি ঐ শব্দটি আপামর সাধারণের অভ্যস্ত হইয়াছে। কদর্য্য বস্তুও অভ্যাসগুণে প্রিয় হয়।

Liquid = তরল। তরল = fluid, দ্রব = liquid, এরূপ প্রয়োগ আছে। Mobile = সরিল, viscous = শ্যান। Mixture = কবর। শব্দটি জানি না। চলিত ইংরাজি শব্দের, বিশেষতঃ ডাক্তারখানার একটা নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দের, এরূপ অপ্রচলিত প্রতিশব্দ চলিবে কি? এইরূপ, acid = শট, ইত্যাদি শব্দগুলির চলন সম্ভাবনা দেখি না। বিশ্লেষণ শব্দটি analysis অর্থে এত চলিত হইয়াছে যে উহা দ্বারা dissociation বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। এইরূপ, crystal = অর্ক করিয়া চলিত স্ফটিক ত্যাগ করা সহজ নহে। Amorphous অর্থে সর্ব্বাবয়ব সর্ব্বাকার শব্দ সংস্কৃত আছে। রত্নপরীক্ষায় এই প্রকার অনেকগুলি শব্দ পাওয়া যায়। যথা,

Hard = অভেদ্য, কঠোর, নিষ্ঠুর

Soft = মৃদু

Even (surface) = সম

Uneven = বিষম

Perfect = অব্যঙ্গ

Flaw (in a gem) = ত্রাস

Striated = রেখাযুক্ত

Specific gravity = গুরুত্ব

Density = ঘনত্ব

Transmitted colour = ছায়া

Transmission = বমন

Transparency = অচ্ছতা

Brilliancy = দীপ্তি, অর্চ্চিষ্মত্তা

Opalescent = অবদীপ্ত

Dichroic (?) = দ্বিচ্ছায়

Mineral = ধাতু

Symmetrical = অনুপূর্ব

Colourless = বিশুদ্ধ

Whiteness = বৈশদ্য

Beam of light = অংশুজাল

Luminous = অংশুমান্

Natural = সহজ, আকরজ

Angle (of a crystal) = কোটি, কোণ, অস্রি

Face = পার্শ্ব

Edge = ধারা

Apex = অগ্র ইত্যাদি

Colour = বর্ণ। Orange = অরুণ, কিন্তু অরুণ অর্থে অনতিরাগ বা ঈষৎ লোহিত বর্ণ। Indigo = ইন্দীবর। কিন্তু ইন্দীবরের বর্ণ indigo নহে, blue। Violet = কাপোত। কাপোত শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, অর্থ dirty white or grey।* কোন্ প্রকার বর্ণের সংস্কৃত নাম আছে, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বহুবিধ বর্ণের নাম আছে, কিন্তু ঠিক violet বুঝায়, এরূপ একটি শব্দ পাই নাই। অমরকোষে অনেকগুলি বর্ণের নাম আছে। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণ বৃক্ষাদির পত্র পুষ্প ও পক্ষ্যাদির পক্ষের বর্ণের সহিত উপমা

* রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ( ১১ সঃ ) কপোতবর্ণ ও অরুণ বর্ণ এক বলা হইয়াছে। যথা, কপোতাভারুণো [illegible]—অর্থাৎ কপোতাভবৎ অরুণ—ধূসরবর্ণ ধন।

দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। বর্ণজ্ঞাপনের ইহাই প্রকৃষ্টবিধি। এক রক্তবর্ণ কতপ্রকার আছে; অশোকপুষ্পবর্ণ, দাড়িম্ববীজবর্ণ, লাক্ষাবর্ণ, গুঞ্জাবর্ণ, জবাবর্ণ, ইন্দ্রগোপবর্ণ ইত্যাদি। যাহা হউক, orange = নারঙ্গবর্ণ করিলে দোষ কি? Indigo = মহানীল বা অতিনীল। ইন্দ্রনীলের বর্ণ মহানীল। Violet অর্থে বোধ করি রক্তনীল করিতে হইবে। ধূমল, ধূম্রলোহিত শব্দ দ্বারা purple বর্ণও বুঝায়।

Spectrum = লেখা। কেবল লেখা না করিয়া বর্ণলেখা করা আবশ্যক; spectroscope = লেখাবীক্ষণ না করিয়া বর্ণবীক্ষণ বা বর্ণলেখাবীক্ষণ করিলে অর্থ স্পষ্ট হয়। Spectrum analysis = লৈখিক বিশ্লেষণ। বর্ণ বিশ্লেষণ বলিলে অর্থ স্পষ্ট হইতে পারে। লেখন বিদ্যাও আছে।

Reflection = পরাবর্ত্তন। আমিও এই শব্দটির পক্ষপাতী। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার পরিবর্ত্তে মূর্চ্ছন পাইয়াছি। Refraction এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই, কেন না প্রাচীন কালে refraction এদেশে অজ্ঞাত ছিল। তবে, কিরণবিঘট্টন ফলে refraction অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, শ্রীপতি ইন্দ্রধনুর সম্ভব সম্বন্ধে

> সূর্য্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাভ্রে।
> বিয়তি ধনুঃসংস্থানা যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ॥

পরিবেষ সম্বন্ধে,

> সংমূর্চ্ছিতা রবীন্দ্বোঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ।
> নানাবর্ণাকৃতয়স্তম্বভ্রে ব্যোম্নি পরিবেষঃ॥

Dispersion = বিশ্লেষণ। ইহার পরিবর্ত্তে বিস্ফারণ করিলে এক বিশ্লেষণ শব্দের বহু অর্থ করিতে হইবে না।

Magnetic meridian = চৌম্বক যাম্যোত্তর রেখা। বড় লম্বা হইল। Meridian = মধ্যরেখা আছে। চৌম্বক মধ্যরেখা করিলে শব্দটি ছোট হয়।

Magnetic declination = চুম্বকক্রান্তি। চুম্বক বলন (variation) বলা যাইতে পারে।

Dip, inclination = চুম্বকাবনতি। চুম্বকনতি আরও ছোট।

Biology = জীব বিদ্যা।

Morphology = শরীর বিদ্যা। অর্থ বড় বিস্তৃত হইল। অঙ্গবিদ্যা?

Physiology = প্রাণবিদ্যা। উদ্ভিদের প্রাণ থাকিলে উদ্ভিদকে প্রাণী বলিতে হয়। বোধ হয়, জীবনবিদ্যা করা আবশ্যক।

Fauna = প্রাণিবর্গ, Flora = উদ্ভিদ্ বর্গ। শব্দ দুইটি দ্বারা ঠিক অর্থ বোধ হয় না।

Organ = অবয়ব, দেহ। বরং অবয়ব বলা যাইতে পারে, কিন্তু দেহ বলিতে পারা যায় না। The liver is an organ of our body,—ইহার অনুবাদ কি হইবে?

Cell = কোষাণু। বোধ হয়, শুধু কোষ করিলে চলিতে পারে। কিন্তু কোষের ভাবটা ত্যাগ করিয়া a unit of living partoplasm এর ভাব আনিতে পারিলে শব্দটি ঠিক হয়।

Protoplasm = জৈবানিক, জীবপঙ্ক। বরং জৈবনিক ভাল, জীবপঙ্ক কেমন কেমন লাগে।

Structure = গঠন, গঠনপ্রণালী। এই শব্দ দ্বারা configuration বুঝিতে পারি; কিন্তু structure বুঝাইতে অন্য শব্দ আবশ্যক। রচনা কেমন? যেমন it is a structureless membrane, it exhibits no structure অনুবাদ কি হইবে?

Art = কারু শিল্প। Fine art = কলা।

শিল্প, শিল্প শাস্ত্র, কলা বিদ্যা, ললিত কলা প্রভৃতি শব্দগুলি আজকাল যথেচ্ছরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু সংস্কৃতে কারু, শিল্প প্রভৃতির অর্থ প্রায় স্পষ্ট আছে। কারু অর্থে artisan বুঝি; একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কারিগর বলি না, তাহার কারিগরী দেখিলে তাহাকে কারিগর বলিতে পারি। তিনি স্থপতি, তক্ষক। আমাদের বিশ্বকর্ম্মা কারু, শিল্পী, স্থপতি, তক্ষক ছিলেন। গৃহাদি নির্ম্মাণ বিদ্যাকে বাস্তু বিদ্যা বলে। ময় এবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। এজন্য বাস্তু বিদ্যার অপর নাম ময়-মত আছে। তক্ষক অর্থে carpenter, স্থপতি অর্থে architect। কারখান বা কারখানা = workshop। স্থাপত্য বিদ্যা বলিলে mechanics বুঝায়। শিল্প শাস্ত্র অর্থে manual, mechanical, and fine arts; শিল্প শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত; বাহ্যকলা ও আভ্যন্তর কলা। গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য প্রভৃতি ৬৪টি বাহ্যকলা দেখিলে শিল্প শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারা যায়। আভ্যন্তর কলা, রতিশাস্ত্রের অন্তর্গত। Practical sciences and arts বুঝাইতে অর্থ শাস্ত্র আছে। Fine art অর্থে সুকুমার বা ললিত কলা বলা আবশ্যক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

---

# প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

[চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের এই বিবরণ আমরা বিশেষ আদরের সহিত প্রকাশ করিলাম। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তির জন্য প্রবন্ধ-লেখক বিশেষ ধন্যবাদার্হ।—পত্রিকা-সম্পাদক।]

বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহার প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন পাইয়া আমরা কখনও বা আনন্দরসে আপ্লুত হই, কখনও বা ইহার শৈশব-স্বভাবসুলভ

হীনতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনা হই। আমাদের এই হর্ষবিষাদ বাহ্য স্থূলদৃষ্টির কার্য্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষা কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্থির নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়কে উহার উৎপত্তিকাল বলিয়া নিশ্চয় নির্ণীত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। বহুযুগব্যাপী সাধনায়, বহুলোকের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও চেষ্টায় একটী ভাষা সৃষ্ট, পরিপুষ্ট ও উন্নত হয়। জগতের যে যে ভাষা আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহারাও এক দিনে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কেন না, প্রকৃতি নিজেই অভিব্যক্তির বশবর্ত্তিনী। প্রকৃতিরাজ্যের সর্ব্বত্রই এই নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা পরিস্ফুট রহিয়াছে।

আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষাও কিছু এক দিনে বা এক ব্যক্তি দ্বারা এই সমুন্নতি প্রাপ্ত হয় নাই। বহুলোকের বহুযুগব্যাপী পরিশ্রমের ফলে ইহার বর্ত্তমান আকার গঠিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে মুদ্রাযন্ত্রের অভাব ছিল বলিয়া আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বভুক্ কালের কঠোরকুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে। কালের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আজও যাহা কিছু আছে, নানা কারণে তাহাও অদ্যাবধি নিরাপদ অবস্থায় নীত হইতে পারে নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্যক্ষেত্র সম্যক্ কর্ষিত হইলে ইহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লেখা যাইতে পারে। ভাবী কোন মহাভাগের এই ইতিহাস সঙ্কলনের সহায়তা কল্পে এখন বঙ্গের বহুতর মাতৃভাষানুরাগী মহাশয় ব্যক্তি ইহার প্রাচীন উপকরণাদি সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা আনন্দ ও আশার কথা বটে। মাদৃশ ক্ষুদ্রশক্তি লোকের পক্ষে তদ্রূপ কোন চেষ্টা একান্ত ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইলেও মাতৃপূজায় অন্যের সহিত সমান অধিকার থাকায় অন্ততঃ অন্যকে উদ্বোধিত করার জন্য আমার এই অকিঞ্চিৎকর আত্মোৎসর্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও উদ্দেশ্যবিহীন বিবেচিত না হইতে পারে, এই আশায় বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা।

এখন বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। আমাদের মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্যসংরক্ষণ জন্য জাতীয় সাহিত্য-গৌরবী ব্যক্তিমাত্রেরই শীঘ্র যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে বিপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বৎসর বৎসর কীট ও হুতাশনাদিতে আমাদের এই মূল্যবান জিনিষগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধীয় যে যে কাব্য, চৌতিশা, পাঁচালী, বারমাস্যা ও অন্যান্য সন্দর্ভ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তৎসমস্ত অতি সংক্ষেপভাবে সমালোচিত হইবে। বলিয়া রাখা উচিত যে, লেখকগণ সম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি নাই।

আমাদের প্রাপ্ত সকল কাব্যাদিই উল্লেখ ও সমাদরযোগ্য নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাহিত্যের ক্রমিক অভিব্যক্তির নিদর্শন রাখিতে গেলে সেগুলি বাদ দিলে চলিবে না।

সাহিত্য-হিসাবে সকলগুলিই সাদরে আলোচিত হইবার যোগ্য। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর নিকট হয়ত সেগুলি অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাক্‌চেষ্টান্দুরণের কালে যে সমস্ত কাব্যাদি বিরচিত হইয়াছে, সে গুলিতে বিশেষ কোন গুণপনা পরিলক্ষিত না হইলেও তাহা বাদ দিতে গেলে বঙ্গভাষার শৈশব-ইতিহাসের একাঙ্গ আদৌ অসম্পূর্ণ থাকিবে। শিশুর অকপট, সরল, সংসারাসক্তিবিহীন হাসিতে যেমন একটা সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তেমনই বাঙ্গালার শৈশবকালের রচিত কাব্যগুলিতেও লেখকের অকপট, অনুকরণপ্রবৃত্তিরহিত, অনাড়ম্বর, স্বাভাবিক, অনাবিল হৃদয়ের প্রকাশ দেখিয়া কেমন একটা আনন্দ আসিয়া চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া ফেলে। তা'ছাড়া, কবির দেশকালপাত্রের কথা যখন মানসপটে চিত্রিত হয়, তখন তাঁহার ত্রুটী বা অক্ষমতা দেখিয়া রাগ বা বিরক্তি না জন্মিয়া এক প্রকার ভক্তিমিশ্রিত দয়ার উদ্রেক হয়। আর যখন মনে করি যে, কেবল আমাদেরই শুভার্থে তাঁহাদের ক্ষীণশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয় বা সঙ্কোচ করেন নাই, তখনই কৃতজ্ঞতার ডালি লইয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হইতে ইচ্ছা যায়।

## ১। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়।

ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ছাপাইলে ইহার আকার বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের আকার চেয়ে বড় কম হইবে, বোধ হয় না। ইহাতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন,—এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের দিগ্বিজয়বার্ত্তা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সরল ও বিশুদ্ধ হইলেও এত একঘেয়ে যে, পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবার ত কথাই নয়, অধিকন্তু পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। পণ্ডিত ভবানীনাথ ইহার রচয়িতা। ইনি ব্রাহ্মণ। জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে লোকহিতার্থে ইহা ব্যাসদেবের অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে অনূদিত হইয়াছে। রাজা জয়চন্দ্র কে এবং গ্রন্থকারও কোথাকার লোক, গ্রন্থমধ্যে তৎসম্বন্ধে কোন বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় না। সাহিত্য-ইতিহাসে আলোচনাযোগ্য অনেক সাহিত্য-বিভূতি এই গ্রন্থে বর্ত্তমান আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সময়ান্তরে আমরা এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। ভাষা পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরে সে বিষয় আলোচিত হইবে বলিয়া অদ্য তাহা হইতে বিরত রহিলাম। গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ :—

(ক) জয়চন্দ্র নরপতি, রসিক সুজন অতি,
সভাসদ ভবানী ব্রাহ্মণ।
নৃপতি আদেশ পাইয়া, ব্যাসের সংহিতা চাইয়া,
সুরচিত্র কৈল পদবন্ধ॥

(খ) মহারাজা জয়চন্দ্র, করাইল পদবন্ধ,
তরাইতে পাতকী সকল।
শ্রীরাম বলিয়া মাথে, রচিল ভবানীনাথে,
সুগম করিয়া ইতিহাস॥

(গ) জয় চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন॥

গ্রন্থে ইহার রচনা কাল নির্দ্দেশক কোন সনাদির উল্লেখ নাই। হস্তলিপিখানি ১১৫১ মগীর অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

## ২। মোহ-মুদ্গর।

'মোহ-মুদ্গর' নাম দেখিয়াই কেহ যেন মনে না করেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সেই ভবভ্রান্তিবারণ মোহ-মুদ্গর বা তদনুবাদ। এ 'মোহ-মুদ্গর' মুদ্গর নয়,—এক জন মানুষ—পৌরাণিক রাজা। ইঁনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে অর্জ্জুন পুত্রশোকে একান্ত বিধুর হয়েন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কাম-ক্রোধাদিরিপুজয়ী ভক্তের কথা পাড়েন। তাহাতে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণ মোহ-মুদ্গর রাজার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত দেখান। ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। প্রারম্ভ এইরূপ :—

এক দিন শিবস্থানে পুছিলা ভবানী।
ভারতের কথা কিছু কহ শূলপাণি॥
অভিমন্যু যুদ্ধে যদি প্রমাদ হইল।
কেন মতে অর্জ্জুনেরে কৃষ্ণে সান্ত্বাইল॥
দেবী বলে শুন মোরে কহ শূলপাণি।
তোমার প্রসাদে আজি কৃষ্ণের কথা শুনি॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব ত্রিলোচনে।
সাধু সাধু কহিয়া যে গৌরীক বাখানে॥

উপসংহার :—

পুনরপি কৃষ্ণপদে অর্জ্জুন পড়িল।
আপনি দ্বারকাপতি হস্তিনাতে গেল॥
শিবে যে কহিলা কথা পার্ব্বতীর স্থানে।
ভক্তি ভাবে হই দেবী পড়িলা চরণে॥
দেবী কহে শুনিলাম আশ্চর্য্য কথন।
কৃতার্থ করিলা নাথ এ সব স্মরণ॥
শোকবন্ধে সঙ্গিতা * যে আছএ বিশেষে।
পয়ার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে॥
সেবা করে যেবা জনে কায়মন চিত্তে।
মায়ামোহ বন্ধ তাতে ছোটে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে তবে হয় অতি মতি।
ভবসিন্ধু তরি যাইব কৃষ্ণপদে গতি॥
এ বোলিয়া সর্ব্বজীব বোল হরি হরি।
কৃষ্ণ পরে বন্ধু নাই ভবসিন্ধু তরি॥

এই গ্রন্থে যে এক মাত্র ভণিতা আছে, তাহা এই :—

শোকবন্ধে সঙ্গিতা যে আছএ বিশেষে।
পয়ার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৫৪ মগী অর্থাৎ আজ ১০৮ বৎসর।

## ৩। ধ্রুব-চরিত্র।

ইহাও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা আপনাকে কখনও লক্ষ্মীকান্ত কখনও বা লক্ষ্মী-নারায়ণ নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'নবুপাড়া' কি 'নওপাড়া' তাঁহার নিবাস স্থল বলিয়া উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কোথায়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। চট্টগ্রামে 'নোয়া-

* সঙ্গিতা—সংহিতা।

পাড়া' নামক এক গ্রাম আছে। ইহাতে কয়েকটী সুন্দর ধুয়া আছে। দু একটী এখানে দেওয়া গেল। হস্তলিপিখানি ১২২৯ মগীর লিখিত।

(১) মিছে মায়াতে ভু'ল নায়ে মন।
এখন দিন গেল, কাল এল, কররে হরি সাধন॥
বেড়ি আছে মায়া জাল, পিছে ঘনাইল কাল,
অন্তকালে যেন হয় নিবারণ॥

(২) দুরাচার মন, কি রসে মজিলে এখন।
জান না শিয়রে বসে সদা রয়েছে শমন॥
গুরুদত্ত তত্ত্বধন, সে ধন পরম রতন,
সে ধনে কর সাধন, হবে শমন নিবারণ॥

(৩) মন রে কেমনে এড়াইবে শমনে।
এখন কেমনে তরিবি ভব তুফানে॥
হরি পরম ধন, পরমার্থের সাধন,
এখন কি ফলে কাঁদাইলে সে ধনে॥

(৪) হরিপদে হৈও না মন ভ্রান্ত।
রবিসুত দূত যবে, কেশে ধ'রে ল'য়ে যাবে,
কেমনে এড়াবে তবে শমন দুরন্ত॥

আরম্ভ :—

রক্ষশাপে পরীক্ষিৎ মুকে মরু পাই।
শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা তাহার পাচয়ে॥
শুকদেব গোস্বামী দিগম্বর বেশ।
পরীক্ষিৎ মুক্তি হেতু করয় প্রকাশ॥

* * *

পঞ্চ বৎসরের শিশু অতি সে অজ্ঞান।
কিরূপেতে হৈল সে কৃষ্ণপরায়ণ॥

উপসংহার :—

এইরূপে হৈল ধ্রুব হরিপরায়ণ।
গাহে গাহনায় যেবা করয় স্মরণ॥
অনায়াসে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
রচিল পুস্তক দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ॥

ভণিতা :—

(ক) বিপ্র নতু পাড়া ধাম, লক্ষ্মীনারায়ণ নাম,
দ্বিজবর করিল রচন।

(খ) দ্বিজ লালবিহারী সুত, সেহ বড় গুণান্বিত,
তার সুত লক্ষ্মীনারায়ণ।
কাতর হইয়া বলে, গুণী জনা পদতলে,
পিতা দুঃখ কর নিবারণ।

(গ) ধ্রুব কথা সুধারস অমৃতের ধার।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত কৈল পাঞ্চালী প্রচার॥

(ঘ) গণেশ অনুজ হরি, তস্য ভ্রাতা লালবিহারী,
বিপ্র নতুপাড়াতে নিবাস।
তাহার সুতের সুত, জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মীকান্ত,
ধ্রুব কথা করিল প্রকাশ॥

## ৪। বাণ-যুদ্ধ।

এ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তিন জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। গ্রন্থে কোন রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট নাই। হস্ত লিখিত পুঁথিখানি নিতান্ত আধুনিক—১২২৪ মগীর লিখিত। ভাষা সহজ ও আড়ম্বরবিহীন।

শুন শুন সর্ব্বলোক হৈয়া হরষিত।
বাণরাজার যুদ্ধ শুন হৈয়া একচিত্ত॥
যথাতে পুত্র এ কন্যা দৈবী বিষহরী।
অনিরুদ্ধ উষা কথা কহিব বিস্তারি॥

* * * *

* * * *

মহারাজ চক্রবর্ত্তী বাণ মহামতি।
সহস্রেক ভুজ তান নাই অব্যাহতি॥

ব্রহ্মশাপে বিজয় যম অনুচর।　　মায়া করি সংহারিল দেব নারায়ণে॥
দৈত্য হৈয়া জন্মিলেক সভার ভিতর॥　　তার পুত্র প্রহ্লাদ যে হয় মহাশয়।
হিরণ্যকশিপু পুত্র খ্যাত ত্রিভুবনে।　　মুক্তিপদ পাইলেক গোবিন্দ সদয়॥

শেষ :—

অনিরুদ্ধ উষা গেল শশুরের সঙ্গে।　　যার যেই পুরেতে চলিলা ততক্ষণ।
কেহ নাচে কেহ গায় মনোহর রঙ্গে॥　　আনন্দে পূর্ণিত হৈয়া সকলের মন॥
কৃষ্ণকান্তত্র গেল দ্বারিকা নগরী।　　এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায়।
প্রণাম করিয়া রাজা গেল নিজপুরী॥　　দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময়॥

ভণিতা :—

(ক) শুন শুন চিত্ররেখা, না পাইলে তান দেখা,
আনলেতে ত্যজিমু জীবন।
গৌরীচরণ শুহে কয়, না ভাবিও বিস্ময়,
পাইবা পতি স্থির কর মন॥

(খ) শ্রীনাথ দেবে কহে করুণা বচন।
করুণা করিয়া উষা করয় ক্রন্দন॥

(গ) এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায়।
দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময়॥

## ৫। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এ ক্ষুদ্র পুস্তক খানির রচয়িতার নাম কি জানা যাইতেছে না। গ্রন্থ মধ্যে কয়েকটী আরব্য ও পারস্য শব্দ থাকিলেও ইহা মুসলমানের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। সেরূপ অনুমানের কোন প্রয়োজনও নাই। কাব্য প্রারম্ভেই "নমো গণেশায়" বাক্যে ইহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ইহার যে দুই খানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে দুইখানিই আধুনিক ; পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

প্রারম্ভ :—

প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিয়া।　　কলিযুগে সত্যপীর আইল পৃথিবীত।
যার নাম লৈলে যায় শমন তরিয়া॥　　দরিদ্র ব্রাহ্মণ হোন্তে হইল বিদিত॥
প্রণমোহ সত্যপীর নিয়ত হাসিল।　　অতিপূর্ব্ব কালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
যাহার প্রতাপে পুনি তরিছে অখিল॥　　অন্ন বস্ত্র না মিলে ভিক্ষা মাগি খাইল॥
সরস্বতীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া।　　নিত্য নিত্য সেই বিপ্র করিয়া মাগন।
শুদ্ধ পদ কহিবা আমার কণ্ঠে রৈয়া॥　　আপনার স্ত্রীপুত্র করয় পালন॥
ব্যাস বৃহস্পতি কদম্ শঙ্কর ভবানী।　　আর এক দিন বিপ্র ভিক্ষারে যাইতে।
করিম প্রচার সত্যপীরের যে ছিন্নি॥　　আচম্বিত সত্যপীর দেখিল পন্থেতে॥

শেষ :—

সুবর্ণের মুদ্রা তাজি ছিন্নি যে করিলা।　　সত্যপীরের ছিন্নি করএ যেই জনে।
আসিয়া পুছিয়া কন্যা ঘরে প্রবেশিলা।　　মক্কিল আসান হৈয়া বাড়ে দিনে দিনে।
সেই হন্তে সদাগরের সম্পদ অপার।　　পীরের পাঞ্চালী শুনএ যেই জনে।
সকল ভুবনে হৈল প্রশংসা তাহার॥　　ঐশ্বর্য্য বাড়এ তার সঙ্কট না মিলে॥

৬। রাধার সংবাদ—ঋতুর বার মাস। শ্লোক সংখ্যা ৫৮।

আরম্ভ :—

কৈহ কৈহ প্রাণ ঋত * রাধার সম্বাদ।
নিমায়া নিঠুর হৈয়া গেল প্রাণনাথ ॥
পউষ মাসেতে ঋত পড়এ শিশির।
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির ॥
হেমন্তের ঋত বহে দীঘল যামিনী।
কৃষ্ণ বিনে কিরূপে বঞ্চিমু অভাগিনী ॥
মাঘ মাসেতে ঋত নগুণ পড়ে জাড় †
ছাড়ি গেল প্রাণকৃষ্ণ কি গতি আমার ॥

শেষ :—

মধু মিষ্টা লাগে মোর গরল সকল।
বাহ যায় কর্ণাট রাগ জীবন বিফল ॥
বহুবেদ মাসে রাধার না পুরিল আশ।
হীন কমরালী কহে এই ঋতের বার মাস ॥
বারমাস পদবন্ধ করিলম রচন।
অপরাধ পাইলে ক্ষামবা গুণিগণ ॥
যেবা গায় যেবা শুনে ঋতের বারমাস।
সর্ব্বত্রে কুশল তার আপদ বিনাশ ॥

৭। চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৪০।

আরম্ভ :—

কয়ে বোলে কত দিনে হইমু উদ্ধার।
কোন সেতু ভবের জঞ্জাল হৈব পার ॥
কৃষ্ণ নাম মুখে ভরি বোল বারে বার।
কৃষ্ণ বিনে নিস্তারিতে কেবা আছে আর ॥
খেণে খেণে উঠে মনে হরি গুণবাণী।
খেণেকে গোবিন্দের নামে কাঁপয়ে পরাণি ॥

শেষ :—

হয়ে বোলে হরি হরি বোল সর্ব্বক্ষণ।
হাসিতে খেলিতে জন্ম যায় অকারণ ॥
হরি ভাবে হরি চিন্তা হরি কর সার।
হরি বিনে ভবেতে বন্ধু নাহি আর ॥

---

* ঋত—ঋতু।

† ন'গুণ—নয়গুণ। জাড়—জাড়া, শীত।

কয়ে বোলে ক্ষীণ হৈল সংসার আনন্দে।
খলতা করিয়া জন্ম গেল অকাজে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা রসে মজি না চিন্তিলাম পরিণাম।
ক্ষেণেকে গোবিন্দের নাম মনে না লইলাম॥

ভণিতা :—

এসব বৃত্তান্ত জানি, ভজ কৃষ্ণ চূড়ামণি,
ভবের জঞ্জাল হৈবা পার।
দর্পনারায়ণ দাসে কয়, কৃষ্ণচন্দ্র দয়াময়,
অনন্তে যে অন্ত নাহি পায়॥

৮। সীতার দশমাস। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসের দিন নানা পুষ্পময়।
রাম হৈছেন নরপতি সর্ব্ব লোক কয়॥
তাহাতে পাষণ্ড বিধি দৈবের লিখন।
ভরতেরে দিয়া রাজ্য রাম গেলেন বন॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ত্রিভুবন সার।
এই মাস গেল বৈরা না কৈলা উদ্ধার॥

শেষ :—

উদ্ধারিয়া নিল সীতা রঘুর নন্দন।
সবংশে রাবণ রাজা করিয়া নিধন॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিল মোচন।
স্বর্ণ লঙ্কা লই রাজা হৈলা বিভীষণ॥
ভ্রাতৃসঙ্গে অযোধ্যাতে গেলেন রঘুমণি।
পাইলা পরমাসুখ সীতা ঠাকুরাণী॥

ভণিতা :—

দশ মাসের দশ ঘোষা লওরে গণিয়া।
এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বানিয়া॥
শ্রীধর বানিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি।
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি॥

৯। সখীর বার মাস। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০।

আরম্ভ :—

শুন শুন প্রাণ সখি দুঃখের কাহিনী।
বিদেশে গেলা রে প্রভু ছাড়ি অভাগিনী॥

* * *

কৃপার সাগর প্রভু দয়ার ঠাকুর।
প্রথম কার্ত্তিক মাসে হইলা নিঠুর॥
গমন কালেতে প্রভুর কঠিন হিয়া প্রাণ।
এক তিল না দেখিলে না রহে পরাণ॥

শেষ :—

আশ্বিন মাসেত সখী পুরাইল বার মাস।
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ॥
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ।
না আসিল প্রাণনাথ হইলাম নিরাশ॥

ভণিতা :—

সেখ জানালে কহে ভাবক ভাবিনী :
চিন্তা না করিও স্বামী আসিব আপনি॥

## ১০। নারায়ণ দেবের পাঞ্চালী।

প্রারম্ভ :—

বন্দ সত্যনারায়ণ, দয়া কর অনুক্ষণ,
মতি রহুক তুয়া পদতলে।
নিবেদিএ কায়মনে, রক্ষ যেন অনুক্ষণে,
মধুকর যে হেন কমলে॥
সংসারের সার তুমি, কি বোলিতে পারি আমি,
তুমি চারি বেদের আধার।
তোমা সেবি প্রজাপতি, সৃষ্টি করে নিতি নিতি,
ত্রিভুবনে যার অধিকার॥

শেষ :—

শুভবার্ত্তা পাইয়া ঘরে, মাএ ঝিএ পূজা করে,
কন্যা হেতু হইল বিপাকে।
জামাতা ডুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুখী,
জামাতা বোলিয়া সাধু ডাকে॥
ডাকে দয়া কৈলা যাটে, ডিঙ্গা ডুবা পুনঃ উঠে,
হরষিত হইল সদাগর।
পুরবাসী যত জন, সব আনন্দিত মন,
পূজার দ্রব্য করিল বিবাদ॥
ঘরে নিয়া মধুকর, পূজা দিলা সদাগর
সোয়া প্রমাণে দ্রব্য আনি।

পুরোহিত দ্বিজবরে,     আনিয়া তা সভারে,
সবে মিলি করিলা যে ছিন্নি ॥
ব্রাহ্মণের বেশ হৈয়া,     নিজ মূর্ত্তি দেখা দিয়া,
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ ।
ভক্তবৎসলায় প্রভু,     অন্য মত নাহি কভু,
এই কথা পুরাণ প্রমাণ ॥

ভণিতা :—

ভাবি সত্যনারায়ণে     দ্বিজ দীনরামে ভণে,
ভাষা ব্যাস গিরির পাঁচালী ।
প্রভুর চরণে মন,     রহুক অনুক্ষণ,
নিবেদিনু করি পুটাঞ্জলি ॥

## ১১ । মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী ।

প্রারম্ভ :—

প্রণমোহ পরম দেবতা আদ্যা দেবী ।
ব্রহ্মা হরিহর থাকে যার পদ সেবি ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে ...
সৃষ্টি পালন তুমি শিবশক্তিভূতা ॥
যার নাম স্মরণে তরিতে দুঃখ যায় ।
মহাপদ পার হয় জল ঈষৎ লীলায় ॥
কাহনে চরিত্র কিছু রচিবারে আশা ।
লোক পরিতোষেরে কহিনু দেশী ভাষা ॥
আছে অতি পশ্চিমে যে নগর উজানি ।
বিক্রম কেশরী তথা নৃপ শিরোমণি ॥

শেষ :—

ঘরে ঘরে করিলেক মঙ্গল অধিষ্ঠান ।
বিক্রম কেশরী রাজা কৈলা কন্যা দান ॥
অর্দ্ধ রাজ্য সমে দিলা জামাইরে কৌতুক ।
নিজ পুরে চলে সাধু পাইয়া যৌতুক ॥
প্রাসাদে সুবর্ণ সব কাঞ্চনে নির্ম্মল ॥
তার মধ্যে সুবর্ণ প্রতিমা স্থাপিল ॥
বিল্বপত্র অখণ্ড ষোড়শ উপচারে ।
পূজিল মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল বাসরে ॥
নানাবিধি বলিদান বণেক বিহিত ।
শঙ্খ শব্দে বাদ্য বাজে লোকে গায় গীত ॥

ভণিতা :—

দুর্গার প্রভাব যে জনে শুনিব।
তাহার সহস্র দুঃখ তখনে খণ্ডিব॥

ইতি শ্রীমদন দত্ত রচিত মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী
সমাপ্ত।

## ১২। রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কহে সব গোপনারী উদ্ধব সম্বোধি।
কোন অপরাধে ছাড়ি গেল গুণনিধি॥
কোথা হোতে আসিয়া যে দারুণ অক্রুর।
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি নিল মধুপুর॥

খরশাণ বাণে মনমথ দহে তনু।
খাইমু গরল বিষ যদি না আইসে কানু॥
খণ্ড তপস্যা কৈলুম্ মুঞি গোপনারী।
খগপতি নাথ গেল আমা প্রেম ছাড়ি॥

শেষ :—

ষড় ঋতু পাদপদ্মে আরাধি রহিমু।
সমুদ্র-উদ্ভব মুক্ত খাইয়া মরিমু॥
হরি পরে গতি নাই আমি অভাগিনী।
হতাশ [illegible] বঞ্চেছে দিনমণি॥

হিয়াক উথলে তাপ সতত অনঙ্গে।
হত অভাগিনী রাধা দরশন মাগে॥
ক্ষীণ তনু হৈল নিত্য কানুকে ভাবিয়া।
ক্ষণ[illegible] সহিতে নারি বিদরয় হিয়া॥

ভণিতা :—

ক্ষীণ দেবীদাসে কহে শুন গোপনারী।
ক্ষিতি তলে মুক্ত হৈয়া ভজিলে শ্রীহরি॥

## ১৩। কালকেতুর চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কান্দে কালকেতু বীরে, কষ্ট পাইয়া কলেবরে,
কঙ্কণ বন্ধনে কারাগারে।
কৃপা কর রাঙ্গাপদে, কঙ্কণের অপরাধে,
কলিজে কাটিব কালি মোরে॥

গোধারূপে পথ জুড়ি গড়াইয়া আছিলেন গৌরী,
জ্ঞান নাহি ছিল মোর মনে।
গলে দিয়া গুণকাশী, গাণ্ডীবে বান্ধিলুম আসি,
গৃহে দিলুম্ গৃহিণীর স্থানে॥

শেষ :—

হস্ত জোড়ে করয়্ স্তুতি, হরিষ হইয়া অতি,
হিতকর হরের ঘরণী।
হুহুঙ্কার নাহি হানা, হত কর দুর্গসেনা,
হিমগিরি রাজার নন্দিনী॥

ভণিতা :—

ক্ষেমঙ্করী খড়্গ ধরি, ক্ষয় কৈলা যত অরি,
ক্ষম দোষ অভয়া পার্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া, ক্ষিতি তলে লোটাইয়া,
শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি॥

## ১৪ । সুধন্বার চৌতিশা ।

আরম্ভ :—

করজোড়ে সুধন্বায় করয় স্তবন ।
করুণাসাগর প্রভু তুমি নারায়ণ ॥
কাকুতি করিয়া ডাকয় চরণে তোমার ।
কৃপা করি অধমেরে করহ উদ্ধার ॥
খল খল করে অগ্নি আমা দহিবারে ।
খণ্ডাও আপদ মোর ডাকয় তোমারে ॥
খসিল বসন বেশ আমলের ডরে ।
খণ্ডাও আপদ প্রভু সেবকের তরে ॥

শেষ :—

হীন বোধ করি দয়া না কর আমারে ।
হিত কথা কহ আমি বাপের গোচরে ॥
হরিণীর রূপে হইলা মারীচ দুর্ম্মতি ।
হরিণ আপনা দোষে হইলা দুর্গতি ॥
ক্ষীণবুদ্ধি হৈয়া যেই ভাবে অনুক্ষণ ।
খণ্ডাও তাহার দুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥

ভণিতা :—

শ্লোক একটি করি প্রভু জনার্দ্দনে ।
খণ্ডিল সকল দুঃখ রাম নন্দে ভণে ॥

## ১৫ । দময়ন্তীর চৌতিশা ।

আরম্ভ :—

কহে দময়ন্তী নৈষধ রাজন ।
কর অবধান প্রভু করম্ নিবেদন ॥
কপটে যে বিধি পাশা কি বোলিমু আর ।
কৌতুকে খেলাই পাশা হারাইলা সংসার ॥
খেদ পরিহরি প্রভু শুনহ বচন ।
খণ্ডিব সকল দুঃখ স্মর নারায়ণ ॥
খগেন্দ্র বাহন-পতি যে বংশে উদ্ভব ।
ক্ষিতিতে জন্মিয়া কষ্ট পাইয়াছ রাঘব ॥

শেষ :—

হরষিত [illegible] না রহে জীবন ।
হেরিয়া চাহিতে চক্ষু নাহি কোন জন ॥
হাহা প্রভু নল রাজা কোথা গেলা চলি ।
হীন জন পরাভব সহিতে না পারি ॥
ক্ষোণিজা গর্ভের গর্ভ বিপুর কুমারী ।
ক্ষবনিতে পূজা করি হেন ফল ধরি ॥

ভণিতা :—

ক্ষীণ বিষ্ণুসেনে কহে দময়ন্তী সতী ।
খলতা ছাড়িলে কলি পাইবা নিজ পতি ॥

## ১৬ । ভূমিকাল গ্রহান্ত ।

আরম্ভ :—

নেত্র বসু সাত পুরিয়া সন্ধান ।
শকাব্দিতা সন এই শাস্ত্র পরিমাণ ॥
নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে এক স্থান ।
মঘী সন আছিলেক এই পরিমাণ ॥
মধুমাসে ত্রিবিংশতি দিবস সুন্দর ।
শুক্লপক্ষ দশমীতে ভার্গব বাসর ॥
বেদ দণ্ড বেলা স্থিতি লোকের বিদিত ।
অকস্মাৎ ভূমিকম্প হৈল পৃথিবীত ॥

শেষ :—

ধরণী ধরিতে লোক স্থির হৈতে নারে ।
পুষ্করিণী হৈতে জল নিকলে বাহিরে ॥
স্থানে স্থানে মেদিনী ফাটিয়া উঠে পানি ।
কত কত স্থানে লোকে হারাইল প্রাণি ॥
সমুদ্র পর্ব্বত কৈল পর্ব্বত সাগর ।
স্থাবর জঙ্গম আর কাঁপে থরে থর ॥
কতক্ষণ বাদে স্থির হৈল বসুমতী ।
রহিল সকল সৃষ্টি কহিল ভারতী ॥

ভণিতা :—

এই বাক্য কত দিন স্মরণ কারণ ।
জগদীশ সিংহে কহে তাহার বচন ॥

## ১৭। তামাকু-চরিত্র।

আরম্ভ :—

এক দিন পরীক্ষিৎ বসিয়া নির্জ্জনে।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিলা শুক মুনি স্থানে॥
রাজা বোলে মহামুনি করি নিবেদন।
কহিবা আমাতে এক অপূর্ব্ব কথন॥
সংক্ষেপে তামাকু কথা কহিবাম তোমাত।
যেরূপ তামাকুর জন্ম হৈল পৃথিবীত॥
দেবগণে মিলি যদি সমুদ্র মথিল।
রত্ন আদি নানা বস্তু তাতে জন্মিল॥
যত দ্রব্য উপজিল যার যেই রুচি।
মহা বস্তু উপজিল তামাকুর বীচি॥
লুকাইয়া রাখিল বীচি প্রভু পদাধরে।
পেলিল * তামাকুর বীচি পৃথিবী উপরে॥
তামাকুর বীচি যদি ভূমিতে পড়িল।
অমৃত সকল হেন পৃথিবী মানিল॥

শেষ :—

শশুরে তামাকু খায় চাহেন জামাই।
বিলম্ব দেখি নিঃশ্বাস ছাড়ে চিন্তাযুক্ত হই॥
সাসাক্ষে তামাকু খায় তারে বোলে ভাই।
হোকাটী দেও যদি এক টান খাই॥
কহিলাম এই সব তামাকু চরিত্র।
তামাকুর জন্ম হৈতে ভুবন পবিত্র॥
জগতে বিচারি কহি তামাকু পুরাণ।
শুক মুনি কহিলেক পরীক্ষিৎ রাজ স্থান॥
পৃথিবী জন্মি লোকে তামাকু না খায়।
প্রাণ যাইতে সেই নরে বড় দুঃখ পায়॥
মৃত্যু হইলে জন্ম হয় শৃগাল উদরে।
হোকা হোকা বলিয়া ডাকয়ে উচ্চ স্বরে॥

ভণিতা :—

ধুলাতে গড়াগড়ি যায়, কান্দে কণ্ঠ দীর্ঘ রায়,
রচিলেক সীতারাম করে।
অপমান দুঃখ মনে, সাধু ভাবে অন্ত মনে,
বোলে প্রিয়া তামাকু দিব তোরে॥

## ১৮। কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কদম্বের তলে কানু মুরলী বাজায়।
খঞ্জন গমনী রাধে ফিরি ফিরি চায়॥
গলায় মুক্তি রাধার করে রঙ্গ চঙ্গ।
ঘন ঘন নৃত্য করে মধুরে করে রঙ্গ॥

শেষ :—

বকুল কদম্ব মালা মালতী কিশোর।
শতে শতে বৃন্দাবনে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হৈলা সেই ঠাই।
শতে শতে নাগরী নাগর কানাই॥

ভণিতা :—

হরি হরি হরি হরি পরবন্ধু।
কণেকে বিশ্রামে বোলে দীন ভবানন্দ॥

## ১৯। কালিকাষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

জয় চণ্ডী বিঘ্নহরা চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী।
শুম্ভ সুর কৈলা দূর তীমরূপে আপনি॥
তীক্ষ অসি রিপু নাশি দৈত্যাসুরমর্দ্দিনী।
বন্দহ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী॥

শেষ :—

তমঃ অঙ্গ জিনি রঙ্গ অধর সুরঙ্গিনী।
ভুবন মোহন বেশ ভুরু কামভঙ্গিনী॥
শম্ভু তাবে কৃপা আশে পাদপদ্মে সুধা যামিনী॥
বন্দহ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী॥

ভণিতা :—

শম্ভু কহে হেন নয় দেখি হরঘরিণী।
বন্দহ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীআবদুল করিম।

* পেলিল—ফেলিল।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ।

## রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ ।

রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক অবস্থা

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ ও বহরমপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গঙ্গাস্রোতোধ্বস্ত একটী পল্লীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার রক্তবর্ণাভ পর্ব্বতাকার উচ্চ ভাগ শুষ্ক নদীগর্ভ হইতে যেন একটী বিস্তৃত দুর্গপ্রাকার বলিয়া বোধ হয়। এই পল্লীর সাধারণ নাম রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ভূমিসংলগ্ন অসংখ্য ইষ্টকখণ্ড ও মৃৎপাত্রচূর্ণ তাহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভাগীরথীতরঙ্গবিধৌত হওয়ায় যদিও ইহার উপরিভাগে পললময় মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তথাপি রাঙ্গামাটির স্বাভাবিক ভূমি যে রক্তবর্ণাভ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার উপরিভাগে সামান্য মাত্র খনন করিলে কঠিন, রক্তবর্ণাভ ভূভাগ বহির্গত হয়, এবং যে স্থানে ইহার ভূমি ভাগীরথীগর্ভে হইয়াছে, সেই স্থানেই তাহার প্রকৃত আকার আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। রাঙ্গামাটি পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী বিস্তৃত পল্লী ছিল; ক্রমে ভাগীরথী তাহাকে গর্ভস্থ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে আপনিই তাহার নীচে শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য রাঙ্গামাটির নিম্নে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ, এক্ষণে একটী বিল বা বাঁওড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর বর্ত্তমান প্রবাহ তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এবং উক্ত বাঁওড় ও ভাগীরথীর মধ্যে এক বিশাল চর মস্তকোত্তোলন করিয়া সগর্ব্বোৎসাহে বিরাজ করিতেছে। বর্ষাকালে ভাগীরথীর সহিত উক্ত বাঁওড়ের যোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাঙ্গামাটি একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে ইহাকে একটী বিস্তৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ডাঙ্গাভূমির ইষ্টকস্তূপ, পথে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণ, এবং স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ভিত্তি দেখিয়া অনুমান হয় যেন পূর্ব্বে ইহা একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরীরূপে বিদ্যমান ছিল। ইহার নিকটস্থ তিন চারিখানি গ্রামে ঐ সমস্ত চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রাঙ্গামাটির এমন স্থান নাই যেখানে দুই চারিখানি ইষ্টক বা মৃৎপাত্রচূর্ণ পড়িয়া নাই। আবার এই সমস্ত ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা,

অঙ্গুরী ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদিও মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যে সময়ে রাঙ্গামাটি ভাগীরথীপ্রবাহধ্বস্ত হইতেছিল, সেই সময়ে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, গৃহের ছাদ, খিলান, ভিত্তি, স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা, শঙ্খ এবং ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ভাগীরথীগর্ভস্থ হইতে দেখা গিয়াছে। যেখানে ইহার যমুনানাম্নী প্রাচীন পুষ্করিণী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই খানে অদ্যাপি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিত রহিয়াছে। এই সমস্ত চিহ্ন দর্শন করিয়া ইহাকে একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া স্বতঃই মনে হইয়া থাকে। ইহা যে কোন প্রসিদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল, প্রবাদ মুখে তাহাও শুনিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহার রাজপ্রাসাদের চিহ্ন আজিও সাধারণের নিকট সুপরিচিত রহিয়াছে। প্রবাদ ও ইতিহাসের সাহায্যে আমরা রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি।

রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তাহা দাতাকর্ণ বা কর্ণসেনের * রাজধানী ছিল। দাতাকর্ণ যে কুন্তীপুত্র ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ, তাহা সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন। কর্ণ স্বীয় পুত্র বৃষসেনের অন্নপ্রাশনের সময় লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইয়া স্বর্ণবৃষ্টি করায় উক্ত স্থানের ভূমি রক্তবর্ণাভ হয়, সেই জন্য উহার নাম রাঙ্গামাটি হইয়াছে। কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে, বিভীষণ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ স্বর্ণবৃষ্টি করেন। আবার এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, ভূদেব নামে কোন ব্যক্তির তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবগণ স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু দাতাকর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিভীষণের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক স্বর্ণবৃষ্টি হওয়ার প্রবাদই সমধিক প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন আর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, চাঁদসদাগর চম্পানগর হইতে আসিয়া রাঙ্গামাটিতে বাস করায় তাহার নিকটস্থ গ্রামের নাম চাঁদপাড়া হইয়াছে। চাঁদসদাগরের বিবরণ মনসার ভাসানে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চম্পা বা চম্পকনগরে বাস করিতেন; উক্ত চম্পানগর সম্ভবতঃ ভাগলপুরের নিকটস্থ, ও প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। † এতদ্ভিন্ন আরও দুই

রাঙ্গামাটির ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ

---

* রাঙ্গামাটি সাধারণতঃ কর্ণসেনের রাজধানী বলিয়া কথিত হয়, এবং দাতাকর্ণের পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ কর্ত্তৃক স্বর্ণ বৃষ্টি হয়, এ প্রবাদও প্রচলিত, সুতরাং কর্ণসেন ও দাতাকর্ণ যে অভিন্নব্যক্তি তাহা প্রবাদের দ্বারাই স্বীকৃত হইতেছে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, কর্ণের পূর্ব্ব নাম বসুষেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণবেশে বসুষেনের নিকট উপস্থিত হইয়া কবচ প্রার্থনা করিলে তিনি স্বীয় গাত্র হইতে ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে উক্ত কবচ প্রদান করেন, সেইজন্য তিনি কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে অভিহিত হন।

"প্রাগুনাম তস্য কথিতং বসুষেণ ইতি ক্ষিতৌ।

কর্ণো বৈকর্ত্তনশ্চৈব কর্ম্মণা তেন সোহভবৎ॥"—মহা, আদি, ১১১ অ।

কর্ণের পুত্রের নাম বৃষসেন, সুতরাং বৃষসেনের পিতা বসুষেন কর্ণসেন নামে যে অভিহিত হইবেন ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব কর্ণসেনকে গৌড়ের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়ে কর্ণসেন নামে কোন রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু অজয়ের নিকট তাঁহার বাসস্থান ছিল।

† ভাগলপুরের নিকটস্থ চম্পানগর ব্যতীত আরও দুই একটী চম্পক নগরের উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলায় ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমে চম্পক নামক স্থান আছে, কিন্তু রাঙ্গামাটির প্রবাদ অঙ্গরাজ্যের চম্পক নগরের সহিত জড়িত।

একটী প্রবাদ রাঙ্গামাটিতে প্রচলিত আছে; সর্ব্বাপেক্ষা দাতাকর্ণেরই প্রবাদ সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক রাঙ্গামাটি অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভাগলপুরের নিকটস্থ চম্পানগর যে তাঁহার রাজধানী ছিল এইরূপ সিদ্ধান্তই হইয়া থাকে, তবে রাঙ্গামাটি অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহা দাতাকর্ণের সাময়িক বাসস্থান বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। * রাঙ্গামাটির নিকট গোকর্ণ নামক স্থানে কর্ণরাজার গোশালা ছিল বলিয়া কথিত হয়।

**রাঙ্গামাটিই কর্ণসুবর্ণ**

প্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাঙ্গামাটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। উহা প্রাচীনকালে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গ যৎকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কী-লো-না-সু-ফা-লা-না বা কর্ণসুবর্ণ † রাজ্যে উপস্থিত হন। কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নাম হওয়ায় সমস্ত রাজ্যও কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। কর্ণসুবর্ণের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ‡ কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিকেই উক্ত কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাঙ্গামাটির সহিত দাতাকর্ণের প্রবাদটী কিছু অধিক পরিমাণে বিজড়িত এবং বৃষসেনের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ যে স্বর্ণ বৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাও সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে। কর্ণরাজার স্থানে সুবর্ণ বৃষ্টি হওয়ায়, আমরা তাহা হইতে কর্ণসুবর্ণ নামের উৎপত্তি বুঝিতে পারিতেছি। ¶ এই কর্ণসুবর্ণ বঙ্গভাষায় ক্রমে কাণসোনা হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থে § দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাণসোনার দেবেরা প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং উক্ত কাণসোনা যে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ তাহাও কুলজী-গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। রাঙ্গামাটি যে উক্ত কাণসোনা বলিয়া পূর্ব্বে অভিহিত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে। যদিও এক্ষণে সাধারণ লোকে তাহার কাণসোনা নামের বিষয় অবগত নহে,

---

* মেদিনীপুরের নিকট কর্ণগড় নামক স্থান দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়। মেদিনীপুর প্রদেশও অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কর্ণগড়ও দাতাকর্ণের সাময়িক বাসস্থান হইতে পারে।

† চীন কী-লো-না-সু-কা-লা-না সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণের রূপান্তর মাত্র।

‡ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সুবর্ণরেখা নদীতীরে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল, কাহারও কাহারও মতে বীরভূম, ও কাহারও কাহারও মতে সিংহভূমে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়। ডাক্তার ওয়াডেল বর্দ্ধমানের কাঞ্চন নগরকে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বহুতর প্রমাণদ্বারা মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিই যে কর্ণসুবর্ণ ছিল ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রমাণ যথানুরূপ প্রদত্ত হইতেছে।

¶ হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমনের পূর্ব্ব হইতে কর্ণসুবর্ণ নাম যে প্রসিদ্ধ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে; কিন্তু কি প্রকারে উক্ত নামের সৃষ্টি হয় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে দাতাকর্ণের স্থানে সুবর্ণ বৃষ্টি হওয়ায় উক্ত প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিলে কর্ণ ও সুবর্ণ যোগে কর্ণসুবর্ণের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। যেখানে কর্ণের নিমন্ত্রণে বিভীষণ সুবর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার নাম কর্ণসুবর্ণ হইয়াছে।

§ "শুন সবে দেব বর্ণ করি নিবেদন।
কাণসোনার দেব হইল বারেন্দ্র শাসন।"—বারেন্দ্র ঠাকুর।

তথাপি অর্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে রাঙ্গামাটির অপর নাম যে কাণসোনা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লোয়ার্ড সাহেব রাঙ্গামাটির বিবরণ প্রসঙ্গে তাহাকে রাঙ্গামাটি বা কাণসোনাপুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সময় পর্য্যন্ত রাঙ্গামাটি যে কাণসোনা নামে অভিহিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কাণসোনা সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণের অপভ্রংশ, উক্ত বিষয়েরও প্রমাণের অভাব নাই। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে আপনাদিগের বংশ বর্ণনোপলক্ষে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের আদিপুরুষ শ্রীহরিদেব মুর্শিদাবাদ নগরের নিকট কর্ণস্বর্ণ সমাজে * বাস করিতেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলজীগ্রন্থানুযায়ী দেব বংশের সমাজ কাণসোনা যে উক্ত কর্ণস্বর্ণ হইতে অভিন্ন তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণ বা কর্ণস্বর্ণ ক্রমে ক্রমে যে বাঙ্গালায় কাণসোনা হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই রাঙ্গামাটি বা কাণসোনা যে হিউয়েন-সিয়াঙ্গ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সিওকী গ্রন্থে + লিখিত আছে যে, তিনি কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নিকট লো-তো-বী-চী বা রক্তভিত্তি নামে সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সিয়াঙ্গের জীবন বৃত্তান্তে উক্ত লো-তো-বী-চী কী-তো-মো-চী বা রক্তমৃত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। জুলিয়ান, বিল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও লো-তো-বী-চী ও কী-তো-মো-চীর রক্তমৃত্তি ‡ অর্থ করিয়া থাকেন। রাঙ্গামাটি যে উক্ত রক্তমৃত্তির অপভ্রংশ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং কাণসোনা বা কর্ণসুবর্ণের সহিত রক্তমৃত্তি বা রাঙ্গামাটির যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতেই পারে না। হিউয়েন সিয়াঙ্গের বিবরণ হইতে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া দেখিলে রাঙ্গামাটিকে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। সিওকী ও হিউয়েন সিয়াঙ্গের জীবন-বৃত্তান্তে তাঁহার কর্ণসুবর্ণে উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অনৈক্য আছে বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে কর্ণসুবর্ণের সম্বন্ধে কোন অনৈক্যের উপলব্ধি হয় না। সিওকীতে লিখিত আছে যে,

---

* "আসীৎ শ্রীহরিদেবাখ্যঃ শ্রীহরেরংশরূপকঃ।
কায়স্থানাং কুলে দেববংশসোদ্ভবহেতুকঃ।
মুরশিদাবাদনগরাভ্যন্তরে স্বজনপালকঃ।
কর্ণস্বর্ণসমাজস্থগ্রামে বাসকারকঃ॥"

+ হিউয়েন সিয়াঙ্গ সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে; একখানির নাম সিওকী বা পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত; উক্ত গ্রন্থ হিউয়েন সিয়াঙ্গের প্রদত্ত উপাদান লইয়া পীনকী রচনা করেন। জুলিয়ান অনুমান করেন যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ বহুদিন বিদেশে বাস করায় চীন ভাষার পরিপাটী বিস্মৃত হওয়ার নিজে গ্রন্থ লিখিতে সাহসী হন নাই। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হিউলী ও ইয়েন সাঙ্গ লিখিত হিউয়েন সিয়াঙ্গের জীবনবৃত্তান্ত।

‡ Red mud (Buddhist Records of the Western World Vol. II p. 202 and Life o Hiuen Tsiang by S. Beal p. 131.)

হিউয়েন সিয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপে গমন করেন, তথা হইতে সমতট অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্তি প্রদেশে উপস্থিত হন। তাম্রলিপ্তি হইতে ৭০০ লী * উত্তর পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে আগমন করেন। বর্ত্তমান মালদহ প্রদেশ পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বলিয়া কথিত হয়, এবং তাম্রলিপ্তি বর্ত্তমান তমলুকের প্রাচীন নাম মাত্র। রাঙ্গামাটি বা কাণসোনা তাম্রলিপ্তি হইতে ঠিক উত্তর পশ্চিমে না হইলেও তাম্রলিপ্তি প্রদেশ হইতে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য যে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং হিউয়েন-সিয়াঙ্গ তাম্রলিপ্তি প্রদেশ হইতে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। বিশেষতঃ কর্ণসুবর্ণ হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রদেশে গমন করা যায়। রাঙ্গামাটির কর্ণসুবর্ণের রাজধানী হওয়ার পক্ষে কোন গোলযোগেরই সম্ভাবনা নাই। আবার জীবন-বৃত্তান্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, হিউয়েন-সিয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতেই কর্ণসুবর্ণে গমন করিয়াছিলেন। মালদহ প্রদেশ পৌণ্ড্র বর্দ্ধন হইলে তাহার নিকটস্থ কর্ণসুবর্ণের রাজধানী রাঙ্গামাটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব, সুতরাং সিওকী ও জীবন-বৃত্তান্তে হিউয়েন-সিয়াঙ্গের কর্ণসুবর্ণে উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অনৈক্য থাকিলেও কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্বন্ধে যে কোনই অনৈক্য নাই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। উক্ত উভয় গ্রন্থ হইতে রাঙ্গামাটির অবস্থানানুসারে তাহাকে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

এক্ষণে হিউয়েন-সিয়াঙ্গ কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। সিওকীতে লিখিত আছে যে, কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি প্রায় ১৫০ ক্রোশ, ও রাজধানী প্রায় ২ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ইহাতে অনেক লোক বাস করিত। গৃহস্থেরা ধনশালী ও সচ্ছন্দচিত্ত ছিল। ভূমি নিম্ন ও চিক্কণ, এবং তাহা রীতিমত কর্ষিত হইয়া নানাপ্রকার ফুল ফল উৎপাদন করিত। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, ও লোকের আচার ব্যবহার বিনয়পূর্ণ ও মনোরম ছিল। অধিবাসীরা বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করিত, ও আগ্রহ সহকারে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইত। তাহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে ১০টী সঙ্ঘারাম ও ২০০০ আচার্য্য † ছিল। তাহারা সম্মতীয় মতাবলম্বী। উক্ত রাজ্যে ৫০টী দেবমন্দির দৃষ্ট হইত, এবং অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত আরও ৩টী সঙ্ঘারাম ছিল। উক্ত সঙ্ঘারামের লোকেরা দেবদত্তের ‡ মতানুসারে নবনীত ব্যবহার করিত না। রাজধানীর পার্শ্বে লো তো-বী-চী ¶ বা রক্ত ভিত্তি নামে সঙ্ঘারাম। তাহার গৃহগুলি প্রশস্ত ও আলোকময়, চূড়া অত্যন্ত উচ্চ। এই মঠে রাজ্যের যাবতীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ জনগণের সম্মিলন

হিউয়েন-সিয়াঙ্গের কথিত কর্ণসুবর্ণের বিবরণ।

---

* লী = ১/৫ মাইল।

† জীবন-বৃত্তান্তে ৩৬০ আচার্য্যের কথা আছে ; ( Beal's Life of Hiuen Tsiang p. 131. )

‡ দেবদত্ত বুদ্ধের আত্মীয় ও শিষ্য ছিলেন, পরে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি একদল শিষ্যের নেতা হন। বুদ্ধের মতের সহিত দেবদত্তের মতের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

¶ জীবন বৃত্তান্তে লো-তো-বী-চীর স্থলে কী-লো-যো-চী বা রক্ত মৃত্তি লিখিত আছে। (Beal's Life of Hiuen Tsiang p. 131)

হইত এবং তাঁহারা পরস্পরের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল না। এক সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে একজন হিন্দু পণ্ডিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হন। উদর তাম্রপত্রে মণ্ডিত করিয়া ও মস্তকে এক প্রজ্বলিত মশাল লইয়া দণ্ডহস্তে সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে তিনি কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করেন, ও আপনার সহিত বিচার করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া একজন প্রতিপক্ষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। লোকে তাঁহার অদ্ভুত সজ্জার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ উত্তর করিতেন যে, অত্যধিক বিদ্যার প্রভাবে তাঁহার উদর বিদীর্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তিনি তাহাকে তাম্রপত্রাবৃত করিয়াছেন, ও অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগের দুঃখে কাতর হইয়া মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছেন। দশদিন পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অবতীর্ণ হয় নাই। রাজ্যের বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। রাজা ইহাতে দুঃখিত হইয়া এইরূপ প্রকাশ করেন যে, রাজ্য মধ্যে কি এতদূর অজ্ঞতা বিস্তৃত হইয়াছে যে, কেহই এই ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছে না? ইহা রাজ্যের পক্ষে বড়ই দুর্নামের কথা। রাজ্যের নির্জ্জন প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইহার পর এক ব্যক্তি রাজার নিকট প্রকাশ করে যে, বনমধ্যে একটী অদ্ভুত লোক বাস করেন। তিনি আপনাকে শ্রমণ বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রমণ অত্যন্ত বিদ্বান্, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি এই অধার্ম্মিক লোকের নিকট সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মমত স্থাপন করিতে পারিবেন। রাজা এই কথা শুনিয়া নিজেই তাঁহাকে আহ্বান করেন। শ্রমণ উত্তর দেন যে, আমি একজন দাক্ষিণাত্য, দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এখানে পথিকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি। আমার ক্ষমতা যৎসামান্য, তথাপি আমি আপনার ইচ্ছানুসারে যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কিরূপ ভাবে বিচার হইবে আমি তাহার কিছুই অবগত নহি। যদি আমি পরাজিত না হই, তাহা হইলে আমার অনুরোধ ক্রমে আপনাকে একটী সঙ্ঘারাম স্থাপন করিতে হইবে, এবং উক্ত সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ নীতির গৌরব ঘোষণার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত জনগণ আহূত হইবেন। রাজা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে শ্রমণ রাজার আহ্বান অনুসারে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহার সম্প্রদায়ের ত্রিশ সহস্র কথা উচ্চারণ করেন। তাঁহার গভীর যুক্তি ও রাশি রাশি দৃষ্টান্ত সমস্ত বিচার পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রমণ তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করেন, ও কয়েক শত কথায় সকল আপত্তির উত্তর দেন। পরে তিনি উক্ত পণ্ডিতকে তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক মতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার উত্তর সকল বিক্ষিপ্ত ও যুক্তি বলহীন হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে মুখরোধ উপস্থিত হওয়ায়, উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। রাজা শ্রমণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন।* তদবধি

* কেহ কেহ হিউয়েন-সিয়াঙকে উক্ত শ্রমণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু হিউয়েন-সিয়াঙের বর্ণনার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে তাহা বোধ হয় না।

কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে বৌদ্ধনীতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘারামের পার্শ্বে, এবং তাহার অদূরেই রাজা অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ। যে সময়ে তথাগত * জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এইখানে সাত দিন ব্যাপিয়া বৌদ্ধনীতি প্রচার করেন। ইহার পার্শ্বে একটী বিহার, তথায় গত চারি জন বুদ্ধের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন ছিল। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি স্তূপের স্থলে বুদ্ধ আপনার মনোহারিণী নীতি প্রচার করিয়াছিলেন; উক্ত স্তূপগুলিও অশোক রাজার নির্ম্মিত।

**হর্ষবর্দ্ধন ও শশাঙ্ক।**

হিউয়েন-সিয়াঙ্গের বর্ণনা হইতে কর্ণসুবর্ণের তদানীন্তন অবস্থা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তথায় কোন্ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন তাহা জানিতে হইলে আরও আলোচনার প্রয়োজন হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের কান্যকুব্জের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার আগমনের কিছু পূর্ব্বে কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্ক নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। উক্ত শশাঙ্ক কান্যকুব্জের তদানীন্তন অধীশ্বর হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে বিনাশ করায় নিজে হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। হর্ষবর্দ্ধনের বিবরণ বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত ও হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপি প্রভৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। রাজা হর্ষবর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠ জনপদের অন্তর্গত স্থান্বীশ্বর (থানেশ্বর) প্রদেশের অধিপতি রাজা পুষ্পভূতির বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্রভাকর বর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা জন্মে। প্রভাকরবর্দ্ধন হূণ, গান্ধার, সিন্ধু, লাট, গুর্জ্জর ও মালব দেশের নরপতিদিগকে পরাজয় করিয়া আপনার অধিকার বিস্তার করেন। কান্যকুব্জরাজ মৌখরী বংশীয় গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। প্রভাকরবর্দ্ধন দাহজ্বরে শয্যাশায়ী হইলে তাঁহার রাজ্ঞী অনল প্রবেশে জীবন বিসর্জ্জন দেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মালবরাজ বিদ্রোহী হইয়া গ্রহবর্ম্মাকে নিহত ও রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মালবরাজকে যুদ্ধে নিহত করিলে, মালবরাজের বন্ধু গৌড়াধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া গোপনে তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করেন। † তাহার পর কান্যকুব্জ (গৌড়াধিপতি) গুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, ও রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রস্থান করেন। হর্ষবর্দ্ধন সে সময়ে দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদে অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। পথিমধ্যে রাজ্যবর্দ্ধনের অনুচর ভণ্ডির সহিত সাক্ষাৎ হইলে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করার আদেশ দিয়া

---

* তথাগত বুদ্ধের নামান্তর। "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ" (অমর); তথা সত্যং গতং জ্ঞাতং যস্য। বুদ্ধ আপনাকে তথাগত বলিয়া অভিহিত করিতেন।

† "তস্মাচ্চ হেলানির্জ্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রং একাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবনএব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ" (হর্ষচরিত ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস)। মধুবনের শিলালিপিতেও এইরূপ ভাবের কথা আছে যথা—

"উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ।"

নিজে ভগিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বিন্ধ্যারণ্যে দিবাকর মিত্র নামে গ্রহবর্ম্মার পরিচিত এক বৌদ্ধ যতির নিকট রাজ্যশ্রীর সংবাদ পাইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন, এবং যতির আশ্রমে রাখিয়া গঙ্গাতীরে নিজ সৈন্যের সহিত মিলিত হন। হর্ষচরিতে রাজা হর্ষের বিবরণ এই পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি তৎপরে গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের পঞ্চ প্রদেশ * তাঁহার করায়ত্ত হয়। উক্ত পঞ্চ প্রদেশের মধ্যে গৌড় অন্যতম। হিউয়েন সিয়াঙ্গ এই গৌড়ের অধিপতিকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কান্যকুব্জ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে যে, কান্যকুব্জের তদানীন্তন রাজা জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। † তাঁহার নাম হর্ষবর্দ্ধন। হর্ষবর্দ্ধনের পিতার নাম প্রভাকরবর্দ্ধন ও ভ্রাতার নাম রাজ্যবর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাজ্যবর্দ্ধন অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব ভারতের কর্ণসুবর্ণরাজ্যে শশাঙ্কনামে নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে প্রত্যন্ত প্রদেশে ধার্ম্মিক রাজা থাকিলে অত্যন্ত অসুখের বিষয় হয়। পরে অমাত্যগণের পরামর্শক্রমে শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের অমাত্যবর্গ হর্ষবর্দ্ধনকে রাজত্ব করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি গঙ্গাতীরস্থ অবলোকিতেশ্বর নামে বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইয়া রাজত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, বোধিসত্ত্ব এইরূপ উত্তর প্রদান করেন যে, পূর্ব্বজন্মে তুমি এই বনের একজন সন্ন্যাসী ছিলে, তপস্যাপ্রভাবে পুণ্যসঞ্চয় করিয়া তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কর্ণসুবর্ণের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, তুমি রাজত্ব লাভ করিলে তাহার অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিবে; যদি তুমি বিপন্নের সহায় হও, তাহা হইলে পঞ্চ ভারত তোমার করায়ত্ত হইবে। আমার উপদেশানুসারে চলিলে আমার গুপ্ত ক্ষমতাবলে তোমার প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ তোমার উপর বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। তুমি কখনও সিংহাসনে উপবেশন ও আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিও না। বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। তিনি আপনাকে কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেন। শীলাদিত্য তাঁহার উপাধি ছিল। হর্ষবর্দ্ধন পাঁচ সহস্র হস্তী দুই সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক সেনার সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, ও ক্রমে ক্রমে পঞ্চভারত আপনার করায়ত্ত করেন। কর্ণসুবর্ণ উক্ত পঞ্চ ভারতের অন্যতম। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মতে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের ষাটি সহস্র রণ হস্তী ও লক্ষ অশ্বারোহী সেনা ছিল। বহু বৎসর হইতে তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের নাম মাত্র ছিল না। হিউয়েন সিয়াঙ্গ হর্ষবর্দ্ধনকে বৌদ্ধ নরপতি

* হিউয়েন-সিয়াঙ্গ Five Indies বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Five Indies সম্ভবতঃ পঞ্চগৌড় হইবে।

† বীলসাহেব বৈশ্যকে রাজপুতজাতির বাইশসম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াঙ্গ সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় স্থলে বৈশ্য লিখিয়াছেন, তাঁহার এই প্রকারের ভ্রম আরও দুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, রাঙ্গামাটি হইতে ঐ জাতীয় অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা যে গুপ্তবংশীয়গণের একটী প্রধান স্থান ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। প্রথমে পাটলিপুত্র গুপ্তসম্রাট্‌গণের রাজধানী ছিল; ক্রমে গুপ্তবংশীয়গণ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতের নানা স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। রাঙ্গামাটি ঐরূপে তাঁহাদের কোন একটী শাখার রাজধানী হইয়া উঠে, এবং উক্ত শাখা হইতেই শশাঙ্ক উদ্ভূত হন বলিয়া অনুমান হয়। হিউয়ান সিয়াঙ্গের ভারতবর্ষে আগমন করার সময়ে গুপ্তবংশীয়গণ যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মালবরাজপুত্র কুমার গুপ্ত ও মাধব গুপ্ত রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের অনুচর ছিলেন। স্কন্দ গুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদিগের প্রধান অমাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় যে, রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্ত প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। * গৌড়াধিপতি বা কর্ণসুবর্ণরাজ যে উক্ত গুপ্তবংশীয় ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে লিখিত আছে যে, মালবরাজ কর্তৃক কান্যকুব্জাধিপ নিহত ও রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হইলে রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে নিহত করেন; অবশেষে তিনিও গৌড়াধিপ কর্তৃক নিহত হন; তৎপরে কান্যকুব্জ গৌড়াধিপতি গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত হয়। † রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আনীত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে গুপ্ত নামক কুলপুত্রের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ করেন। ‡ গৌড়াধিপ গুপ্ত কর্তৃক কান্যকুব্জ গৃহীত হওয়ায়, এবং কুলপুত্র গুপ্ত কর্তৃক রাজ্যশ্রী মুক্তিলাভ করায় গৌড়ের তদানীন্তন অধিপতি যে গুপ্তবংশজ ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, এবং উক্ত গৌড়াধিপ যে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ শশাঙ্ককে নরেন্দ্র গুপ্ত বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। নরেন্দ্র গুপ্তের মুদ্রা দ্বারা তাঁহার যে সময় স্থির হয়, হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন ও শশাঙ্কের রাজত্ব তাঁহাদের মতে সেই সময়ে হওয়ায় তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায় আমরা নরেন্দ্র গুপ্তকে শশাঙ্ক বলিয়া স্থির করিতে সাহসী হইতে পারি না; এবং হিউয়েন সিয়াঙ্গ ও শশাঙ্কের সময় সম্বন্ধেও আমরা তাঁহাদের

---

* "রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ।
কৃত্বা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ॥"

† দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনে গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিভ্রশ্য বন্ধনাৎ বিন্ধ্যাটবীং সপরিবারা প্রবিষ্টেতি লোকতো বার্ত্তামশৃণবম্। ( ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছাস )

দেবভূয়ং গতে রাজ্যবর্দ্ধনে গৌড়েয়গৃহীতে চ কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিভ্রষ্টা বন্ধনাদ্বিন্ধ্যাটবীং সপরিজনা প্রবিষ্টেতি লোকতো বার্ত্তামশৃণবম্। ( জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস )

কুশস্থল কান্যকুব্জের নামান্তর; উপরোক্ত পাঠদ্বয় হইতে 'গুপ্তনাম্না' ও 'গৌড়েয়' একার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং গৌড়াধিপতি যে গুপ্তনামা ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

‡ ভুক্তবাংশ্চ বন্ধনাৎ প্রভৃতি বিস্তরতঃ স্বসুঃ কান্যকুব্জাৎ গৌড়সম্ভ্রমং গুপ্তিতো গুপ্তনাম্না কুলপুত্রেন নিষ্কাসনং ( ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিত ৮ম উচ্ছ্বাস )

এখানেও গৌড় রাজবংশীয় গুপ্তনামা কুলপুত্রের উল্লেখ আছে।

সহিত একমত নহি। যাহা হউক শশাঙ্ক যে গুপ্তবংশীয় কোন নরপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শশাঙ্কের বিষয় আলোচনা করিয়া এইরূপ মনে হয়, উহা কোন রাজার নাম নহে, একটী উপাধি মাত্র। হর্ষ-চরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কামরূপের রাজা সুস্থির বর্ম্মা "মৃগাঙ্ক" উপাধিতে অভিহিত হইতেন। * মৃগাঙ্কের ন্যায় শশাঙ্ক যে একটী উপাধি ছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। পরাক্রমশালী

ভিন্ন ভিন্ন শশাঙ্ক।

ভিন্ন ভিন্ন শশাঙ্কের বিবরণ হইতে উহা আরও বিশদীকৃত হয়। আমরা প্রথমতঃ দুইজন পরাক্রান্ত শশাঙ্কের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন গয়ার বোধিদ্রুমের শত্রু এবং আর একজন আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ণসুবর্ণরাজ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কিন্তু উক্ত দুই জনকে এক ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে কদাপি উক্ত দুই জনকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা কেবল একটী মাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্ক যে ঘোরতর বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ককেও যে বৌদ্ধদ্বেষী বলিয়া স্থির করেন, সে বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, এবং কেবল উক্ত প্রমাণের বলেই তাঁহারা উভয়কে এক ব্যক্তি বলিতে বাধ্য হন। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধদ্বেষের কথা কেবল একটী স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। যৎকালে রাজা হর্ষবর্দ্ধন অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তির নিকট গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উক্ত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধদ্বেষের কথা প্রকাশ করেন। বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত এই অলৌকিক ঘটনা কতদূর বিশ্বাস্য, প্রথমে তাহাই বিবেচনা করা উচিত। উক্ত বর্ণনা বিশ্বাস করিলেও এবং তাহাতে উল্লিখিত কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধদ্বেষের কথা স্বীকার করিয়া লইলেও বোধিদ্রুমের শত্রু শশাঙ্কের বর্ণনার সহিত কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের বিবরণের সামঞ্জস্য হয় না। আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। বোধিদ্রুমের শত্রু শশাঙ্কের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায়, বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছিলেন, হিংসাপ্রযুক্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদিরও বিনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি বোধিদ্রুম ছেদন ও খনন করিয়া তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলেন; কিন্তু তাহাকে একেবারে নিঃশেষ করিতে পারেন নাই; অবশেষে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ইক্ষুরস প্রক্ষেপ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে মগধাধিপতি অশোকবংশীয় পূর্ণবর্ম্মা সহস্র গাভীর দুগ্ধে স্নাত করিলে সেই নিঃশেষপ্রায় বোধিমূল এক রাত্রি মধ্যে দশ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে।

---

* পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিরস্থিতেঃ স্থিতিবর্ম্মণঃ সুস্থিরবর্ম্মা নাম মহারাজাধিরাজো জজ্ঞে তেজসাং রাশিঃ মৃগাঙ্ক ইতি যং জনা জগুঃ। (হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস)

পূর্ণবর্ম্মা অবশেষে তাহাকে চল্লিশ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া ফেলেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ উক্ত প্রাচীরকে বিশ ফুট উচ্চ দেখিয়াছিলেন। বোধিদ্রুম ধ্বংসের পর শশাঙ্ক রাজা তাহার নিকটস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি অপসারণ করিয়া তাহার স্থানে এক মহেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত কর্ম্মচারী বৌদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধমূর্ত্তি অপসারণে সাহসী না হইয়া তাহার চারি পার্শ্বে ইষ্টক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া বুদ্ধমূর্ত্তিকে আবৃত করিয়া ফেলেন, এবং তাহার বাহিরে এক মহেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাজাকে তাহার সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা উক্ত সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হন, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ব্রণ-পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; মাংস গলিত হইতে আরম্ভ হয়; অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তাহার পর উক্ত কর্ম্মচারী ইষ্টক প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। হিউ-য়েন সিয়াঙ্গ বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্কের বিষয় যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কদাপি হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয় না। বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মতে পূর্ণবর্ম্মা অশোক বংশের শেষ রাজা; অশোক বংশ হর্ষবর্দ্ধনের বহুকাল পূর্ব্বে বিলুপ্ত হয়। পৌরাণিক মতে খৃষ্ট জন্মের ১১৯৫ বা ১১৬০ বৎসর পূর্ব্বে * এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে খৃষ্টের জন্মের ১৮৩ বৎসর পূর্ব্বে † অশোক বংশের রাজত্ব শেষ হয়। তাহার পর শুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্র বংশ মগধে রাজত্ব করেন। অবশেষে গুপ্ত সম্রাট্‌গণ মগধের অধীশ্বর হইয়া ভারতের বহু প্রদেশে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই গুপ্ত বংশের রাজত্ব সময়েই হিউয়েন সিয়াঙ্গ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর মধ্য ভাগ তাঁহার উপস্থিতির সময় বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ণবর্ম্মা অশোকবংশের শেষ রাজা হইলে বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক যে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক হইতে পারেন না, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। তবে যদি হিউয়েন সিয়াঙ্গ পূর্ণবর্ম্মাকে অশোকবংশীয় বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত লইয়া কতকটা আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু পূর্ণবর্ম্মা কোন্ বংশীয় রাজা, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইলে তাঁহার সময় লইয়া আলোচনা কিছু কঠিন হইয়া উঠে; এবং হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণনা হইতে তাঁহার আগমনের অল্পকাল পূর্ব্বেই যে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাও বুঝা যায় না। ‡ বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক কর্ণ-সুবর্ণরাজ হইলে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে কর্ণসুবর্ণরাজ যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা তিনি কদাপি বোধিদ্রুম বিনাশ করিতে

---

* বিষ্ণুপুরাণের মতে খৃষ্টের জন্মের ১১৯৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং বায়ু ও মৎস্য পুরাণের মতে খৃষ্টের ১১৬০ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশের রাজত্ব শেষ হয়।

† R. C. Dutt's Ancient India, Book IV. P. 490

‡ বেভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন যে "But it seems clear that Sasanka had done this long before and in the time of Siladitya's predecessor"

সাহসী হইতেন না। * কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব সময়ে কর্ণসুবর্ণরাজের স্বাধীনতা অবলম্বন করা দূরে থাকুক, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হর্ষচরিত পাঠে জানা যায় যে, হর্ষবর্দ্ধন ভণ্ডিকে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিয়া নিজে বিন্ধ্যারণ্যে রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে গমন করেন। পরে তথা হইতে গঙ্গাতীরে নিজ সেনার সহিত মিলিত হন। ইহার পর তিনি যে গৌড় বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মতেও হর্ষবর্দ্ধন অবলোকিতেশ্বরের উপদেশানুসারে সসৈন্যে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, এবং প্রথমেই যে কর্ণসুবর্ণে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও অবশ্য বুঝিতে হইবে। কর্ণসুবর্ণ বিজয় করিয়া হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহন্তাকে যে জীবিত রাখিয়াছিলেন, তাহা কদাপি মনে হয় না। ভ্রাতৃহন্তাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলে তাঁহার যশ প্রবাদবাক্যের ন্যায় গীত হইত, কিন্তু কোনও স্থলে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে শশাঙ্ক জীবিত থাকিলেও তিনি যে নিতান্ত হীনবল হইয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পঞ্চ গৌড় বা পঞ্চ ভারতেশ্বর হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বসময়ে তাঁহার অধীন রাজগণের মধ্যে কাহারও স্বাধীনতা অবলম্বনের ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে কদাপি তাঁহার অধীন রাজা বোধিদ্রুম নষ্ট করিতে সাহসী হইতেন না। এবং শশাঙ্ক যে বিজিত হওয়ার পূর্ব্বে বোধিদ্রুম নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না। কারণ বোধিদ্রুম নাশের পরেই শশাঙ্কের মৃত্যু হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইলে, তিনি যে তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মতে তিনি যে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং যেরূপ অসংখ্য স্তূপ সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন, বোধিদ্রুম রক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার যত্ন যে অপরিসীম হইত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বোধিদ্রুমধ্বংসরূপ এই প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত হর্ষবর্দ্ধনের সম্বন্ধ থাকার কোনও উল্লেখ না থাকায় তাঁহার সময়ে যে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা কদাপি বিশ্বাস করা যায় না। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক যে এক ব্যক্তি নহেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্বের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলে, বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্কের ন্যায় কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কও বৌদ্ধবিদ্বেষ্টা ছিলেন, এইমাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ককে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু বলিয়া স্বীকার করি না। একমাত্র অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তির কথা ব্যতীত অন্য কোথায়ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং হিউয়েন সিয়াঙ্গের কর্ণসুবর্ণের বিবরণ হইতে তাহার বিপরীত প্রমাণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্কের বর্ণনায় লিখিত আছে যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অবমাননা ও সঙ্ঘারামাদির বিনাশ

* Lassen holds that Sasanka must have retained his independence during Siladitya's reign, or otherwise he never would have ventured to cut down the sacred tree. ( Beveridge )

সাধন করিয়া বোধিদ্রুম উৎপাটনে প্রবৃত্ত হন। কর্ণসুবর্ণের বিবরণে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ উক্ত রাজ্যে আসিয়া রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত সঙ্ঘারাম যে শশাঙ্কের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও দশটী সঙ্ঘারাম ও অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ ও বিহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু হইলে নিজ রাজ্যে এই সমস্ত বৌদ্ধ চিহ্ন অক্ষত রাখিয়া রাজ্যান্তরে সঙ্ঘারামাদির বিনাশের জন্য যে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, ইহা কদাপি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। গুপ্তবংশীয়েরা হিন্দু ও শক্তি-উপাসক হওয়ায় শশাঙ্ককে যদি কেহ বুদ্ধবিদ্বেষ্টা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ কর্ণসুবর্ণরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা শশাঙ্ককে বুদ্ধবিদ্বেষ্টা বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কথা কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক কদাপি এক ব্যক্তি নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শশাঙ্ক কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা উপাধি মাত্র। সম্ভবতঃ বোধিদ্রুমবিনাশকের শশাঙ্ক উপাধি কর্ণসুবর্ণরাজ গ্রহণ করায় এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্ক বিহার প্রদেশের কোনও রাজা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রোটাসের শিলালিপিতে যে শশাঙ্কের নাম পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্ক হইবেন এবং তাঁহার মোহরাদিরও আবিষ্কার হইয়াছে। উক্ত দুই শশাঙ্ক ব্যতীত আরও কোন কোন শশাঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায়। বগুড়াতে শশাঙ্ক নামে একটী পুষ্করিণী আছে; কেহ কেহ তাহাকে কোনও শশাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন। খরকপুরে শশাঙ্ক নামে ক্ষেত্রী বংশীয় এক রাজা ১৫০২ খৃষ্টাব্দে (৯১০ ফসলীতে) নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক নামে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেভারিজ সাহেব আদিশূর বংশীয় শশধরকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের নামান্তর স্থির করিয়া, তাঁহার সময় নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আদিশূর হিউয়েন সিয়াঙ্গের যে বহুকাল পরে আবির্ভূত হন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শশধর আদিশূর হইতে নবম পুরুষ; সুতরাং তিনি যে বহুকাল পূর্ব্বের লোক নহেন তাহাও বুঝা যাইতেছে। উক্ত শশধরের প্রকৃত নাম শশধর কি সৃষ্টিধর অথবা অন্য কিছু, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

এখানে আমরা হিউয়েন সিয়াঙ্গের ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের সময় নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন; কিন্তু দেশীয় গ্রন্থ পর্য্যা-

**হিউয়েন সিয়াঙ্গ ও শশাঙ্কের সময়।**

লোচনা করিলে তাহার বহুপূর্ব্বে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মালবের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার মালবে উপস্থিতির ষাটি বৎসর পূর্ব্বে শীলাদিত্য রাজা মালবে

রাজত্ব করিতেন এবং তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, উক্ত শীলাদিত্য সুবিখ্যাত শকারি বিক্রমাদিত্যের পুত্র; তাঁহার অপর নাম প্রতাপশীল।* তিনি কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় প্রবরসেনের সমসাময়িক। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে দ্বিতীয় প্রবর সেন ৪৭ শকাব্দ হইতে ১০৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণীর মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের ভারতবর্ষে আগমন স্থির হয়।† হিউয়েন সিয়াঙ্গের নেপালের বর্ণনায় রাজা অংশুবর্ম্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অংশুবর্ম্মা হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমনের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। নেপালের বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঠাকুরী বংশীয় প্রথম রাজা অংশুবর্ম্মার পূর্ব্বে সূর্য্য স্বামীর বংশীয় শেষ রাজা তাঁহার শ্বশুর বিশ্বদেববর্ম্মা, রাজত্ব করিতেন, উক্ত বিশ্বদেববর্ম্মার রাজত্ব সময়ে নেপালে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ প্রচলিত হয়।‡ অংশুবর্ম্মা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০১ অব্দে রাজা হন।§ অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপি হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে অংশুবর্ম্মা ৩ হাজার কলিযুগে বা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০১ অব্দে রাজা হন।

---

* বৈরিনির্ব্বাসিতং পিত্রো বিক্রমাদিত্যাঙ্গং স্থধাৎ।
রাজ্যে প্রতাপশীলং স শীলাদিত্যাপরাভিধম্ ॥—(রাজতরঙ্গিণী ৩য় তরঙ্গ)

† প্রবরসেন ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন, শীলাদিত্যও ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। শীলাদিত্যের রাজত্ব প্রায় ১০০ শকাব্দ পর্যান্ত ধরিলে হিউয়েন সিয়াঙ্গ ১৬০ শকাব্দ বা ২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মালবে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

‡ সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য ও শকাব্দ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য দুইজনে বিভিন্ন ব্যক্তি। শেষোক্ত বিক্রমাদিত্যই উজ্জয়িনীর বিদ্যোৎসাহী রাজা। সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য তাঁহার পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

§ অংশুবর্ম্মার সময়ের চারিখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ১ম খানিতে ৩৪, ২য় খানিতে ৩৯, ৩য় ৪র্থ খানিতে ৪৮ সংবৎ লিখিত আছে। (Indian Antiquary Vol I. X,) এই সংবৎকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শ্রীহর্ষ সংবৎ বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। কারণ হিউয়েন সিয়াঙ্গ যে সময়ে নেপালে উপস্থিত হন, তাহার বহু পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হয় এবং রাজা হর্ষবর্দ্ধন সেই সময়ে কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রচলিত শ্রীহর্ষাব্দের কথা অংশুবর্ম্মার শিলালিপিতে থাকিতে পারে না। আলবেরুণি যে শ্রীহর্ষাব্দের কথা লিখিয়াছেন তাহা বিক্রম সম্বৎ হইতে ৪০০ বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং উক্ত শ্রীহর্ষাব্দের কথা থাকাও অসম্ভব। বেণ্ডাল সাহেব নেপাল হইতে শিবদেব বর্ম্মা ও অংশুবর্ম্মার যে শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে ৩১৮ সম্বৎ পড়িয়াছেন। উহাকে তিনি গুপ্ত বলভী অব্দ বলিতে চান, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই অংশুবর্ম্মা যে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত অংশুবর্ম্মা নহেন, তাহার কতকটা অনুমান হইয়া থাকে। বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলীতে যে অংশুবর্ম্মার উল্লেখ আছে, তিনিই যে হিউয়েন সিয়াঙ্গের কথিত অংশুবর্ম্মা ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। উক্ত প্রসিদ্ধ অংশুবর্ম্মা নেপালের ঠাকুর বংশের স্থাপয়িতা। তিনি সূর্য্যস্বামীর বংশীয় শেষ রাজা, বিশ্বদেব বর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিশ্বদেব বর্ম্মার রাজত্ব সময়ে নেপালে বিক্রম সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল। বেণ্ডাল সাহেবের উল্লিখিত শিবদেব বর্ম্মা, উক্ত সূর্য্যস্বামীর বংশীয় হইলে তিনি অংশুবর্ম্মার শ্বশুর বিশ্বদেব বর্ম্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইয়া উঠেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে অংশুবর্ম্মার জীবিত থাকা ও স্বাধীন রাজরূপে রাজত্ব করা অসম্ভব। উক্ত অংশুবর্ম্মা প্রসিদ্ধ অংশুবর্ম্মা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি হইলেও তিনি শিবদেবের, মহাসামন্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত ৩১৮ সম্বৎ সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম নহি। শ্রীযুক্ত বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপির অঙ্কগুলিকে গুপ্ত সম্বৎ ও বেণ্ডাল সাহেবের ৩১৮ সম্বৎকে শকাব্দ বলিতে চাহেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। গুপ্তকাল সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন

অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপি হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহার পূর্ব্বে নেপালে বিক্রম সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল, সুতরাং অংশুবর্ম্মার পর হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন হইলে দেশীয় গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনায় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁহার ভারতবর্ষে উপস্থিতি স্থির হয়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন স্থির হইলে, কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমনকালে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে শশাঙ্কের সময় স্থির করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় রাজা। গুপ্ত বংশের রাজত্ব লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে; গুপ্ত বংশের প্রকৃত সময় অদ্যাপি স্থির হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে গুপ্তরাজগণ খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় [illegible] শতাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি।

রাজা শশাঙ্কের বিবরণের পর আমরা কর্ণসুবর্ণ বা রাঙ্গামাটির বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত নাই। কতদিন পর্য্যন্ত রাঙ্গামাটিতে গুপ্তবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। গুপ্তবংশের পর আর কোন বংশ রাঙ্গামাটিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না তাহাও জানা যায় না। গুপ্তবংশের পর গৌড় বা বাঙ্গালায় শূরবংশ রাজত্ব করেন। সাধারণতঃ গৌড় তাঁহাদের রাজধানী ছিল। আদিশূরের পুত্র ভূশূর, মগধাধিপ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি তথায় পুণ্ড্র* নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং রাঢ়ের প্রসিদ্ধ নগর রাঙ্গামাটির সহিত শূরবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা জানা যায় না। পালবংশ যৎকালে উত্তর রাঢ়ে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করেন সে সময়ে মহীপাল তাঁহাদের রাজধানী হইয়া উঠে। সেনবংশের সময় গৌড় ও [illegible] প্রভৃতি রাজধানীর কথা অবগত হওয়া যায়। গুপ্তবংশের পরবর্ত্তী এই সমস্ত রাজবংশের সহিত রাঙ্গামাটির কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই, তবে রাঙ্গামাটি অনেক দিন পর্য্যন্ত রাঢ় প্রদেশের যে একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিরূপে রাঙ্গামাটির গৌরব হ্রাস বা তাহার ধ্বংস হয় তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া

রাঙ্গামাটি ধ্বংসের প্রবাদ।

---

[illegible] গুপ্তকাল [illegible] আমাদের মনে নানারূপ তর্ক উপস্থিত হয়। বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলী হইতে যখন [illegible] সময় ও বিক্রম সম্বৎ প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপির [illegible] বিক্রম সম্বৎ বলা যাইতে পারে। বেণ্ডাল সাহেবের সংগৃহীত শিলালিপিতে নেপালের পূর্ব্ব প্রচলিত [illegible] কোনও সম্বৎ হইতে পারে। এই কালের শিলালিপিতে ৫৫৬ সালে পুলকেশীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পুলকেশী হিউয়েন সিয়াঙ্গের কথিত পুলকেশী বলিয়া স্থির হইয়া থাকে, যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন হয়।

* এই পুণ্ড্রকে কেহ কেহ হুগলী জেলার বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো বলিয়া অনুমান করেন।

যায় না। উইলফোর্ড সাহেব রাঙ্গামাটি ধ্বংসের একটী প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকেন। যবদ্বীপ বা অথবা সিংহলের রাজা কতকগুলি রণতরী লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তৎকালে রাঙ্গামাটি বাঙ্গলার একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল ও তাহা কুসুমপুরী নামে অভিহিত হইত। বাঙ্গলার রাজা প্রায়ই তথায় বাস করিতেন। আক্রমণকারীরা দেশ লুণ্ঠন করিয়া নগরের ধ্বংস সম্পাদন করে। উইলফোর্ড সাহেবের মতে তাহা বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।* বেভারিজ সাহেব বঙ্গবিজয়ের অল্প পূর্ব্বেই রাঙ্গামাটি ধ্বংসের অনুমান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার মতে সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর সময়ে রাঙ্গামাটি আক্রান্ত হয়। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে সিংহলের সিংহাসনে উপবেশন করেন; এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দিগ্বিজয় আরব্ধ হয়। তাঁহার কয়েকখানি জাহাজ আরামা বা রামামার কুসুমী বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। উইলফোর্ড সাহেবের মতে রাঙ্গামাটির নাম কুসুমপুরী হওয়ায়, এবং কুসুমী বন্দরের সহিত তাহার নামের কথঞ্চিৎ ঐক্য দেখিয়া, বেভারিজ সাহেব ঐরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু রামামার অবস্থান সম্বন্ধে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায় ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থার যেরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকে কদাচ রাঙ্গামাটি প্রদেশ বলিয়া স্থির করা যায় না।† সুতরাং বেভারিজ সাহেবের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। লঙ্কার রাজা কর্ত্তৃক রাঙ্গামাটি ধ্বংসের প্রবাদ অনেক দিন প্রচলিত ছিল, লেয়ার্ড সাহেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার শ্রুত প্রবাদ উইলফোর্ড সাহেবের প্রবাদ হইতে বিভিন্ন। এক্ষণে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রাঙ্গামাটির শেষ রাজা তাহার নিকটস্থ চৌটার বিলে সপরিবারে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই সমস্ত প্রবাদের কোনও মূল আছে কি না বলা যায় না এবং এই সকল রাজা মহারাজেরও কোন পরিচয় পাওয়ার উপায় নাই। রাঙ্গামাটি ধ্বংসের কোনও রাজনৈতিক কারণ ছিল কি না বলিতে পারা যায় না। তবে প্রাকৃতিক কারণে তাহার যে অনিষ্ট হইয়াছে ইহা বেশ বুঝা যায়। যে কারণে গুপ্তবংশীয়দের প্রধান রাজধানী পাটলিপুত্রের ধ্বংস হইয়াছিল, সেই জলপ্লাবনে তাঁহাদের অন্যতম রাজধানী রাঙ্গামাটির ধ্বংস হয় বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে।

রাঙ্গামাটির প্রাচীন বিবরণ সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে; এক্ষণে তথায় প্রাচীন সময়ের যে সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

**রাঙ্গামাটির প্রাচীন চিহ্ন।**

উইলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে রাঙ্গামাটির

---

* **Asiatic Researches Vol IX p. 39.**

† Wijesinha রামামাকে আরাকান ও শ্যামদেশের মধ্যস্থিত মনে করেন। Gastaldiর পুরাতন মানচিত্রে উড়িষ্যার পূর্ব্বে হিজলীর নিকট রামামা নামক স্থানের উল্লেখ আছে। ইহার কোনটির অবস্থান রাঙ্গামাটির অবস্থানের সহিত মিলে না। আবার রামামা দেশে অপর্য্যাপ্ত নারিকেল বৃক্ষের উল্লেখ দেখা যায়, রাঙ্গামাটিতে নারিকেল বৃক্ষ অধিক পরিমাণে জন্মে না। কারণ রাঢ় প্রদেশের মৃত্তিকায় নারিকেল বৃক্ষ জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং রামামার অবস্থান ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্যে তাহাকে রাঙ্গামাটি হইতে স্পষ্টই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

একটি স্থান মহাদেবের পূজার জন্ম উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, এবং অনেক ভূভাগ তাঁহার সেবার জন্য অর্পিত হয়। উক্ত উৎসর্গীকৃত ভূখণ্ডকে হরার্পণভূমি বলিত। তাহা গঙ্গাগর্ভে লীন হইলে আর একটী স্থান পূজার জন্ম নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতি লোকের আর তাদৃশ যত্ন নাই, এবং শিবলিঙ্গও স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই শিবমন্দির কোন্ স্থানে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ রাঙ্গামাটির অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। "ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা নামে একটী উচ্চ স্থান আছে, তথায়, কিংবা যমুনা নাম্নী তাহার প্রাচীন পুষ্করিণীর নিকটস্থ কোন স্থানে উক্ত শিবমন্দির ছিল তাহা বুঝা যায় না। যমুনা পুষ্করিণী হইতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার নিকটে একটী দেব মন্দির ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শিব মন্দির তথায় কিম্বা ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গায় ছিল তাহা অবগত হওয়া কঠিন। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে যে সমস্ত প্রাচীন চিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণেও প্রায় সে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উল্লিখিত রাক্ষসীডাঙ্গা ও রাজবাড়ী ডাঙ্গা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই রাক্ষসী ডাঙ্গা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ ও অসংখ্য ইষ্টকখণ্ডে পরিপূর্ণ। তাহার নীচে একটি বটবৃক্ষ। বৃক্ষের তলে পীর তুর্কান সাহেব নামে এক জন মুসলমান ফকীরের সমাধি। রাক্ষসী ডাঙ্গা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, লঙ্কা হইতে একটী রাক্ষসী আসিয়া তথায় বাস করে; রাজা প্রতিদিন তাহার সহিত তর্ক করিবার জন্ম একজন করিয়া পণ্ডিত পাঠাইতেন; পণ্ডিতেরা তর্কে পরাজিত হইলে রাক্ষসী তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত। পীর তুর্কান সাহেব রাক্ষসীকে পরাজয় ও বধ করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন; অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইলে তথায় তাঁহার সমাধি হয়। তাহার সমাধিতে ইষ্টক সংযোগের আদেশ নাই; সেই জন্য তাহা একটী খড়ের চালার মধ্যে অবস্থিত। সমাধির নিকটে অসম্পূর্ণ ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত একটী ভিত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তথায় একটী মসজীদ্ নির্ম্মিত হইতেছিল। রাক্ষসী ডাঙ্গার উত্তরে পীর পুকুর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। এই রাক্ষসী ডাঙ্গাকে একটী বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ইহা হিউয়েন সিয়াঙ্গ বর্ণিত অশোক রাজার স্তূপ হইবে। বৌদ্ধস্থাপত্য কার্য্যে নানারূপ অস্বাভাবিক মূর্ত্তি থাকায়, এবং পূর্ব্বে উক্ত স্থানে সেই প্রকারের মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ায়, তাহার নাম রাক্ষসীডাঙ্গা হইয়া থাকিবে।* এই রাক্ষসী ডাঙ্গার নিকটেই রাজবাড়ী ডাঙ্গা; তাহাও একটী অনত্যুচ্চ ভূভাগ ও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই স্থানে রাজা কর্ণসেনের প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। প্রাসাদের চারিদিক গভীর পরিখাবেষ্টিত ছিল। পরিখার চিহ্ন তিন দিকে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। চতুর্থ দিকের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না; তাহার অধিকাংশ ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরিখা এক্ষণে কর্ষিত হইয়া

* মহীপাল দেবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের মহীপাল গ্রামে একখণ্ড প্রস্তরে শৃঙ্গযুক্ত চতুষ্পদ কোন জন্তুবিশেষের মূর্ত্তি আছে, লোকে তাহাকে রাক্ষসের দেহ বলে। রাঙ্গামাটির রেশম কুঠীর আকৃতিযুক্ত প্রস্তর খণ্ডকেও লোকে রাক্ষসের দেহ বলিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রস্তরের অবস্থানের জন্ত বৌদ্ধস্তূপ রাক্ষসী ডাঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শস্যোৎপাদক ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই রাজবাড়ী-ডাঙ্গাকে লোকে অন্দর ও সদর দুই ভাগে বিভক্ত করে। কাজলা নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী রাজবাড়ী ডাঙ্গায় অবস্থিত। তাহার নিকটে সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যাবাস করার প্রস্তাব সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী বৃহৎ কূপ খনিত হইয়াছে। রাজবাড়ীর পূর্ব্বে একটী সুবৃহৎ তোরণ দ্বারের চিহ্ন অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল; লোকে তাহাকে বুরুজ বলিত। কয়েক বৎসর হইল তাহা ভাগীরথী গর্ভস্থ হইয়াছে। ইহার নিকটে যদুপুর গ্রামে বিল্বপুষ্করিণী নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে; তাহার উপর রাজা কর্ণসেনের বিচারালয় ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কিছু দূরে ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা; উহার অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথী গর্ভস্থ। এইখানে রাজবংশের ঠাকুর বাড়ী ছিল বলিয়া লোকমুখে শুনা যায়। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গার ভূমি ভাগীরথীগর্ভস্থ হওয়ার সময় একখানি স্বর্ণপ্রতিমা একজন লোকের হস্তগত হয়; অনেকে তাহাকে লক্ষ্মী মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। * এতদ্ভিন্ন অনেক শঙ্খ ও বহু পরিমাণে সিন্দুর ভাগীরথী গর্ভে পতিত হইয়াছিল। রাজবাড়ী ডাঙ্গার পূর্ব্বদিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রাচীন গঙ্গাতীরে একটী অত্যুচ্চ ভূভাগ আছে, রাঙ্গামাটির রেশম কুঠীর নিকটবর্ত্তী ডাঙ্গা ব্যতীত উক্ত ভূভাগের ন্যায় উচ্চ ডাঙ্গা আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম সন্ন্যাসী ডাঙ্গা। এই সন্ন্যাসী ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া সমস্ত রাঙ্গামাটির দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইহার উপরে ও নিম্নে ভাঙ্গনের মুখে বাবলা নিম্ব ও তাল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সন্ন্যাসীডাঙ্গার উচ্চতা, তাহার নাম ও অবস্থান প্রভৃতি দেখিয়া ইহাকে রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামের স্থান বলিয়া অনুমান হয়। সঙ্ঘারাম বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সম্মিলন স্থান হওয়ায় তাহার নাম সন্ন্যাসীডাঙ্গা হওয়া অসম্ভব নহে। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ ও বর্ত্তমান রেশম কুঠীর পশ্চিম প্রাচীন গঙ্গা বা বাঁওড়ের উপর একটী পুষ্করিণীর গর্ভ দৃষ্ট হয়। তাহার গভীরতা প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই পুষ্করিণীর নাম যমুনা পুষ্করিণী। লেয়ার্ড সাহেব এইখানে পূর্ব্বে পাথরগড় ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকখানি পাথর ব্যতীত পাথরগড়ের কোন চিহ্ন এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভ ও তাহার নিকটস্থ স্থান হইতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড উত্তোলিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কোনও কোনও প্রস্তরখণ্ডে দেব দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। একখানি বৃহৎ অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। † উক্ত মূর্ত্তি যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভ হইতে আনীত হইয়া রাঙ্গামাটীর রেশম কুঠীর বিশাল বটবৃক্ষ তলে স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মূর্ত্তির কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হওয়ায় তাহাকে সহসা কোন দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা কঠিন হয়। মূর্ত্তিখানি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত;

---

* গুপ্তবংশের অনেক মুদ্রায় কমলাত্মিকা মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ায়, উক্ত প্রতিমাকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

† লেয়ার্ড সাহেব তাহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি বলিয়াছেন, ও তাহাকে কালীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। তন্ত্রসারোক্ত মহিষমর্দ্দিনীর ধ্যানের সহিত ইহার অনেক ঐক্য আছে।

উচ্চে দুই হস্তেরও অধিক হইবে। অষ্টভুজের দুই একটী ভুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বামদিকের উপরের হস্তে ও নিম্নহস্তে ধনুক, দক্ষিণদিকের উপরের হস্তে শঙ্খ বা খড়্গের কিয়দংশ ও নিম্ন হস্তে একটী সর্প আছে বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য হস্তের কোন কোন অংশ ভগ্ন হওয়ায় আর কি কি অস্ত্র ছিল বুঝা যায় না। কটিবন্ধ ও কোন কোন হস্তে অলঙ্কার দৃষ্ট হয়; পায়ে নূপুর বিদ্যমান; দেবীর মুখের মধ্যভাগ ভগ্ন হওয়ায় মুখমণ্ডলের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; দেবীর পদতলস্থ মহিষটী পূর্ণদেহে বিদ্যমান আছে। তাহার চক্ষু ও শৃঙ্গ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রে মহিষমর্দ্দিনীর যেরূপ ধ্যান লিখিত আছে, এই মূর্ত্তির সহিত তাহার প্রায়ই ঐক্য হয়। প্রায় ১৬ ইঞ্চ উচ্চ আর একখণ্ড প্রস্তর যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একটী শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। শিবমূর্ত্তির মুখের কতকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মস্তকস্থ জটা ও লম্বিতোদর দেখিয়া শিবমূর্ত্তি বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই শিবমূর্ত্তির উপরে আর একটী কি মূর্ত্তি আছে তাহা বুঝা যায় না। উক্ত প্রস্তরখণ্ড পূর্ব্বে কোন মন্দিরসংলগ্ন ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর একখানি ঐরূপ মন্দিরসংলগ্ন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উক্ত যমুনা পুষ্করিণী হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। তাহা দৈর্ঘ্যে ২ হাত, প্রস্থে ১০ ইঞ্চ হইবে এবং তাহার বেধও ১০ ইঞ্চ। উক্ত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থলে একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; সহসা তাহাকে বুদ্ধ বা শিবমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা কোন দেবমূর্ত্তি কিনা সন্দেহ। মূর্ত্তির দুই পার্শ্ব কারুকার্য্যভূষিত। শিল্পকার্য্যমণ্ডিত আরও কয়েকখানি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও দুই চারিখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড যমুনা হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। এক্ষণেও কয়েকখণ্ড তথায় পড়িয়া আছে। রাঙ্গামাটির নিকট সংসার নামক গ্রামে একটী নিম্নভূমির মধ্যে একটী বাটীর চিহ্ন দেখা যায়। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তথায় পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, সেই দীঘির মধ্যে রাজার ভাগিনেয় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। রাজবাড়ী ডাঙ্গার অর্দ্ধ মাইল উত্তর পশ্চিম আমলাবাড়ী পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে রাজার কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটি হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে গোকর্ণ গ্রামে রাজা কর্ণের গোশালা ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেদার রায় নামে একজন সিদ্ধপুরুষ বহুক্রোশব্যাপী এক জাঙ্গাল ও একটী দীঘি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। * উক্ত জাঙ্গাল ও দীঘি এক্ষণে তাহার নামে প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাঙ্গামাটি প্রাচীনকাল হইতে একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী রূপে বিদ্যমান ছিল। রাঙ্গামাটির নিকট পূর্ব্বে হরিনগর নামে এক প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল, তথায় বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি বাস করিত।

* এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কেদার রায় প্রত্যহ রাত্রিতে সেই বহুদূরব্যাপী জাঙ্গাল দিয়া যাতায়াত করিতেন, সেইজন্য লোকে বলিয়া থাকে,

"বাপের ঠাকুর কেদার রায়,
রেতে আসে রেতে যায়।"

ভাগীরথী প্লাবনে উক্ত গ্রামের ধ্বংস হওয়ায়, তাহার অধিবাসীরা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কতক অধিবাসী রাঙ্গামাটির নিকটস্থ যদুপুর প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বাস করে। মুসলমান রাজত্ব সময়েও রাঙ্গামাটি একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া কথিত হইত। কেহ কেহ ইহাকে ফৌজদারী রাঙ্গামাটি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে; উক্ত ফৌজদারী রাঙ্গামাটি আসামের অন্তর্গত। বঙ্গদেশে অনেকগুলি রাঙ্গামাটি আছে, তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। কর্ণেল রেভার্টি তাঁহার তবকত নাসিরির অনুবাদে গঙ্গার পশ্চিম ও পূর্ব্ব পারস্থ বিস্তৃত প্রদেশদ্বয়ে রাঙ্গামাটি ও ঢাকা নামে যে নগরীদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার উল্লিখিত রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার দ্বিতীয় ওলন্দাজ গভর্ণর ম্যাথিউ ভাণ্ডেনব্রুক তাঁহার ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে রাঙ্গামাটিকে রাঢ় প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের চিত্রেও রাঙ্গামাটিকে একটী প্রসিদ্ধ নগর রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। পলাসী যুদ্ধের পর রাঙ্গামাটিতে সৈন্যাবাস করার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাঙ্গামাটির রাজবাড়ী ডাঙ্গায় সৈনিকদিগের একটী স্বাস্থ্য নিবাস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পরগণা ফতেসিংহের অন্তর্গত। ফতেসিংহ এক্ষণে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও জেমোর রাজগণের জমিদারী। রাঙ্গামাটির রেশমী কুঠী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের সময় স্থাপিত হয়। বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী এক্ষণে উহার অধিকারী। রাঙ্গামাটির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে উক্ত রেশমকুঠী অবস্থিত। কুঠীর প্রাঙ্গণে চারিটী সমাধিস্তম্ভ আছে। তন্মধ্যে একটীতে এডওয়ার্ড ক্রোস ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে একটী বন্যমহিষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। এই রেশম কুঠীতে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আপনার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

---o---

মুর্শিদাবাদ জেলা, কান্দি মহকুমা, গোকর্ণ থানার মধ্যে, ফতেসিংহ পরগণার উত্তর সীমান্তে রাঙ্গামাটি গ্রাম অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা মানসিংহের জনৈক সৈনিক পুণ্ডরীক গোত্রজ পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ সবিতাচাঁদ দীক্ষিত রণনৈপুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ ফতেসিংহের জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি ফতেসিংহ পরগণা সবিতাচাঁদের বংশধরগণের অধিকারে আছে। ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ জেমোর রাজবংশের ও অপরার্দ্ধ বাঘডাঙ্গা রাজবংশের সম্পত্তি। বাঘডাঙ্গার অর্দ্ধাংশ সম্প্রতি হস্তান্তরিত হইয়া মুর্শিদাবাদের মহামান্য নবাব বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে।

রাঙ্গামাটি অতি প্রাচীনকালে কোন সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রাঙ্গামাটির

সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ হইতেই বুঝা যায়। রাঙ্গামাটির নৈসর্গিক অবস্থান প্রকৃতই একটা রাজধানীর উপযুক্ত। পূর্ব্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে একটা বহুক্রোশ বিস্তৃত নিম্ন জলাভূমি বা বিল এই গ্রামকে একটা নৈসর্গিক দুর্গে পরিণত করিয়াছে। ঐ বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বাঁকি নদী ও দ্বারকা নদী পরিখার আকারে রাঙ্গামাটি ও সন্নিহিত গ্রামগুলিকে উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। রাঙ্গামাটি অতি উন্নত রক্তবর্ণ মৃত্তিকার উপর অবস্থিত; এই রক্তবর্ণ মৃত্তিকাকে ছোট নাগপুর ও বীরভূম প্রদেশের রক্তমৃত্তিকার পূর্ব্ব সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাঙ্গামাটিই যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার আর সম্যক্ কারণ নাই। এই সম্বন্ধে প্রমাণপরম্পরা একত্র স্থাপিত করিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন কিন্তু লেখককৃত কালনির্ণয় ঐতিহাসিক সম্মত হইবে কি না সন্দেহ। কর্ণসেনের সহিত কর্ণসুবর্ণের নাম কিরূপে জড়িত হইল বলা যায় না। সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ নাম হইতেই কর্ণসেনের প্রবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। চাঁদপাড়া ব্যতীত নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সহিত চাঁদ সদাগরের প্রবাদ জড়িত আছে। দ্বারকা নদীর তীরবর্ত্তী পাটনের বিল বাহিয়া ময়ূরাক্ষী পার্শ্বস্থ নবদুর্গা গোলাহাট গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চাঁদ সদাগরের নৌকা গিয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কান্দির অন্তর্গত বাঘডাঙ্গা গ্রামের নীচে যেখানে চাঁদ সদাগরের নৌকা বাঁধা হইয়াছিল, এখনও লোকে সে স্থান দেখায়।

দীঘাপাতিয়া রাজবংশধর কুমার শরৎকুমার রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি পদ্যে রচিত বাঙ্গালা হিতোপদেশ আমার নিকট আছে। সংস্কৃত হিতোপদেশে যে সকল উপাখ্যান আছে, তদ্ব্যতীত অনেকগুলি লেখকের স্বরচিত অথবা সংগৃহীত নূতন উপাখ্যান বাঙ্গালা হিতোপদেশের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। পুঁথি খানি ১৫৯ পত্রে সম্পূর্ণ, ১৫০ হইতে ১৫[illegible] পত্র মধ্যে একটি রাজনীতিঘটিত উপাখ্যান আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৫১ পাতাটা না থাকায় উপাখ্যানটি সমস্ত পাওয়া গেল না। গল্পটির প্রথম ও শেষ ভাগ, যাহা পাওয়া গেল, তাহা এইরূপ :—

মদন পাল গেল রণে হইল হড় বড়।
বেড়িয়া লইল দলে কর্ণসিংহের গড়॥
করিল অনেক যত্ন যুদ্ধ অতিশয়।
কদাচ তাহার গড় নহে পরাজয়॥
মরিল অনেক সৈন্য না হইল কাজ।
তাহা দেখি মদন পাল মনে পায় লাজ॥
[illegible]াকর্ণ নামে পাত্র কহিল তাহায়।
কি মতে লইব গড় চিন্তহ উপায়॥
যদি [illegible]হি রাজা তুমি পার লইবার।
সর্ব্বথা তোমাকে আমি দিব অধিকার।

*      *      *      *

( এই স্থানে পুঁথি খণ্ডিত )

আপনার লস্কর গিয়া কহে পাত্র স্থানে।
যে কার্য্য করিবা তাহা করিবা যতনে॥
এহি কথা শুনি তবে রায় মদন পাল।
হরষিত হয়া অতি বুকে মারে তাল॥
শীঘ্রগতি সাজে রণে লইয়া দলবল।
চারিদিকে গড়খান বেড়িল সকল॥
গরল ভক্ষণে সব কাতর বদন।
মদন পাল রণ জয় করিল তখন॥
জ্ঞানানন্দ দাসে কহে জানিবা নিশ্চয়।
পাত্র বোলে সেহি কাক সেহি জানি হয়॥

কানসোনা গড় ক্রমে কর্ণসেনের গড় ও কর্ণ সিংহের গড়ে পরিণত হইয়াছে কি? মদন পাল কি প্রসিদ্ধ পালবংশীয় রাজা? রাজা মদন পাল বিষ প্রয়োগে অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া কর্ণসিংহের গড় বা কানসোনা গড় অধিকার করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বনে কি উক্ত উপাখ্যান রচিত হইয়াছে?

পত্রিকা-সম্পাদক।

---

# জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম জগন্নাথ-বিজয়। প্রণেতা মুকুন্দ। কিরূপে উড়িষ্যা দেশে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, জগন্নাথের মাহাত্ম্য কি, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ২৩। লেখকের নাম বা সন তারিখ কিছুই নাই। কিন্তু পত্রগুলির অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, গ্রন্থখানি শত বৎসরের অধিকবয়স্ক।

কবি মুকুন্দ গ্রন্থমধ্যে আপনার কোন পরিচয় দেন নাই। সুতরাং এই সুদীর্ঘকাল পরে তিনি কি জাতি, কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, তাহা সুনিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থমধ্যে তিনি নিম্নলিখিত রূপে স্বীয় নামের ভণিতা দিয়াছেন ঃ—

১। ভারতী মুকুন্দে ভণে কৃষ্ণের চরণে।
জগন্নাথবিজয় নর শুনে সাবধানে॥
২। কান্দিতে কান্দিতে রাজা স্থির কৈল মন।
ভারতী মুকুন্দ ভণে গোবিন্দচরণ।
৩। হেন কালে ব্রহ্মার পুরী থাকিলা নরপতি।
ভারতী মুকুন্দে ভণে জগন্নাথ গতি॥

৪। জগন্নাথ বিজয় নর শুনে এক চিত্তে।
ভারতী মুকুন্দে ভণে বন্দিয়া জগন্নাথে ॥

৫। ভারতী মুকুন্দে ভণে শ্রীহরির চরণে।
মালাবতীর ক্রন্দনে দয়া হৈল নারায়ণে ॥

এই সকল কবিতা হইতে মুকুন্দ নাম ব্যতীত অধিক আর কিছু জানা যায় না। বঙ্গবাসিগণ মুকুন্দ নামক এক কবির বিবরণ বহুদিন হইতে অবগত আছেন। তিনি মুকুন্দরাম মিশ্র বা চক্রবর্ত্তী—উপাধি কবিকঙ্কণ। কিন্তু সে মুকুন্দ, এ মুকুন্দ নহেন। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে আপনার যে ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে চণ্ডীমঙ্গল রচনার পূর্ব্বে যে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এমন কথা নাই। চণ্ডীমঙ্গলই তাঁহার প্রথম রচনা। তৎপূর্ব্বে দামুন্যায় চাষ চষিয়াই কাল কাটাইতেন। চণ্ডীমঙ্গল রচনার পর জগন্নাথ-বিজয় রচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। জগন্নাথবিজয়ের ভাষা ও রচনাপ্রণালী চণ্ডীমঙ্গলের ভাষা ও রচনাপ্রণালী হইতে এত প্রাচীন যে, যে লেখনীতে চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়াছে, সেই লেখনীতেই জগন্নাথ-বিজয় রচিত হইতে পারে না। উভয় গ্রন্থের ভাষাও এক প্রকার নয়। বঙ্গদেশের ভিন্ন অংশে এখনও যেমন ভাষার বিভিন্নতা দেখা যায়, সে কালেও সেইরূপ ছিল। আমরা কবি রূপনারায়ণের দুর্গামঙ্গলে যেরূপ ভাষা দেখিয়াছি, জগন্নাথ-বিজয়ের ভাষা ঠিক সেইরূপ। ইহাতেও যে স্থলে কর্ত্তার উত্তম পুরুষ, সেই স্থলের ক্রিয়ায় নাম পুরুষ; সপ্তমীর 'তে' স্থলে 'ত' দ্বিতীয়ার 'কে' স্থলে 'ক'; তৃতীয়ার 'কর্ত্তৃক' স্থলে 'সে', সম্ভ্রমার্থে ক্রিয়াপদে 'আ' যোগ, অতীতকালে 'ইলাম' স্থলে 'লুঁ' প্রভৃতি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'জগন্নাথ-বিজয়' হইতে সপ্রমাণ শব্দগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। কর্ত্তা উত্তমপুরুষ, ক্রিয়া প্রথম পুরুষ।

মাঙ্গে ( মাগি ) … … মহা মহা কবিগণের আগে মাঙ্গে পরিহার।

রচিল ( রচিলাম ) … … রচিল কৃষ্ণের কথা দারু অবতার।

২। কর্ত্তা প্রথম পুরুষ, ক্রিয়া উত্তম পুরুষ।

হৈল ( হইলাম ) … … মহাপ্রলয় হৈল সে বৃক্ষ না চলিব।

৩। ভবিষ্যৎ অর্থে অতীতকালের বিভক্তি।

রহিল ( রহিবে ) .. … যুগে যুগে সেই কীর্ত্তি রহিব ঘোষণ।

কহিব ( কহিবে ) .. … তা সবার গুণ কহিব কাহার শকতি।

রচিল ( রচিব ) … … রচিল কৃষ্ণের কথা দারু অবতার।

৪। সম্ভ্রম স্থলে তুচ্ছার্থক 'ইল' প্রয়োগ।

নিরমিল ( নিরমিলেন ) … কৌতুকে শ্রীহরি এক কুণ্ড নিরমিল।

৫। ব্রজভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার।

কৈলুঁ ( করিলাম ) … … কোন কার্য্য কৈলুঁ যুক্তি ব্রহ্মার পুত্রী গিয়া।

পাইলুঁ ( পাইলাম ) … … "বৃক্ষ হৈতে মুক্তি পাইলুঁ উদ্দেশ।"

না পাঁও ( না পাই ) … … "কোন খানে মোর পুরী না পাও উদ্দেশ।"

৬। দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' প্রয়োগ।

বংশেক ( বংশকে ) … … "সূর্য্যবংশেক দিলু রাজা উড়ুম্বা নগর।"

কৃষ্ণেক ( কৃষ্ণকে ) … "বড় কর্ম্ম করিল তারা কৃষ্ণেক পাইতে দরশন।"

৭। সপ্তমীর 'তে' স্থলে 'ত' প্রয়োগ।

তপেত ( তপেতে ) … … "তপেত তপস্বী রাজা বুদ্ধির বৃহস্পতি।"

৮। দ্বিতীয়া স্থলে প্রথমা প্রয়োগ।

রাজা ( রাজাকে ) … … "রাজা থুইয়া পক্ষী গেলা কূর্ম্মের গোচর।"

৯। 'ইলেন' স্থলে 'ইলোঁ'।

গেলোঁ ( গেলেন ) … … "তরাতরি গেলোঁ রাজা আপনার দেশ।"

১০। সপ্তমী স্থলে প্রথমা।

দরশন ( দরশনে ) … … "দারিদ্র্য দুর্গতি খণ্ডে যাহার দরশন।"

১১। সপ্তমী স্থলে ষষ্ঠী প্রয়োগ।

তাহার ( তাহাতে ) … … "তাহার স্নান পিণ্ডদানে আর জন্ম নহে।"

বুদ্ধির ( বুদ্ধিতে ) … … "তপেত তপস্বী রাজা বুদ্ধির বৃহস্পতি।"

১২। অকারান্ত শব্দের উত্তর সপ্তমীর 'য' প্রয়োগ।

মণ্ডলয ( মণ্ডলে ) … … "তাহার সমান দাতা নাহি মহীমণ্ডলয়।"

১৩। মধ্যম পুরুষীয় 'উন' স্থলে 'উকা' প্রয়োগ।

থাকুকা ( থাকুন ) … … "নিরন্তর থাকুকা কৃষ্ণ তাহার সংহতি।"

কবি রূপনারায়ণের গ্রন্থে আমরা বর্ত্তমান কালের অপ্রচলিত যে সকল শব্দ দেখিতে পাই, জগন্নাথ বিজয়েও সেই সকল শব্দ দৃষ্ট হয় :—

গহীর ( গভীর ), আপুনি ( আপনি ), আছিল ( ছিল ), এহি ( এই ), অলক্ষ ( অলক্ষ্য ), সমার ( সবার ), এতেক ( এই ), মোকে ( আমার প্রতি ), বৈসে ( বাস করে ), সঙ্গে ( সহ ) ইত্যাদি।

এই সকল ভাষাসাদৃশ্য দর্শনে কবি মুকুন্দকে রূপনারায়ণের প্রতিবেশী বলিয়া সহজেই অনুমান হয়। বিশেষতঃ কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়ে এমন কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়, যাহা টাঙ্গাইল মহকুমা ব্যতীত অন্যত্র সমধিক প্রচলিত নহে। সেই শব্দগুলিই কবি মুকুন্দের বাসস্থানবিষয়ক আমাদের অনুমানকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। সে শব্দগুলি এই-

(১) অলক্ষ ( বহু, অনেক ) … … "খনিল পৃথিবী হৈল অলক্ষ সাগর।" (ক)

---

নিম্নোদ্ধৃত পাঠান্তরগুলি নগেন্দ্র বাবুর সংগৃহীত জগন্নাথ মঙ্গল হইতে গৃহীত। পাঃ সঃ।

(ক) খনিয়া পৃথিবী কৈল অলক্ষ্য সাগর। ২।১।৯।

অলঙ্গ শব্দ সংস্কৃত অলজ্য শব্দের বিকৃতি। আটীয়া পরগণার চলিত কথায় এবং জমিদারী চিঠায় এই অলঙ্গ শব্দের বহু ব্যবহার দেখা যায়। জমিদারী চিঠায় 'অলঙ্গ তপ' বলিলে 'তাহার অনেক পশ্চিম' এই অর্থ বুঝায়। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সহিত শিক্ষিত সমাজ হইতে অলঙ্গ শব্দের ব্যবহার উঠিয়া গেলেও প্রাচীন সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত শ্রেণী অনেক বুঝাইতে অলঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ প্রদেশে অনেক স্ত্রীলোকের নামও 'অলঙ্গসুন্দরী' দেখা যায়।

(২) তরাতরি ( শীঘ্র ) ... ... "তরাতরি গেলা রাজা আপনার দেশ।"

'ত্বরা' এই সংস্কৃত শব্দ হইতে 'তরাতরি' শব্দ উৎপন্ন। আটীয়া পরগণায় 'তরাতরি' শব্দের খুব প্রচলন।

(৩) নবলেশ বা লবলেশ ( চিহ্নমাত্র ) " পুরী দেউল কিছু নাহি নব লেশ। (খ)

'কিছুমাত্র' বা 'চিহ্নমাত্র' বুঝাইতে ভদ্র মহিলা ও ইতর শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষদিগের মধ্যে এই শব্দ বহু প্রচলিত, ভদ্র পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলন কম।

(৪) গমাগম ( গমনাগমন ) "মনুষ্যের গমাগম দেখে কত্তো দূরে। (গ)

আটিয়া পরগণার স্ত্রীলোকদের ইতর শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এই শব্দ বড়ই প্রচলিত।

(৫) উদ্দেশ ( ঠিকানা ) "উদ্দেশ না জানি মোরা কাহার রাজ্য খানি। (ঘ)

অনুসন্ধান, ঠিকানা, চিহ্ন, প্রভৃতি বুঝাইতে উদ্দেশ বা উদ্দিশ ব্যবহার হয়।

(৬) সাফল ( সফল ) "তোমা দরশনে মোর সাফল জীবন।

প্রাচীনেরা ও নিম্নশ্রেণীর লোকে 'সফল' শব্দের স্থলে 'সাফল' ব্যবহার করেন।

(৭) আছিল ( ছিল ) "মোর পিতৃলোক আছিল এহি স্থানে।

এ প্রদেশে সকলেই 'আছিল' প্রয়োগ করেন। কিন্তু নব্য শিক্ষিতদিগের মধ্যে 'আছিল' প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। তাঁহারা 'ছিল' ব্যবহার করেন।

(৮) গহিন ( গভীর ) "অলঙ্গ তাহার জল গহিন গভীর। (ঙ)

ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে 'গহিন' শব্দ খুব প্রচলিত।

(৯) মাঠ ( অতীক্ষ্ণ, কম ) "বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্ব অস্ত্র হইলে মাঠধার।"

এই শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ। হসন্ত উচ্চারণে ক্ষেত্র বা প্রান্তর বুঝায়।

(১০) বিচ্ছেদ ( বিলাপ অর্থে ) "এত শুনি ব্রহ্মা বলেন না কর বিচ্ছেদ।"

বিলাপ অর্থে বিচ্ছেদ শব্দ আটীয়া পরগণার স্ত্রীলোক ও ইতর শ্রেণীতে খুব প্রচলিত। নমঃশূদ্র জাতীয়েরা বিচ্ছেদকে বিকৃত করিয়া বিচ্ছাদ উচ্চারণ করে।

---

(খ) দেউল দেহরা পুরী কিছু নাহি লেশ। ৪।১।৮

(গ) মনুষ্যের সমাগম দেখি কত দূরে। ৪।২।৬

(ঘ) এ রাজ্যের কোন রাজা একুই না জানি। ৪।১।৯

(ঙ) সেত গঙ্গা নাম তার অতি বড় গভীর। ৭।১।৬

(১১) ব্যথে ( কষ্ট হয় )   "নিদারুণ নৃপতি খানিক নাহি ব্যথে।"

ব্যথে সর্ব্বশ্রেণীতে ব্যবহৃত হয়।

(১২) ক্ষেমুকা ( ক্ষমা করুন )   "যত অপরাধ কৈলুঁ ক্ষেমুকা আমারে।"

'ক্ষমা' কে 'ক্ষেমা' বলিয়া এ অঞ্চলের লোকে উচ্চারণ করে। সম্ভ্রমার্থে 'উন' স্থানে উকান্ ব্যবহার করে। যেমন করুকান ( করুন ) যাউকান্ ( যাউন )। শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে 'উন বা উকান' ব্যবহার না করিয়া 'উকা' ব্যবহার করিয়া থাকে। বোধ হয় বহু পূর্ব্বে এ দেশেও 'উকা' বলাই রীতি ছিল, ক্রমে 'উকান' হইয়াছে। এখন আবার উকানের পরিবর্ত্তে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 'উন' প্রচলিত হইতেছে।

(১৩) পৈরণ ( পরিধান )   কঙ্কণ বলয়া হাতে পৈরণ পীতবাস।

পৈরণ শব্দ নিম্ন শ্রেণীতে খুব প্রচলিত।

(১৪) থুইয়া ( রাখিয়া )   "রাজা থুইয়া ব্রহ্মা আইলা সন্ধ্যা করিতে সত্বর।"

সর্ব্ব শ্রেণীতে 'থুইয়া' শব্দ প্রচলিত।

(১৫) অখন ( এখন )।   অখনে দেখিয়া আইস পুরী আপনার। (চ)

পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষা ও প্রাদেশিক বিশিষ্ট শব্দগুলি দর্শনে আমরা কবিকে টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আটীয়া পরগণার অধিবাসী বলিয়া অবধারণ করিতেছি। কবি মুকুন্দরচিত জগন্নাথবিজয় গ্রন্থ আটীয়া পরগণায় প্রাপ্ত হওয়াও তাঁহার আটীয়া পরগণায় অধিবাস অনুমান করিবার এক কারণ। জগন্নাথ বিজয় ব্যতীত মুকুন্দ রচিত অন্য কোন গ্রন্থ আমরা পাই নাই; পাইলে মুকুন্দের নিবাস আটীয়া পরগণার কোন গ্রামে ছিল, তিনি কি জাতি ছিলেন, তাহা জানিবার সম্ভব ছিল। জগন্নাথ বিজয়ের এক স্থলে "রাম রাম প্রভু রাম জগত জীবন" এই ধূয়াটি আছে। আটীয়া পরগণায় 'সীতার বারমাস্যা' নামে একটী অতি প্রাচীন 'বারমাস্যা' বহুকাল যাবৎ কৃষকসমাজে চলিত আছে। ঐ বারমাস্যা "রাম রাম প্রভু রাম জগত জীবন" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় এই বারমাস্যা মুকুন্দ রচিত। এই বারমাস্যাতেও কবির কোন পরিচয় নাই। কিন্তু বারমাস্যা আটীয়া পরগণায় প্রচলিত থাকায় কবির নিবাস যে আটীয়া পরগণায় ছিল, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

কবি মুকুন্দের জগন্নাথ বিজয়, এবং রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল, এই উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্তকে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। দুর্গামঙ্গলের রচনা বিবিধ অলঙ্কার ছন্দ ও রস বিশিষ্ট; উহাতে মিত্রাক্ষর ও মিতাক্ষরতার বিন্দুমাত্রও শিথিলতা দৃষ্ট হয় না। জগন্নাথ বিজয় দুইটী ছন্দে রচিত—পয়ার ও ত্রিপদী। কবি মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থে পয়ারকে কোথায়ও খর্ব্ব ছন্দ, কোথায়ও নাচাড়ী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপদী দুই স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে—একস্থলে উহা মালিনী ছন্দ, অন্যত্র নাচাড়ী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদী নাম কোথায়ও নাই। বোধ হয় পয়ার ও ত্রিপদী নাম তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। জগন্নাথ বিজয়ে ত্রিপদী ছন্দ প্রযুক্ত হইলেও মোটামুটী পয়ার ছন্দেই প্রায় সমস্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।

(চ) আপনে দেখিয়া আইস পুরী আপনার। ৪।১১৬

কিন্তু পয়ারের চতুর্দশ অক্ষর নিয়ম ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। মুকুন্দ কবির পয়ার বা খর্ব্ব ছন্দের এক এক চরণ ১২ হইতে ২০ অক্ষরে রচিত। পাঠকগণের অবগতির জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) চণ্ডিকাচরণ মুক্তি বন্দো শিরে। ১২
যাহার মায়ায় স্থির নহে ব্রহ্মা হরি হরে। ১৬

(২) ব্যাস আদি মুনি বন্দো যথা তথা স্থিতি। ১৪
মহা মহা কবিগণের আগে মোর প্রণতি। ১৫

(৩) ব্রহ্মপুরাণের কথা শুনি তা শ্রবণে। ১৪
পাঁচালী প্রবন্ধে বিষ্ণুর গুণ রচিল বিধানে। ১৭

(৪) রোহিণী নক্ষত্রে তাহাতে দেবা প্রাণ ত্যজে। ১৫
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তথাই হএ দিব্য সাজে। ১৫।

(৫) তপেত তপস্বী বুদ্ধির বৃহস্পতি। ১৩
ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া যাহার আন নাহি গতি। ১৬

(৬) বহু কর্ম্ম করিলা রাজা কৃষ্ণের পাইতে দরশন। ১৯
না দেখিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি ত্যজিতে জীবন। ১৪

(৭) রাজা থুইয়া ব্রহ্মা আইলা সন্ধ্যা করিতে সত্বর। ১৮
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তেক ষাটি সহস্র বৎসর। ১৫

(৮) হস্তী ঘোড়া নানা রোপ্য কৈল দান। ১২
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ করে হাতেতে লইয়া দুর্ব্বা ধান। ২০

এই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে বিশেষ কোন অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। গ্রন্থের যে পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই পত্রেই ছত্রে ছত্রে অক্ষরের এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। রূপনারায়ণ ও মুকুন্দ একদেশবাসী, সুতরাং এক অবস্থায় উভয়ের রচনায় এই প্রভেদ অল্পদিন ব্যবধানে ঘটিতে পারে না। মুকুন্দের বিংশতি অক্ষরের পয়ার ও নিরঙ্কুশ রচনা প্রণালী রূপনারায়ণের সুমার্জ্জিত চতুর্দ্দশাক্ষর পয়ার রসালঙ্কারযুক্ত রচনাতে পরিণত হইতে বহু কাল লাগিয়াছিল। মুকুন্দের মালিনী বা লাচাড়ী ছন্দ ও ত্রিপদী তদীয় খর্ব্ব ছন্দের মত আক্ষরিক বৈষম্যে পরিপূর্ণ। রচনা দেখিয়া বোধ হয় মুকুন্দের সময় পাঁচালী রচনা করিবার প্রথা আরম্ভ হইতেছিল। রাগিণী ও তালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবি পদ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। অক্ষরের হ্রাস বৃদ্ধির দিকে তাঁহার দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। স্বরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতায় আক্ষরিক বৈষম্য দূর হইয়াছে। বাঙ্গালা পদ্য রচনার এই আদিম ভাব মুকুন্দের গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল ভাবে দৃষ্ট হয়। এইজন্য আমরা তাঁহাকে রূপনারায়ণ হইতে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি। কবি রূপনারায়ণ প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।* সুতরাং কবি মুকুন্দ তিন শত বৎসরেরও বহু পূর্ব্বে জগন্নাথবিজয় রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

* 'দুর্গামঙ্গল' প্রবন্ধ দেখ।

কবি মুকুন্দ বৈষ্ণব ছিলেন; তিনি জগন্নাথকে 'গতি' 'পতি' জানিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ চরণে' জগন্নাথ বিজয় গীত গাইয়াছেন। বঙ্গের বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাবতার বলিয়া মানেন। চৈতন্যদেব শেষাবস্থায় নীলাচলে বাস করিয়া তথায়ই লীলা সংগোপন করায় জগন্নাথক্ষেত্র বঙ্গের বৈষ্ণবগণের নিকট প্রধান [illegible] পরিণত হইয়াছে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর মুকুন্দ জগন্নাথবিজয় রচনা করিলে [illegible] তাহাতে দেব বন্দনার স্থলে চৈতন্যের বন্দনা থাকিত। কিন্তু মুকুন্দ নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমাপতি, সরস্বতী, গুরুদেব লক্ষ্মী, গণেশ, চণ্ডিকা, ব্যাসদেব, জনক জননী, জন্মভূমি প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যের প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে বোধ হয় মুকুন্দ চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই জগন্নাথ বিজয় রচনা করেন। তাঁহার ভাষা তদনুরূপই বটে। চৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরে পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। চৈতন্য ভাগবতের ভাষার সহিত তুলনা করিলে মুকুন্দের ভাষা ও রচনাপদ্ধতি অনেক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য আমরা কবি মুকুন্দকে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝিতেছি।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাস ঠাকুর। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে চণ্ডীদাস চৈতন্যের এক শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। "বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ" হইতে চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অবধারণ করা যায়। এই মত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতের অধিক বিরোধী নহে। চণ্ডীদাসকে বঙ্গের আদি কবি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাঁহার সুরচিত মাত্রাক্ষরপরিমিত কবিতা গুলি পাঠ করিলে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে প্রথমেই কোন ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা রচিত হইতে পারে না। মুকুন্দের জগন্নাথ বিজয়ের কবিতার সহিত চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনা করিলে মুকুন্দকে চণ্ডীদাসের শতাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কাল ১৩২৫ শক ধরিয়া মুকুন্দের আবির্ভাব কাল ১২২৫ শক বা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ নিশ্চয় করিতেছি, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কবি মুকুন্দ জগন্নাথবিজয় রচনা করিয়াছিলেন।

কবি মুকুন্দ বিবাহের মঙ্গলাচরণ বর্ণনায় এক স্থলে লিখিয়াছেন—"গুয়া কলা নারিকেল রোপিল সারি সারি।" মঙ্গলাচরণের জন্য কদলী বৃক্ষ রোপণ প্রথা অদ্যাপি বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু গুয়া নারিকেল রোপণ প্রথা যে বঙ্গদেশে কোন কালে ছিল, তাহা কোন গ্রন্থে বা লোক মুখে জানা যায় না। বোধ হয় অতি পূর্ব্বে গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষও মঙ্গলার্থে রোপিত হইত। ক্রমে সে প্রথা লোপ পাইয়াছে; এই গুয়া ও নারিকেল রোপণ বর্ণনা হইতেই মুকুন্দ যে অতি প্রাচীন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে কবি মুকুন্দকেই বঙ্গের প্রাচীনতম কবি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু মুকুন্দের পূর্ব্বেও চণ্ডী ও মনসা বিষয়ক কোন গান প্রচারিত থাকা অসম্ভব নহে। মুকুন্দের আবির্ভাবকালে চণ্ডী বিশেষভাবে সর্ব্বত্র এবং বিষহরী দেবী কচিৎ পূজিতা

হইতেছিলেন। তাহা মুকুন্দের রচনাভঙ্গীতেই বোধ হয়। দেব দেবীর বন্দনা স্থলে মুকুন্দ লিখিয়াছেন ;—

> চণ্ডিকাচরণ [illegible] বন্দো শিরে।
> যাহার [illegible] হে ব্রহ্মা হরি হরে॥
> অসুর [illegible] দেবের অব্যাহতি।
> হেন দেবীর চরণে মোর থাকুক ভকতি॥

বন্দনায় এত কথা মুকুন্দ আর কোন দেবতার সম্বন্ধে লিখেন নাই। চণ্ডীর বন্দনায় অধিক লেখাতে তৎকালে চণ্ডীর প্রভাব সহজেই অনুমিত হয়। বন্দনাস্থানে বিষহরীর বন্দনা নাই। কিন্তু জগন্নাথের বিবাহ সভায় দেব দেবীর আগমনের পর কবি বিষহরীকে অষ্ট নাগে চড়াইয়া সর্ব্বশেষে আনিয়াছেন :—

> সিদ্ধ মুনি ঋষিগণ আইলা যে ততক্ষণ
> অষ্টনাগে আইলা বিষহরী।

ইহাতেই বোধ হয় কবি মুকুন্দের সময় বিষহরীর তেমন প্রতিপত্তি হয় নাই। তিনি দেবতা পদ কেবল পাইয়াছেন মাত্র। চণ্ডীরই তখন পূর্ণ অধিকার। পরবর্ত্তী মনসার গীত কাব্যগুলিতে দেখা যায় বঙ্গদেশে প্রথমে চণ্ডীর পূজাই প্রচলিত ছিল। চণ্ডীর সহিত বিবাদ করিয়া বহুকষ্টে বিষহরীকে আপন মহিমা প্রচার করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক বন্দনা প্রভৃতি পাঠ করিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে যখন চণ্ডীর পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, বিষহরীর পূজা তেমন প্রচলিত হয় নাই, সেই সুপ্রাচীন সময়ে কবি মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। চণ্ডীদাসের জীবনীতে দেখা যায়, তাঁহার সময়ে বিষহরী বঙ্গদেশে একরূপ প্রধান দেবতারূপে পরিণত হইয়াছেন। বিষহরী গীত গাহিয়া সর্প ব্যবসায়ীরা সাপ 'ঝাঁপাইত'। সুতরাং এই বিষহরীর বৃত্তান্ত হইতেও মুকুন্দ যে চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বুঝা যায়। *

কবি মুকুন্দ সংস্কৃত জানিতেন না। তিনি ব্রহ্মপুরাণের কথা লোকমুখে শুনিয়া জগন্নাথ বিজয় রচনা করিয়াছিলেন :—

> ব্রহ্মপুরাণের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
> পাঁচালী প্রবন্ধে বিষ্ণুর গুণ রচিল বিধানে॥

কবি স্বীয় গ্রন্থকে পাঁচালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে শ্রীরাগ, মল্লার, পঠমঞ্জরী, ধানশী, সুহি, সিন্ধুরা, বড়ারি, প্রভৃতি রাগ রাগিণী অনুসারে পদ রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে রচিত পাঁচালী গ্রন্থ সমূহেও আমরা এই সকল রাগ রাগিণীর ব্যবহার দেখিতে পাই। পয়ার ছন্দকে মুকুন্দ খর্ব্ব ছন্দ বলিয়া লিখিয়াছেন। ত্রিপদী এক স্থলে

* চৈতন্যের আবির্ভাবের সময় বিষহরীর পাঁচালী গানের খুব প্রচলন ছিল।

মালিনী নামে অভিহিত হইয়াছে। কবি মুকুন্দের পরবর্ত্তী কালে রচিত রাজেন্দ্র দাসের মহাভারতে আমরা পয়ারকে খর্ব্বছন্দ ও ত্রিপদীকে দীর্ঘ ছন্দ বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি। পয়ারের খর্ব্ব ছন্দ নাম বহু প্রাচীন গ্রন্থেই দেখা যায়। ত্রিপদীর মালিনী নাম আর কোথায়ও দেখা যায় না। মালিনী নাম কবি মুকুন্দেরই স্ব[illegible]থবিজয়ে ত্রিপদী ও পয়ারকে দুই স্থলে 'নাচাড়ী' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। [illegible] নাম প্রাচীন যাবতীয় গ্রন্থেই দেখা যায়। নাচাড়ী বোধ হয় নাচিবার প্রাদ। যে স্থলে কোন রসের উদ্দীপনা বা বর্ণনায় বিশেষ চাতুর্য্য দেখা যায়, সেই স্থলেই নাচাড়ী নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঁচালী কীর্ত্তনে নৃত্যও এক বিশেষ অঙ্গ। নাচাড়ী গাইবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় নাচা হইত।

কবি মুকুন্দ নিম্নলিখিত বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

সরস্বতী গুরুদেবের বন্দিব চরণ।
জগন্নাথ মাহাত্ম্য কথা রচিব বচন ॥
প্রণমোহ নারায়ণ প্রথম কারণ।
যাহার প্রসাদে সৃষ্টি হয় পূর্ণ ॥
জল স্থল নাহি ছিল না রহে কারণ।
স্বরূপ আকার প্রভু দেবনারায়ণ।
দিগ বিদিগ নাহি হএ পরিত্রাণ ॥
হেন কালে নারায়ণ স্বভাব ভেজিল।
কেবল প্রকৃতি হৈতে সৃষ্টি মন দেল ॥
প্রথমে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।
তিন হেতু তিন জন করিল নিয়োজন ॥
ব্রহ্মা সৃজে বিষ্ণু পালেন সংসার।
যে কালে মহাদেব করেন সংহার ॥
প্রণমোহো ব্রহ্মা বিষ্ণু উমাপতি।

*　　*　　*　　*

সরস্বতী চরণে মন মজুক মোর মতি।
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি ॥
বন্দো আর প্রণমোহ লক্ষ্মীর চরণ।
দারিদ্র দুর্গতি খণ্ডে যাহার দরশন ॥
*　　*　　মোর যায় আর।
গণপতি প্রণমোহ বিঘ্ন কর তার ॥
চণ্ডিকা চরণ মুক্তি বন্দো শিরে।
যাহার মায়ায় স্থির নহে ব্রহ্মা হরি হরে ॥
অসুর মারিয়া কৈল্য দেবের অব্যাহতি।
হেন দেবীর চরণে মোর থাকুক ভকতি ॥

ব্যাস আদি মুনি বন্দে যথা তথা স্থিতি।
মহা মহা কবিগণের আগে মোর প্রণতি॥
গুরুর চরণ বন্দো অষ্টাঙ্গ প্রণতি।
অজ্ঞ [illegible] গুরু সে সঙ্গতি (?)॥
অজ্ঞ [illegible] পিতা যার যেহি কর্ম্ম।
পুনরপি গুরু হইতে হয় আর জন্ম॥
জনক জননী বন্দো বন্দো জন্মস্থান।
যাহার প্রসাদে হইল আমার নির্ম্মাণ॥
মহামহা কবি গণের আগে মাগে পরিহার।
রচিল কৃষ্ণের কথা যাক্ অবতার॥

অতঃপর গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইবে, কবি সংক্ষেপে তাহার কথা বলিয়াছেন—

উড়ুস্যা পুরীর কিছু বলিব বাখান। *
যেমতে সৃজন হৈল যেমতে নির্ম্মাণ॥
জগন্নাথ মহাপ্রভু জগতের সার।
যেরূপে উড়ুস্যা পুরী কৈল অবতার॥

কবি উড়ুস্যা পুরী (শ্রীক্ষেত্র) নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নীলমাধব নামে পূর্ব্বে দেব নারায়ণ।
নীল পর্ব্বতে রহে সে অতি সুশোভন॥
পৃথিবীর অন্ত শুন সমুদ্রের পাশে।
পুরী নির্ম্মাণ হইল যেন মনের হরিষে॥
পুরী নির্ম্মাণ করি উড়ুস্যা নাম ধরি।
ক্ষিতিতলে যাক্ রূপে বৈকুণ্ঠপুরী॥
অক্ষয় নামেতে বট পাতালেতে বৈসে।
উঠিল পৃথিবী ভেদি কৃষ্ণের আদেশে॥
তিন ডালে তিন তীর্থ তখনে সঞ্চারি।
গয়া প্রয়াগ মহাতীর্থ উড়ুস্যা পুরী॥

ভগবান্ নীলমাধব উড়স্যা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবংশীয় কোন ব্যক্তির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উড়স্যার অধিকার দিলেন। কালে তাঁহার বংশে ইন্দ্রদ্যুম্নের জন্ম হইল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনার তেজে ভুঞ্জে রাজ্য চিরদিন।
নানা গুণে অনুপম লোকেত প্রবীণ॥
তপেত তপস্বী বুদ্ধির বৃহস্পতি।
ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া আচার আন নাহি গতি॥

* কবি মুকুন্দ উড়িষ্যা না লিখিয়া সর্ব্বত্রই উড়ুস্যা লিখিয়াছেন। বোধ হয় প্রাচীন কালে উড়ুস্যা লেখাই প্রচলিত ছিল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন এক স্বুবর্ণ দেউল গঠন করিয়া তাহাতে কমললোচন মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন। স্বুবর্ণমন্দির নির্ম্মিত হইল। রাজা মূর্ত্তি আনিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন।। সন্ধ্যা করিতে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত সময় গত হইল। ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে মনুষ্যের ষাটি হাজার বৎসর। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোকে ছিলেন, ষাটি হাজার বৎসর যে গত হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এ দিকে পুরীতে ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পৌত্রাদি বহুবর্ষ রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিল। তৎপর প্রলয় উপস্থিত হইল—সমস্ত রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, সমুদ্রের বালুকায় স্বর্ণ দেউল সহ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরী আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তার পর ব্রহ্মা পুনরায় নূতন সৃষ্টি করিলেন।

তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ রাজ্যে আসিলেন। কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই রাজ্য, সেই দেউল সমস্ত বালুকায় ও বনে পরিণত হইয়াছে। কান্দিতে কান্দিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিশ্বক্সেন নামে এক মুনি তথায় আসিলেন। মুনি রাজাকে কহিলেন :——

"বচনেক বলি তোরে শুন মহাশয়।
অক্ষয় বট বৃক্ষ আছে দেখাইল আলয়॥
চারি যুগের তরুবর বিদিত ভুবনে।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত অক্ষয় বট জানে॥

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন বৃক্ষের নিকটে গমন করিলেন।

বৃক্ষ কহিল—

ইন্দ্রদ্যুম্ন নাম রাজা আছিল প্রধান।
সোণার দেউল দিয়া গেল ব্রহ্মার বিদ্যমান॥
পুনর্ব্বার না আইল রাজা আপনার দেশে।
রাজা করিয়া গৈল তারা অনেক পুরুষে॥
সকল বৃত্তান্ত নাহি জানি ভাল মতে।
কহিব সকল কথা উলুক তোমাতে॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন উলুকের নিকট গেলেন। স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া উলুক তাঁহাকে চিরজীবী কূর্ম্মের নিকট লইয়া গেলেন।

কূর্ম্ম রাজাকে দেখিয়াই চিনিল; চিনিয়া মমতার সহিত ভর্ৎসনা করিতে করিতে কহিল——

তোমা হেন রাজা নাহি সংসারে।
রাজা নাশ বংশ নাশ কইলা একবারে॥
দেউল দিয়া গেলা তুমি ব্রহ্মার গোচর।
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তেক ষাটি সহস্র বৎসর॥
পুত্র পৌত্র তোমার অনেক পুরুষে।
চিরকাল রাজা তুমি গেল স্বর্গবাসে॥

তবে সে তোমার রাজ্যে প্রলয় হইল।
সমুদ্রের বালি আসি পুরী আচ্ছাদিল॥
পুনরপি প্রজাপতি রাজা করিলা সৃজন।
রাজ্য নাশ এত দিনে তোমার গমন॥

রাজা কূর্ম্মের কথা শুনিয়া স্ত্রী পুত্র ও রাজত্বের জন্য বহু আক্ষেপ করিলেন। রাজার ক্রন্দনে কূর্ম্ম ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সেই দেশের রাজ্য গ্রহণ করিতে বলিল।

কূর্ম্মের উপদেশে রাজা রাজ্য স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে কৌমার্য্য নৃপতির কন্যা মালাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর রাজা সস্ত্রীক যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বর দিলেন।——

ভাবার কারণে গোসাঞি ক্ষিতেতে অবতার।
কৃষ্ণ দৈত্য মারি কৈল পৃথিবী উদ্ধার॥
ব্রহ্ম শাপ লক্ষ্য করি ছাড়িব সংসার।
লক্ষ অগ্নি পুড়িবেন কৃষ্ণ দেহ আপনার॥ *
যেহি দিন কৃষ্ণ করি ছাড়িব জীবন।
সেই দিন দারু ভাসিয়া আসিব ততক্ষণ॥
বিষ্ণুপঞ্জর সহে অক্ষয় শরীরে।
পাইবা বাঞ্ছিত ফল মিলিব সত্বরে॥
পূর্ব্বে তপ করিলে তুমি সেই সে কারণে।
দারু হইলা কোণ ফুটিব ভুবনে॥
বিষ্ণু পঞ্জর সহিত মিলিল শ্রীহরি।
একত্র করিয়া তবে আনিবা তরাতরি॥
পূর্ব্বের দেউল আছিল এখানে।
তাহার উপর দেউল তুমি করহ রচিতে॥
তাহার মধ্যে লইয়া দারু পুতিয়া বিধানে।
দ্বার দিয়া ফিরিয়া চাহিব পঞ্চদশ দিনে॥
পঞ্চদশ দিন গেলে করিহ নিরীক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান হৈয়া দিব দরশন॥
বলভদ্র নারায়ণ সুভদ্রা সোদরিকে।
তিন মূর্ত্তি হইব তথা ত্রিভুবন জিনে॥
সেহি তিন মূর্ত্তি যেহি দেখিব নয়নে।
মনুষ্য শরীরে যাইব বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

* জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাঠ—
ভারাবতরণে কৃষ্ণ ক্ষিতি অবতরে।
কৃষ্ণ দৈত্য মারি খণ্ডাইল ক্ষিতিভারে॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি শরীর ছাড়িব।
ব্রহ্ম অগ্নি নিজ দেহ সকল পুড়িব॥—তীর্থ খণ্ড।

ব্রহ্মার বর পাইয়া রাজা মালাবতীর সহিত স্বীয় রাজধানীতে আগমন করিলেন। [illegible] তাঁহার চতুর্দ্দশ পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। কন্যার নাম সত্যবতী।

ব্রহ্মার উপদেশে পূর্ব্বগঠিত স্বর্ণ দেউলের উপর ইন্দ্রদ্যুম্ন নূতন দেউল নির্ম্মাণ করিলেন। দেউল নির্ম্মিত হইল, কিন্তু দারু মিলিল না। রাজা বিষ্ণুপঞ্জর সহ দারু কবে আসিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন ভাসিতে ভাসিতে দারু আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সমুদ্র হইতে দারু উঠাইয়া মন্দিরে স্থাপন করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা মন্দিরে আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি দেবতা বঞ্চনা করিলেন। হঠাৎ বিশ্বকর্ম্মার সমুদয় অস্ত্রের ধার কমিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা অস্ত্র আনিতে স্বর্গে গেলেন। মন্দিরের মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের শব্দ থামিয়া গেল। শব্দ না শুনিয়া রাজার মনে হইল বুঝি মূর্ত্তিনির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। অমনি দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। পঞ্চদশ দিন দ্বার বন্ধ রাখিতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন—

আকার হইতে আছে কাষ্ঠের নির্ম্মাণ।
হস্ত পদ চক্ষু মাথা নাহিক সমান॥ *

তখন রাজার পঞ্চদশ দিনের কথা মনে হইল। অমনি আপনাকে বহু তিরস্কার করিয়া পুনরায় দ্বার বন্ধ করিলেন। কিন্তু নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে বিশ্বকর্ম্মা আর মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে আসিলেন না। পঞ্চদশ দিন পরে দ্বার খুলিয়া পূর্ব্ববৎ অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা বড় বিষণ্ণ হইলেন।

সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া জগন্নাথ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বর দিতে চাহিলেন; ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর; আমি এই বর চাই। জগন্নাথ সম্মত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিবাহের আয়োজন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে জগন্নাথ রথ আরোহণ করিয়া বলরাম ও সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের আলয়ে গমন করিলেন। কাষ্ঠে মানুষে বিবাহ হইবে, এই অদ্ভুত সংবাদ শুনিয়া চারিদিকের অসংখ্য লোক বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল। দেবতারাও আসিতে ছাড়িলেন না। ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, গণেশ, প্রভৃতি আসিয়া সমবেত হইলেন। সিদ্ধ, ঋষি, মুনিগণ আসিলেন। শেষে অষ্ট নাগে চড়িয়া বিষহরীও আসিলেন। সত্যবতী বৈবাহিক বেশে সজ্জিত হইলেন। কবি রাজকন্যা সত্যবতীর বেশভূষার এই বর্ণনা করিয়াছেন :——

বাহু মৃণাল বলয়া দুই করে।
কনকের বলয়া মাণিক্য মিশালে॥
সুবর্ণের অঙ্গে গলে মুক্তাহার।
প্রবাল মুকুতা পরে মণিময় হার॥

---

* আকার হইয়াছিল মূর্ত্তির নির্ম্মাণ।
চক্ষু মুখ হস্তপদ নাহি [illegible]—[illegible]।

মধ্যদেহ ভাগ তার কেশরী গঞ্জিত।
কনক কিঙ্কিণী শোভে দেখিতে বিরচিত॥
মেঘ কুন্তল জিনি চামর কেশ।
আহা দেখি চামর * * প্রবেশ॥
হেন কেশ উর্দ্ধ করি বান্ধয়ে কবরী।
বিচিত্র পাটের থোপ বান্ধে সারি সারি॥
বিচিত্র কাঁচলি পরে নাবে গঙ্গাজল।
মেঘ বিদ্যুৎ জিনি করে ঝলমল॥
দিব্যবস্ত্র পরে তার নাহিক বাখান।
রবির কিরণ যেন দেখি বিদ্যমান॥
সুচারু বদন দেখি কোটি চান্দ নিন্দিত।
খঞ্জন যুগল আঁখি কাজরে রঞ্জিত॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত গন্ধ চন্দন কস্তুরি।
গজেন্দ্র গমনে যায় চরণে নূপুরি॥

সত্যবতীর রূপ দেখিয়া সভাসদ্‌গণ দুঃখিত হইল :—

সত্যবতী দেখিয়া লোকে করে হাহাকার।
রাজা নহে দেখি এমত অবুধ সোঙার॥
পরম সুন্দরী বামা লক্ষ্মীর সমান।
হেন রূপবতী কন্যা কাষ্ঠে করে দান॥ *

সত্যবতীর মাতা মালাবতী জামাতাকে বরণ করিতে আসিয়া জামাতার অপূর্ব্ব কাষ্ঠ মূর্ত্তি দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মালাবতীর ক্রন্দনে জগন্নাথ কাষ্ঠ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ভুজ মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মালাবতী সন্তুষ্ট হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন যথাশাস্ত্র কন্যাদান করিয়া রাজপুরী সহিত সমগ্র রাজ্য নারায়ণকে যৌতুক দান করিলেন। সত্যবতী নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ সত্যবতীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে সত্যবতী প্রার্থনা করিলেন :—

যদি মোরে তুষ্ট হৈলা প্রভু গদাধরে।
বৎসর বৎসর অন্তরে বিবাহ করিবা আমারে॥
এহি পুরী থাকিব আমি শুন নারায়ণ।
সত্যরূপে আমার গৃহে করিবা গমন॥

নারায়ণ সত্যবতীর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন—

তোমার অধিক প্রিয়া নাহিক আমার মনে।
সত্য এক বলি আমি তোমার বিদ্যমানে॥

---

* পরম সুন্দরী কন্যা দিল সেই কাঠে।
হৃদয় বিদরি যায় প্রাণ নাহি আঁটে॥—জয়ানন্দ।

কোন কালে না হইব তোমাক বিস্মরণ।
সত্যরূপে তোমার গৃহে করিব গমন॥
বিবাহ করিব প্রতি বৎসর অন্তরে।
লৌকিক বিধান হেতু পীরিতি তোমারে॥

নারায়ণ সত্যবতীকে বর দিয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন, কিন্তু পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। বিবাহের সংবাদ শুনিয়া লক্ষ্মী দ্বারে কপাট আটকাইলেন। লক্ষ্মীর ক্রোধ দেখিয়া জগন্নাথ অত্যন্ত ভয় পাইলেন। পুরীতে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। বলরামের বহু অনুনয় বিনয়ে শেষে লক্ষ্মী দ্বার ছাড়িয়া দিলেন।

অতঃপর নারায়ণ প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সত্যবতীকে বিবাহ করিবার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্নের বাটীতে যাইতে লাগিলেন। ইহাই জগন্নাথের রথযাত্রা।

সত্যবতীর বিবাহের পর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া জগন্নাথ বর দিতে চাহিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রার্থনা করিলেন—

চতুর্দ্দশ পুত্র মোর অতি খরতর।
সকল বিনাশ করহ প্রভু গদাধর॥
* * * *
এক বোল শুন চক্রপাণি।
পুত্র সবে বলিবে হে দুরক্ষর বাণী॥
আমার পিতা বড় কৈল সংসার ভিতরে।
নিজপুরী সহে রাজা দিল গদাধরে॥
হেন দুরক্ষর বাণী প্রাণে নাহি সয়।
তথির কারণে পুত্র করিব প্রলয়॥

নারায়ণ রাজার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া রাজপুত্রদিগকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি জন্য অনেক বর দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের অনন্তকালস্থায়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশেষে——

দিব্য দৃষ্টি ইন্দ্রদ্যুম্নের হইল তখনে।
হাত যোড় করি থাকে গোসাঞির ধেয়ানে॥
জ্যোতিস্বরূপে রাজা হইল বাহির।
প্রবেশ করিল জ্যোতি গোসাঞির শরীর॥ *

এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্নের জগন্নাথপ্রাপ্তির সহিত কবি গ্রন্থের উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, কেদারপুর,—টাঙ্গাইল।

---

* দিব্যদেহে ইন্দ্রদ্যুম্ন হইলা পাষাণ।
জোড় হস্তে রহে জগন্নাথের বিদ্যমান॥
জ্যোতি স্বরূপ রাজা হইল বাহির।
প্রবেশিলা জ্যোতি জগন্নাথের শরীর॥—জয়ানন্দ।

১। আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দ ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ একব্যক্তি কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রবন্ধ লেখক যে লিখিয়াছেন, "কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনার পূর্ব্বে কোন গ্রন্থ-রচনা করেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল তাঁহার প্রথম রচনা" এ কথা ঠিক নহে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল রচনার পূর্ব্বে শিবকীর্ত্তন রচনা করেন।

২। প্রবন্ধলেখক তাঁহার সংগৃহীত কবি মুকুন্দের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য আছে। এখনও যেমন কলিকাতা ও ঢাকা-অঞ্চলের কথিত ভাষায় প্রভেদ আছে, পূর্ব্বকালেও এইরূপ ছিল। যে কোন গ্রন্থকার যে কোন জেলার লোক হউন না কেন, তাঁহার গ্রন্থ ভিন্ন জেলার লোক-দ্বারা পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইবার সময় সেই স্থানের প্রচলিত ভাষানুসারে একটু রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। প্রায় ১.. বর্ষের পূর্ব্বের হাতের লেখা দুই খানি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুথি দেখিয়াছি; তাহার একখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোকের লেখা, অপরখানিতে ত্রিপুরাবাসীর হস্তাক্ষর। গ্রন্থখানি এক ব্যক্তির রচনা হইলেও বর্দ্ধমানের পুথিতে রাঢ়ের ভাষার রূপ, আর ত্রিপুরার পুথিতে তদ্দেশপ্রচলিত ভাষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয় সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটিয়াছে। রসিক বাবু ময়মনসিংহ জেলাস্থ আটীয়া পরগণার পুথিতে তৎস্থানীয় লৌকিক ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া কবি মুকুন্দকে আটীয়া পরগণার লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর ও আমার নিজের সংগৃহীত কবি মুকুন্দের দুইখানি পুথিতে ঐরূপ প্রাদেশিক (অর্থাৎ ময়মনসিংহ অঞ্চলের) ভাষার আদৌ প্রয়োগ নাই। এই পুথি দুইখানি দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষায় লিখিত। ইহাও জানান উচিত যে রসিক বাবুর পুথি ও সোসাইটীর পুথি প্রায় এক সময়ে লেখা। এরূপ স্থলে, রসিক বাবু আটীয়ার পুথি দেখিয়া কবি মুকুন্দকে যেমন ময়মনসিংহের লোক বলিতেছেন, আমরাও সেইরূপ অন্য দুইখানি দেখিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ রাঢ়ের লোক বলিতে পারি। এই জন্য আমার মত এই যে, গ্রন্থকারের স্বহস্তের লেখা গ্রন্থ ভি অপরের লেখা গ্রন্থের ভাষা ধরিয়া গ্রন্থকারের জন্মভূমি নির্দ্দেশ করা সহজ নহে।

৩। এক স্থলে রসিক বাবু বলিয়াছেন,—কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয় ও রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল পাঠ করিলে, জগন্নাথ-বিজয় দুর্গামঙ্গলের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এই "বোধ" হইবার কারণ—(১) জগন্নাথ-বিজয়ে তেমন রচনা-পরিপাট্য বা চন্দাড়ম্বর নাই; কবি কেবল রাগ ও তালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পদ রচনা করিয়াছেন।—(২) তাঁহার গ্রন্থে অপরাপর দেবদেবীর বন্দনা থাকিলেও চৈতন্য দেবের বন্দনা নাই। চৈতন্য দেব শেষাবস্থায় নীলাচলে ছিলেন অথচ জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য লিখিলেও যখন কবি চৈতন্যের নাম উল্লেখ করেন নাই, তখন তিনি চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। রসিক বাবুই এক স্থলে লিখিয়াছেন, "মুকুন্দের ভাষার সরল ভাব চণ্ডীদাসেও নাই"; সুতরাং তাঁহার মতে মুকুন্দ চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব তিনি স্থির করিলেন কবি মুকুন্দ দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান

ছিলেন। বাস্তবিক কবি মুকুন্দ যদি ছয় শত বর্ষেরই হইতেন তাহা হইলে আমরা রসিক বাবুকে ধন্যবাদ করিতাম এবং তিনি ছয় শত বর্ষের এক প্রাচীন বাঙ্গালী কবির গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু তাহা নহে। রসিক বাবু যে সকল প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে আমরা কবি মুকুন্দকে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না। ভাষার সমালোচনায় তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন,—"কবি রূপনারায়ণের ভাষা যেরূপ দেখিয়াছি,—জগন্নাথ-বিজয়ের ভাষা ঠিক সেইরূপ।" রসিক বাবুই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রমাণ করিয়াছেন, আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে কবি রূপনারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ স্থলে কবি মুকুন্দ ছয় শত বর্ষের কবি হন কিরূপে? কেবল ছন্দোবন্ধের দোষ ও ভাষার সরলতা দেখিয়া কবি মুকুন্দকে প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রসিক বাবু আরও বলিয়াছেন "দেড় শত দুই শত বর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও এরূপ ভাষার অভাব নাই।" এরূপ স্থলে রসিক বাবুই আবার কবি মুকুন্দকে ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে লইয়া যান কেন? তবে একটা কথা কবি মুকুন্দ চৈতন্যের পরবর্ত্তী হইলে অবশ্যই বন্দনামধ্যে তাঁহার নামটা করা সম্ভব হইত, কিন্তু তিনি যদি চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত না হন, তবে তাঁহার নাম করিবেন কেন? জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য, তন্মধ্যে চৈতন্যবন্দনার তত বেশী প্রয়োজন দেখা যায় না; সুতরাং কবি মুকুন্দ তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই যে তাঁহার প্রাচীনত্ব কল্পনা করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? উৎকল ভাষায় অনেকগুলি জগন্নাথ মাহাত্ম্য আছে, তাহার অনেকগুলির গ্রন্থকার চৈতন্যের পরবর্ত্তী, কিন্তু কেহই ত চৈতন্যের নাম করেন নাই।

৪। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুকুন্দের জগন্নাথ মাহাত্ম্যের আর দুই খানি পুথি আমরা পাইয়াছি, সে দুখানি হইতে কোন ক্রমে তাঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার লোক বলা যায় না। বোধ হয় ময়মনসিংহের কোন লোক স্বদেশে জগন্নাথ-মাহাত্ম্য গান করিবার জন্য পুথি নকল করিয়া লয় এবং নকল করিবার সময় স্বদেশের লোকের বুঝিবার সুবিধা করিবার জন্য তাহাতে স্বদেশের চলিত শব্দ সকল বসাইয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছিল। আমার কথিত অপর দুইখানি পুথির লিপিকারকের সে প্রয়োজন হয় নাই; সুতরাং তাহাতে অন্য প্রদেশের ভাষার আভাসও নাই। যাঁহারা হস্তলিখিত পুথি লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারাই জানেন যে একই গ্রন্থ যত পরবর্ত্তী লেখকের হস্তে লিখিত হইয়াছে, ততই তাহাতে উত্তরোত্তর মার্জ্জিত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। জগন্নাথমাহাত্ম্য গ্রন্থও যে সেইরূপ মার্জ্জিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

৫। রসিক বাবু কবি মুকুন্দের জাতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমার সংগৃহীত পুথিতে "দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়া শ্রীহরি" ভণিতা থাকায় কবি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা জানা যায়।

৬। আর একটি গোল আছে,—রসিক বাবুর পুথিতে গ্রন্থের নাম আছে জগন্নাথবিজয়,

আর আমার পুথিতে গ্রন্থের নাম আছে জগন্নাথমঙ্গল। এসিয়াটিক সোসাইটির পুথির নামও জগন্নাথ-বিজয় ;—কিন্তু তিনখানি পুথিরই বর্ণনীয় বিষয় এক, কবির নামও এক। দুই একটি পাঠান্তর ব্যতীত এবং রসিক বাবুর পুথির প্রাদেশিক শব্দগুলি ব্যতীত পুথি তিন খানিতে ছত্রে ছত্রে মিল আছে। এক ব্যক্তির রচিত একই গ্রন্থের দ্বিবিধ নাম কেন? আমার বোধ হয়, প্রথমতঃ জগন্নাথ-মঙ্গলই নাম ছিল, পরে জগন্নাথ-বিজয় নাম হইয়াছে। এ অনুমানের কারণ আছে। এখনকার জগন্নাথ-বিজয়ের পুথিতে গ্রন্থারম্ভে নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী, গণেশ, চণ্ডিকা ও ব্যাসের বন্দনা আছে, কিন্তু জগন্নাথ-মঙ্গলে এক নারায়ণ ব্যতীত আর কাহারও বন্দনা নাই। জগন্নাথমঙ্গলে কেবল "দ্বিজ মুকুন্দ কহে" এইরূপ ভণিতা আছে, কিন্তু জগন্নাথ-বিজয়ে "ভারতী-মুকুন্দ ভণে" এই "ভারতী" উপাধিযুক্ত ভণিতা পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সত্যবতীর রূপ বর্ণনার অংশ জগন্নাথমঙ্গলে নাই, জগন্নাথ বিজয়ে আছে। ইহা হইতে বোধ হয় যখন কবি ভারতী উপাধি লাভ করেন নাই, তখন "মঙ্গল" নামে স্বীয় গ্রন্থ প্রচার করেন, তৎপরে উপাধি পাইয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া "বিজয়" নাম দিয়া থাকিবেন।

৭। জগন্নাথ-বিজয়ে আছে,—

"ব্রহ্ম পুরাণের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিষ্ণুর গুণ রচিল বিধানে॥"

এ কবিতা কবির প্রথম রচনা জগন্নাথ-মঙ্গলে নাই। এ কবিতাটি দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে কবি বাস্তবিক ব্রহ্মপুরাণ দেখিয়া আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে জগন্নাথ সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা উৎকলের প্রবাদ অনুসারে লিখিত। ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথমাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত থাকিলেও তদনুসারে এ জগন্নাথ বিজয় রচিত হয় নাই তাহা মিলাইয়া দেখিয়াছি। ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথের কথা আছে শুনিয়া কবি আপনার গ্রন্থের মৌলিকতা রক্ষা করিবার জন্য, পরবর্ত্তীকালে যখন জগন্নাথ-বিজয় নামে গ্রন্থের সংবর্দ্ধিত আকার প্রচলিত করেন, সেই সময় ঐ কবিতাটি যোজনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার গ্রন্থ যে মৌলিক নহে তাহার অন্য প্রমাণও আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের মুখে জগন্নাথ দেবের যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করাইয়াছেন, তাহার সহিত কবি মুকুন্দের বর্ণনার সর্ব্বাংশে ঐক্য আছে। কেবল ঐক্য নহে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে বর্ণনার মিল আছে। মূল প্রবন্ধের টিপ্পনীতে দুই একটা উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলেই সহজে বোধ হয় যেন এক ব্যক্তি অপরের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে যেন মাজিয়া ঘষিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে, জয়ানন্দ ও মুকুন্দ উভয়ের মধ্যে কে কাহার অনুসরণ করিয়াছেন? জয়ানন্দের রচনার ভাষার তুলনায় মুকুন্দের ভাষা যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। জয়ানন্দ নিঃসঙ্কোচে আপনার

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কবি মুকুন্দের নাই। বিনীত বৈষ্ণব কবি স্বীয় পূর্ব্ববর্ত্তী বহুতর কবির নামোল্লেখে কাতর হন নাই। মুকুন্দ যদি জয়ানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেন, আর তাঁহার কোন গ্রন্থ যদি জয়ানন্দের দৃষ্টিতে পড়িত, তবে এরূপ বিনীত কবি তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহা দ্বারাও বুঝা যায় মুকুন্দ জয়ানন্দের পরবর্ত্তী। মুকুন্দ স্বগ্রন্থে এরূপ কাহারও উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না; সুতরাং মুকুন্দ জয়ানন্দের নাম করেন নাই, অতএব তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী, এ কথা তাঁহার প্রতি খাটে না। এখন একমাত্র ভাষার তুলনা ভিন্ন আর কিছুরই প্রমাণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। আমার সংগৃহীত পুঁথি দুই খানির ভাষাই জয়ানন্দের ভাষা অপেক্ষা অনেকটা অপ্রাচীন, ইহা যে কেহ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। জয়ানন্দ প্রায় তিন শত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন। কবি মুকুন্দ তাঁহার পরবর্ত্তী। আমরা কবি মুকুন্দরামের যে শিবসঙ্কীর্ত্তন দেখিয়াছি, তাহাতেও স্থানে স্থানে "দ্বিজ মুকুন্দ" এইরূপ ভণিতা আছে। আমার বোধ হয় তাঁহার মতে শিবসঙ্কীর্ত্তন মুকুন্দরামের বাল্যকালের রচনা। তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলের ভাষার মত শিবসঙ্কীর্ত্তনের ভাষা সরল হইলেও ততটা ওজস্বিতা বা মাধুর্য্যপূর্ণ নহে। শিব-সঙ্কীর্ত্তনের ভাষা অনেকটা জগন্নাথমঙ্গলের মত। ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও দুই মুকুন্দ এক কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

# কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস।

বঙ্গ ভাষায় প্রসিদ্ধ মহাভারতপ্রণেতা কাশীদাসের আর দুই সহোদর ছিলেন; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম স্বয়ং কাশীদাস, কনিষ্ঠ গদাধর দাস। কাশীদাস স্বীয় মহাভারতে আর দুই ভ্রাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন——

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে তথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥

অন্যান্য পুস্তকে——

হব পাদাম্বুজ, কৃষ্ণদাসানুজ, কাশীদাস ধ্যায় ধ্যানে।

পুনশ্চ——

মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কাশীদাস কহে গদাধরদাসাগ্রজ॥

কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর দাস, তিনজনেই পরম ধার্ম্মিক, পরম বৈষ্ণব ও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরও যে গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন তাহা কাশীদাস স্বকৃত মহাভারতে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কোনরূপ আভাস পর্য্যন্তও দেন নাই। অন্য সহোদরকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিলে নিজের গৌরব বা প্রতিপত্তি কম হইতে পারে কাশীদাস এরূপ আশঙ্কায় ঈর্ষ্যাপ্রবণ হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন নাই এরূপ হইতে পারে না।

কাশীদাস মধ্যম হইলেও জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরের পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে মহাভারত রচনা করেন। ১৩০৭ সালের ২য় সংখ্যার পরিষৎ-পত্রিকায় পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়, বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মধ্যে কাশীদাসী বিরাটপর্ব্বের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়,

যে জন শ্রবণ করে তারে কর দয়া।
উদ্ধার করহ প্রভু দিয়া পদছায়া॥
চন্দ্র,বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥

এই পয়ারে লিখিত ১৫২৬ শককে বাঙ্গালা ১০১১ সাল করা হইয়াছে। অতএব ১০১১ সালের কিছু পূর্ব্ব হইতে মহাভারত আরম্ভ করিয়া ঐ ১০১১ সালে বিরাট পর্ব্ব শেষ করেন। তাহার পর অন্য অন্য পর্ব্ব রচিত হইলেও গদাধরদাস রচিত জগন্নাথমঙ্গলের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার মহাভারত শেষ হইয়াছিল। সুতরাং কাশীদাস মহাভারতে গদাধরকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণদাস গোপালদাস নামক এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর এই আখ্যা প্রাপ্ত হন ও তাঁহার কৃপাতেই কৃষ্ণবিলাস নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ব্রাহ্মণ কুমার গুরু অতি দয়াবান।
কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোর কৈল পরিত্রাণ॥
সেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা।
আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিঞা॥
সে গুরুকৃপাতে দূর করি মনদম্ভ
অনুভাব হরিকথা করিল আরম্ভ॥
শ্রীকৃষ্ণবিলাস নাম শুদ্ধ ভক্তিযোগ।
শ্রবণ করিলে ঘুচে মনের বিয়োগ॥

কৃষ্ণদাস যে সময় গ্রন্থরচনা করেন, সে সময় তাঁহার পূর্ব্ব নাম গিয়াছে। কৃষ্ণদাস নাম আর নাই, তিনি গুরুদত্ত শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর এই নামেই সাধারণ লোকের নিকট অভিহিত হইয়াছেন ও নিজেও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতের পূর্ব্বে যদি কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর হইতেন ও কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ রচনা করিতেন, তবে কাশীদাসও গদাধর দাসের ন্যায় আপন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদাসকে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলিয়া কোন ভণিতায় নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন।

কনিষ্ঠ গদাধর দাস দুই সহোদরের গ্রন্থাদি রচনার পর স্বয়ং জগন্নাথমঙ্গল নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। সুতরাং তিনি অন্য দুই সহোদরের পূর্ব্ব নাম ও প্রচলিত আখ্যা ও রচিত গ্রন্থাদির পরিচয় স্বকৃত জগন্নাথমঙ্গলে বিশেষরূপে প্রদান করিয়াছেন। যথা—

সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার।
ভূমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥
জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥

গদাধর দাস যদি গ্রন্থে এই কৃষ্ণদাসের নাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ও রচিত গ্রন্থের আভাস না দিতেন, তাহা হইলে, কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না।

কমলাকান্তের প্রথম পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস; দ্বিতীয় কাশীদাস পাঁচালিচ্ছন্দে মহাভারত রচনা করেন, তৃতীয় গদাধরদাস জগন্নাথমঙ্গল লেখেন। মহাভারত পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। জগন্নাথমঙ্গলও সংগৃহীত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের কোন পুস্তকাদি বহুদিন হইতে অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবিলাস নামক একখানি পুস্তকের সংগ্রহ হইয়াছে। এই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করই কাশীদাসাগ্রজ, তাহা গদাধরের জগন্নাথমঙ্গলের—

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥

এই ভণিতায় প্রমাণিত হইতেছে।

কৃষ্ণদাস স্বকৃত কৃষ্ণবিলাসে নিজের বা পিতা মাতার ও ভ্রাতাদির কোন পরিচয় দেন নাই। পিতা মাতা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াছেন,——

সাদরে বন্দি পিতা মাতা দোঁহাকারে।
যাহার প্রসাদে জন্ম [illegible] সংসারে॥

আত্মপরিচয় স্থলে গ্রন্থকর্ত্তা আপনার প্রকৃত নাম যে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নহে, কেবল ইহাই বলিয়াছেন এবং এইরূপ শেষ বাক্যে নিজপরিচয়ে—

পুনরপি শ্রীগুরু চরণে পরণাম।
যার গুণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর হইলাম॥
যার গুণে মনের তিমির হইল নাশ।
যার গুণে শ্রীকৃষ্ণবিলাস পরকাশ॥
গোবিন্দের গুণে গুরু করিঞা আদেশ।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলি করিল আদেশ॥

এতদ্ব্যতীত আর কোন বিশেষ পরিচয় দেন নাই। সুতরাং চিনিবার জন্ত তাঁহারই সহোদর গদাধর দাসের আশ্রয় লইতে হইতেছে। গদাধর দাস তাঁহার জগন্নাথমঙ্গলে আত্ম-পরিচয়স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, অগ্রজ কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মনোহর হরিগুণপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম কি তাহা বলেন নাই, কিন্তু বিষয় বলিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য এই গ্রন্থখানি মনোহর হরিগুণ গানে পরিপূর্ণ এবং ইহার গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণকিঙ্করও হইতেছেন; সুতরাং ইহাকে কাশীদাসের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিহীন নহে।

কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর যে গুরুর কৃপায় এই মনোহর হরিলীলাপূর্ণ কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছেন, পিতা, মাতা, সহোদর প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও সেই গুরুর একটু পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

বিপ্রকুলে জন্ম যার শ্রীগোপাল দাস।
আজন্ম ভরিঞা কৈল গুরুতে বিশ্বাস॥
অকুমার ব্রতে দেহ করিয়া শোধন।
অন্তে সুরধুনী মধ্যে পাইল নির্ব্বাণ॥

গুরুর নাম গোপাল দাস। গোপাল দাস ব্রাহ্মণ গুরুভক্ত, ও ব্রহ্মচারী। অন্তিমে ভাগীরথীতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাশীদাস ও গদাধর দাস উভয়েই নিজ নিজ গ্রন্থে পিতা, মাতা, ভ্রাতাদির পরিচয় দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর তাঁহাদের পরিচয়ের কোন কথাই বলিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ও সংসারাসক্তিহীন হওয়াতে আপনার পরিচয় দেন নাই। অনেক পুস্তকে দেখা যায়, শেষভাগে গ্রন্থ সমাপ্তির পর গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ পরিচয় থাকিলেও, পরবর্ত্তী লেখকবৃন্দ, অনাবশ্যক বোধে গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়টি পরিত্যাগ করিয়া মূল গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্য লিখিয়াই সন তারিখ দিয়া ক্ষান্ত হন। তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে এই সামান্ত অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যপাদপের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। অপর এক জন কৃষ্ণদাস কৃত নারদসংবাদ নামক গ্রন্থ তিন চারি খানি দেখিয়াছি, কিন্তু কোন পুস্তকেই গ্রন্থকর্ত্তার

পরিচয় পাই নাই। সম্প্রতি একখানি নারদসংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থারম্ভে পুস্তকপ্রণেতার বিশেষ পরিচয় ও গ্রন্থ রচনার সন তারিখ পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং এরূপ স্থলে লেখকের আলস্য ও দুর্ব্বুদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। যদি এই কৃষ্ণবিলাসেও এইরূপ হইয়া থাকে, আশা করা যায় অন্য অন্য পুস্তক সংগ্রহ হইলে, কৃষ্ণকিঙ্করের নিজ দত্ত পরিচয়াদি পাওয়া যাইতে পারিবে।

কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থখানি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সরল ভাবে ও সংক্ষেপে হরিলীলার বর্ণনায় পূর্ণ। ইহা কোন গ্রন্থের অনুবাদ নহে। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের শাস্ত্রীয় মতামত দ্রষ্টব্য নহে। যেহেতু গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন—

সে গুরু কৃপাতে দূর করি মনদম্ভ।
অনুভবি হরি কথা করিল আরম্ভ॥
শ্রীকৃষ্ণবিলাস নাম শুদ্ধ ভক্তিযোগ।
শ্রবণ করিলে ঘুচে মনের বিয়োগ॥

শেষভাগে।—

সর্ব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার।
আপনার গুণে দোষ না লবে আমার॥
কহিতে গোবিন্দগুণ কি মোর শকতি।
তবে জে কহি লঞা শাস্ত্র অনুমতি॥
অশেষ গোবিন্দ-লীলা মহিমা অসংখ্য।
ইহা নির্ব্বন্ধন কৈল কবি লক্ষ লক্ষ॥
মুঞি অতি হীনমতি হৃদয় পাষাণ।
অল্প গুণে কি কহিব সে গুণ বাখান।
অনন্ত সহস্র মুখে না পাইল ওর।
যার নাম লঞা শিব হইলা বিভোর॥
চারি মুখে ব্রহ্মা কৈল বেদের বাখান।
তবু জানিবারে না পারিলা ভগবান॥
হেন গুণ মহিমা ভকত মুখে শুনি।
নির্ব্বন্ধন কৈল সর্ব্ব শাস্ত্র পর মানি॥
পূর্ব্বে ব্যাসদেব কৈল বেদের বিচার।
তাহাতে জন্মিল শাস্ত্র কত পরকার॥
প্রকৃতি ভাষাতে সর্ব্ব শাস্ত্রের গোচর।
পুস্তক গ্রন্থন কৈল শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥

কৃষ্ণবিলাসে বিষয় সূতের নিকট শৌনকাদির প্রশ্ন। কশ্যপ ও অদিতির তপস্যা। ভগবানের দ্বাবিংশতি অবতার। বামনোপাখ্যান। কৃষ্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকায় লীলা। উদ্ধবপ্রশ্ন। উদ্ধবের প্রতি ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ। [illegible] গুরুর বিষয়। ধ্রুবচরিত্র। ভগীরথের উপাখ্যান। শঙ্খাসুর বধ। তুলসী উপাখ্যান। [illegible]

চরিত্র। পরে গুরুভক্তি প্রশংসা, হরি ভজনা প্রশংসা ও স্বকৃত গ্রন্থের শ্রবণ অধ্যয়ন ফলাদি কহিয়া উপসংহার করিয়াছেন। ভাগবত মতে একবিংশতি অবতার; ঊনবিংশে রাম কৃষ্ণ, বিংশে বুদ্ধ, একবিংশে কল্কি। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ঊনবিংশে বলরাম, বিংশে শ্রীকৃষ্ণ, একবিংশে বুদ্ধ, দ্বাবিংশে কল্কি, এইরূপে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ অবতার বলিয়া এক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ তাঁহার কৃষ্ণবিলাসে বর্ণিত উপাখ্যান সকলে ভাগবতের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা ঠিক ভাগবত পুরাণানুসারে রচিত নহে। অনুভব, শ্রবণ ও অনুমানে লেখা, ইহা কবি পূর্ব্বে বলিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থের শাস্ত্রীয় বিষয় বিচার্য্য নহে।

কৃষ্ণদাস পরম বৈষ্ণব হইলেও দেবতান্তরে ভক্তিবিহীন বা চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা নাই; প্রথমেই ব্যাসদেব ও শুকদেবকে নমস্কার করিয়াই বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে জার আছে এ বাসনা।
আগে সে করিহ শিব দুর্গার অর্চ্চনা॥

তিনি তৎপরে বৈষ্ণবগণ, বলি, বিভীষণ, নারদ, প্রহ্লাদ, নিমি, ভৃগু, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, উদ্ধব ও জনক রাজা প্রভৃতিকে বন্দনা করিয়াছেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর বা পরবর্ত্তী শিষ্য-বৃন্দের নমস্কার বন্দনা, বা কোনরূপ তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। ভগবানের একবিংশতি অবতারকে দ্বাবিংশতিতে পরিণত করিয়াও চৈতন্য প্রভুকে কোন অবতার মধ্যে স্থান দেন নাই। মহাপ্রভুর নাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; শেষভাগে হরি ভজনা প্রশংসা প্রকরণে শুদ্ধ মহাপ্রভুর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে একজন ভক্তের মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

সবার অধিক হরিনামের মহিমা।
এ তিন ভুবনে যার দিতে নারি সীমা॥
হরিনাম লঞা স্বর্গে রাজা পুরন্দর।
হরিনাম লঞা যোগী হইল মহেশ্বর॥
কুব্জ অপ্সরা হরিভজন কারণ।
হরিদোষ করি নষ্ট হৈল দুর্য্যোধন॥
হরি ভজি নৃপতি ভরত জাতিস্মর।
হরিবোল বোলাইয়া চৈতন্য অবতার॥
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হরির অর্চ্চনা।
কলিযুগে কে আর হইবে হেন জনা॥

এক্ষণে কৃষ্ণবিলাসের উপাখ্যানের সরল ও সহজ কবিত্বের সারল্য ও ভাষার প্রাঞ্জলতা কিঞ্চিৎ দেখাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পঞ্চমে উত্তানপাদ অতি বড় রাজা।
পুত্রকে অধিক করি পালএ প্রজা॥

পরম দুর্ভগা আমি বিদিত সংসারে।
সবে এক ভাগ্য আমি ধরাছি উদরে॥
একে একে শুনি ধ্রুব মাএর বচন।
নিজ অপমানাধিক বাড়িল বেদন॥
ধরণী লোটাঞা কান্দে ধ্রুব শিশুমতি।
ঘন ঘন বলে কিসে হব অব্যাহতি॥
ধ্রুব মুখ দেখি রাণী বলে সকরুণে।
পাইবে সকল ভজ শ্রীনন্দনন্দনে॥
হরি না ভজিলে না পাইবে দিব্যস্থান।
সকল পাইবে মাত্র ভজ ভগবান্॥

ধ্রুবকে অরণ্য হইতে আনয়ন করিতে পিতা, মাতা, বিমাতা ও অন্যান্য পুরজন সকল গমন করিলে ধ্রুব বিমাতার ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত কিরূপ কথোপকথন ও ব্যবহার করেন, কবি বর্ণনা করিয়াছেন ——

সে দূতের সঙ্গে সঙ্গে চলিলা ধাইঞা।
যেখানে আছিলা ধ্রুব অরণ্যে বসিঞা॥
আনন্দে আকুল হঞা আইলা সুনীতি।
উত্তম সুরুচি আইলা পাঞা অপ্রীতি॥
নব লক্ষ দলে আইলা উত্তম কোঙর।
উড়িছে ধবল ছত্র মাথার উপর॥
পিতা মাতা বিমাতা দেখিঞা শিশুমতি।
একে একে সভাকারে করিল প্রণতি॥
সর্ব্বপুরজন মেলি করিল কল্যাণে।
হেন বোল কহে ধ্রুব বিমাতার স্থানে॥
শুনগো বিমাতা মোর এই নিবেদন।
তোমার প্রসাদে আমি প্রবেশিল বন॥
তোমার প্রসাদে দেখা হইল মুনি সনে।
তোমার প্রসাদে মুনি মন্ত্র দিল কাণে॥
তোমার প্রসাদে তপ যমুনার কূলে।
তোমার প্রসাদে হরি আসি কৈল কোলে॥
তোমার প্রসাদে আমি দেখিল সে পদ।
তোমার প্রসাদে মোর এ সুখ সম্পদ॥
বিমাতার কাছে ছিল উত্তম কুমার।
নানারত্নে বিভূষিত সর্ব্ব কলেবর॥
তা দেখিঞা বলে ধ্রুব শুন যুবরাজ।
কহিঞ তোমারে সর্ব্ব পরিজন মাঝ॥

তোমার বিভবে মোর হৈল অভিমান।
সে কারণে পাইল আমি প্রভু ভগবান॥
শুনহ উত্তম অভিমান বড় সুখ।
ছাড়িঞা কুমার আমি দেখিল শ্রীমুখ॥
হের আইস তোমার সনে করি আলিঙ্গন।
বৈরাগ্য পরম পদ তোমার কারণ॥

দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদের উক্তি কবি দেখাইতেছেন

একদিন দৈত্যপতি সভাতে বসিঞা।
গুরু গৃহ হইতে শিশু আনিল ডাকিঞা॥
পুত্রে জিজ্ঞাসিল রাজা সঘন বচনে।
কি পড়িলে কহ পুত্র মোর বিদ্যমানে॥
রাজার বচন শুনি শিশু মহাশয়।
নিজ অধ্যয়ন কহে হইঞা নির্ভয়।
শুন শুন দৈত্যরায় করিএ মিনতি।
যে কিছু পড়িল তাহা কর অবগতি॥
আদি অন্ত জন্ম মৃত্যু ক্ষয় যার নাহিএ।
হেন বিদ্যা পড়ি আমি শুনহ গোসাঞিএ॥
ব্রহ্মা আদি করিঞা সকল দেবগণ।
নিরন্তর করে যারে অনন্ত স্মরণ॥
ঋক সাম যজুরথর্ব্ব চারি বেদ গাথা।
নারিল কহিতে অন্ত যার গুণ গাথা॥
অচঞ্চল মানসে যত যোগিগণ।
পরম ধেয়ানে দেখে সেই নিরঞ্জন॥
পঞ্চ মুখে শ্রীহর যাহার গুণ গায়।
সেই অধ্যয়ন মোর শুন দৈত্য রায়॥

সংগৃহীত কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থের লিপিকাল ১১৩২ সাল; দুই এক স্থানে কীট দষ্ট, পত্রসংখ্যা ১৭৬; প্রতি পৃষ্ঠে ১১ ছত্র। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১,২৫,০০০।

শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ।

---

# প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

## ২০। একাদশীর ব্রতকথা।

**প্রারম্ভ—**

দেব নিরঞ্জন বন্দম্ সংসারের সার।
কহিতে না পারে যার মহিমা অপার॥
কিছু কহিব আমি পুরাণ-কাহিনী
দেব গুরু বন্দম্ আর যত ঋষি মুনি॥

ব্রহ্মা আদি দেব বন্দম্ অষ্ট লোকপাল।
যাহার প্রসাদে লোকে করে ঠাকুরাল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যতেক দেবগণ।
সংক্ষেপে বন্দিব আমি তা সবার চরণ॥

একাদশীর ব্রত কথা শুন সর্ব্ব জনে।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন যে যুধিষ্ঠির স্থানে॥
একাদশী তীর্থরূপে আপনি ভগবান।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন পুরাণ-কথন॥

শেষ —

একাদশী ব্রত যেবা করে ভক্তিমতি।
সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুলোকে গতি॥
পাপী নিস্তারিতে বিষ্ণু হৈল্যে একাদশী।
রোগ ব্যাধি হরে তার করিলে একাদশী॥

সঙ্গে কেহ না যায় আর পুত্র পরিজন।
একাদশী কৈলে হয় পরলোকে ধন॥
একাদশী তুল্য ব্রত ত্রিভুবনে নাই।
পাপী নিস্তারিতে কৃষ্ণ আসিয়া এথাই॥

ভণিতা—

একাদশী পাঞ্চালী রচে যুক্ত শ্রীধরে।
যেই জন শুনে তার সর্ব্ব পাপ হরে॥

## ২১। শ্রীলক্ষ্মীব্রত পঞ্চালী।

পদসংখ্যা ১০৮।

প্রারম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ যত চরাচর।
যাহার সৃজন হয় যত দেবনর॥
সরস্বতী প্রণমোহ তাহান বনিতা।
যাহার প্রসাদে হয় সরস সঙ্গীতা॥
দেব ঋষি মুনিগণ করম্ বন্দন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা বন্দম্ তিন জন॥
মাতা পিতা গুরুপদে করিয়া শিরালি (?)।

লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত কথা রচিব পাঞ্চালী॥
একদিন নারায়ণ করিয়া ভ্রমণ।
যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে হৈলা উপাসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলে বিনয় বচন।
করজোড়ে স্তুতি করি দৈল নারায়ণ॥
করজোড়ে জিজ্ঞাসয়ে গোবিন্দচরণে।
লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত গোসাঞি কহিতে লয় মনে॥

শেষ—

ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে ঐশ্বর্য্য হইল।
লক্ষ্মীচন্দ্র বরে দ্বিজ সুখে নির্ব্বাহিল॥
নবরত্ন গাভী দুগ্ধ বৃক্ষ যোগায় ধন।
সন্তোষ হইয়া দ্বিজ করয় বরুন॥
যেই জনে একমনে করয়ে পূজন।

তাহারে প্রসন্ন হয় লক্ষ্মী নারায়ণ॥
যেই জনে অবজ্ঞা করয়ে কদাচিৎ।
বহু দুঃখ পায় সেই পুরাণ লিখিত॥
কত দিন সুখে বিপ্র করিয়া বসতি।
রথে চড়ি অন্তকালে হৈল স্বর্গগতি॥

ভণিত —

ভবিষ্যপুরাণ কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ বিদ্যা অভিরাম পাঞ্চালী বাখান॥

## ২২। জ্ঞান বারমাস।

পদসংখ্যা ২৬।

প্রারম্ভ :—

বৈশাখে বসন্তের বাও তরু মেলে পাত।
দুই ভাবে স্তব করে ত্রিজগতের নাথ॥
নানা পুষ্প ফল ধরে বায়ু করে গতি।
সদা সুখে কেলি করে ত্রিজগতের পতি॥

* * *

* * *

ত্রিবেণীর ঘাট বৈসে দেখিতে সুন্দর।
কনক কমল মধ্যে গুঞ্জরে ভ্রমর

শেষ—

চৈত্রে চঞ্চল হয় ব্রহ্মা নারায়ণ।
মন্দাকিনী জলে স্নান করে দেবগণ॥
যমুনা খগড়া জলে স্থাবর জঙ্গম।
প্রকাশিত হৈয়া আসে নিদারুণ যম॥
যম না যোলিক তারে দেবের দেবরাজ।
যমুনাখে গায় গীত জাকর সমাজ॥
যেই গায় যেই শুনে অন্ত যার নাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে অন্তে স্বর্গবাস॥

## ২৩। বিদ্যাসুন্দর।

ইহাকে অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বোধ হয় কবি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সারাংশ লইয়াই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায় নাই; মধ্য ভাগের যেটুকু আছে, তাহাতে কবির রচনা-নৈপুণ্য কি কবিত্বের বড় একটা বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। কবি তেমন উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থের এক স্থলে এইরূপ একটা ভণিতা আছে :—

গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথায়।
লক্ষ্মীর বন্দন কবি নিধিরাম গায়॥

এবং অন্য এক স্থলে "শ্রীকবিরতনে গায়" এই ভণিতাও দৃষ্ট হয়। কবি নিধিরামই যে কবিরত্নোপাধিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই। "বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

শুনিয়া মায়ের কথা সে চন্দ্রবদনী।
সাহসে কপট জুড়ি ভাঁড়ায় জননী॥
শুন মা ও তোমার বাক্যে মনে লাগে দুখ।
শরীর ভিতরে মোর আছে তিন রোগ॥
সর্ব্ব অঙ্গেত বায়ু দুঃখ পাই আমি।
সর্ব্বক্ষণে সে কারণে উঠে মোর হাসি॥
সপূর্ণ শরীর হৈছে পিলাইর * কারণ
শিশু তন্তে আছে কুচে কাজল বরণ॥
সপ্ত অষ্ট দিনাবধি গাও বেরারাম।
সবায় অজীর্ণ ভাব বড় দুঃখ পাম্॥
সকৌতুকে শয্যা কৈনুম পতি:*।
সেই সে কারণে বুঝি উঠে মিছা বাণী॥

আরও একটু দেখুন—

"গোমধ্যমধ্যে মৃগলোচনে হে সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা নদন্তি গোকর্ণ-শরীরভক্ষাঃ॥"

এই শ্লোকের কবি এই অনুবাদ করিয়াছেন :—

বজ্রের (?) মধ্যম মাঝা শুন মৃগ আঁখি।
সহস্র নয়ান ঘরে কিঙ্করের দেখি॥
বজ্রধরাধর সে যে তাহার গর্জ্জেরে।
মত্ত হৈয়া গোকর্ণভক্ষকে শব্দ করে॥
সর্প যে ভক্ষণ করে তার নাম শিখী।
পর্ব্বত তাহার নাম শুন চন্দ্রমুখী॥

---

* পীলাই—প্লীহা।

## ২৪। শ্রীসূর্য্যব্রত পাঁচালী।

**আরম্ভ—**

প্রণমোহ সরস্বতী চরণ যুগল।
একে একে বন্দ[illegible] যত দেবতা সকল॥
ইষ্টদেব বন্দোহ মনের যে রঙ্গে।
আনন্দে জনক বন্দম্ জননীর সঙ্গে।

* * *

যেই গুরু শিখাইল জ্ঞান ভাল মন্দ।
তাহার চরণ বন্দম্ হইয়া আনন্দ॥
আর বহু প্রণমিয়া বোলম্ বারে বার।
এবে মুই প্রণাম করম্ দিবাকর॥
রচিবারে নাহি কিছু তাহার চরিত্র॥
এক চিত্তে শুন সভে হইয়া পবিত্র॥

* * *

পূর্ব্বে এক গ্রামে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই কন্যা নারী সহ পোষে পরিজন॥
ভিক্ষা মাগি খায় দ্বিজ আজন্ম অবধি।
দুঃখিত দেখিয়া তাকে সৃজিয়াছে বিধি॥

**শেষ—**

তবে রাজা কৈল এক সূর্য্যের পূজন।
নরা মাতা পিতা রাজা দেখিল তখন॥
যুবরাজ পুত্রেরে রাজ্য সমর্পিয়া।
সূর্য্যপুরে গেল রাজা মা বাপ লইয়া॥
এইমতে সূর্য্য পূজা করে যেই জন।
সর্ব্ব স্থানে রক্ষা তারে করয়ে তপন॥
ধন পুত্র বাড়য়ে যে ঐশ্বর্য্য অপার।
বিঘ্ননাশ হয় তার আপদ নিস্তার॥
আদিত্যর পূজা যেই করে এক মতি।
অন্তিম কালেতে তার হয় সদগতি॥

**ভণিতা—**

অল্প বয়স মোর দ্বিজকুলে জাত।
পণ্ডিত না হয় মুই কহিয়ম তোমাত॥
মনেতে ভাবিয়া মাত্র [illegible] আদিত্য।
কবিতা কহিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত॥
[illegible]পদে অ দেখিল পরম সন্তোষে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসয় বিশেষে।
গ্রামাধিপ মহারাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সভা আছে নরেশ্বর॥
সেই গ্রামে নিবসতি শ্রীরামজীবন।*
সূর্য্যের চরিত্র মাত্র করিল রচন॥

**রচনা কাল—**

সিন্ধু বাণ ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্যচরিত॥

## ২৫। সীতাহরণ যাত্রা।

এই গ্রন্থখানি উনবিংশ শতাব্দীর রচনা; ইহা দেশবিখ্যাত যাত্রাদলের অধিকারী ৺শ্যামাচরণ খাস্তগিরীর লেখনীপ্রসূত। ইনি যাত্রাদল করিয়াই সর্ব্বত্র "শ্যামাচরণ বাবু" নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ৺অন্নদাচরণ খাস্তগিরী ও সবজজ ৺বাবু উমাচরণ খাস্তগিরী ইহার ভ্রাতা। সম্ভবতঃ শ্যামাচরণ বাবু ইহা স্বীয় দলে অভিনীত করিবার জন্যই রচনা করিয়াছিলেন। ইহার আদ্যন্ত পদ্যময় নহে, মাঝে মাঝে সেকেলে গদ্যও আছে। কিন্তু অধুনা গদ্য লিখিবার যে সকল অদ্ভুত রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থের

* এখানে একটী পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। লেখক যে গ্রামের কথা বলিতেছেন, তাহার নাম কোথায় গেল?

গদ্যকেও এক শ্রেণীর পদ্য বলা যাইতে পারে। ইহার ভাষা ও রচনা প্রণালী নিম্নোদ্ধৃত চারিটী সঙ্গীত হইতে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) তাল বৎ।

রক্ষ বিপত্তি সময়ে ভবদারা। কিঞ্চিৎ করুণা কর দুর্গে দারাৎসারা।
কে রাখিবে বিপৎকালে বিনে তোমরা তারা। চঞ্চল জীর্ণ তরণী কটাক্ষে হের জননী
সঙ্কটে পড়েছি বড়, হর হর ক্লেশ হর, হের মা হরঘরণী বহুদুঃখ হরা।

(২) তাল একতালা।

ধনী বনে একাকিনী কেনে। নাম ধাম কিবা, কার কুলবালা,
নির্জ্জন কাননে কামিনী কি মনে, বলহ সরলা, শুনিয়ে শ্রবণে।
আশ্রয় বিহনে, থাকগো কেমনে। তড়িত জড়িত গঠিত-বরণী, ক্ষীণ কটি তথি কুরঙ্গ-নয়নী
রাজবালা কিবা দেববালা, অপাঙ্গে অনঙ্গ মোহ পায় ধনী.
রাক্ষসী মানুষী গন্ধর্ব্ব অবলা, কলঙ্কবর্জ্জিত সুধাংশুবদনে।

(৩) তাল কাওয়ালি।

জিনি চঞ্চল দামিনী সৌদামিনী, ধন্যে কি লাবণ্যে কার কন্যে,
মুখ কলঙ্কবর্জ্জিত শত সুধাকর জিনি, এ অরণ্যে, কিবা জন্যে, অসামান্য রূপে ধনী।
বল কাহার কামিনী, বনে কেন একাকিনী, ক্ষীণ কটি দেখি সিংহ অভিমানী,
থাক নির্জ্জনে কুটীরে বল কি সাহসে ধনী। মৃগনেত্র দৃষ্টি মাত্র বন ত্যজিল হরিণী।

(৪) তাল একতালা।

হায় স্বর্ণমৃগ আশা জন্যে এ দুরদশা, সে আশা নৈরাশা হইল।
সর্ব্বসুখ আশা শেষ হই। পঞ্চবটী মূলে কুলনাশা বাসা,
মৃগতৃষ্ণা প্রায় কাল মৃগ আশা মম সর্ব্বনাশ করিল। কি আশা আমি করিলেম;
সুখেরি আশায়, কৈলেম্ মৃগ আশা, পূর্ণ হইত এই দুঃখিনীর সর্ব্ব আশা,
সে আশায় মম ঘটিল এ দশা; এ সময় যদি হৈত রামের আসা;
শুনে কটু ভাষা, শূন্য করে বাসা, রামের আসার আশা, দূরেরি পিপাসা,
দেবর লক্ষ্মণ কোথায় রহিল, আশা মাত্র আসা না হইল।
বহু আশা ছিল শেষ হবে সুখ,

শ্যামাচরণ বাবুর জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। পরে তাঁহার জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

## ২৬। সুবচনীর ব্রতকথা।

পদসংখ্যা ৭০।

প্রারম্ভ—

বন্দম্ মাগো সুবচনী * প্রণাম করিয়া। চন্দনে চর্চ্চিত তনু করেতে কঙ্কণ।
সুবচনী ব্রত কথা কহিমু রচিয়া। শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুচারু বদন।
ত্রিজগের দেবী মাগো জগতের মাতা। হেন মাগো সুবচনী প্রণমোহ মাথে।
জয়নাশ দুঃখনাশ কর সানন্দিতা। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় চলি যায় রথে।

* সুবচনী—শুভচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত অপভ্রষ্ট নাম মাত্র।

রাজা হৈল পাটেতে বসিব কোন জন।
দ্বিতীয় ঘরেতে আসি করিল পয়ান॥
বড়ুরে পৃষ্ঠেতে লৈয়া বসাইল পাটে।
পাত্র পঞ্চ জন বৈসে তার। পঞ্চ ঘাটে॥
সুবচনীর ব্রত করে প্রতি শুক্রবার।

*  *  *

হাসি মুখে হাসি হাতে যে করে স্মরণ।
আপদে না লজ্যে তারে যাবত জীবন॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে কহন না যায়।
আপদে না লজ্যে তারে ঠাকুরাণী পায়॥

## ২৭। জয়গুণের বারমাস।

পদসংখ্যা ৩৭।

প্রারম্ভ—

মাধবী মাসেত মন্মথ মহীরাজ।
মহোৎপল দণ্ড রুচি মধু সেনা সাজ॥
মধুব্রত কুল মধুমত্ত ভমোনাথ।
মধুরস কুটায় পরভৃত কুহুনাদ॥
মনোরম বনস্পত প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মনে বিরহে আকুল॥

শেষ—

মধুমাসে মধু ঋতু মধুরি মধুর।
মাধবী মালতী মল্লী বিকাশে প্রচুর॥
মলয়া পবন বহয় অতি মন্দ।
মধুকর ঝঙ্কারে পীয়য়ে মকরন্দ॥
মকরকেতু মদনে পীড়িত সর্ব্ব দেশ।
মরিমু পরল ভণি বৎসরের শেষ॥

ভণিতা—

মরণ বিফল সতী যদি কভু মিলে।
অচিরে মিলিব প্রভু হারি পণ্ডিত বোলে॥

এই মহম্মদ হারি পণ্ডিতের নিবাস চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তঃপাতী ভিঙ্গরোল গ্রাম। ইনি ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসরের লোক।

## ২৮। রসরঙ্গের বারমাস।

পদসংখ্যা ৫১।

প্রারম্ভ—

খেলারে প্রেমের খেলা রসের কামিনী।
খেলে হেলে দিন গেলে আর পাবে নি॥ ধুয়া॥
কহি সবাকের পাশ, রসরঙ্গের বারমাস,
যে মাসে রঙ্গরস জানী।
বৃন্দাবনে কৎপাসঙ্গে, বসিয়া প্রাণপ্রিয় সঙ্গে,
প্রেমানন্দে রঙ্গ কমলিনী॥
প্রথমে আশ্বিন মাসে, শরতের ঋতু বৈসে,
সাগরে নির্ম্মল হৈল পানি।
নির্ম্মল নক্ষত্র শশী, প্রকাশ ধবল নিশি,
জলে শোভে পদ্ম কুমুদিনী॥

শেষ—

দেখ বন পাখিগণ, যায় কাল যেইক্ষণ.
প্রেমানন্দে নাচে রঙ্গজানী।
জন্মিয়া মনুষ্য কুলে, কালে কার্য্য না করিলে,
অনুশোচে ত্যজিবা পরাণি॥
ত্যাজক বৎসর সাঙ্গ, যে করিল প্রিয়ারঙ্গ,
সে হইল স্বামীর সোহাগিনী।

ভণিতা—

কহে মতিওলা হীনে, যে রহিল বন্ধু বিনে,
সে হইল দুঁকুল অনাথিনী।
সেখ পান মোহম্মদ, প্রণামি তাহান পদ,
তান সুতে কহে রসবাণী।
অর্থ তার রস ছন্দ, যদি হয় ভাল মন্দ,
বিচারি শোধিও দোষজ্ঞানী॥

## ২৯। নিমাইচাঁদের বারমাস।

পদসংখ্যা ২৮।

প্রারম্ভ—

হাহা পুত্র নিমাইচাঁদ দুঃখের বাদুমণি। কেশব ভারতী গুরু কি না মন্ত্র দিল॥
কিরূপে ধরাইমু চিত্ত শচী অভাগিনী। কি না মন্ত্র পাইয়া নিমাই হইলা উদাস।
মাঘল মাসেতে নিমাই ব্যাকুল হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে থুইয়া নিমাই যায় সন্ন্যাসি॥

শেষ—

পৌষ মাসেত রে নিমাই তুষেরি রান্ধন। অন্ন জল দিয়া মাত্র করাইল ভোজন।
রান্ধন চড়াই মাত্র জুড়িল কান্দন॥ তুমি বাছু না দেখিলে ব্যাকুল জীবন॥
কান্দিতে কান্দিতে মাত্র করিল শয়ন। স্বপন জাগন হৈতে হারাইলুম গুণমণি।
নিদ্রাতে আসিয়া পুত্র দেখাইলা স্বপন॥ এবে সে জানিলুম পুত্র বধিবা জীবন॥

এই বারমাসে লেখকের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

## ৩০। লায়লি মজনু।

এই সুন্দর প্রাচীন পুঁথিখানি বর্ণজ্ঞানবিহীন মুসলমান লিপিকরের হস্তে পড়িয়া যেরূপ ভ্রমজালে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহাকে উদ্ধার করা একরূপ দুঃসাধ্যই বলিতে হয়। লিপিকর এত অনবহিত ছিলেন যে, তিনি কোথাও একই চরণ দুইবার লিখিতেও বিরত হন নাই, কিন্তু কোথাও বা পদের এক চরণ লিখিয়া অপর চরণ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থখানি এতই ভ্রান্তিসঙ্কুল যে, ইহার সুন্দর দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটী একেবারেই অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার রচয়িতা একজন শিক্ষিত সুন্দর কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে আপন বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া চট্টগ্রামে রাজশক্তির অভ্যুদয়ের যে বিবরণ নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় বংশবিবরণ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের উক্ত বিবরণ স্থল হইতে একটী পাতা হারাইয়া যাওয়ায় ইহার সম্যক্ পরিজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। অন্য একখানি নকল না পাওয়া গেলে ইহা এরূপই থাকিবে। ইহার হস্তলিপিখানি ১১৯১ মগীতে অর্থাৎ ৭১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ :—

প্রণমোহ আল্লা মহম্মদ নাম সার। সে করে করতা প্রভু যেই মনে লয়।
দোসর বর্জ্জি    এক করতার॥ সজীবকে মৃত করে মৃতকে জীয়ায়॥
করিম করুণানি, রহিম দয়াল। রাজাকে প্রজার শীঘ্র রাজ্যপাট হারি॥
রজ্জাক্ আহারদাতা পালক সভার॥ ভিক্ষুকের প্রতি করে রাজা অধিকারী॥
* * * নির্ম্মিতে বা হয় রঙ্গ বর্ণিতে বরণ।
* * * কহিতে কথন নহে শুনিতে বচন॥
চতুর্দ্দশ ভুবন প্রভু সৃজিলা অবিলম্বে। পঢ়িতে পুস্তক নহে লেখিতে অক্ষর।
সপ্তগুণ গগন সৃজিলা বিনু স্তম্ভে। বুঝিতে লক্ষণ তান অধিক দুষ্কর॥

গ্রন্থকারের নিজ পরিচয় বর্ণন প্রসঙ্গে যে অদ্ভুত এতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণ বিষয়টী এখানে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তাহান নন্দন নাম, সব গুণ অনুপাম,
পীর সাহা জমুদ সুমতি।
ধর্ম্মবন্ত কলেবর, পাপ তাপ দুঃখহর,
দয়াশীল আন নাহি গতি॥
তান সুত গুণসিন্ধু, দরিদ্র দুঃখিত বন্ধু,
মহম্মদ সৈয়দ সুজন।
অবিরত যত শত, ধর্ম্মমতি সাদরত,
প্রভু বিনে আন নাহি মন॥
পীর স্থির ধীর মতি, বীর বলবন্ত অতি,
মহম্মদ সৈয়দ তনয়।
ছিদ্দিক সমান জ্ঞান, হাতিম সমান দান,
আছাওদ্দিন দয়াল।
বঙ্গদেশ মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর,
নগর ফতেয়াবাদ নাম।
আছাওদ্দিন পীর, নির্ম্মল শরীর ধীর,
তথাতে বসতি অনুপাম॥
* * *
মুই পাপী হীনমতি, তুমি বিনে নাহি গতি,
এ ভবসাগরে কর পার॥
সর্ব্বলোক নরপতি, ভুবন বিখ্যাত অতি,
আছিল হোছন সাহা বর।
তান রত্ন সিংহাসন, অতি মায়া বিলক্ষণ,
গৌড়েত শোভিত মনোহর॥
প্রধান উজীর তান, মহম্মদ খান নাম,
তাহান গুণের নাহি অন্ত।
অন্য স্থলে স্থানে স্থানে, মছজিদ সুনির্ম্মাণে,
পুষ্করণী দিল ঠাঁই ঠাঁই।
প্রতি দিন মহামতি, পিপীলা মক্ষিকা প্রতি,
সর্ব্ব রাত্রি দিলেন খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি, শিব শিবা চতুষ্পদী,
পাঠাইলা সভান আহার॥
অন্ধল আতুরি যত, পালিলেন্ত অবিরত,
দান ধর্ম্ম করিলা বিশেষ।
* * *
প্রশংসা হইল সর্ব্বদেশ॥

শুনিয়া দানের ধ্বনি, ক্রোধ হৈল নৃপমণি,
যত ধন লুটয়ে সদায়।
কেমন ধার্ম্মিক সার, এক অন্ন বারে বার,
তাহাকে বুঝিমু পরীক্ষিয়া।
প্রথম কোপে বাঘের জালে, ফেলিলা দেখিলা তালে,
ব্যাঘ্র দেখি নামাইল মাথা।
দ্বিতীয়ে বান্ধিয়ে দিলা, সাগরেতে পরীক্ষিলা,
নমাজ পড়িলা সুখে তথা॥
তৃতীয়ে বান্ধিয়া রাগে, দিলেন্ত হস্তীর আগে,
গজে দেখি ছালাম করিলা।
চতুর্থে ক্রোতের ঘরে, রাখিলা হামিদ খাঁরে,
আনন্দে রহিয়া পরীক্ষিলা॥
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে, পরীক্ষিলা নরনাথে,
খড়্গ ভাঙ্গি হৈল খান খান।
ষষ্ঠমে হানিয়া শর, পরীক্ষিলা নৃপবর,
অঙ্গে না লাগিল এক বাণ॥
সপ্তমে গরল দিলা, মহারাজ পরীক্ষিলা,
কারণেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া জন্মায় সুখ, * *
প্রসাদ করিলা * *॥
নগর ফতেয়াবাদ, † দেখিতে পূরয়ে সাধ,
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম, অমর নগরসম,
শতে শতে অনেক নিবাস॥
* * কর্ণফুলী নদীতট,
শুভপুরী অতি দিব্য মান।
চৌদিকে * * উচল বিস্তর সব,
তাহে সাহা বদর পয়ান॥
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে, উজীর হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈল চাটিগ্রাম।
আদারূপ দান ধর্ম্ম, করিলা পুণ্যের কর্ম্ম,
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম॥

---

† চট্টগ্রামের নাম কি কখনও ফতেয়াবাদ ছিল?

অনুক্রমে বংশ চ্যুত, পরকিলেক এই মত,
গৌড়ের কুদিন হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি, নানামত মহামতি,
নৃপতি নেজাম সাহা সুর।
একশত ছত্রধারী সন্তানের অধিকারী,
ধবল অরুণ গড়েশ্বর।
রজনী সময় হৈলে, মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে,
অপরূপ পুরীর অন্তর।
ওই যে হামিদ খান, আদোর উজীর তান
তাহান বংশেত উৎপতি।
মোবারক খান নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে তান মতি।

তান প্রতি মহীপাল, খিতাপ অধিক তার,
ছাপিলেন্ত দৌলত উজীর।
সাধু সৎলোক সঙ্গে, জনম বঞ্চিলা রঙ্গে,
ধর্ম্মরূপে ত্যজিলা শরীর।
তান সুত বুদ্ধ সম, নাম মোর মহরাজ
মহারাজা গৌরব অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি, দয়া ধর্ম্ম অনুমানি,
বাপের খিতাপ দিল মোরে।
আছাওদ্দিন বন্ধু, তান পদ জ্ঞান সিন্ধু,
* * *
পুস্তক পয়ার সার, যেন মুকুতার হার,
রচিলেন্ত দৌলত উজীর।

উদ্ধৃত অংশে যে যে স্থানে বাদ দিয়া গিয়াছি, তাহার অনেক স্থলেই অর্থহীন শব্দরাশি বা শব্দ দুইবার লেখা; কোথাও বা সেই সেই স্থলে কিছুই লেখা নাই।

এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ অপেক্ষাকৃত নির্ভুল মজনু বিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সমগ্র গ্রন্থের ভাষাই এরূপ কোমল, ললিত ও সরস ছিল; কিন্তু মূর্খ লিপিকরের প্রমাদে এখন তাহা একরূপ অবোধ্য, কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যস্বরূপে এ গ্রন্থ রক্ষিত হওয়ার একান্ত যোগ্য।

জগতে বোলয় তোমা সুধাকর নাম।
তোমার শীতল গুণ অতি অনুপাম।
মোর প্রতি কেন তুমি গরল সমান।
অনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ।
তোমার সমান মোর ঈশ্বরী বদন।
তোমারে দেখিতে শ্রদ্ধা ইহার কারণ।
মোর প্রতি নাহি কিন্তু তোমার পিরীত।
অমৃত গরল হৈল একি বিপরীত।
বিপদ সময়ে বৈরী হয় বন্ধুগণ।
শুভদশা হৈলে হয় অমিল মিলন।
বিরহী জনের প্রতি শশী দয়াহীন।
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ।
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে একবার বন্ধুর মরণ।

বিরহী জনের মন হৃদয় নিঃশঙ্ক।
তে কারণে রহিলেক ইন্দুর কলঙ্ক।
* * *
* * *
দুঃখের বারতা জানে রাহুর গ্রহণে।
দুঃখিত জনের প্রতি দয়া নাই কেনে।
যদি মুই লক্ষ দিয়া হস্তে লাগ পাম্।
নামাই আকাশ হতে সায়রে ডুবাম্।
নিরঞ্জন আরাধন করি যোড় হস্ত।
অবিলম্বে চন্দ্র যাউক অস্ত।
শশধর হেরিতে বাড়য়ে দুখ।
নক্ষত্র দেখিতে মোর বিদরয়ে বুক।
গণিতে তারকা মেলে পুনি হৈল শেষ।
অবহু দারুণ নিশি নহে অবশেষ।

ইহার দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটী সাহিত্যামোদীর আদর পাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল; কিন্তু লিপিকরের দোষে আমরা তদ্রসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার ভাষা বৈষ্ণবকোবিদকুল

কুহরিত দূরাগত নৈশানিলসঞ্চালিত সঙ্গীতধ্বনিবৎ সুমিষ্ট সেই ব্রজবুলি,—প্রেমপ্রবণ বঙ্গ হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। 'নিদাঘ ঋতুর' কিয়দংশ মাত্র এই দেখুন :—

চাতক পীউ পীউ নাদ শুনি,
বিরহিণী চিত্ত চমকিত,
বরিখত বারিদ জগত ভরি,
রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।
শুনহে যে ধনী বিরহিণী,
যুগল নয়ানে বহে বারি॥

সকলেই জানেন, লায়লী মজনু বিয়োগান্ত কাব্য। মজনু ও লায়লীর জন্য বড় দুঃখ হয়। বাস্তবিক বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ে বিয়োগের মর্ম্মভেদী তীব্র-যন্ত্রণা অসহ্য। তাই এই গ্রন্থের—

লায়লী লায়লী বলি হইল নৈরাশ।
মজনু ঘরেতে রৈল ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥

এই শেষ দুই ছত্র পড়িয়া আমাদের কোমল হৃদয় নৈরাশ্যে গুরুভাবে আপনিই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কবি দৌলত উজীর বহরামের পীরের নাম আছাওদ্দিন সাহা, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কবি সর্ব্বত্রই এই মহাত্মার পবিত্র চরণ ধ্যান করিয়া এইরূপে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়াছেন :—

আছাওদ্দিন সাহা কল্পতরু সম।
উজীর দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম॥

## ৩১। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই পুঁথি খানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের শেষভাগে সংযোজিত আছে। ঐরূপ একখানি উত্তরকাণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভবানীদাস নামক এক ব্যক্তি এই পুঁথিখানির প্রণেতা। ইহার হস্তলিপিটী ১১৫১ মগীতে অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। ইহা সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়প্রণেতা ভবানীদাসের রচিত। ইহার শেষ কয় পাতা পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ—নমো রামচন্দ্রায়।

সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি।
তথাপি শ্রীরাম গুণ কহিতে না পারি॥
বুদ্ধি অনুরূপে আমি করিব রচন।
উত্তরার শেষে শ্রীরামের স্বর্গ আরোহণ॥
সীতা পাতালে গেল লোক চমৎকার।
অযোধ্যার লোক সবে করে হাহাকার॥
রাজ্য করে প্রভু রাম মনেত অসুখ।
পাত্র মিত্র সকলের মনে ভারি দুঃখ॥

ভণিতা—

সর্ব্বজনে বোলে শুন রামের চরিত।
উত্তরার শেষে ভবানী দাসের রচিত॥

ইহাকে লক্ষ্মণদিগ্বিজয়প্রণেতা ভবানীদাসের রচিত বলিয়া অনুমান করার কারণ এই যে ইহা ও লক্ষ্মণদিগ্বিজয় একই হাতের লেখা ও একই পুঁথির অন্তর্নিবিষ্ট। লক্ষ্মণদিগ্বিজয়ের শেষে যে উত্তর কাণ্ডটা যোজিত আছে, তাহার পরেই এই স্বর্গারোহণ খানিও রহিয়াছে।

## ৩২। শনিপূজার পুঁথি।

আরম্ভ—

সরস্বতী পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূমিগত হৈয়া বন্দি শ্রীগুরুচরণ॥
বৃষভ বাহনে বন্দি উমা মহেশ্বর।
গরুড় বাহনে বন্দি গোলোক ঈশ্বর॥
হংসবাহনে বন্দি দেব পদ্মাসন।
মূষিক বাহনে বন্দি দেব গজানন॥
*　　　*　　　*
*　　　*　　　*
শনৈশ্চর মাহাত্ম্য স্কন্দ পুরাণের মত।
পয়ার প্রবন্ধে আমি রচিব তাবত॥

ভণিতা—

ধন লোভে লোভী হৈয়া,　　দ্বিজবর মুক্ত হৈয়া
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
যদুনাথ কহে রাজা,　　শনৈশ্চর কর পূজা,
পাবে রাজা তনয় তোমার॥

শেষ—

শনি প্রতি হরিষেতে করহ প্রণাম।
সঙ্কটে নিস্তার করে গ্রহস্তুধাম॥
*　　　*　　　*
*　　　*　　　*
স্কন্দ পুরাণের মত করিয়া ধারণ।
শনির পাঞ্চালী কথা হৈল বিরচন॥
দণ্ডবৎ প্রণমোহ ভূমিতলে পড়ি।
পাঞ্চালী সমাপ্ত হৈল বল হরি হরি॥

## ৩৩। জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত পাঞ্চালী।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণী দেবী ত্রিনয়নী।
যার পদ ধ্যান করে যত মহামুনি॥
এক দিন ব্যাস আইল হস্তিনা রাজ্যএ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজে জনমেজয়॥
যোড় হস্ত করিয়া বলেন ব্যাসমুনি।
জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত কহ শুনি।
মুনি বলে জনমেজয় শুনহ কাহিনী।
যে কারণে ব্রতী সবে পূজেন ভবানী॥
শিরেতে বন্দম্ মাতা উমা মহেশ্বরী।
যাহার নামেতে যায় ভবসিন্ধু তরি॥
*　　　*　　　*
*　　　*　　　*
এক দিন মহাদেবে সঙ্গে নিয়া গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প তোলে বলাবলি করি॥

শেষ—

যেই বর চায় রম্ভা সেই বর পায়।
ধনে জনে পুত্র বর দিলা মহামায়॥
প্রকাশ হইল ইহা মুনির মুখ হোতে।
জনমেজয় প্রকাশিলা তাহার রাজ্যেতে॥
এই সকল প্রচার যে হইল নগরে॥
জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত সকলেই করে॥

এই পাঁচালীতে লেখকের নাম প্রকাশ পায় নাই। এবং হস্তলিপিরও কোন তারিখ নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীআবদুল করিম।

—)০(—

# বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই, অথচ সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রথমে তাহার একটি তালিকা দিতেছি; পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তালিকাটি যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি না; ইহা পূরণ করিয়া দিবার জন্য পাঠকগণের সহায়তা প্রার্থনা করি।

আই ঢাই, আঁকু বাঁকু, আনচান, আমতা আমতা ॥

ইলিবিলি ॥

উসখুস ॥

কচ, কচাৎ, কচকচ, কচাকচ, কচর কচর, কচমচ, কচর মচর, কট, কটাৎ, কটাস, কটকট, কটাকট, কট মট, কটর মটর, কড়কড়, কড়াৎ, কড়মড়, কড়র মড়র, কনকন, কপ, কপাৎ, কপকপ, কপাকপ, করকর, কলকল, কসকস, কিচকিচ, কির্চমিচ, কিচির মিচির, কিটকিট, কিড়মিড়, কিরকির, কিলকিল, কিলবিল, কুচ, কুচকুচ, কুট, কুটকুট, কুটুর কুটুর, কুটুস, কুপ, কুপকুপ, কুপকাপ, কুলকুল, কুরকুর, কুঁইকুঁই, কেঁইমেই, কেঁউমেউ, ক্যাঁ, ক্যাঁক্যাঁ, কোঁকোঁ, কোঁৎকোঁৎ, ক্যাঁচ, ক্যাঁচক্যাঁচ, ক্যাঁচরক্যাঁচর, ক্যাঁটক্যাঁট। কচকচে, কটমটে, কড়কড়ে, করকনে, করকরে, কিটকিটে (তেল কিটকিটে), কিরকিরে, কিলবিলে, কুচকুচে, কুটকুটে, ক্যাঁটকেঁটে।

খঁক, খকখক, খচখচ, খচাখচ, খচমচ, খট, খটখট, খটাখট, খটাস, খটাৎ, খটরখটর, খটমট, খটরমটর, খড়খড়, খড়মড়, খন, খনখন, খপ, খপাৎ, খপাস, খরখর, খলখল, খসখস, খাঁখাঁ, খিক, খিকখিক, খিটখিট, খিটমিট, খিটিমিটি, খিলখিল, খিসখিস, খুক, খুকখুক, খুটখুট, খুটুরখুটুর, খুটুসখুটুস, খুটখাট, খুৎখুৎ, খুঁৎমুৎ, খুরখুর, খুসখুস, খেঁইখেঁই, খ্যাঁক, খ্যাঁকখ্যাঁক, খ্যাঁচখ্যাঁচ, খ্যাঁচাখেঁচি, খ্যাঁৎখ্যাঁৎ, খ্যানখ্যান। খটখটে, খড়খড়ে, খরখরে, খসখসে, খিটখিটে, খিটমিটে, খুঁৎখুঁতে, খুঁৎমুতে, খুসখুসে (কাশি), খ্যানখেনে ॥

গজগজ, গজরগজর, গট, গটগট, গড়গড়, গদগদ, গনগন, গপগপ, গবগব, গবাগব, গমগম, গরগর, গলগল, গসগস, গাঁগাঁ, গাঁইগুঁই, গাঁকগাঁক, গিজগিজ, গিসগিস, গুটগুট, গুড়গুড়, গুনগুন, গুপগুপ, গুবগাব, গুম, গুমগুম, গুরগুর, গেঁইগেঁই, গোঁগোঁ, গোঁৎগোঁৎ। গনগনে (আগুন), গমগমে, গুড়গুড়ে ॥

ঘটঘট, ঘটর ঘটর, ঘড়ঘড়, ঘসঘস, ঘিনঘিন, ঘিসঘিস, ঘুটঘুট, ঘুটমুট, ঘুরঘুর, ঘুসঘুস, ঘেউঘেউ, ঘোঁৎঘোঁৎ, ঘেঁচ, ঘেঁচঘেঁচ, ঘ্যাঁচরঘ্যাঁচর, ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানরঘ্যানর। ঘুরঘুরে, ঘুসঘুসে (জ্বর), ঘ্যানঘেনে ॥

চকচক, চকরচকর (পশুর জলপান শব্দ), চকমক, চট, চটাস, চটচট, চটাচট, চটপট,

চটাপট, চচ্চড়, চড়াৎ, চড়াস, চড়াচ্চড়, চন, চনচন, চপচপ, চপাচপ, চিঁচিঁ, চিকচিক, চিকমিক, চিটচিট, চিচ্চিড়, চিড়িক, চিড়িকচিড়িক, চিড়বিড়, চিন, চিনচিন, চুকচুক, চুকুরচুকুর, চুচ্চুর, চেঁইচেঁই, চেঁইমেই, চোঁ, চোঁচোঁ, চোঁভোঁ, চোঁচা, চ্যাঁচ্যাঁ, চ্যাঁভ্যাঁ, । চকচকে, চটচটে, চটপটে, চনচনে, চিকচিকে, চিটচিটে, চিনচিনে, চুকচুকে, চুচ্চুরে ॥

ছটফট, ছপছপ, ছপাছপ, ছপাৎ, ছপাস, ছমছম, ছলছল, ছোঁ, ছোঁছোঁ, ছ্যাঁক, ছ্যাঁকছ্যাঁক। ছটফটে, ছলছলে, ছলোছলো, ছ্যাঁকছেঁকে, ছিপছিপে ॥

জরজর, জ্যাবজ্যাব, জ্যালজ্যাল। জবজবে, জিরজিরে, জ্যালজেলে, জিলজিলে ॥

ঝকঝক, ঝকমক, ঝটপট, ঝড়াৎ, ঝন, ঝনঝন, ঝপ, ঝপঝপ, ঝপাঝপ, ঝমঝম, ঝমাৎ, ঝমাস, ঝমরঝমর, ঝমাজ্ঝম, ঝরঝর, ঝাঁ, ঝাঁঝাঁ, ঝিকঝিক, ঝিকমিক, ঝিকিমিকি, ঝিনঝিন, ঝিকমিক, ঝিরঝির, ঝুনঝুন, ঝুপঝুপ, ঝুমঝুম। ঝকঝকে, ঝরঝরে, ঝিকঝিকে ॥

টক, টকটক, টকাটক, টংটং, টন, টনটন, টপ, টপটপ, টপাটপ, টলটল, টলমল, টসটস, টিকটিক, টিকিস টিকিস, টিংটিং, টিপটিপ, টিমটিম, টুকটুক, টুকুসটুকুস, টুংটুং, টুংটাং টুনটুন, টুপ, টুপটুপ, টুপুস টুপুস, টুপটাপ, টুসটুস, টোটো, ট্যাঁট্যাঁ, ট্যাঁসট্যাঁস, ট্যাঁঙসট্যাঁঙস। টকটকে, টনটনে, টলটলে, টসটসে, টিংটিঙে, টিপটিপে, টিমটিমে, টুকটুকে, টুপটুপে, টুসটুসে, ট্যাসটুসে, ট্যাসটেসে ॥

ঠক, ঠকঠক, ঠকরঠকর, ঠংঠং, ঠনঠন, ঠুক, ঠুকঠুক, ঠুকুরঠুকুর, ঠকাঠক, ঠকাৎ, ঠকাস, ঠুকুসঠুকুস, ঠুকঠাক, ঠুংঠুং, ঠুনঠুন, ঠ্যাংঠ্যাং, ঠ্যাসঠ্যাস। ঠনঠনে, ঠ্যাংঠেঙে ॥

ডগডগে ( লাল ), ডিগডিগে ॥

ঢক, ঢকঢক, ঢকাঢক, ঢকাস, ঢকাৎ, ঢবঢব, ঢলঢল, ঢুকঢুক, ঢুলঢুল, ঢ্যাবঢ্যাব। ঢকঢকে, ঢলঢলে, ঢুলঢুলে, ঢুলুঢুলু, ঢ্যাবঢেবে ॥

তকতক, তড়তড়, তড়াতড়, তড়াক, তড়াক তড়াক, তরতর, তলতল, তুলতুল, তিড়িং, তিড়িং তিড়িং, তড়াং, তড়াং তড়াং। তকতকে, তলতলে, তুলতুলে, তিড়িংগে ( মেজাজ ) ॥

থকথক, থপ, থপাৎ, থপাস, থপথপ, থমথম, থরথর, থলথল, থসথস, থৈথৈ। থকথকে, থপথপে, থমথমে, থলথলে, থসথসে, থুড়থুড়ে, থ্যাসথেসে ॥

দগদগ, দপদপ, দবদব, দমদম, দমাদ্দম, দরদর, দড়াদ্দড়, দড়াম, দাউদাউ, দুদ্দুড়, দুদ্দাড়, দুপদুপ, দুপদাপ, দুমদুম, দুমদাম। দগদগে ( রক্তবর্ণ বা অগ্নি ) ॥

ধক্, ধকধক, ধড়ধড়, ধড়াস, ধড়াসধড়াস, ধড়াদ্ধড়, ধড়ফড়, ধড়মড়, ধপ, ধপধপ, ধপাধপ, ধমাস, ধবধব, ধম, ধমধম, ধমাদ্ধম, ধস, ধসধস, ধাঁ, ধাঁধাঁ, ধিকি, ধিকিধিকি, ধিনধিন, ধুকধুক, ধুম, ধুমধুম, ধুমধাম, ধুমাধুম, ধুপধাপ, ধুধু, ধেইধেই। ধড়ফড়ে, ধপধপে, ধবধবে, ধসধসে ॥

নড়নড়, নড়বড়, নড়রবড়র, নিশপিশ, নিড়বিড়। নড়নড়ে, নড়বড়ে, নিশপিশে, নিড়বিড়ে ॥

পট, পটপট, পটাপট, পটাৎ, পটাস, পটাসপটাস, পচপচ, পড়পড় ( ছেঁড়া ), পড়াস,

পড়াৎ, পড়াৎ, পড়াংপড়াং, পড়িংপড়িং, পিটপিট, পিলপিল, পিপি, পুট, পুটপুট, পোপো, প্যাকপ্যাক, প্যাচপ্যাচ, প্যানপ্যান, প্যাটপ্যাট, পটাং, পটাংপটাং। পিটপিটে, পুসপুসে, প্যাচপেঁচে, প্যানপেনে॥

ফটফট, ফটাফট, ফড়ফড়, ফড়রফড়র, ফটাৎ, ফটাস, ফড়াৎ, ফড়াস, ফনফন, ফরফর, ফস, ফসফস, ফসাফস, ফিক, ফিকফিক, ফিটফাট, ফিনফিন, ফুটফুট, ফুটকাট, ফুরফুর, ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎফুড়ুৎ, ফুস, ফুসফুস, ফুসফাস, ফোঁফোঁ, ফোঁফোঁ, ফোঁৎফোঁৎ, ফোঁচফোঁচ, ফোঁস, ফোঁসফোঁস, ফ্যাফ্যা, ফ্যাকফ্যাক, ফ্যাঁচ, ফ্যাঁচফ্যাঁচ, ফ্যাঁচরফ্যাঁচর, ফ্যাটফ্যাট, ফ্যালফ্যাল। ফুরফুরে, ফিনফিনে, ফুটফুটে, ফ্যাটফেটে, ফ্যালফেলে॥

বকবক, বকরবকর, বজরবজর, বনবন, বড়বড়, বড়রবড়র, বিজবিজ, বিজিরবিজির, বিড়বিড়, বিড়ির বিড়ির, বুগবুগ, বোঁ, বোঁবোঁ, ব্যাজব্যাজ॥

ভকভক, ভড়ভড়, ভনভন, ভুকভুক, ভুটভাট, ভুরভুর, ভুড়ুকভুড়ুক, ভোঁ, ভোঁভোঁ, ভ্যাঁ, ভ্যাঁভ্যাঁ, ভ্যানভ্যান। ভ্যানভেনে॥

মচ, মচমচ, মট, মটমট, মড়মড়, মড়াৎ, মসমস, মিটমিট, মিটিমিটি, মিনমিন, মুচ, মুচমুচে, ম্যাড়ম্যাড়, ম্যাজম্যাজ। মড়মড়ে, মিটমিটে, মিনমিনে, মিসমিসে, মুচমুচে, ম্যাড়মেড়ে, ম্যাজমেজে॥

রীরী, রিমঝিম, রিনিঝিনি, রুমুঝুমু, রৈরৈ। রগরগে॥

লকলক, লটপট, লিকলিক। লকলকে, লিকলিকে, লিংলিঙে॥

সট, সটসট, সনসন, সড়সড়, সপসপ, সপাসপ, সরসর, সিরসির, সাঁ, সাঁসাঁ, সাঁইসাঁই, সুট, সুটসুট, সুড়সুড়, সুড়ুৎ, সোঁসোঁ, স্যাৎসাঁৎ। স্যাঁৎসেঁতে॥

হট, হটহট, হটরহটর, হড়হড়, হড়াৎ, হড়বড়, হড়রহড়র, হনহন, হলহল, হড়রবড়র, হাউমাউ, হাহা, হাউহাউ, হাউমাউ, হাঁহাঁ, হাসফাস, হিঁহিঁ, হিড়হিড়, হুহু, হুটহাট, হুড়হুড়, হুড়মুড়, হুড়ুৎ, হুপহাপ, হুস, হুসহুস, হুসহাস, হোহো, হোহা, হ্যাঁহ্যাঁ ( কুকুর ), হ্যাটহ্যাট, হ্যাতহ্যাত, হাপুস, হুপুস, হাপুড়হুপুড়, হুড়োমুড়ি॥

---

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরাজী ভাষাতেও আছে যথা bang, thud, ding-dong, hiss ইত্যাদি—কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সহিত তুলনায় তাহা যৎসামান্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে তাহা প্রমাণ হইবে।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার একটী অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যে সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।

এরূপ ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাবাবিপর্য্যয়ের উদাহরণ কেবল বাঙ্গালায় নহে, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। "মিষ্ট" বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে, মিষ্ট মুখ,

মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্র জাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরাজীতে loud শব্দ ধ্বনির বিশেষণ হইলেও বর্ণের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে যথা loud colour। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বিশেষণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে, এই শব্দগুলির আদিম ব্যবহার যতই সঙ্কীর্ণ থাক, ক্রমেই তাহার অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। "মিষ্ট" শব্দ মুখ্যতঃ স্বাদকে বুঝাইলে এক্ষণে তাহার গৌণ অর্থ মনোহর দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত। সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে, অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাঙ্গালা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের, অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, বাঙ্গলাভাষায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশ স্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

গতির দ্রুততা প্রধানতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়—কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া, অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। "তীরবেগে চলিয়া গেল" বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে;—'সাঁ' শব্দে অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিতভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।

ইহার আর এক সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে এত বর্ণনাবৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। 'সাঁ করিয়া গেল' এবং 'গটগট করিয়া গেল,' উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে, অথচ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

এক কাটা সম্বন্ধে কত বিচিত্র বর্ণনা আছে। কচ করিয়া, কচাৎ করিয়া, কচকচ করিয়া কাটা, কচাকচ কাটিয়া যাওয়া, কুচ করিয়া, কট করিয়া, কটাৎ করিয়া, কটাস করিয়া, ঘ্যাচ করিয়া, ঘ্যাচ ঘ্যাচ করিয়া, ঝড়াৎ করিয়া,—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে কাটা সম্বন্ধে যত প্রকার বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভেদ ভাষান্তরে বিদেশীর নিকট ব্যক্ত করা অসম্ভব।

ইংরাজিতে গমন ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে; creep, crawl, sweep, totter, waddle ইত্যাদি। বাঙ্গালায় আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না—ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধান-তিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। খাঁটি

করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট করিয়া, খুরখুর করিয়া, খুটুসখুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধড়ফড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া, চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে?

চলা, কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য্য নহে—কারণ গতি হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ছবি ধ্বনির সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাও বাঙ্গালা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয়। যেমন পাতলা জিনিষকে 'ফিন ফিন', 'ফুরফুর', ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা। পাতলা ফিনফিন করচে, বলিলে এ কথা কেহ বোঝে না যে, পাতলা বস্তু বাস্তবিক কোন শব্দ করিতেছে, অথচ তদ্দারা তনু পদার্থের তনুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছিপছিপে কথাটাও ঐরূপ—সরু বেতই বাতাসে আহত হইয়া ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এই জন্য ছিপছিপে লোক বস্তুতঃ কোন শব্দ না করিলেও ছিপছিপে শব্দ দ্বারা তাহার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আসে। লকলকে, লিকলিকে, লিংলিঙে শব্দও এই শ্রেণীর।

কিন্তু ধ্বনির সহিত যে সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাঙ্গালায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত;—কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীতে শরীরে যে বেদনা বোধ হয়, আমাদের কল্পনার কোন অদ্ভুত বিশেষত্ববশতঃ আমরা তাহাকে কনকন ধ্বনির সহিত তুলনা করি—অর্থাৎ আমরা মনে করি, সেই বেদনা যদি শ্রুতিগম্য হইত, তবে তাহা কনকন শব্দরূপে প্রকাশ পাইত।

আমরা শরীরের প্রায় সর্ব্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি—যথা কটকট, কনকন, করকর (চোখের বালি), কুটকুট, গা-ঘ্যান ঘ্যান, গা-চচ্চড়, চিনচিন, গা-ছমছম, ঝিনঝিন, দবদব, ধকধক, বুক-দুদ্দুড়, ম্যাজ ম্যাজ, সুড়সুড়, সড়সড়, রীরী। ইংরাজিতে এইরূপ শারীরিক বেদনা সকলকে, throbbing gnawing, boring, crawling, cutting, bearing, bursting প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। আমরাও ছিঁড়ে পড়া, ফেটে যাওয়া, কামড়ান প্রভৃতি বিশেষণ আবশ্যকমত ব্যবহার করি, কিন্তু উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে যাহা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা আর কিছুতে হইবার যো নাই। ঐ সকল ধ্বনির সহিত ঐ সকল বেদনার সম্বন্ধ যে কাল্পনিক, এক্ষণে আমাদের পক্ষে তাহা মনে করাই কঠিন। বাস্তবিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিরূপ বিসদৃশ উপমা আমাদের মনে উদিত হয়, "গা মাটি মাটি করা" বাক্যটি তাহার উদাহরণস্থল। মাটির সহিত শারীরিক অবস্থাবিশেষের যে কি তুলনা হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না, অথচ "গা মাটিমাটি করা" কথাটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক।

সর্ব্বপ্রকার শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন কি, নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ

ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়ো বাড়ী হাঁ হাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, কোথাও কেহ না থাকিলে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে—এই সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ জানি না, আমাদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ;—ইংরাজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ, অন্ততঃ আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট নহে।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও আশ্চর্য্য। টকটকে, টুকটুকে, ডগডগে, দগদগে, রগরগে লাল; ফুটফুটে, ফ্যাটফেটে, ফ্যাকফেকে, ধবধবে শাদা; মিসমিসে, কুচকুচে কালো।

টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে লাল অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাত ক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়। কবির কর্ণে যেমন "silent spheres" অর্থাৎ নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের একটি সঙ্গীত উহ্যভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে, এও সেইরূপ। ঘোর লাল আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে যে আঘাত করে, তাহার যদি কোন শব্দ থাকিত, তবে তাহা আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত করে, তখন তাহার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

কিন্তু ধবধব শব্দ সম্ভবতঃ গোড়ায় ধবল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংসর্গ বশতঃ নিজের অর্থ সম্পত্তি হারাইয়া ধ্বনিরদলে ভিড়িয়া গিয়াছে। জ্বলজ্বল শব্দ তাহার অন্যতর উদাহরণ;—জ্বলন শব্দ তাহার পিতৃপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সে কুলত্যাগী—সেই কারণে আমরা কোন জিনিষকে "জ্বলজ্বল হইতেছে" বলি না—'জ্বলজ্বল করিতেছে' বলি—এই "করিতেছে" ক্রিয়ার পূর্ব্বে "ধ্বনি" শব্দ উহ্য। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। নদী কুল কুল করে, জুতা মচমচ করে, মাছি ভনভন করে, এরূপ স্থলে "শব্দ" করে বলা বাহুল্য;—শাদা ধব ধব করে বলিলেও বুঝায়, শ্বেত পদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে এক প্রকার অশাব্দিত শব্দ করে। কোন বর্ণ যখন তাহার উজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করে, তখন বলি ম্যাড়ম্যাড় করিতেছে। কেন বলি তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে, কিন্তু যেখানে ম্যাড়মেড়ে বলা আবশ্যক, সেখানে 'মলিন, ম্লান' প্রভৃতি আর কিছু বলিয়া কুলায় না।

"চিকচিক" গোড়ায় চিক্কণ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে প্রসঙ্গ এস্থলে আমি অনাবশ্যক বোধ করি। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এক্ষণে বিশুদ্ধ ধ্বনি মাত্র। চিকচিকে পদার্থের চঞ্চল জ্যোতি আমাদের চক্ষে একপ্রকার অশব্দ ধ্বনি করিতে থাকে তাহাকে আমরা চিক্‌চিক্ বলি—আবার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয়, তবে তাহা নীরবে চুক্‌চুক্ শব্দ করে, আমরা বলি তেল-চুকচুকে। চিক্কণ পদার্থ যদি চঞ্চল হয়, যদি গতিবশতঃ তাহার জ্যোতি একবার একদিক হইতে একবার অন্যদিক হইতে আঘাত করে, তখন সেই জ্যোতি চিকচিক্ ঝিক্‌ঝিক্ বা ঝলঝল না করিয়া চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ ঝলমল করিতে থাকে অর্থাৎ তখন সে একটা শব্দ না করিয়া দুইটা শব্দ করে। কটমট করিয়া চাহিলে সেই দৃষ্টি যেন একদিক হইতে কট এবং আর একদিক হইতে মট করিয়া আসিয়া মারিতে থাকে, এবং ধ্বনির বৈচিত্র্য দ্বারা কাঠিন্যের ঐক্য যেন আরো পরিস্ফুট হয়।

অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে ;—ধপ্ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস্ করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিষ কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিষ কচাৎ করিয়া কাটে।

আলোচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। দেখা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সীমা কোথায় অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষ জাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য ইহারা নিযুক্ত। প্রথমতঃ ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়—অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে স্থিতি-বাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ঐ দলে ধরা যাইতে পারে। যথা, মাঠ ধূধূ করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধূধূ এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্ম্মী। চক্‌চকে জিনিষ স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তক্‌তক্ করে, তাহার আভাও স্থির নহে। বর্ণ জল-জলে হউক বা ম্যাড়মেড়ে হউক্, তাহার আভা আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় স্থিরত্ব বর্ণনার উপাদান কি, তাহা আলোচনা করিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

গট্ হইয়া বসা, গুম্ হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, বুঁদ্ হইয়া যাওয়া। গট্, গুম্ এবং ভোঁ ধ্বন্যাত্মক বটে, কিন্তু আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যেও গুম্‌ভাবে একটি আবদ্ধ আবেগ আছে ;—যেন গতি স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভোঁ ভাবের মধ্যেও একটি আবে-গের বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। ইহারা একান্ত স্থিতিবোধক নহে, স্থিতির মধ্যে গতির আভাস-বোধক। যাহাই হউক এরূপ উদাহরণ আরো যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যল্প।

স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব, বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই। অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্য্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্ব্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সঙ্কেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সঙ্কেত।

গদ্য ও পদ্যের প্রভেদও এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয় ; কিন্তু অনুভাব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই ; সেই ধ্বনি অনির্ব্বচনীয়কে সঙ্কেতে প্রকাশ করে।

আমাদের বর্ণনায় যে অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্ব্বচনীয়তর, সেইগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যাহা চঞ্চল, যাহার বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হইবার নহে, তাহাদের জন্য এই ধ্বনিগুলি সঙ্কেতের কাজ করিতেছে।

আমার তালিকা অকারাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশতঃ সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন, কর্ত্তন, পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা; তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত। কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কিনা। ঐক্য থাকারই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত অথবা টকারান্ত;—কচ এবং কট—তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন কচ এবং গুরু অস্ত্রে কট। এই পর্য্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত;—ক্যাঁচ, খ্যাঁচ, গ্যাঁচ, ঘ্যাঁচ।

পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া এইরূপ পর্য্যায়বিভাগে সহায়তা করিলে বাধিত হইব।

জ্যাবড়া, ধ্যাবড়া, খ্যাবড়া, হিজিবিজি, হাবজা গোবজা, হোমরা চোমরা, হেজিপেজি, ঝাপসা, ভাবসা, ঝুপসি, চ্যাপ্‌সা, হোঁৎকা, গোমসা, ধুমসো, ঘুপসি, মটকা মারা, মিটকি মারা, গুঁড়ি মারা, উঁকি মারা, টেবো, ট্যাবলা, ভেবড়ে যাওয়া, মুষড়ে যাওয়া প্রভৃতি বর্ণনামূলক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসঙ্কলনে পাঠকদিগকে একান্ত অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---
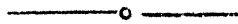
# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

## অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

গত ১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারি ১৯০০) রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় পরিষদের কার্য্যালয়ে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হয়। ঐ দিবস সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি) | শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী |
| „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর | „ „ প্রকাশচন্দ্র দত্ত |
| „ কুমার জিতেন্দ্রকৃষ্ণ দেব | „ „ কৃষ্ণলাল দাস |
| „ বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, | „ „ জগদ্বন্ধু মোদক |
| „ „ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ | „ „ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |
| „ „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ | „ „ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, |
| „ „ সতীশচন্দ্র মিত্র | „ „ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি, এ, |
| „ „ রমেশচন্দ্র বসু | „ „ প্রমথনাথ মিত্র |
| „ „ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম, এ, বি, এল, | „ „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, |
| „ „ নগেন্দ্রনাথ বসু | „ „ কিরণচন্দ্র দত্ত |
| „ „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, | „ „ কানাইলাল ঘোষাল |
| „ „ অনুকূলচন্দ্র শেঠ | „ „ চারুচন্দ্র ঘোষ |
| „ „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি | „ „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, |
| „ „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ | „ „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ, } সহকারী |
| „ „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু | „ „ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সম্পাদকদ্বয় |

অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধ পাঠ।

(ক) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কৃত "সেকালে কলিকাতার ইংরাজ সমাজ" নামক প্রবন্ধ।

(খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কৃত "বঙ্গীয় রঙ্গভূমির ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ।

৪। বিবিধ।

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে

(২) নিম্নলিখিত সভ্যের নির্ব্বাচন হয়—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত | শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট। |

(৪) বিবিধ বিষয়ের মধ্যে

সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে স্থির হইল, তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অংশ পরিষৎ কার্য্যালয়েই প্রদত্ত হইবে। তদুপরে পরিষৎ—

(১) Annual Report of the Calcutta Government Sanskrit College. (২) A Brief Summary of the Proceedings of the Public Meetings to protest against the Calcutta Municipal Bill (৩) Potato Culture (৪) A Treaties on Mango (৫) The Proposed Changes in the Municipal Laws of Calcutta, Parts 3 & 4, এই সকল পুস্তিকার জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে ;—

(৬) হিতে বিপরীত ও (৭) অভিজ্ঞান শকুন্তল, এই পুস্তকদ্বয়ের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে ; এবং (৮) কাব্যগ্রন্থাবলীর জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে,—

(৩) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে তৎকালীন অনেক কথা জানা গিয়াছে। এইরূপ প্রবন্ধই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তৎকালীন Monitorial Gazette নামক একখানি পত্রের উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মিষ্টার লঙ্ প্রণীত Peeps into the Social Life of Calcutta পুস্তকাবলম্বন করিয়া অনেকগুলি জানিবার কথা বলেন,— তখন পাঁচ জনমাত্র বাঙ্গালী ইংরাজী বুঝিতেন। ইংরাজদের বাঙ্গালা বুঝিবার বড় অসুবিধা ছিল। জাহাজে এইরূপে যোগাযোগও হইত। তখন কলিকাতার চারিদিকে জঙ্গল, সহরে অস্বাস্থ্য ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কেল্লায় সাধারণ পাঠাগার খোলা হয়। তাহাতে প্রতিবৎসর এক এক জাহাজ পুস্তক আসিত। তখন ছাপার ব্যয় অত্যন্ত অধিক ছিল; ১৯২ পৃষ্ঠা পুস্তক ২৪ টাকা দরে বিকাইত। Freemason সম্প্রদায় ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে এখানে আড্ডা গাড়েন। ইংরাজদের আয় ও ব্যয় অধিক ছিল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি প্রীতিকর। ভাষা মার্জ্জিত ও হৃদয়গ্রাহী। প্রবন্ধ হইতে অনেক কথা জানা গিয়াছে। লেখক যেন আমাদের সম্মুখে কতকগুলি পরিস্ফুট চিত্র স্থাপিত করিয়াছেন। এদেশে ইংরাজ সমাজে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে তাহা বুঝা যায়। বঙ্গীয় সমাজে ইতিমধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যদি সে সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে পঠিত হয়, তবে আমাদের প্রীতি ও শিক্ষা উভয়ই হয়। প্রবন্ধকার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র সন্দেহ নাই।

ইহার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ-ঠাকুর,
সভাপতি।
২৮শে ফাল্গুন।

## বিশেষ অধিবেশন।

গত ৩রা ফাল্গুন (ইংরাজি ১২ই ফেব্রুয়ারি) অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়—"পরিষদের অধিবেশন ও কার্য্যালয় কোন সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রমুখ সভ্য মহাশয়দিগের প্রস্তাব ও নিয়মাবলীর তজ্জন্য আবশ্যক পরিবর্ত্তন"—বিষয় আলোচনার জন্য পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়।

সভায় যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম পাওয়া গিয়াছে—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল,
" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
" রমানাথ ঘোষ
কুমার শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
" " শরৎকুমার রায় এম, এ,
" " জিতেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" হেমচন্দ্র বসু মল্লিক
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ,
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ,
" কিরণচন্দ্র দত্ত
ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল
" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র ঘোষ
" অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম, এ,
শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু
" প্রমথনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর এম, বি,
" কৃষ্ণলাল রায়
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" প্রফুল্লচন্দ্র বসু
কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্ন
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" রমেশচন্দ্র বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" অম্বিকাচরণ গুপ্ত
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
" শশিভূষণ দে
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ,
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ
" জগদ্বন্ধু মোদক
" কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
" রজনীকান্ত গুপ্ত
" মতিলাল ঘোষ
" বীরেশ্বর পাঁড়ে
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,
" মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ,
" সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল,
" মন্মথমোহন বসু এম, এ,
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,
" যোগেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মল্লিক
„ প্রকাশচন্দ্র দত্ত
কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সোম এম এ বি এল
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম, এ, বি, এল,
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
কুমার শ্রীযুক্ত কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
„ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ,
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
শ্রীযুক্ত রামদয়াল দে
„ অক্ষয়কুমার বড়াল
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল,
ডাক্তার রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
„ সখারাম গণেশ দেউস্কর
„ সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল,
যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল
সি, আর, দাস ( ব্যারিষ্টার )
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌এ, বি এল ( সম্পাদক )
ব্যোমকেশ মুস্তফী } ( সহকারী সম্পাদক )
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ }

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে তিনি কার্য্যগতিকে অনেক সময় মফস্বলে থাকেন, তখন তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সহকারী সম্পাদকদ্বয় পরিষদের সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। এবার তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যতর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ এই সভার আহ্বান করিয়াছেন; এই সভা সম্বন্ধে হেমেন্দ্র বাবুই যাহা বক্তব্য বলিবেন।

হেমেন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত অনুরোধ পত্র পাঠ করেন—

কলিকাতা।

২৩ মাঘ ১৩০৮।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

পরিষদের অধিবেশন ও কার্য্যালয় যাহাতে কোন সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং তৎসম্পর্কে নিয়মাবলীর আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিবার জন্য, আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র পরিষদের একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেন, আমাদের এই বিনীত অনুরোধ জানিবেন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

পাঠান্তে হেমেন্দ্র বাবু বলেন, যাঁহাদিগকে লইয়া পরিষদের গৌরব, অনুরোধ পত্রে তাঁহাদেরই অনেকের নাম দেখিয়া ও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তিনি পরিষদের নিয়মানুসারে এই সভার আহ্বান করিয়াছেন।

সহকারী সম্পাদকের এরূপ সভা আহ্বানে অধিকার নাই, এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রস্তাব করেন "অদ্যকার সভার কার্য্য স্থগিত হউক এবং অন্য দিবসে সভাধিবেশন হউক।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও বলেন,—পরিষদের নিয়মানুসারে এই সভাধিবেশন রবিবারে হওয়াই উচিত ছিল।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন "পরিষৎ যাঁহার গৃহে ছিল, তিনি এখন এখানে অনুপস্থিত; তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষৎ স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব-বিচার ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

এই সময় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ বলেন, বৃথা কথায় সময়ক্ষেপ না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় অনেক সভ্য সমাগম দেখিয়া বলেন, কোন ষড়যন্ত্রে চালিত হইয়া, কোন অসাধারণ উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই অধিবেশনে এত সভ্যের সমাগম হইয়াছে। হঠাৎ এরূপ করা অবৈধ।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—সহকারী সম্পাদকের প্রতি কার্য্যভার প্রদানের ক্ষমতা সম্পাদকের নাই। তাহা গর্হিত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পূর্ব্ববক্তাদিগের যুক্তি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, তাঁহারা যে সকল নিয়মের কথা বলিয়াছেন, সে সকল নিয়ম বর্ত্তমান অধিবেশন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ইতিপূর্ব্বেও রবিবারেতর বারে সভাধিবেশন হইয়াছে। রবিবারেতর বারে সভাধিবেশন হওয়ায় যে কাহারও অসুবিধা হয় নাই, তাহার প্রমাণ, এই অধিবেশনে যেরূপ সভ্যসমাগম হইয়াছে, সেরূপ পূর্ব্বে আর কখনই হয় নাই।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বলেন যে, এখন তিনি বুঝিয়াছেন, পরিষদ্ এখন যে গৃহে আছে সে গৃহের অধিকারীর অনুপস্থিতিতেই এ অধিবেশন হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "গর্হিত" কথার প্রত্যাহার করেন ও "অসাধু" কথার ব্যবহার করিয়া পুনরায় তাহার প্রত্যাহার করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলিবার পরে সভাপতি মহাশয়ের আজ্ঞায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গৃহীত হয়। দুই দল দুই দিকে বিভক্ত হইলে, দেখা গেল, ৩৯ জন বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ও ৪৯ জন সে প্রস্তাবের বিপক্ষে। নিম্নে উভয় পক্ষের নামাদি লিখিত হইল। অতঃপরে আবার সভার কার্য্যারম্ভ হইল। অতঃপর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করেন, পরিষদের কার্য্যালয় কোন সাধারণ

স্থানে স্থানান্তরিত হউক, পরিষদের অধিবেশন সেখানেই হইবে। তদ্ভিন্ন পরিষদের তৃতীয় নিয়ম হইতে "সভাবাজার ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্" ও "রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে" এই দুইটী অংশ ত্যক্ত হউক। তিনি বলিলেন, পরিষদ্ যদি আপনার শক্তিতে আপনি স্বতন্ত্র স্থানে স্থানান্তরিত হইতে পারে, তবে তাহাতে তাহার হিতার্থী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সকলের অপেক্ষা অধিক আনন্দ; আর তিনি যখন শুনিবেন যে অদ্যকার এই আলোচনায় নানা ব্যক্তিগত কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইবে[ন]। তবে আশা করা যায়, বঙ্গসাহিত্যের মুখ চাহিয়া আমরা এসকল ভুলিব। পরিষদ্ সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার সময় আসিয়াছে, এই বিশ্বাসে আমি ত পূর্ব্বেও একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করেন ও ধনরক্ষক হীরেন্দ্র বাবু সেই গুলির উত্তর দেন।

ইহার পর আরও কিছু তর্ক হয়। পরে সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের বিপক্ষবাদীদিগকে হাত তুলিতে বলিলে, তাঁহারা "ইহা অরীতি" বলিয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের কার্য্যালয় সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য স্থির হয়।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করেন—"রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব সাহিত্য পরিষদকে—এ পর্য্যন্ত স্থান দিয়া পোষণ করিয়াছেন; তজ্জন্য পরিষদ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন।"

শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব করেন,—পরিষদের ভবিষ্যৎ কার্য্যালয়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের একখানি চিত্র স্থাপিত করা হইবে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করেন,—পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকদ্বয় ও ধনরক্ষক এই কয়জনকে লইয়া একটী সমিতি গঠিত হউক। সেই সমিতি রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন। শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

যাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিয়াছেন তাঁহাদের নাম;—

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ
২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ
৩। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী
৪। „ ললিতমোহন ঘোষাল
৫। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৬। „ চারুচন্দ্র ঘোষ

৭। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু
৮। „ মৃণালকান্তি ঘোষ
৯। „ রমানাথ ঘোষ
১০। „ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী
১১। „ কুমার শরৎকুমার রায়
১২। „ অক্ষয়কুমার বড়াল
১৩। „ হেমচন্দ্র বসু মল্লিক
১৪। „ কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর
১৫। „ মন্মথমোহন বসু এম, এ
১৬। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল
১৭। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল
১৮। „ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
১৯। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ
২০। „ প্রমথনাথ মিত্র
২১। „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
২২। „ সি, আর, দাস (ব্যারিষ্টার)
২৩। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
২৪। „ যোগেশচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি, এল
২৫। „ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় (চোরবাগান)
২৬। „ ললিতমোহন মল্লিক
২৭। „ রজনীকান্ত গুপ্ত
২৮। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ
২৯। „ প্রকাশচন্দ্র দত্ত
৩০। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল
৩১। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
৩২। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৩। „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৪। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
৩৫। „ কালিদাস নাথ
৩৬। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ (বসুমতী) *
৩৭। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
৩৯। „ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪০। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪১। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
৪২। „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ
৪৩। „ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
৪৪। „ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম, এ, বি, এল
৪৫। „ ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
৪৬। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ
৪৭। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
৪৮। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল
৪৯। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁহারা এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়াছেন তাঁহাদের নাম।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ
২। „ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি, এল
৩। „ রমেশচন্দ্র বসু
৪। „ শশিভূষণ দে
৫। „ সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল
৬। „ জগদ্বন্ধু মোদক
৭। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ
৮। „ ডাক্তার রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর এম, বি
৯। „ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
১০। „ সতীশচন্দ্র মিত্র
১১। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ
১২। „ কুমার ক্ষিতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব
১৩। „ কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
১৪। „ রামদয়াল দে
১৫। „ নন্দকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন
১৬। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৭। „ অতুলচন্দ্র বসু
১৮। „ সখারাম গণেশ দেউস্কর
১৯। „ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
২০। „ কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন
২১। „ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
২২। „ গোপালচন্দ্র সোম এম, এ, বি, এল
২৩। „ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৪। „ কৃষ্ণলাল দাস
২৫। „ কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়

* ইনি উভয় পক্ষে ভোট দেওয়ায় ইহার মত কোন পক্ষেই গ্রহণের যোগ্য নহে। (ক)

২৬। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ (বসুমতী)*
২৭। ,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
২৮। ,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
২৯। ,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
৩০। ,, যাঁদোয়ার পাঁড়ে
৩১। ,, অমৃতলাল বসু
৩২। ,, বেণীমাধব কাব্যতীর্থ †
৩৩। শ্রীযুক্ত ভূপতি তর্কভূষণ †
৩৪। ,, কার্ত্তিকেয় কাব্যভূষণ †
৩৫। ,, কবিরাজ নবেন্দুশিখর সেন
৩৬। ,, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী †
৩৭। ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত
৩৮। ,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
৩৯। ,, রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।
২৮শে ফাল্গুন।

## নবম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৮ ফাল্গুন ( ১১ই মার্চ্চ ১৯০০ ) রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নূতন কার্য্যালয় ১৩৭/১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ইহার নবম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( সভাপতি )
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল
,, ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম, এ, বি, এল,
কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ,
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ
,, মন্মথমোহন বসু এম, এ
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,
,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল
ডাক্তার রায় চুণিলাল বসু এম, বি, বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
,, সত্যচরণ শাস্ত্রী
,, জগদ্বন্ধু মোদক
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, মৃণালকান্তি ঘোষ
,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, হরিচরণ বসু
,, অশ্বিনীকুমার ঘোষ
,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
,, প্রমথনাথ মিত্র
,, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
,, যতীশচন্দ্র সমাজপতি
,, রজনীকান্ত গুপ্ত
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী
,, রাজবিহারী দাস
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, ললিতমোহন মল্লিক
,, হৃদয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, (সম্পাদক)
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, }

† ইঁহারা সভারূপে নির্ব্বাচিত হইলেও কেহ প্রবেশিকা কেহ বা মাসিক চাঁদা দেন নাই, সুতরাং ইঁহারা সভায় ভোট দিবার অধিকারী নহেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। বর্ত্তমান গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের পদত্যাগে তাঁহার স্থানে নূতন গ্রন্থরক্ষক নিয়োগ।

৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ কর্ত্তৃক "বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী গত ৮ম অধিবেশনের এবং ৩রা ফাল্গুনের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নাম যথাক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া নির্ব্বাচিত হইল,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। নূতন সভ্য—(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্, এ ২০নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট। (২) শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ হরীতকী বাগানলেন, নাট্য মন্দির। (৩) শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মজুমদার (জমিদার), নরেন্দ্রপুর, যশোহর, ১০৬নং মসজিদবাড়ী স্ট্রীট। (৪) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম্, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট। (৫) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, P. W. D. কুচবিহার (৫০নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট)। (৬) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার এম, এ ৫০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। (৭) শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ৩৯নং রাজা রাজবল্লভের স্ট্রীট। (৮) শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ বসু, রাজা রাজবল্লভের স্ট্রীট। (৯) শ্রীযুক্ত ধনূলাল আগরওয়ালা বি, এল, এটর্ণী, হাইকোর্ট, ৪নং মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল। সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল। নূতন সভ্য—(১০) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, অধ্যাপক, জেনারল এসেমব্লিস্ ইনষ্টিটিউসন্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল। সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল। নূতন সভ্য—(১১) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, 2nd Asst. Manager, Hathwa Raj, Hathwa, Via Saran. (১২) শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর দাস, এম্, এ, বি, এল, উকীল, জজ আদালত, বাঁকীপুর। (১৩) শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন, এম্, এ, বি, এল, বেহার হেরাল্ড সম্পাদক এবং উকীল বাঁকীপুর। (১৪) শ্রীযুক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র এল, এম্, এস্ Physician বাঁকীপুর। (১৫) শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্ত ডেঃ মাঃ ও কলেক্টর, বাঁকীপুর। (১৬) ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী বসু এম্, বি, Lecturer, Materia Medica Govt. Temple Medical School Bankipur (১৭) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, হেডমাষ্টার, ট্রেনীং স্কুল, রাঁচী। (১৮) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, অধ্যাপক পাটনা কলেজ, পাটনা। (১৯) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মিত্র বি, এল উকীল, বাঁকীপুর। (২০) শ্রীযুক্ত সোনালাল বসু বি, এল, উকীল, বাঁকীপুর। (২১) শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র বি, এল, উকীল, বাঁকীপুর। (২২) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, উকীল বাঁকীপুর। (২৩) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, উকীল, বাঁকীপুর। (২৪) শ্রীযুক্ত [illegible] উকীল, বাঁকীপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,। সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,। নূতন সভ্য—(২৫) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র, ১৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট্। (২৬) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, জমিদার, ৬৫।২ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্। (২৭) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু, জমিদার, ৬৫।২ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্। (২৮) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্। (২৯) শ্রীযুক্ত ছন্নুলাল রায়, ১৪ নং শ্রীনাথ রায়ের লেন (চোরবাগান)। (৩০) শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বসু, নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্ (খড়্‌প, হুগলী)। (৩১) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ সেন, এম, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্। (৩২) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক, ৪৩ নং ক্যাথিড্রল মিসন্ লেন। (৩৩) শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নী, হাইকোর্ট, ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। (৩৪) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল, এটর্নী, হাইকোর্ট, ১৪ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্। (৩৫) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। (৩৬) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্। (৩৭) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। (৩৮) শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র মল্লিক, ১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্। (৩৯) শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর এম, এ, বি, এল, এটর্নী, হাইকোর্ট, হেমচন্দ্র করের লেন। (৪০) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র এম, বি, ১১০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্। (৪১) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, Translater (Interpreter) হাইকোর্ট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল,। সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,। নূতন সভ্য—(৪২) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট্। (৪৩) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৫৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্। (৪৪) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, ২৪ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট্। (৪৫) শ্রীযুক্ত কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্। (৪৬) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, বি এল, ৪৭ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্। (৪৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, ৯ নং রসিকলাল ঘোষের লেন (দর্জ্জিপাড়া)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়। সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,। নূতন সভ্য—(৪৮) শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাও সাহেব লালগোলা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ,। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,। নূতন সভ্য।—(৪৯) শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে এম, এ, অধ্যাপক জেনারেল্ এসেমব্লিস্ ইনষ্টিটিউসন্। (৫০) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩০ নং নন্দরাম সেনের গলি, শোভাবাজার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ,। নূতন সভ্য—(৫১) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জমোহন বসু এম, এ, বি, এল, উকীল, পুলিস্‌কোর্ট, ৪ নং গোকুল মিত্রের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,। সমর্থক।—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল। নূতন সভ্য—(৫২) শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, দীঘাপতিয়া, ৮৬ নং লোয়ার সারকুলার রোড্। (৫৩) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ, অধ্যাপক, রিপন্ কলেজ, ২৬ নং স্কট্‌স্ লেন। (৫৪) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিংহ, দাওরাকুঠি, ভাগলপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,। নূতন সভ্য।—(৫৫) ডাক্তার শ্রীমহীন্দ্রনাথ মজুমদার কাশীপুর। (৫৬) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার বি, এল, কাশীপুর। (৫৭) শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ মিত্র শ্যামবাজার। (৫৮) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত, এসেসর, চিৎপুর—কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটী। (৫৯) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাগবাজার। (৬০) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাগবাজার। (৬১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল,। (৬২) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (৬৩) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র, টাপুকুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। নূতন সভ্য–

(৬৪) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী পাল, ৩৪৪ নং আপার চিতপুর রোড্। (৬৫) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৩৫০ নং আপার চিতপুর রোড্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল। সমর্থক—শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল। নূতন সভ্য। (৬৬) শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, ৬২।৭ বীডন্ ষ্ট্রিট্। (৬৭) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, বি এল, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল। নূতন সভ্য—(৬৮) শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী "প্রতিবাসী" সম্পাদক, ৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট্। (৬৯) শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন বি, এ। (৭০) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সরকার এম, এ, ৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট্। (৭১) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, ৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্। (৭২) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬৫।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। (৭৩) শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি, এ, ৬৯।১ নং ইডেন্ হিন্দু হোটেল। (৭৪) শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ১২ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্। (৭৫) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল হালদার, ১৭ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, আহীরীটোলা। (৭৬) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম সবওভারসিয়ার, পালামৌ। (৭৭) শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। (৭৮) শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম. এ, এল, এম, এস, বি, এল, হ্যারিসন্ রোড্। (৭৯) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, ৮ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেন। (৮০) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এ, রাজার বাগান জংসন্ লেন। (৮১) শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুমার মটস্ লেন। (৮২) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় এম, এ, ১০ হাতীবাগান রোড্। (৮৩) শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণকুমার ঘোষ এল, এম, এস, ৩ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান। (৮৪) শ্রীযুক্ত কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি, ১৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। (৮৫) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক সি, এস, কটক, উড়িষ্যা। (৮৬) শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত বি, এল, জগৎসরকারের বাটী, গেণ্ডেরিয়া ঢাকা। (৮৭) শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ৪৩।৪ আরমানি[illegible], ঢাকা। (৮[illegible]) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম, এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। (৮৯) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনা[illegible]কুর। (৯০) শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৯১) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি,এল। (৯২) শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৯৩) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৯৪) দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৯৫) শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। (৯৬) শ্রীযুক্ত রাজা শরচ্চন্দ্র চৌধুরী চাঁচোল, মালদহ। (৯৭) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি, এস্ গাজীপুর, N. W. P. (৯৮) H. Bose Esq. (Perfumer) বহুবাজার ষ্ট্রীট। (৯৯) শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১ নং শ্যামাপুকুর লেন। (১০০) হেমেন্দ্রমোহন বসু বি, এ, ৬৬ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। (১০১) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসাক ৮ নং রায়ের লেন, যোড়াসাঁকো। রতন সরকারের গার্ডেন লেন। (১০২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী, জমসেরপুর, নদীয়া। (১০৩) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী এম, এ। (১০৪) সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, কপালী টোলা। (১০৫) শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী নং ১ ৩৫।২ বীডন্ ষ্ট্রীট। (১০৬) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার ১০ নং সার্কুলার রোড, বালীগঞ্জ। (১০৭) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এম, এ ৯ নং ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ। (১০৮) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, স্কুলবুক্ সোসাইটী। (১০৯) শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল উকীল, মালদহ। (১১০) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, জাহানাবাদ, গয়া। (১১১) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি এল ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, জাহানাবাদ, গয়া। (১১২) শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি ৬১ নং হ্যারিসন্ রোড্। (১১৩) শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ৪৫।৫ বেনেটোলা লেন। (১১৪) শ্রীযুক্ত সুদর্শন চক্রবর্ত্তী বি, এল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। (১১৫) শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার পত্নিতলা, রাজসাহী। (১১৬) শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ বৈদ্য এম, এ, ২৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। (১১৭) শ্রীযুক্ত রাজা রমণীকান্ত রায় বি, এ চৌধুরী—ভায়া নাটোর (রাজসাহী)। (১১৮) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এম, এ ৯নং খুরুট রোড, হাওড়া। (১১৯) শ্রীযুক্ত রাধারমণ কর ১০৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

(১২০) শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল, আর, সি, পি ১০৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। (১২১) শ্রীযুক্ত হেমশঙ্কর সেন, ৬৩ নং আপার সারকিউলার রোড। (১২২) চন্দ্রশেখর কর বি, এ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা। (১২৩) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কুণ্ডু, খামার পাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। (১২৪) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ ১১৪।১১৫ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। (১২৫) চুণিলাল গুপ্ত ৪।৩ ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। (১২৬) শ্রীযুক্ত এ, ঘোষ, ওভারসিয়ার Rewakantha Agency, Bungalow, Camp, Paroda, Guzrat (১২৭) শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় ঐ ঐ ঐ (১২৮) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম, এ, বি, এল মুনসেফ, উলুবেড়িয়া। (১২৯) শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র বি, এল ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন। (১৩০) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন। (১৩১) শ্রীযুক্ত মৌ. এম্, ডব্লিউ, হোসেন, ঝালসী বাগান। (১৩২) শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ ৭০।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। (১৩৩) শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত বি, এ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল। (১৩৪) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারস্ লেন। (১৩৫) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে, ম্যানেজার, মিনার্ভা থিয়েটার ৬ নং বীডন ষ্ট্রীট। (১৩৬) মাননীয় শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল বালীগঞ্জ রোড, ভবানীপুর। (১৩৭) মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর নশীপুর, মুরশিদাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়। নূতন সভ্য—(১৩৮) শ্রীযুক্ত অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। (১৩৯) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দত্ত, জমিদার, মজিলপুর, জয়নগর। (১৪০) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুটীঘাটা, বরাহনগর। (১৪১) শ্রীযুক্ত মদনমোহন দত্ত ৩৮ নং বসুপাড়া লেন। (১৪২) শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরসীলাল সরকার এম, এ, এল এম, এস ১২১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। (১৪৩) শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বক্সী এম, এ অধ্যাপক, জব্বলপুর কলেজ। (১৪৪) শ্রীযুক্ত জয়দয়াল সিংহ ডেঃ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের আফিস, দানাপুর। (১৪৫) শ্রীযুক্ত রঞ্জননিলাস রায় চৌধুরী পোষ্টমাষ্টার, মহিষাদী। (১৪৬) শ্রীযুক্ত হেমন্তচন্দ্র মিত্র, ১ নং লাল ওস্তাগরের লেন। (১৪৭) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ১ নং লাল ওস্তাগরের লেন। (১৪৮) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র ১ নং লাল ওস্তাগরের লেন। (১৪৯) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় ৬ নং বীডন ষ্ট্রীট। (১৫০) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার ৬ নং বীডন ষ্ট্রীট। (১৫১) শ্রীযুক্ত উত্তমকুমার মিত্র ৪২।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট। (১৫২) শ্রীযুক্ত তুলসীদাস মুখোপাধ্যায় এম, এ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। (১৫৩) শ্রীযুক্ত প্রমোদপ্রকাশ সেন গুপ্ত এম, এ স্যাণ্টেনটাইন লেন। (১৫৪) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি, এ ২১।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। (১৫৫) শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বসু ৫ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। (১৫৬) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন বসু নায়েব সদরের হাট, কাছারী, জয়নগর। (১৫৭) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বি, এ ২১।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। (১৫৮) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র, মজিলপুর। (১৫৯) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র মোহনলাল মিত্রের ষ্ট্রীট।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ "বুদ্ধদেবের জীবন চরিত" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বলিলেন,—আলোচ্য প্রবন্ধ যে অতি উপাদেয় হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক প্রবন্ধ-লেখক যেরূপ পরিশ্রম, গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু তাঁহার নিকটে আমার এক বিষয়ে জিজ্ঞাস্য আছে। তিনি বলিয়াছেন বুদ্ধদেব ৬২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ও ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। ইহা সিংহলবাসীদের মত, ব্রহ্মদেশবাসীদের মতেরও সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ শুনিয়া বোধ হয়, তিনি এই মতই অনেকটা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন,

জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর, বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করেন। জৈনদিগের মধ্যে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় বলেন বিক্রমাব্দের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে, এবং দিগম্বর সম্প্রদায় বলেন শকাব্দের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে, মহাবীরের মৃত্যু হয়; সুতরাং ঐ উভয় জৈন সম্প্রদায়ের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫২৭ অব্দে মহাবীর তিরোহিত হন। ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দকে বুদ্ধের মৃত্যুকাল ধরিলে, এই মতের সহিত বিরোধ হয়। আবার একটা মত আছে, মৌর্য্য চন্দ্র গুপ্তের অভিষেকের ১৬২ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সে হিসাব্ বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাল ৪৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ এবং জন্মকাল ৫৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হয়। আজ কাল অনেকে এই মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য আমি বলিতে চাহি না যে ইহাই ঠিক, কিন্তু আশা করি সতীশ বাবু এই বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ বলেন,—সতীশ বাবুর প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় একরূপ অনাবসায়ী, সুতরাং আমার পক্ষে ইহার সমালোচনা অসম্ভব। ইতিপূর্ব্বে সতীশ বাবুর "ভবভূতি" প্রবন্ধ শুনিয়াছি, তাহার পরিষৎ পত্রিকাতে প্রকাশও হইয়াছে, তাহা আমার বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছিল। সতীশ বাবু বৌদ্ধতত্ত্বালোচনায় বিজ্ঞ, তিনি যেরূপ খাটিয়া বিবরণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রবন্ধ অতি উত্তম এবং প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তাঁহাকে আমারও একটা জিজ্ঞাস্য আছে,—বৌদ্ধশাস্ত্রে "মারের" উল্লেখ আছে। এই "মার" অর্থে কামদেব। মারের কার্য্যাবলীর সহিত কামদেবের কার্য্যাবলীর মিল আছে কি? বৌদ্ধশাস্ত্রের মারের বর্ণনার সহিত হিন্দুশাস্ত্রের কামদেবের বর্ণনায় মিল আছে কি না? বুদ্ধপূর্ব্ব সংস্কৃতসাহিত্যে মারের উল্লেখ আছে কি না? বুদ্ধপর সংস্কৃতসাহিত্যে মারের উল্লেখ আছে এবং সে সকল স্থলে মার অর্থে কামদেবকে বুঝায়, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মার যে ভাবে বুদ্ধদেবকে বিপথগামী করিতে গিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে খৃষ্টীয় শাস্ত্রের শয়তানের সহিত মারের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের কামদেবও মনুষ্যকে গোলে ফেলেন বটে, কিন্তু তিনি শয়তান নহেন, অধিকন্তু একজন বড় দেবতা বলিয়া পূজিত। কামদেব পাপে প্রবৃত্তিদাতা নহেন। আমার বোধ হয় বৌদ্ধশাস্ত্রের মার এবং সংস্কৃত সাহিত্যে কামদেব এক নহেন। সতীশ বাবু উদাহরণাদিদ্বারা এই বিষয়টির মীমাংসা করিলে প্রীত হইব।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন,—বুদ্ধপর সংস্কৃতসাহিত্যের মধ্যে কুমারসম্ভবে কামদেব কর্ত্তৃক শিবযোগ-ভঙ্গের সহিত মারের কাজের সৌসাদৃশ্য আছে। মার কিরূপে বুদ্ধকে পাপপ্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ নাই। বুদ্ধপূর্ব্ব সংস্কৃতসাহিত্যে মারের উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ বলিলেন,—প্রবন্ধ লেখকের প্রবন্ধটী অতি

উপাদেয় হইয়াছে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতামত আলোচনা এবং ঐতিহাসিক সাহিত্য মন্থন করিয়া যেরূপ গবেষণা ও ধৈর্য্যসহকারে এই প্রবন্ধটী রচিত হইয়াছে, তাহা একবার শুনিলেই যে সহজে আয়ত্ত করিতে পারা যায় তাহা নহে। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধজীবনীর অনেক উপকরণ একত্র করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। পত্রিকাতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আলোচনার সুবিধা হইবে। আমি বৌদ্ধশাস্ত্রাদি পড়ি নাই, মার সম্বন্ধে বিশেষ জানি না। রামেন্দ্র বাবু কামদেব সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, সে সম্বন্ধে আমার বোধ হয় পৌরাণিক সাহিত্যের কামদেবের সহিত আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কামদেবের কোন মিল নাই। Sexual desire বলিলে আমরা যে কাম বুঝি, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কামদেব যেন তাহারই অধিষ্ঠাতা। পৌরাণিক কামদেবের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সাধকের প্রধান সাধন কামনা-ত্যাগ। মহাভারতে ভীষ্মের উক্তি হইতে এই কামনার অধিষ্ঠাতা পৌরাণিক কামদেবের স্বরূপ বুঝা যায়। সাধকের এই কামনাত্যাগ-সাধন ব্যাপারের রূপক বর্ণনায় কবির হস্তে কামদেবকে রূপধারী হইতে হয়। বৌদ্ধগ্রন্থের মার ও বাইবেলের শয়তান এইরূপ কামনারূপী কামদেব, sexual desireএর অধিষ্ঠাতা কামদেব নহেন। রামেন্দ্র বাবুর প্রশ্নেও শয়তানের ও মারের একত্বভাব এই দিক্ হইতেই গৃহীত; প্রায় সকল শাস্ত্রেই সাধকের সহিত কামনার সংগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়—তাহাতেই বোধ হয় মূল জিনিস এক, কিন্তু বাস্তবিক সম্বন্ধ রহিত। বৌদ্ধ মার ও খৃষ্টান শয়তানের একত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভবও এই সূত্র হইতে; প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু উভয়ে সম্বন্ধ রহিত।

অবশেষে প্রবন্ধ-পাঠক সতীশ বাবু বলিলেন,—মন্মথ বাবুর প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—আমি সময় নিরূপণে কেবল সিংহলগ্রন্থ অবলম্বন করি নাই। চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতও তুলিয়াছি। সিংহলের মহাবংশ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, প্রামাণিকও বটে, তাহাতে আছে বিম্বিসার বুদ্ধদেব অপেক্ষা ৮ বৎসরের ছোট। চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক সিংহল রাজের নাম তিষ্য। তিষ্যের ও চন্দ্রগুপ্তের যখন মিলিতেছে, তখন তিষ্যের ৫।৭ পুরুষের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাও সত্য বলিয়া ধরিলে ক্ষতি হয় না। তিব্বত সাহিত্যের সৃষ্টিই যখন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে, তখন উহাতে প্রাচীন কথার প্রামাণিকতায় সন্দেহ আছে। চীনের গ্রন্থোক্ত বর্ণনার প্রতিপোষক কথা অন্য দেশে পাওয়া যায় না। জাপানের কথা কোন বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে বলিয়া স্মরণ হয় না। জৈন শাস্ত্রের কথা আমি জানি না। এই সকল কারণে ৬২৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দকে বুদ্ধ জন্মকাল বলিয়া আমি গ্রহণ করিয়াছি। রামেন্দ্র বাবুর প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য—বুদ্ধপূর্ব্ব সংস্কৃতসাহিত্যে ইন্দ্রকেও তপস্যা ভঙ্গকারীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মারের ন্যায় দেবতা বেদে নাই। পৌরাণিক শাস্ত্রের কাল নিরূপণ বড় কঠিন; ললিত বিস্তর ৬৯ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুদিত হয় সুতরাং উহা খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের গ্রন্থ। উহাতে আছে, রতি কামদেবের কন্যা, তাহার ৫ শত পুত্র ও ৫ শত

কল্পা হয়, তাহারাই মনুষ্যের সমস্ত সদসৎ চিত্তবৃত্তির মূল। হীরেন্দ্র বাবুর কথাই যুক্তিসিদ্ধ, বৌদ্ধশাস্ত্রের মর্ম্মও ঐরূপ।

তৎপরে সভাপতি বলিলেন,—অদ্যকার প্রবন্ধ বড় ভাল, কিন্তু অতি বৃহৎ এবং কেবল বিবরণ পূর্ণ। এরূপ বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠে শ্রোতার বড় হৃদয়গ্রাহী হয় না। কৌতূহল-জনক কথা না থাকিলে প্রবন্ধের আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হয়। বিভিন্ন দেশের শাস্ত্রে যত কথা আছে, তাহাই যে বুদ্ধজীবনের ঐতিহাসিক কথা তাহা নহে, অনেক রূপক ও অতিশয়োক্তিও আছে; বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব স্বীকারের কথাই তাহার প্রমাণ। তবে নানা দেশের মতামত সংগ্রহ করা না হইলে, ঐতিহাসিক কথা বাছিয়া লওয়া যায় না। যদিও প্রবন্ধের মধ্যগত নীরস-বিবরণ-সংগ্রহ শুনিতে অদ্য অনেকের ধৈর্য্যভঙ্গ হইয়াছে তবু উহা যে আবশ্যক এবং উপকারী তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। মার লইয়া একটা গোলযোগ উঠিয়াছে। আমার বোধ হয় মার-মারক। ইংরাজী Devil অর্থে মৃত্যু। সেই ধরণের একটা কিছু মার। বৈদিক সাহিত্যে যেন পাপপুরুষগোছ একটা কিছু পড়িয়াছি, বৌদ্ধ মার বোধ হয় সেই পাপপুরুষ জাতীয়। (এই স্থলে হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন বৈদিক সাহিত্যে পাপপুরুষের নাম নির্ঋতি। রামেন্দ্র বাবু বলিলেন সন্ধ্যোপাসনাতেও পাপপুরুষের উল্লেখ আছে। যতীন্দ্র বাবু বলিলেন, বৈদিক শাস্ত্রে পাপপুরুষেরই বর্ণনা আছে।)

সভাপতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কালিদাসের সময়ে এদেশে গ্রীক্‌প্রভাবের কথা অনেকে স্বীকার করেন। সেই সময় হইতেই মূর্ত্তি কল্পনা। কালে কল্পনার মূর্ত্তিটাই থাকিয়া যায়, আসল ইতিহাস অর্থাৎ কোন্ কল্পনার কি সূত্র হইতে মূর্ত্তিবিশেষের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা লোপ হইয়া যায়। মূর্ত্তি সকলের ভাব ধরিয়া, তলাইয়া, উহা হইতে কল্পনার আবরণ ছাড়াইয়া দেখা আবশ্যক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রস্তাবে এবং যতীন্দ্র বাবুর সমর্থনে আপাততঃ এক মাসের জন্য শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতি।

২৬শে চৈত্র।

—০—

# প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী।

## সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ।

---

বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তর গ্রন্থ প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। সে কালে খৃষ্টীয় মিশনরীদিগের কৃপায় এবং বটতলার কতিপয় পুস্তক-বিক্রেতার চেষ্টায় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, অপ্রকাশিত গ্রন্থ রাশির তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য। পরিষৎ আজ ছয় বৎসরের চেষ্টায় অমুদ্রিত বাঙ্গালা পুঁথির যে সকল বিবরণ পরিষৎ পত্রিকায় প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন সাহিত্য পরিষদের কার্য্যকলাপে অনুপ্রাণিত হইয়া আরও অনেকানেক মাসিক পত্রিকায় অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন অভাব পূর্ণ হইবে না। এই জন্য পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩০৭ সাল হইতে "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া প্রতি দুই মাসে একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাদি স্থির হইয়াছে,—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থাবলী সম্পাদন কার্য্যের সর্ব্ব প্রধান সম্পাদক হইবেন।

২। আপাততঃ প্রতি দুই মাস অন্তর ডিমাই ৮ পেজী আকারে ৮ ফর্ম্মা করিয়া এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ২৪ পাউণ্ড ওজনের কাগজে ইহা মুদ্রিত হইবে।

৩। প্রতি সংখ্যায় একাধিক পুস্তক মুদ্রিত হইবে। কোন পুস্তক এক ফর্ম্মার কম প্রকাশিত হইবে না এবং প্রত্যেক পুস্তকের স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া হইবে। প্রত্যেক পুস্তকে কবির ইতিহাস, ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে টিপ্পনী, পাঠভেদ ইত্যাদি দেওয়া হইবে এবং প্রত্যেক পুস্তকের উপযুক্ত ভূমিকা থাকিবে। প্রত্যেক পুস্তকের সম্পাদন ভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর প্রদত্ত হইবে।

৪। পরিষদের সভ্যগণ এই গ্রন্থাবলীও বিনামূল্যে পাইবেন। অপর সাধারণকে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ২৲ টাকা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। পুস্তকালয় প্রভৃতিতে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে না।

৫। পরিষদের যে সকল সভ্য নিয়মিত চাঁদা নিয়মিতরূপে না দিবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে পাইবেন না।

৬। আগামী আষাঢ় মাসের প্রথমেই ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

গ্রাহকেচ্ছুকগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্ব স্ব নাম ধাম পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়,<br>১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,<br>সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ।

## শঙ্কর ও শাক্যমুনি ।

( সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত )

"শঙ্কর" এই নাম শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যেন মনে না করেন, পঠিতব্য প্রবন্ধে কোন আধুনিক শঙ্করের অথবা দেবতা শঙ্করের প্রসঙ্গ হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকে পূর্ব্বকাল হইতে যে শঙ্করের উল্লেখ চলিয়া আসিতেছে, সেই শঙ্কর এতৎ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। শঙ্করোদ্দেশী শ্লোকটী এই ;—

> "নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরাশরঞ্চ
> ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্।
> শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্ম-পাদঞ্চ হস্তামলকঞ্চ শিষ্যম্
> তং তোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি ॥"

শ্লোকটী বেদান্তীদিগের মধ্যে প্রণতি-পদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ভাবানুবাদ এই যে,— ভগবান্ নারায়ণ, তন্নাভিপদ্মজ ব্রহ্মা, তৎপুত্র বশিষ্ঠ, তৎপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র ব্যাস, তৎপুত্র শুক, শুকের শিষ্য বা প্রশিষ্য গৌড়পাদ, গৌড়পাদের শিষ্য যোগীন্দ্র গোবিন্দনাথ, গোবিন্দনাথের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদ, হস্তামলক, তোটকাচার্য্য এবং বার্ত্তিক-গ্রন্থকার সুরেশ্বরাচার্য্য, ইহাদিগকে এবং অন্যান্য আমাদের গুরুদিগকে আমি নমস্কার করি।

উল্লিখিত প্রণতি-পদ্যোক্ত শঙ্কর বেদান্তদর্শনের, বিশেষতঃ অদ্বৈত-ব্রহ্ম-বাদের প্রধান প্রচারক। এই মহাপুরুষের জন্ম, মরণ, শাস্ত্রাভ্যাস, তত্ত্বোপদেশ, [illegible] বিস্ময়াবহ। সেইজন্য তিনি এদেশে অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। [illegible] পাধ্যায় পণ্ডিতেরাও "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্" [illegible] থাকেন। এতাদৃশ গুণশালী শঙ্করের রচিত যে সকল পুস্তক [illegible] সে সকল পুস্তকের দোষগুণ বিচার অস্মাদৃশ অসাধ্য। [illegible] পাই যে, যেমন পাণিনীর ব্যাকরণের [illegible]

গিয়াছে, তেমনি শঙ্করের সূত্রভাষ্যাদি গ্রন্থের প্রচারে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের পরে অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য; তাঁহারাও পুস্তক লিখিয়া ও শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়া তদীয় কীর্ত্তি বিলোপ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য; পরন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

"শঙ্করের সূত্রভাষ্য"—এতৎ প্রসঙ্গে একটি অনেক দিনের কথা মনে পড়িল। কোন এক সময়ে জনৈক খ্যাতনামা প্রত্নবিৎ পণ্ডিত আমাকে বলেন, বুদ্ধের পূর্ব্বের কিছুই নাই। তিনি সুব্যক্ত কথায় না বলুন, প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মসূত্রও বুদ্ধের পরে বিরচিত। আমি তাঁহার ঐ কথায় সন্দিহান হইয়া প্রমাণপরম্পরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তাহাতে জ্ঞাত হই, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ বুদ্ধের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। একটা প্রমাণ এই যে, উপবর্ষাচার্য্য ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার। বৌধায়ন ও উপবর্ষ মুনি যে গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, সে গ্রন্থ কিরূপে বুদ্ধপরবর্ত্তী হইবে? যদিও আমরা বৌধায়নের স্থিতিকাল নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণারূঢ় করিতে না পারি, তথাপি, প্রমাণ-সহকারে বলিতে পারি, উপবর্ষ শাক্যসিংহ বুদ্ধের বহু পূর্ব্বের ব্যক্তি। এই উপবর্ষ ব্যাকরণপ্রণেতা পাণিনি মুনির অধ্যাপক। পাণিনি ও উপবর্ষ যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, সে সময়ে শাক্যসিংহ কপিলবাস্তু নগরে জন্ম-গ্রহণও করেন নাই। ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় শ্রেণীর পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা পাণিনি মুনির "নির্ব্বাণোহবাতে" ইত্যাদি সূত্র পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পাণিনি মুনি শাক্যসিংহ-জন্মের পূর্ব্বে ব্যাকরণসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের উপর উপবর্ষাচার্য্যের যে কোনরূপ ব্যাখ্যা পুস্তক আছে, অথবা ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের 'বদাহ স্ম ভগবানুপবর্ষঃ' "স্ফোটং ইত্যাহ" ইত্যাদি উল্লেখে উদ্ধৃত তদীয় বাক্যাংশ ও মত দ্বারা জানিতে পারি। তাই আমরা ব্রহ্মসূত্রের বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীনতায় নিঃসন্দেহ এবং পূর্ব্বোক্ত "নন্ অ্যান্টি বুদ্ধিষ্টিক্" কথায় শ্রদ্ধা বর্জ্জিত। কেবল ব্রহ্মসূত্র নহে, সমুদায় স্মৃতি ও অনেকগুলি পুরাণ বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন। এ অংশে বুদ্ধের কথাই প্রমাণ। বুদ্ধ বোধিদ্রুমতলে উপবিষ্ট হইয়া তাৎকালিক লোকগতি পর্য্যালোচনা করতঃ আক্ষেপ সহকারে বলিতেছেন, "অহো! আমি এই পূর্ণ পাপকালে (কলিকালে) জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কালের লোকেরা মোহ বশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্র সাধনদ্বারা বৃথা শুদ্ধি ইচ্ছা করিতেছে। যথার্থ বস্তু কি, প্রকৃত শুদ্ধি কি, গন্তব্য পথ কি, তপস্যাই বা কি, তাহা জানিতেছে না। কেহ মন্ত্রবিচার, কেহ মৎস্য মাংস ত্যাগ, কেহ ফল পত্র ভক্ষণ, কেহ অযাচিতাহার, কেহ ভিক্ষান্ন ভোজন, কেহ কুশপত্রশয়ন, কেহ স্থণ্ডিলশয়ন, কেহ পঞ্চগব্যপান, কেহ মৌনব্রত, কেহ একাহার, কেহ অনাহার, কেহ দ্বাদশাহসাধ্য ব্রত, কেহ পঞ্চদশাহসাধ্য ব্রত, কেহ চান্দ্রায়ণ ব্রত, কেহ কুশাসন, বল্কলাসন, কম্বলাসন ও চর্ম্মাসন, কেহ কৌপীন, কেহ তীর্থস্নান, কেহ কেশ ধারণ, কেহ জটাধারণ, কেহ ভস্ম ম্রক্ষণ, কেহ

মেখলা ধারণ, কেহ করঙ্গ (কমণ্ডলু) ধারণ, কেহ বা ত্রিদণ্ড ধারণ দ্বারা শুদ্ধি হয়, পাপক্ষয় হয়, মনে করিতেছে। কেহ এক পদে, কেহ উর্দ্ধপদ ও উর্দ্ধবাহু হইয়া তপঃসঞ্চয় করিতেছে, তুষাগ্নিমরণ, কুম্ভকদ্বারা মরণ, ভৃগুপতন, অগ্নি-প্রবেশ, অনশনে মরণ ও তীর্থমরণদ্বারা অভীষ্ট লাভের আশা করিতেছে। প্রণব জপ, যজ্ঞ, হোম, শ্রাদ্ধ ও তর্পণদ্বারা নিষ্পাপ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ স্তুতি-নমস্কারাদিদ্বারা, কেহ মন্ত্র জপদ্বারা, কেহ দেবার্চ্চনাদ্বারা, কেহ বেদাধ্যয়ন দ্বারা এবং কেহ বা নির্ম্মাল্যধারণ দ্বারা, পবিত্র হইবার ইচ্ছা ক রিতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, হুতাশন, কুবের, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, মাতৃগণ, কাত্যায়নী, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস, মহাসর্প, ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে। পুণ্যলাভ প্রত্যাশায় গিরি, নদী, উৎস, সরোবর, হ্রদ, তড়াগ, সাগর, পল্বল ও যূপ প্রভৃতি আশ্রয় করিতেছে। দধি, ঘৃত, তিল, সর্ষপ, যব, দূর্ব্বা, ধান্য, মণি, সুবর্ণ ও রজত প্রভৃতিকে মাঙ্গল্য মনে করিতেছে। এই ঘোর পাপ-কালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবেরা সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া পরিত্রাণ কামনায় ঐ সকল অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু হায়! ইহারা জানিতেছে না যে, ঐ সকলের দ্বারা সংসারভয় নিবারিত হয় না। কেহ মনে করিতেছে, পুত্রদ্বারা স্বর্গ ও অপবর্গ হইবে। অহো! কি কষ্ট! বর্ত্তমান কালের প্রায় সমুদয় জীবই ঐরূপ মিথ্যাপথে ভ্রমণ করতঃ অশরণে শরণ, অমঙ্গলে মঙ্গল ও অশুদ্ধিতে শুদ্ধি জ্ঞান করিয়া বিনষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ইহাদিগকে আমি মঙ্গল কি, শুদ্ধি কি, পথ কি, যথার্থ তপস্যাই বা কি, তাহা শিখাইব। ধ্যান কাহাকে বলে, যথার্থ যোগ কি, তাহাও জানাইব ও শিখাইব।" *

এই সকল কথা যদি সত্য সত্যই বুদ্ধমুখ-নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা বলিতে পারি, বুদ্ধের পূর্ব্বে বেদ, স্মৃতি ও কতকগুলি পুরাণ বিদ্যমান ছিল। কেননা, ঐ সমস্ত কথাই বেদের, স্মৃতির ও পুরাণের কথা, তন্ত্রের বা অন্য শাস্ত্রের নহে। আবৃদ্ধ মান্য গণ্য বৃদ্ধ-পুরাতন ও দর্শন-শিরোমণি বলিয়া পূজিত ব্রহ্মসূত্রের উপর উৎকৃষ্টতর ভাষ্য রচনা করিয়া মহাবুদ্ধিধর শঙ্কর ইহলোকে কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এতদীয় শারীরক-নামধেয় ভাষ্য অধ্যাপক-সমাজে এত আদৃত এবং তাহার উজ্জ্বলতা বা শ্রেষ্ঠতা এত অধিক যে, শারীরক-ভাষ্য না পড়িলে যেন বেদান্ত পড়া সিদ্ধই হয় না। ছাত্রেরা যতই ভাষ্য পড়ুন না কেন, একমাত্র শারীরক পাঠের অভাবে সমস্তই অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। ভিন্ন-সম্প্রদায়ের বেদান্ত হয় ত মানুষকে ভক্ত করিতে পারে, সাধক করিতেও পারে; কিন্তু পণ্ডিত করিতে পারেনা। কারণ এই যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বেদান্ত ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের বেদান্তে জ্ঞানতত্ত্বের ও জ্ঞেয়তত্ত্বের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা নাই।

এক সময়ে ভারতবর্ষীয় জনগণের ধর্ম্মগত, সমাজগত ও আচারগত অবস্থা, কুষ্ঠ রোগের ন্যায় শোচনীয় হইয়াছিল। বেদান্তভাষ্য-প্রণেতা শঙ্কর সেই সময়ে জন্মগ্রহণ

---

* বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ।

কথায় আমরা "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ইত্যাদি ঋষিবচনের প্রতি আস্থা বা শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি না। এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা ও শক্তিলোপোন্মুখতা, অপর দিকে কর্ম্মপ্রধান বৈদিক ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব এই দুএর সন্ধি-সময়ে বা সংঘর্ষ-সময়ে মহাপুরুষ শঙ্কর যেন মাধ্যমিক অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি যে অব্দে, যে গ্রামে, যাহার ঔরসে ও যাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যত কাল জীবিত ছিলেন এবং জীবিত থাকিয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সমস্তই তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যের লিখিত "শঙ্করচরিত" "শঙ্কর-বিজয়" ও "শঙ্কর-মন্দার-সৌরভ" প্রভৃতি গ্রন্থদ্বারা জানা যায়। তাঁহার জীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পর্য্যাপ্ত হইবার নহে; কার্য্যেই অদ্য এই সভায় আমি তদীয় জীবনের কতিপয় প্রধান অংশ মাত্র সংক্ষেপে বর্ণন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। এক্ষণে সভ্যবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে আমি যত্নসাফল্য অনুভব করিব ও সুখী হইব।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিভাগে কেরল নামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ আছে। তাহার বর্ত্তমান নাম মালবার। মহাত্মা শঙ্কর তাদৃশ কেরলের কালপি নামক গ্রামে শিবগুরু নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ভদ্রা বা সুভদ্রা। শঙ্কর-মন্দার-সৌরভ নামক গ্রন্থের রচয়িতা নীলকণ্ঠ ভট্ট শঙ্করের জন্মাব্দ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই ;—

প্রাসূত তিষ্যশরদামতিযাতবত্যাং একাদশাধিকশতোনচতুঃসহস্র্যাম্।
বৈশাখশুক্লদশমীদিবসে কুমারং শ্রীশঙ্করং কলিকলঙ্কবিনাশদক্ষম্॥

তিষ্য শব্দের অর্থ কলি। কল্যব্দের একাদশাধিক শত ন্যূন চতুঃসহস্র বৎসর অতীত হইলে অর্থাৎ তিন হাজার আট শত উন-নব্বই বৎসর গত হইলে, বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে শিবগুরুপত্নী ভদ্রা, কলিকলুষনাশন শঙ্করকে প্রসব করিলেন। এখন কল্যব্দ পাঁচ হাজার এক। এতদনুসারে বলিতে পারি, শঙ্কর যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা তাঁহাকে ১১১২ বৎসরের বৃদ্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম।

যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য-প্রশিষ্য, তাঁহাদের মধ্যেও শঙ্করের আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রচলরূপ আছে। যথা—

"নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে মাসি মাধবে।
শুক্লে তিথৌ দশম্যান্তু শঙ্করার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ॥"

ইহাতেও পাওয়া যাইতেছে যে, শঙ্কর কলিযুগের ৩৮৮৯ বৎসর গত হইলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থকার মেরুতুঙ্গাচার্য্য লিখিয়াছেন, ১১৫০ সম্বৎ অব্দে গুর্জ্জরাধিপতি জয়সিংহ জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীপত্তনে দেবসূরি নামক জনৈক পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার ছাত্র মাণিক্য পণ্ডিত। এই মাণিক্য পণ্ডিতকে স্বরচিত সংকেতনাম্নী কাব্য-প্রকাশ টীকায় প্রসঙ্গবশতঃ কুমারিল ভট্টের নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। এই

কুমারিল যখন বৃদ্ধ, শঙ্কর তখন দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক। অতএব, প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থের অভিহিত বার্ত্তাও উপরিউক্ত কাল বিনির্ণয়ের পোষক প্রমাণ।

বোম্বে নগরে পঞ্চদশীগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার ভূমিকায় বিদ্যারণ্যস্বামীর জীবন ও জন্মকাল নির্ণীত হইয়াছে। এই বিদ্যারণ্য শঙ্করাচার্য্যের অন্যতম শিষ্যবংশীয়। উক্ত ভূমিকার লেখক শঙ্কর হইতে বিদ্যারণ্য পর্য্যন্ত যে কাল গণনা করিয়াছেন, সে গণনাও মদুক্ত কাল নির্ণয়ের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ।

এই স্থানে একটা অবান্তর কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। শঙ্করের জন্মকাল নির্ণয় করিতে আমি দিঙ্মূঢ়-ন্যায়ে নিপতিত হইয়াছি। "দিঙ্মূঢ় ন্যায়" কথাটা দার্শনিকদিগের ব্যবহার্য্য। উহার অর্থ—বরং অন্য ভ্রম শীঘ্র যায় ত দিগ্‌ভ্রম যায় না। শত শত যুক্তি তর্ক উহার অপনয় করিতে পারে না। আমি গত চৈত্রমাসের সাহিত্য-পত্রিকায় দেখিয়াছি, শঙ্কর ২৩।২৪ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধের লেখক আমার প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় নানাপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, তথাপি আমার মন এগার শত, বার শত বৎসরের ও-দিকে যাইতে চাহে না। এক এক বার মনে করি, উদাহৃত প্রমাণগুলিকে মন হইতে তাড়াইয়া দিই, পরন্তু শঙ্করের শারীরক-ভাষ্যের লিপি-সন্দর্ভ মনে পড়ায় তাহা পারি না। তখন ভাবি, যে শঙ্কর ২৩।২৪ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া বত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, সে শঙ্কর সম্বৎ-অব্দ-প্রারম্ভের পরবর্ত্তী শবর স্বামীর মীমাংসা ভাষ্যের পাঠ স্বকৃত শারীরকভাষ্যে কিরূপে উদ্ধৃত করিলেন? এবং কুমারিল ভট্টের অভিহিত ভ্রমজ্ঞানের লক্ষণই বা কি প্রকারে বর্ণন করিলেন? আমরা শারীরক ভাষ্যে যে "বস্তু শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণং—দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম" এবং "কেচিত্তু যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রমঃ" ইত্যাদি কথা পড়িয়াছি, ঐ সকল কথা শবরস্বামীর ও কুমারিল ভট্টের। প্রথম কথা শবরস্বামীর ও দ্বিতীয় কথা কুমারিল ভট্টের। তাই আমার মন শঙ্করের জন্মকাল সম্বন্ধে শবর স্বামীর ও কুমারিল ভট্টের পরবর্ত্তিতা ব্যতীত কিছুতেই খৃঃ পূঃ ৪৩৩ দিকে যাইতে রাজী হইল না। শবরস্বামীর অবস্থিতিকাল লইয়া যদি কেহ তর্ক তুলেন, তবে সে তর্ক পৃথক্ প্রবন্ধের বিষয় হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, শঙ্করের জন্মকোষ্ঠী কিরূপ।

শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে,—

> লগ্নে শুভে শুভযুতে সুষুবে কুমারং শ্রীপার্ব্বতীব সুখিনী শুভবীক্ষিতে চ।
> জায়া সতী শিবগুরো র্নিজতুঙ্গসংস্থে, সূর্য্যে কুজে রবিসুতে গুরৌ চ কেন্দ্রে॥

শ্লোকটির অর্থ এই যে, পার্ব্বতী যেমন বিনা ক্লেশে কুমার কার্ত্তিকেয়কে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায়, শিবগুরুজায়া সতীও বিনা ক্লেশে শুভগ্রহযুক্ত ও শুভগ্রহদৃষ্ট পরিদৃষ্ট শুভলগ্নে শঙ্করকে প্রসব করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি তখন কেন্দ্রস্থ ও সূর্য্য, কুজ, শনি এই গ্রহত্রয় তখন তুঙ্গী অর্থাৎ স্ব স্ব উচ্চস্থানস্থ ছিল। শঙ্করচরিত্র-লেখকেরা লিখিয়াছেন

শুভলগ্নজাত উক্ত শিশুর শরীরে অনেকগুলি সামুদ্রিকজ্যোতিষোক্ত অনন্যসাধারণ চিহ্ন ছিল। মস্তকে হিমাংশুচিহ্ন, ললাটে নেত্ররেখা, স্কন্ধোপরি ত্রিশূলাঙ্ক, চরণে চামরচিহ্ন, করতলে চক্র, গদা, ধনু ও ডমরু চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ সকল চিহ্ন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও কান্তি পুরাণাদিশাস্ত্রের বর্ণিত শিবমূর্ত্তির অনুরূপ দৃষ্ট করিয়া তাৎকালিক পণ্ডিতগণ ও জ্যোতির্ব্বিদগণ শিবগুরুর এই নবকুমারকে শিবাবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে শিবগুরু ও তৎপত্নী উভয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ভাগ্যধর শিবগুরু অতি আনন্দের ও উৎসাহের সহিত পুত্রের জাতকর্ম্ম-সংস্কার নির্ব্বাহ করিলেন, পরে "শঙ্কর" এই নামে নামকরণ-সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। তৃতীয় বর্ষ আগতে চৌল-সংস্কার সমাপ্ত করিয়া শিবগুরু মনে মনে আশা করিতেছেন, পুত্র পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে স্বয়ং তাহাকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিবেন, কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় নাই। শিবগুরুর আশা পূর্ণ হইল না, তিনি সেই অনুচিত সময়ে সেই শিশু পুত্রকে ও সহধর্ম্মিণীকে নাথহীন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শিবগুরু সপ্ততি বৎসর বয়সে পুত্ররত্ন লাভ করেন এবং দ্বিসপ্ততি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শঙ্করকে শিশু ও তদীয় জননীকে যার পর নাই শোকাতুর দেখিয়া শিবগুরুর জ্ঞাতিগণ শিবগুরুর দাহাদি অন্ত্যেষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক বর্ষ অতীত হইল, শঙ্করের মহাগুরু-নিপাত-জনিত দেহাশুদ্ধি অর্থাৎ কালাশৌচ সমাপ্ত হইল এবং তাঁহার পঞ্চম বর্ষ বয়সের প্রথম দিনও সমাগত হইল। দুঃখিনী শঙ্কর-মাতা আজ পরলোকগত ভর্ত্তার জীবদ্দশার ইচ্ছা স্মরণ করিয়া শঙ্করকে উপনীত করিবার জন্য নিতান্ত চঞ্চলমতি হইলেন এবং জ্ঞাতিগণ ও সুহৃদ্গণ সকাশে মনের সে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রতিবাসী-গণ শঙ্করের অদ্ভুত প্রতিভা, আশ্চর্য্য শক্তি, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলের প্রথা, শাস্ত্রের শাসন এবং পরলোকগত শিবগুরুর জীবিতাবস্থার ইচ্ছা, এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর-জননীর ইচ্ছার প্রতিরোধ করিলেন না; প্রত্যুত সহায়তাই করিলেন। অচিরকাল পরেই শঙ্করের শঙ্করতুল্যবপু যজ্ঞোপবীত-শোভায় সুশোভিত হইল। তিনি শাস্ত্রানুসারে গুরুকুলে বাস করতঃ গুরুসেবা, বেদাভ্যাস, ভিক্ষান্ন-ভোজন, অগ্নিপরিচর্য্যা, সত্যনিষ্ঠতা, শৌচ ও সন্তোষ প্রভৃতি নৈষ্ঠিকী বৃত্তি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যে ভাগ্যধর দ্বিজ শঙ্করের আচার্য্য-গুরু হইয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় তত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না, তাই শঙ্করচরিত্র লেখকেরা তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, অদ্ভুত শিশু শঙ্কর নাকি এক বৎসর বয়সে মাতৃভাষায় অভ্যস্ত, দ্বিবর্ষ বয়সে লিপিকার্য্যে সুশিক্ষিত ও ত্রিবর্ষ বয়সে নাকি পুরাণ-পাঠ শুনিয়া তাহার অর্থ বোধগম্য করিতে পারগ হইয়াছিলেন। পঞ্চমবর্ষে তিনি উপনীত হন, তদবধি আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করেন। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে তিনি নাকি সমুদায় সাঙ্গ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে অষ্টম বর্ষে অধ্যয়ন-ব্রত উদ্যাপন করিয়া স্বালয়ে আগমন করেন।

শঙ্কর গুরু-সকাশে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সমাবর্তন অর্থাৎ অধ্যয়ন-ব্রত উদ্‌যাপন করতঃ স্বালয়ে আগমন পূর্ব্বক মাতৃসেবা, বেদাভ্যাস, অগ্নিপরিচর্য্যা, ও সূর্য্যোপাসনা প্রভৃতি গার্হস্থ্যোচিত সৎকর্ম্মে রত হইলেন। তাহাতে তাঁহার বহিঃকান্তি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী ও আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। ক্রমে তাঁহার অলৌকিকী ক্ষমতা, সচ্চরিত্রতা, ও বিদ্যাখ্যাতি দেশব্যাপিনী হইয়া উঠিল। দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক বিদ্যার্থী বিদ্যাশিক্ষার্থে তাঁহার আলয়ে আগমন করিতে লাগিল। কিছুকাল উক্ত প্রকারে অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার চিত্ত অন্য এক দুর্গম পথে সবেগে ধাবমান হইল। বৈরাগ্য তাঁহার চিত্ত আক্রমণ করিয়াছে, তিনি আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করেন না, গার্হস্থ্য সংসর্গ ভাল বাসেন না, গৃহত্যাগই তাঁহার শান্তিদাতা পরম সহায় হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করেন, জননীর অনুমতি ব্যতীত তিনি আপনার অভীপ্সিত পথে অগ্রসর হইতে পারেন না।

একদা তাঁহার ভবনে কতিপয় পর্য্যটক অতিথি আগমন করিলে, তপস্বিনী শঙ্কর-জননী তাঁহাদের নিকট প্রিয়তম পুত্রের ভাবি শুভ বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, ভদ্রে! তোমার এই পুত্র, গুণে শিবতুল্য; কিন্তু স্বল্পায়ু। "পুত্র স্বল্পায়ু" এই বজ্রতুল্য দুঃসহ শব্দ শ্রবণে তিনি মুহূর্ত্তেকের জন্য চেতনাশূন্য, নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন, পরে চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে ও শোকে পুনঃ পুনঃ কাতরা হইতে লাগিলেন। শোকনাশন শঙ্করও নানা প্রকার বচনরচনার দ্বারা জননীর ভয় ও শোক নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে দিন ঐরূপে অতিবাহিত হইল। পরদিন শঙ্কর জননী-সকাশে আপন অভীষ্ট ব্যক্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াও উপযুক্ত অবসর অভাবে করিতে পারেন নাই। ঐরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, আর থাকিতে পারিলেন না। পঞ্চম দিবস আসিলে তিনি জননীর সমীপবর্ত্তী হইয়া অতি বিনীত ও বিষণ্ণ-ভাবে অঞ্জলি বদ্ধ করতঃ বলিতে লাগিলেন, জননি! যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর সংসার পথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদের দুঃখের সীমা ও ইয়ত্তা নাই। সেই কারণে আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ঐ পথের অবসান ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি প্রসন্না হইয়া অনুমতি প্রদান করুন। শুনিবামাত্রই তাঁহার ভয় ও শোক ও উদ্বেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, কিয়ৎক্ষণ মৃতপ্রায়া হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, বৎস! তুমি যে চতুর্থাশ্রমের ইচ্ছা করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। তোমার ঐ বুদ্ধি শীঘ্র অপনীত হউক। আগে গৃহস্থ হও, পুত্রলাভ কর, যাগযজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাদিগকে প্রসন্ন কর, পশ্চাৎ তুমি যতি হইও। বৎস! তাহাই সজ্জনদিগের চিরসেবিত ধর্ম্ম। বৎস! তুমি ব্যতীত আমার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। এ অবস্থায় তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চিত আমি জীবিত থাকিব না। তোমার প্রস্থানের পর আমার মৃত্যু হইলে, কে আমার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিবে, তাহাও ভাবিয়া দেখ। সতী শঙ্কর-মাতা শঙ্করসকাশে রোদন

সহকারে ঐরূপ ঐরূপ কথা বলিতে লাগিলেন, শোকশাসন শঙ্করও অনুরূপ প্রবোধ-প্রদান-দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এদিনও সন্ন্যাসানুমতি পাইলেন না। পরদিন প্রভাতাগমে তাঁহার বৈরাগ্য দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? কোন বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত ইনি যে আমাকে সন্ন্যাসানুমতি প্রদান করিবেন, তাহা বোধ হয় না; অথচ আমার সন্ন্যাস ইহাঁর অনুমতি-সাপেক্ষ। এই স্থলে শঙ্করবিজয়-প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত কথা এই যে, শঙ্কর ঐরূপ চিন্তার পর এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করিয়া জননীর নিকট হইতে সন্ন্যাসানুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌশলটী এইরূপ—

শঙ্কর সেই দিন মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানার্থ নিকটস্থ নদীজলে অবতরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও জননীকে ডাকিতে লাগিলেন। "মা, শীঘ্র আইস, এক বলিষ্ঠ কুম্ভীর আমার পদদ্বয় ধরিয়াছে।" শঙ্কর-জননী ভদ্রা গৃহ হইতে পুত্রের রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং ব্যাকুলিতা হইয়া নদীতীরে গিয়া দেখেন, পুত্র জলমগ্ন ও কুম্ভীর-গ্রস্ত। তিনি তখন নিরুপায় জ্ঞানে পুত্রের জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া পাগলিনীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন, জলমগ্ন শঙ্করও জলে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শঙ্কর বলিলেন, মা! কে যেন আমায় বলিতেছে, তোমার জননী যদি তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন, তাহা হইলে এই কুম্ভীর তোমাকে এখনই ছাড়িয়া দেয়।

সতী শঙ্কর-মাতা তখন জ্ঞানশূন্যা, পুত্রের জীবন রক্ষাই তৎকালের প্রার্থনীয়, সুতরাং তিনি উক্ত দুঃসহ বাক্যকেও মৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্র অপেক্ষা অধিক হিতকর বিবেচনা করিলেন এবং ভাল মন্দ চিন্তা না করিয়াই সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি দিলেন। এদিকে কুম্ভীরও শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল, শঙ্করও সবেগে তীরোপরি উঠিয়া শিশুসুলভ ভয়-কম্পাদির অভিনয় করিতে লাগিলেন। পরে জননী-সহ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নানা কথায় জননীর মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন এবং সন্ন্যাসোপযোগী প্রসঙ্গের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। অবসর প্রাপ্তে বলিলেন, মা! আপনার অনুমতিক্রমে যেই আমি মনে মনে সন্ন্যাস সংকল্প করিলাম, অমনি দুরন্ত কুম্ভীর আমাকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু মা, আমি বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাসের সংকল্প করিয়াছি, সেজন্য এখন আমি গৃহী নহি। তাই বলিতেছি, এখন যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। শুনিয়া শঙ্কর-মাতার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিত্রলিখিতের ন্যায় থাকিয়া অতি কষ্টে এইমাত্র বলিলেন, আমি আর কি বলিব, তুমি আপনিই আপনার কর্ত্তব্য বিচার কর। শঙ্করও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন, আমি তাহাই করিব, কিন্তু মা! আমার আর এক অনুরোধ আছে। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া গেলে আপনার অন্নাচ্ছাদনের কষ্ট হইবে, সে আশঙ্কা করিবেন না। যাহারা আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, তাহারা অবশ্য লোকাপবাদ ভয়েও আপনার রক্ষণাবেক্ষণাদি

এবং মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও করিবে। তপস্বিনী শঙ্করমাতা "জ্ঞাতিরা শ্রাদ্ধাদি করিবে" এই কথায় অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং বলিলেন, আমি যখন অনুমতি প্রদান করিয়াছি, তখন আমার কোন প্রত্যুত্তর নাই। এখন আমার এইমাত্র অনুরোধ—তুমি যেখানেই থাক, আসিয়া আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিও। লোকাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে তোমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করা আমার বৃথা হইবে। এই বলিয়া তিনি অনর্গল অশ্রু-বর্ষণে পৃথিবীকে সিক্ত করিতে লাগিলেন।

মাতৃবৎসল শঙ্কর জননীর তাদৃশী কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, স্বীয় আশ্রমাচার উল্লঙ্ঘন করিয়াও আপনার মৃত্যুকালে আগমন করিব ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও করিব। আমি গৃহে থাকিলে আপনি আমার দ্বারা যে ফল পাইতেন, সন্ন্যাসী হইয়া আমি তাহার দশগুণ ফল প্রদান করিব।

এই স্থানে পণ্ডিতগণ বলেন শঙ্কর যে দশগুণ ফলের কথা বলিলেন, তাহা ঐহিক ফল নহে, তাহা পারত্রিক ফল। শঙ্কর যে কুম্ভীরের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃত কুম্ভীর নহে, কুম্ভীরের রূপক। সংসার সমুদ্র, পুত্রকলত্রাদি নদী, এবং ইন্দ্রিয়-প্রলোভন প্রভৃতি কুম্ভীর। সংসারক্ষণ-সমুদ্র পরিত্যাগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উক্ত কুম্ভীরের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। শঙ্কর, স্বজননীকে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, কোনরূপ কপট-কথা বলেন নাই। যাহাই হউক, বিচক্ষণশিরোমণি শঙ্কর কালবিলম্ব করিলে পাছে আবার কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে তিনি তন্মুহূর্ত্তে গৃহপরিত্যাগ করা উচিত বোধ করিলেন এবং জননীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা ও জ্ঞাতিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরিধানে গৈরিক বসন, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, এ বেশ যাহারা দেখিয়াছিল, তাহাদের ভ্রম হইয়াছিল, যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মদেব ব্রহ্মলোকাভিমুখে যাইতেছেন। শঙ্কর যে দিন উক্তবেশ ধারণ করিলেন, সেই দিনটী তাঁহার নবম বর্ষ বয়স হওয়ার প্রারম্ভ দিন।

শিশু সন্ন্যাসী শঙ্করের এই সন্ন্যাস নিতান্ত বিস্ময়জনক ও অনন্যসাধারণ। অমায়ী-ঘোষক বুদ্ধ শাক্যসিংহও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, নবদ্বীপের নাম-বিস্তারকারী নিমাইও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই স্ত্রীপুত্রের মুখ না দেখিয়া ও না পলাইয়া পারেন নাই। তাঁহাদের বৈরাগ্য ভুক্তবৈরাগ্য, আর শঙ্করের বৈরাগ্য অভুক্তবৈরাগ্য। তাই সন্ন্যাসীরা বলিয়া থাকেন, শঙ্করের সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠসন্ন্যাস ও প্রকৃত বিদ্বৎসন্ন্যাস। এই নবসন্ন্যাসী শঙ্কর যে দিন গৃহবহির্গত হন, সে দিন তিনি সায়ংকালে নর্ম্মদানদীর তীরস্থিত গোবিন্দনাথ স্বামীর আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দনাথস্বামী একজন তৎকালের যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। ইনি গৌড়পাদ মুনির শিষ্য, অদ্বৈত মতের তাপস ও যোগীন্দ্র উপাধ্যায় বিভূষিত ছিলেন। ইঁহার গুহাশ্রমে অনেক লোক থাকিত। কেহ যোগশিক্ষা করিত, কেহ বা কেবল তপস্যা করিত,

নবাগত শঙ্কর ইহাঁকে গুরুত্বে বরণ করিলে, যোগীন্দ্র গোবিন্দনাথ শঙ্করকে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যচতুষ্টয় উপদেশ করিলেন এবং শঙ্করও উক্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুসকাশে বাস করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ইহাঁরই নিকট ব্যাসকৃত শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব ও অদ্বৈতমতের পূর্ণ ব্যাখ্যা বিদিত হন। যদিও ইনি নিজ সহজাত প্রজ্ঞার সাহায্যে সমস্তই বিদিত ছিলেন, তথাপি, শাস্ত্রমর্য্যাদা-সংরক্ষণার্থ বিদিত বিষয় পুনর্ব্বিদিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শঙ্কর গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই ঋতুদ্বয় ব্যতীত আর অধিক কাল গোবিন্দনাথাশ্রমে বাস করিতে পারেন নাই। বর্ষার অবসানেই তাঁহাকে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীক্ষেত্রে গমন করিতে হইয়াছিল। শঙ্কর বর্ষাঋতুর অবসানে গুরুপদাম্বুজ ধ্যান করিয়া কাশীক্ষেত্রাভি-মুখে যাত্রা করিলেন এবং কিয়দ্দিবস পরেই শিবনগরী কাশী তাঁহার নয়নগোচর হইল।

সে সময়ে কাশীর নগরসন্নিবেশ এখনকার মত ছিল না; অন্যরূপ ছিল। কাশীর যে অংশ এখন জনতায় পরিপূর্ণ, সে অংশ তখন অরণ্যকল্প ছিল। কাশীর যে অংশে এখন শত শত অট্টালিকা, সেই অংশে তখন যজ্ঞীয় যূপ, তাপসগণের আশ্রম, কদম্বের বন ও পিপ্পল বৃক্ষের শ্রেণী শোভা বিস্তার করিত। যে অংশে এখন সারনাথ নামক বক্তস্থান ও ইতরলোকের বাসস্থান, শঙ্করের সময়ে সেই অংশে প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৌদ্ধগণ ঐ অংশে নগর স্থাপন করিয়াছিল। আচার্য্য শঙ্করও এবার ঐ অংশে থাকিয়া যতিধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিবার কামনা করিলেন; বাসের জন্য এক বটবৃক্ষের তলদেশ মনোনীত করিলেন। চোলদেশের সনন্দননামা জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এই শঙ্করাবাস বটমূলে আসিয়া শঙ্করের অনুশাস্য হইলেন। চিৎসুখ ও আনন্দগিরি প্রভৃতি কয়েকজন বিবেকী এই স্থানে বাস করিতেন, তাঁহারাও আজ প্রোক্ত বটমূলে আসিয়া শঙ্করের শিষ্য হইলেন। যিনি শঙ্করের প্রথম শিষ্য, যাঁহার নাম সনন্দন, তিনিই কিছুকাল পরে পদ্মপাদাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কিছুকাল ঐরূপ কাশীবাসের পর শঙ্করের গুরুর আদেশ মনে পড়িল, তদনুসারে তিনি সূত্রভাষ্য প্রণয়নের জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, ব্যাসের প্রিয়তম স্থান বদরিকাশ্রম, সেই স্থানে থাকিয়া সূত্রভাষ্য প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থির করিয়া তিনি অনতিবিলম্বে শিষ্যসহ বদরিকাশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস পরেই বদরিকাশ্রম তাঁহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। এই স্থানের রমণীয়তা প্রভৃতি বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক; সেই জন্য তাহা উপেক্ষিত হইল।

শঙ্কর শিষ্যসহ উক্তস্থানে বাস করিয়া প্রথমতঃ তত্রস্থ যোগীদিগের ও বিবেকীদিগের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও শব্দ-তাৎপর্য্যাদি আলোচনা করিলেন। পরে ব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করিলেন। শঙ্কর যখন সূত্রভাষ্য রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। সূত্রভাষ্য সমাপ্ত হইলে ঐ স্থানে থাকিয়াই

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, এই দশ উপনিষদের প্রসন্নগম্ভীর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে মহাভারতের সারস্বরূপ ভগবদ্গীতার, সনৎসুজাতীয় অধ্যায়ের ও বিষ্ণু-সহস্রনামের ভাষ্য রচনা করিলেন। তদ্ভিন্ন নৃসিংহতাপনীয় ব্যাখ্যা ও মুমুক্ষুদিগের পাঠোপযোগী উপদেশসাহস্রী, আত্মানাত্মবিবেক, মহাবাক্যরত্নাবলী, কতক-গুলি শতক, কতকগুলি [illegible]বেক, কতকগুলি অষ্টক প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থও প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। ঐ সকল পুস্তক অদ্যাপি পঠিত হইতেছে। শঙ্কর কৃত শিব, বিষ্ণু, গণেশ ও দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর স্তোত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সেই স্তোত্র দৃষ্টে কেহ তাঁহাকে শাক্ত, কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ গাণপত এবং কেহ বা সাকারোপাসক ভাবিয়া পরিতুষ্ট হন।

উপরে যে বিষ্ণু-সহস্রনাম ভাষ্যের কথা বলা হইল, দণ্ডী সন্ন্যাসীরা বলেন, ঐ ভাষ্য তিনি গৌড়পদ মুনির অনুমতিক্রমে প্রস্তুত করেন। গৌড়পদ তখন হিমগিরির গুহা আশ্রয় করিয়া বিরল-বাস করিতেছিলেন। শঙ্কর মাণ্ডূক্য উপনিষদের তাৎপর্য্যার্থে সন্দিহান হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে গৌড়পদ তাঁহার বুদ্ধি ও জ্ঞান পরীক্ষার জন্য অর্থাৎ তিনি উপযুক্ত অধিকারী কি না বুঝিবার জন্য, একখণ্ড পুস্তক তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, তুমি যদি এই পুস্তকের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাণ্ডুক্যোপনিষদের তাৎপর্য্য বলিতে পারি। আচার্য্য শঙ্কর দেখিলেন, পুস্তক খানি বিষ্ণুসহস্রনামের পুস্তক। তিনি কতিপয় দিবসের মধ্যে অতি সাবধানতার সহিত তাহার ভাষ্য রচনা করিয়া পরমগুরু গৌড়পদের করে অর্পণ করিলে, তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া শঙ্করকে নিজরচিত মাণ্ডূক্যকারিকা পুস্তক প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, এই কারিকাদ্বারা তোমার মাণ্ডূক্যার্থ নিরবশেষ স্ফূর্ত্তি পাইবে। ইহারই পরে ভাষ্যকার শঙ্কর মাণ্ডূক্য উপনিষদের ও গৌড়পদ-প্রদত্ত সেই মাণ্ডূক্য-কারিকার উপর যার পর নাই উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্য শেষ হইলে, অমন যে রমণীয় বদরীবন, তাহাও তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচার ও তাৎকালিক দুষ্ট মত সকলের নিরাস করিবার জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। অনন্তর অনতিবিলম্বে শিষ্যগণসহ প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখী হইলেন। প্রথমে কাশী, পরে বিন্ধ্যাচল, তৎপরে প্রয়াগে আগমন করিয়া বৌদ্ধ-বিজয়ী ভট্টপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভট্টপাদ অর্থাৎ ভট্টকুমারিল যে সময়ে প্রয়াগ তীর্থে তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার হয়। সেইজন্য তাঁহার সহিত কোনরূপ বিচার-বিবাদ ঘটনা হয় নাই। কিন্তু ভট্টপাদ সেই মরণ সময়ে শঙ্করের মত শুনিয়া ও তাঁহার কৃত সূত্রভাষ্য যথাসম্ভব দেখিয়া বিশেষরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া প্রাণ [illegible]

করিয়াছিলেন। ভট্টপাদ তুষানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছিলেন কেন? সে প্রস্তাব স্বতন্ত্র। প্রবন্ধ বিস্তৃতিভয়ে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। ভট্টপাদের মৃত্যু হইলে শঙ্কর তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে বিশ্বরূপের অথবা মণ্ডন মিশ্রের বসতিস্থান মাহিষ্মতীনগর গমন করিয়াছিলেন। সশিষ্য শঙ্কর কিয়দ্দিবস গমনের পর নর্ম্মদাতীরস্থিত মাহিষ্মতী পুরী প্রাপ্ত হইলেন। সে দিন তাঁহারা নগরপ্রান্তস্থ কোন এক আম্র কাননে থাকিলেন, পরদিন প্রাতে মণ্ডনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই মণ্ডনের সহিত শঙ্করের বহুদিন-ব্যাপী বিদ্যাবিবাদ চলিয়াছিল। অবশেষে মণ্ডন পরাভূত হইয়া পূর্ব্বকৃত পণ বা প্রতিজ্ঞা অনুসারে গার্হস্থ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী ও শঙ্করের অনুশাস্ত হন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মণ্ডন সুরেশ্বর নামে বিখ্যাত হন এবং শঙ্করকৃত সূত্রভাষ্যের উপর যুক্তিপূর্ণ বার্ত্তিক রচনা করেন। শ্রোতৃবর্গ স্মরণ করুন, ইনিই সেই প্রণতিপদ্যোক্ত বার্ত্তিককার।

শাঙ্করী ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, মণ্ডনপত্নী সরস্বতীর সহিতও শঙ্করের বিদ্যাবিবাদ হইয়াছিল। মণ্ডন ও সরস্বতী পরাজয়ের পর তাঁহার তীর্থপর্য্যটনেচ্ছা বলবতী হয়। তাহাতে তিনি পর পর গোকর্ণ, হরিহরালয়, মূকাম্বিকাভবন ও শ্রীবলী-ক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। শ্রীবলীক্ষেত্রে ভাস্কর নামে এক পণ্ডিত দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহার জড়ভরতের ন্যায় অন্তর্জ্ঞানী ও বাহ্যজড় একটী পুত্র ছিল। শঙ্করসমাগমে তাহার ব্রহ্মবিত্ত্ব ও অসংসারিত্ব নিশ্চয় হওয়ায় ভাস্কর অগত্যা তাঁহাকে শঙ্কর-সকাশে রাখিতে বাধ্য হন। এই ত্রয়োদশবর্ষীয় ভাস্কর-পুত্রই শঙ্করের হস্তামলকনামা শিষ্য। মহাপুরুষ শঙ্কর এই নবশিষ্য হস্তামলক ও পুরাতন সনন্দন প্রভৃতির সহিত শ্রীবলীক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৃঙ্গ-গিরিতে গমন ও তথায় এক উৎকৃষ্ট পরিব্রাজকাবাস প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই প্রাসাদ অদ্যাপি শৃংগেরি মঠ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সময়েই তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যুকালীন চিন্তায় পূর্ব্বাঙ্গীকার স্মরণ হওয়ায় শঙ্কর অবিলম্বে আসন্ন-মৃত্যু জননীর নিকটস্থ হন এবং তাঁহার দেহান্ত হইলে তদীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদিও পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে নির্ব্বাহ করেন। ইহারই পরে তিনি সুধন্বা নামক জনৈক রাজার সহায়বল অবলম্বন করিয়া নানাদেশীয় দ্বৈতবাদী ও অদ্বয়বাদী বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে রামেশ্বর ও রামনাথ প্রদেশ, পরে চোল, দ্রাবিড়, কাঞ্চী, কর্ণাট এবং পুনর্ব্বার গোকর্ণ প্রদেশে গমন করিলেন। এবার এই স্থানে তাঁহার শৈব নীলকণ্ঠের সহিত ঘোরতর বিদ্যাবিবাদ, অবশেষে নীলকণ্ঠের পরাজয় ঘটনা হয়। নীলকণ্ঠ-পরাজয়ের পর তিনি সৌরাষ্ট্রাদি দেশস্থ বিদ্যাভিমানীদিগকে পরাভূত করিয়া কৃষ্ণপুরী দ্বারকায় গমন করেন। তৎস্থানীয় পণ্ডিতাভিমানী পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবদিগকে পরাকৃত করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীদিগের প্রতি বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কিরূপ, তাহা উপদেশ করিয়াছিলেন। শঙ্করের কৃত একখানি ভক্তিবাদের গ্রন্থ আছে। মধুসূদন সরস্বতী সেই অবলম্বনে ভক্তিরসায়ন নামে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। শঙ্করের ভক্তিগ্রন্থ

খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র। পরে দ্বারাবতী হইতে অবন্তীনগরে গমন করতঃ ভাস্করাচার্য্যের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী বিদ্যাবিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং জয়লাভ করে নৈমিষ দেশে আসিয়া হর্ষমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে পরাভূত করেন। হর্ষমিশ্র একজন প্রধান নৈয়ায়িক। ইনিই বেদান্তবাদে পরাভূত হইয়া অবশেষে ন্যায়বাদ খণ্ডন ও বেদান্তবাদ স্থাপন উদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শঙ্কর এই হর্ষমিশ্র-পরাজয়ের পর কামরূপ প্রদেশে আগমন করেন, তদ্দেশস্থ অভিনব-গুপ্তনামা অনেক শাক্ত পণ্ডিতকে পরাভূত করেন। পরে কামরূপ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গ দেশে এবং অঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। গৌড়দেশে ঐ সময়ে মুরারিমিশ্র, উদয়ন ও ধর্ম্মগুপ্ত এই তিন মহাবিদ্বান্ বাস করিতেন। তন্মধ্যে উদয়ন প্রধান নৈয়ায়িক। বলা বাহুল্য যে, এই তিন আচার্য্যই শঙ্করকর্ত্তৃক নিমীলিত-নেত্র হইয়াছিলেন। ইতিবৃত্ত-লেখকগণ বলেন, গৌড়দেশে বাসকালে শঙ্করের ভগন্দর রোগ হয়, এবং গৌড়ের রাজা স্বকীয় সুচিকিৎসকবৃন্দদ্বারা তাঁহার যথোচিত চিকিৎসা করান। তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার রোগশান্তি হয়। ইহারই পরে তিনি গৌড়মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরমণ্ডলে গমন করেন। এখানে বিশেষরূপে অদ্বৈতবাদের প্রচার করিয়া পুনঃ শৃঙ্গগিরিতে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার ব্যাসের প্রিয়তমভূমি বদরীবনে আগমন করতঃ পার্থিবী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ শঙ্কর এইরূপে নানাদেশে যতিধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া ও নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বয়সের বত্রিশ বৎসর সমাপ্তে ব্যাসাবাস বদরীবনে যোগাবলম্বনে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন তিনি আমাদের নিকট স্মর্ত্তব্যশেষ। এই স্থানেই শঙ্করের জীবন, জীবনী, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিদ্যা বিষয়ে যে কিছু বক্তব্য ছিল সে সমস্তই পরিসমাপ্ত হইল।

শঙ্করের জীবনবার্ত্তা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যেন মনে না করেন, শঙ্করের জীবনী বর্ণিত-প্রকারের সংক্ষিপ্ত। আমিই অপারগ বিধায় সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি।

মধ্যে মধ্যে আমার মনে শঙ্করের সম্বন্ধে যে তর্ক-বিতর্কের উদয় হয়, সেগুলিও এতদ্-প্রসঙ্গে ব্যক্ত করি, সভ্যগণ তাহার যুক্তাযুক্ততা বিচার করুন।

১। শঙ্করের আবির্ভাবে তাৎকালিক ধর্ম্মজগতের অথবা সাহিত্য-সংসারের কোনরূপ উপকার-অপকার হইয়াছিল কি না?

২। শঙ্করের পূর্ব্বে আর কেহ অদ্বয়বাদী ছিলেন কি না?

৩। শঙ্করকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলে, তাহাই বা কেন বলে?

এই তিন বিতর্ক আমার মনোমধ্যে যখন যখনই উঠে, তখন তখনই আমি [illegible] চিন্তায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যথা—

১। বৌদ্ধেরা এ দেশকে প্রায় ঈশ্বরভাববর্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, [illegible]

আবির্ভাবে সে ভাবের অপগম অর্থাৎ ঈশ্বরাস্তিকতা পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রকে অধঃপাতিত ও বিধ্বস্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, শঙ্করের আবির্ভাবে তাহার পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা সংস্কৃতভাষাকে নষ্টকল্প করিবার চেষ্টা করিতেছিল, পালি প্রভৃতি অপভাষাদ্বারা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, ভট্টকুমারিল ও শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারও প্রতীকার করিয়াছিলেন। কুমারিল, শঙ্কর ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কয়েকজন মহাপুরুষের পূর্ব্বে অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিচারের উপযুক্ত ভাষা অতি সংকীর্ণ অবস্থায় ছিল, পরন্তু ইহাঁদেরই আবির্ভাবে তাহার অঙ্গপুষ্টি ও বিশেষ বিস্তৃতি হইয়াছে। অবিশ্রান্ত কর্ম্ম, নিরন্তর সংসারাসক্তি, এবং চিরকালের মত কর্ম্মত্যাগ, এ সকলের সমাবেশ প্রণালী শঙ্কর মহামতির দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সকল যদি উপকার বলিয়া গণ্য হয় ত উপকার হইয়াছে এবং অপকার বলিয়া গণ্য হইলে অপকারই হইয়াছে।

ঈদৃশ প্রসঙ্গে এক দিন মৃত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত আমার এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, মহাশয়, শঙ্কর বেদান্ত-প্রচারের জন্ত ভত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন? বেদান্তে এমন কি উপকার আছে? আপনি মুক্তির কথা বা পরলোকের কথা বলিবেন; কিন্তু তাহা আমার জিজ্ঞাস্য নহে। আমার জিজ্ঞাস্য—কোনরূপ দৃষ্ট উপকার আছে কি না। তদুত্তরে আমি "কৌতুকপবৃত্তস্ত ফলাদর্শনাৎ" ইত্যাদি বাক্য অনুবাদ করিয়া বলিলাম,—যাহারা কৌতুক নিবৃত্তির জন্ত বেদান্ত পড়ে, অথবা যাহারা বিদ্যাখ্যাতি বিস্তারের জন্ত বেদান্ত পড়ে, তাহারা কোনরূপ দৃষ্ট উপকার পায় বলিয়া আমার বোধ হয় না। কিন্তু যাহারা তদুপদিষ্ট পথে চলিবার জন্ত পড়ে, তাহারা অন্নাধিক দৃষ্ট উপকার পায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। শোক, সন্তাপ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অরিবর্গ তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ করিতে পারে না। আমার বিবেচনায় তাহাই তাহাদের দৃষ্ট উপকার।

শুনিয়া তিনি বলিলেন, জ্ঞানের বিস্তৃতি যে শোক-সন্তাপাদির ও হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির অল্পতার কারণ, তাহা আমি আমাদের স্ত্রীলোকদিগের দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করি। পুত্র-কন্যাদির বিনাশ ও ধনের অপহার হইলে স্ত্রীলোকেরা যত অভিভূত হয়, আমরা তত অভিভূত হই না। হিংসা, দ্বেষ, পৈশুন্য, স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যত প্রবল, আমাদের মধ্যে তত প্রবল নহে।

আমি বলিলাম, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলিতে পারি, বেদান্তদ্বারাও দৃষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কেন না ঐ সকল উপকার বেদান্তোক্ত জ্ঞানের অর্জ্জন ব্যতীত ধনাদি অর্জ্জনদ্বারা পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। কাহার কাহার ধনের তৃপ্তিতে শোকের সঙ্কোচ হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির সঙ্কোচ

হয় না। আমি যখন যখনই বেদান্তের অধিকারি-নির্ব্বাচন-বিভাগ পর্য্যালোচনা করি, তখন তখনই আমার মনে হয়, বেদান্তের এই বিভাগটা নীতি-বিশেষ। বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, অন্যান্য নীতি মাত্র সমাজকে সুশৃঙ্খলে চালাইবার চেষ্টা করে; পরন্তু এ নীতি মনুষ্যের শরীর-বাস ও পৃথিবী-বাস উভয়বিধ বাসকে নির্ব্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব, নিরুদ্বেগ ও দীর্ঘস্থায়ী করিবার চেষ্টা করে। নীতি শব্দের অর্থ কি? এতৎ প্রসঙ্গে আমার এইরূপ মনে হয়, যাহা যাহা মানুষকে ঈশ্বরের, প্রকৃতির, কালের অথবা স্বভাবের হিতকর আদেশের অধীনস্থ রাখিয়া সুখসচ্ছন্দতার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তাহা তাহাই নীতি। এ লক্ষণ আমি বেদান্তের অধিকারি-নির্ণয় বিভাগে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। তাই আমি বলি, বেদান্তও নীতিবিশেষ; সুতরাং ইহলোকেরও সুখসচ্ছন্দতার নেতা। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, যাহারা বেদান্ত-নীতির বিনেয় (শিষ্য,) তাহাদের দশ জন চতুর্হস্ত প্রমাণ এক খণ্ড কম্বলে অনায়াসে বাস করিতে পারে; কিন্তু যাহারা অবিনেয়, তাহাদের দুই জনে এক বিস্তৃত গৃহে বাস করিতে পারে না। পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরে। ইহার সত্যতা গৃহীমাত্রে অনুভব করিতে সমর্থ। আরও একটা দিক্ দেখুন। অন্যান্য দর্শন পাঠে কেবল সেই সেই দর্শনেরই বিষয় বিদিত হওয়া যায়; বরং বেদান্তদর্শন পাঠে সমুদায় আস্তিক নাস্তিক দর্শনের বিষয় বা মত অল্লাধিক পরিমাণে জানা যায়। অতএব, বিবিধ দার্শনিক জ্ঞানে বিভূষিত হওয়া কি দৃষ্ট উপকার নহে? আমার বিবেচনায়, দার্শনিক জ্ঞানে বিভূষিত হওয়া মনুষ্যত্বের অন্যতম অঙ্গ।

রমেশ বাবুর সহিত আমার এই পর্য্যন্ত কথা হইয়াছিল। এক্ষণে যদি কেহ বলেন, যে উপকারের জন্য যে উপদেশ, তাহা আমাদিগকে এক একটী করিয়া বুঝাইয়া দিউন, তাহা হইলে কাযেই আমাকে বাধ্য হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এরূপ জীবনী-প্রবন্ধে ততদূর আলোচনা অসম্ভব।

২। শঙ্করের পূর্ব্বে অদ্বয়বাদ ছিল কি না, এই বিষয়ে আমার বক্তব্য—শঙ্করের পূর্ব্বে শঙ্করগুরু গোবিন্দনাথ, তৎপূর্ব্বে গৌড়পাদ মুনি, তৎপূর্ব্বে শুকদেবস্বামী অদ্বয়বাদী ছিলেন। শঙ্কর গোবিন্দনাথ গুরুকর্তৃকই "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি অদ্বয়ব্রহ্মাত্মবোধক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেজন্য গুরু গোবিন্দনাথের অদ্বয়বাদিত্ব সন্দেহাক্রান্ত নহে। গৌড়পাদ মুনির রচিত যে মাণ্ডুক্য-কারিকা পাওয়া যায়, তাহা পুরা অদ্বয়বাদ। তদ্দৃষ্টে তাঁহারও অদ্বয়বাদিতা সপ্রমাণ হয়। তবে শুক অদ্বয়বাদী ছিলেন কি না সে বিষয়ে অনেক তর্ক উঠিতে পারে বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস—শুকই হউন আর ব্যাসই হউন, যিনি লিখিয়াছেন "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা, ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" তিনি নিশ্চিত অদ্বয়ব্রহ্মবাদী। এতদ্ভিন্ন অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতেও প্রতি পর্ব্বে

অদ্বৈতবাদের সঙ্কেত দৃষ্ট হয়। বনপর্ব্বের অষ্টাবক্রীয় উপাখ্যানে দেখা যায়, জিগীষু অষ্টাবক্র জনক রাজার যজ্ঞসভায় "সোহহং ব্রুহ্মা ব্রাহ্মণানাং সকাশে ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুং আগতোহস্মি" এইরূপ বিস্পষ্ট কথায় ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপন্ন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। অতএব, শঙ্করের ধর্ম্মমতই বলুন, আর দার্শনিক মতই বলুন, কিছুই নূতন নহে, সমস্তই পুরাতন। তাঁহার সন্ন্যাস "ন ধনেন ন প্রজয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, তাঁহার জ্ঞানকারণবাদ "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইত্যাদি উপনিষদ্ মূলক, তাঁহার নির্ব্বিশেষাদ্বৈত বাদ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, তাঁহার নিরাকার বাদ "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বং" "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা" ইত্যাদি উপনিষদ্মূলক, তাঁহার জীবব্রহ্মসিদ্ধান্ত "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক। তাঁহার একজীববাদ "স ঐক্ষত বহুস্যাং" ইত্যাদি বেদমূলক, তাঁহার মায়াবাদ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি বেদমূলক, তাঁহার অভিন্ননিমিত্তোপাদান বাদ "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, এবং তাঁহার জগন্মিথ্যাত্ববাদ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইত্যাদি উপনিষদ্মূলক। অধিক কি বলিব, শঙ্করের এমন একটিও কথা নাই যাহা অবৈদিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাই আমার বিশ্বাস— শঙ্করের ধর্ম্মমত ও দর্শন প্রাচীন ধর্ম্মমতের ও দর্শনপরিপাটীর বিস্তৃতিমাত্র।

৩। তৃতীয় কথা—শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে কেন? "মায়াবাদমসৎ শাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥" শ্লোকটীর মূল্য কি? প্রামাণ্যংকিরূপ? তাহাও জানি না। আমি মাত্র এই বুঝি যে, ব্যাসের পুরাণে বুদ্ধের ও শঙ্করের মতোল্লেখ তত অসম্ভব নহে, নামোল্লেখ যত অসম্ভব। যাহাই হউক, অবশ্য কেননা কোন কারণ আছে, না থাকিলে ঐ কথা উঠিবে কেন। কিন্তু সে কারণ আমার অবিদিত। আমি দেখিতেছি শঙ্কর বৌদ্ধের প্রভেদ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল প্রভেদের অনুরূপ। বৌদ্ধেরা বর্ণাশ্রমবিধানের বিরোধী, কিন্তু শঙ্কর তাহার অনুরোধী; বৌদ্ধেরা দেবদেবী পূজার নিষেধক, কিন্তু শঙ্কর তাহার বিধায়ক; বৌদ্ধেরা জাতিভেদ ব্যবস্থার বিপক্ষ, শঙ্কর তাহার স্বপক্ষ; বৌদ্ধদিগের নীতি ও আচার অবৈদিক, শঙ্করানুমোদিত নীতি ও আচার বৈদিক। এইরূপ দর্শনাংশেও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—শঙ্কর বলেন আকাশ প্রথম ভূত, কিন্তু বৌদ্ধ বলেন "আবরণাভাবোহি আকাশঃ" আবরণের অভাবকেই আমরা আকাশ শব্দে ব্যবহার করি সত্য, পরন্তু আকাশ কোন তত্ত্ব বা পদার্থ নহে। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনে আকাশ অভাব পদার্থ, পরন্তু শঙ্কর দর্শনে উহা ভাব পদার্থ। বৌদ্ধ দ্বিপ্রমাণবাদী, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কিন্তু শঙ্কর ষট্প্রমাণবাদী প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। শঙ্কর বলেন জগৎপ্রপঞ্চ পাঞ্চভৌতিক, বৌদ্ধ-বিশেষ

বলেন, জগৎপ্রপঞ্চ চাতুর্ভৌতিক। বৌদ্ধ স্বভাবকারণবাদী; শঙ্কর ব্রহ্মকারণবাদী। বৌদ্ধের অভিমত স্বভাব জড়শক্তিবিশেষ, শঙ্কর বলেন, আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার পদার্থ, বৌদ্ধ বলেন, আত্মা সবিকার পদার্থ। শঙ্কর বলেন আত্মা নিষ্ক্রিয়, বৌদ্ধ বলেন, সক্রিয়। বৌদ্ধ অহং জ্ঞানকে আত্মা বলেন, যে অহং জ্ঞান অনাদি ও নির্ব্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত নবদ্বার গৃহে অবিচ্ছিন্ন শিখার দীপের ন্যায় নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিয়া রূপালোক ও মনস্কার জন্মায়। রূপালোক শব্দের অর্থ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ প্রভৃতি গ্রহণ করা এবং মনস্কার শব্দের অর্থ—গৃহীত শব্দ স্পর্শাদির ভালমন্দ বা অনুকূল প্রতিকূল প্রভৃতির বিবেচনা (অনুভব করা)। শঙ্কর বৌদ্ধোক্ত আত্মাকে আত্মা বলেন না, অর্থাৎ অহংজ্ঞানকে আত্মা বলেন না। তিনি বলেন, যাহা ঐ অহং-জ্ঞানেরও জ্ঞাতা, সাক্ষী বা প্রকাশক, এবং যাহাদ্বারা উহাদের অস্তিতাব্যবহার সাধিত হইতেছে, সেই চিৎ বা চেতনা নামক পদার্থই আত্মা। বৌদ্ধের মতে অহংজ্ঞান ও আত্ম-চেতনা একই বস্তু; পরন্তু শঙ্করের মতে পৃথক্ বস্তু। শঙ্কর বলেন, অহং একপ্রকার মনোবৃত্তি, সুতরাং জড়; আত্মা তাহার গ্রাহক, প্রকাশক, অস্তিতা-আধায়ক ও সাক্ষীর স্থানীয়। বৌদ্ধমতে আত্মা নানা শরীরে নানা। শঙ্করের মতে সকল শরীরে একই আত্মা জলচন্দ্রের অনুরূপে বিরাজিত। শরীর ও মন প্রভৃতি আধারের ভেদ থাকায় বন্ধ মোক্ষের ও সুখ দুঃখাদি অনুভবের অব্যবস্থা নিবারিত হয়। যে সময়ে শঙ্কর কাশ্মীর দেশে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে জনৈক বৌদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বিজ্ঞানবাদে ও বেদান্ত-বাদে প্রভেদ কি?" শুনিয়া তিনি হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানবাদী আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া জানে, আর বেদান্তবাদী আত্মাকে সচ্চিদানন্দরূপী অদ্বয় প্রত্যগভিন্ন ও নিত্যশুদ্ধস্বভাব বলিয়া মান্য করে। বিজ্ঞানবাদীরা নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ নিরাশ্রয় ভ্রম মান্য করে, আর বেদান্তী পরব্রহ্মনামক অধিষ্ঠান মান্য করিয়া তদাশ্রয়ে মায়িক প্রপঞ্চা-রোপ অঙ্গীকার করে; এই প্রভেদ। এইরূপ আরও প্রভেদ দেখান যাইতে পারে, যদি প্রবন্ধের কায়বৃদ্ধি করা যায়।* যাহাই হউক, এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যাহা জানা গেল

---

* শঙ্কর, প্রভাকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির সময়ে এবং তাঁহাদেরও কিছু পূর্ব্বে যে সকল বৌদ্ধাচার্য্য পৃথিবীতে স্বধর্ম বিস্তার ও পুস্তক প্রণয়ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের দুষ্ট বৌদ্ধমত সকল শঙ্কর প্রভৃতির [illegible] উল্লিখিত ও দোষাক্রান্ত বা যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছে। আমিও সেই সকল কথা এতৎপ্রবন্ধে গ্রহণ করিলাম। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিত আছে, শাক্যমুনির মৃত্যুর অনূ্যন দেড় শত বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্মের ভূরিপ্রচার আরম্ভ হয়, তৎপূর্ব্বে বিরলপ্রচার অবস্থাতেই ছিল। ভূরিপ্রচারের [illegible] নাগার্জ্জুন নামা জনৈক বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত "ধর্ম্মসংগ্রহ" নামক [illegible] "মহাবস্তু অবদান" প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন; সেই সকল পুস্তকের [illegible] [illegible]হিক বৌদ্ধমত সকল দেখিতে পাইবেন।

তাহাকে তাঁহাকে গুপ্তবৌদ্ধ বলা যায় কিনা তাহা শ্রোতৃবর্গই স্থির করিবেন। কেহ কেহ তাঁহার গুপ্তবৌদ্ধতার প্রতি নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

১। শঙ্করও অদ্বয়বাদী, বৌদ্ধও অদ্বয়বাদী।

২। শঙ্কর ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিগ্রহ অর্থাৎ শরীর থাকা মান্য করেন না।

৩। তৃতীয় কারণ, শঙ্কর বৌদ্ধদিগের ন্যায় নির্ব্বাণমুক্তির উপদেষ্টা।

৪। চতুর্থ কারণ, শঙ্করের দর্শনে ভক্তির উপদেশ নাই।

৫। পঞ্চম কারণ, শঙ্কর প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎকে নাই বলেন বা বুদ্ধের ন্যায় মিথ্যা বলেন। এই কারণপঞ্চকের মধ্যে প্রথমোক্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, শঙ্করের অদ্বয়বাদ ও বৌদ্ধের অদ্বয়বাদ একরূপ নহে। শঙ্করের অদ্বয়বাদ ব্রহ্মসত্তাবশেষিত, বুদ্ধের অদ্বয়বাদ শূন্যাবশেষিত।

দ্বিতীয় কারণ—শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের ন্যায় সাকারবাদী নহেন। তাদৃশ নিরাকারবাদ কারণে যদি তাঁহাকে গুপ্তবৌদ্ধ বলিতে হয়, তাহা হইলে জৈমিনি, কপিল, কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিবৃন্দকে গুপ্তবৌদ্ধ না বলি কেন? ঐ সকল দর্শনকার ও শঙ্কর যে কারণে ঈশ্বরের বিগ্রহ অস্বীকার করেন, সে কারণের বর্ণনা বিস্তৃত প্রবন্ধসাপেক্ষ।

তৃতীয় কারণ—শঙ্কর বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাণবাদী। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে নির্ব্বাণ বৌদ্ধের, সে নির্ব্বাণ শঙ্করের নহে। শঙ্করের নির্ব্বাণ স্বতন্ত্র। বৌদ্ধেরা দীপনির্ব্বাণের দৃষ্টান্তে [illegible] যাওয়া অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করেন। শঙ্কর "নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং" ইত্যাদি দৃষ্টান্তে মনোবৃত্তিসম্পর্কবর্জ্জিত অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ প্রয়োগ করেন। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণে অহংজ্ঞানরূপ দীপের বিনাশে শূন্যতাপত্তি, শঙ্করোক্ত নির্ব্বাণে চিত্তবৃত্তির অনুরঞ্জন অভাবে আত্মার নির্ব্বিকার সুখরূপতাপত্তি। অতএব, শঙ্করোক্ত নির্ব্বাণ—

"নির্ব্বেদাদেব নির্ব্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্বিচিন্তয়েৎ।
সুখং বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম নির্ব্বেদাদেব গচ্ছতি।"

এই ব্যাসোক্ত নির্ব্বাণের সহিত সমান।

চতুর্থ কারণ—শঙ্করের দর্শনে ভক্তির কথা নাই। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর ঠিক্ এইরূপ কথা হইয়াছিল। তাহাকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, শঙ্কর ঈশ্বরের আদেশে ভক্তিমার্গ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এইরূপ বুঝি যে, শঙ্করের দর্শনে কেন, কোনও দর্শনে ভক্তির কথা নাই। না থাকিবার কারণ এই যে, দর্শনগুলি সমস্তই বৈদিক উপকরণে রচিত, পৌরাণিক উপকরণে নহে। যখন বেদের কুত্রাপি ভক্তির কথা নাই, অর্থাৎ আজকাল আমরা ভক্তিকে যে ভাবে জানি বা দেখি, সে ভাবের ভক্তির কথা নাই, এমন কি, ভক্তি শব্দটী পর্য্যন্ত নাই, তখন তদনুযায়ী দর্শনে ভক্তিবাদ থাকিবে কেন? এমন মনে করিবেন না যে আমি ভক্তিবাদকে বেদবাহ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছি। ভক্তিবাদ যখন বেদার্থবাদী পুরাণের অভিমত, তখন কাহার সাধ্য ভক্তি-

যাদকে বেদবাহ্য বলে। যাঁহারা তলাইয়া বুঝিবার অথবা চিন্তা করিবার অবসর পান না, তাঁহারা ভক্তিবাদের বেদমূলকত্ব বুঝিতে পারিবেন না। বেদে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এই ত্রিবিধ উপদেশ আছে। প্রথমে সতত সংসারোন্মুখ চিত্তকে সংযত করা ও তাহার মালিন্য মার্জ্জন করা আবশ্যক বিধায় প্রথমাধিকারীর প্রতি প্রথমে কর্ম্মকরণের উপদেশ; অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সংযতেন্দ্রিয় মধ্যমাধিকারীর প্রতি উপাসনা করিবার আদেশ। তৎপরে উত্তমাধিকারীর জন্য সপরিকর তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত বৈদিক উপাসনাই বৈদিক কোন কোন কর্ম্মের সহিত মিশিয়া ভজনা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিক উপাসনা পূর্ব্বে মাত্র সগুণব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপারে (ধ্যানে বা চিন্তনে) পর্য্যবসিত ছিল। পুরাণকার ঋষিরা সুগমতার জন্য ব্রহ্মকে মূর্ত্ত ঈশ্বরে আনিয়া, তাহাতে রূপ, লাবণ্য, লীলা, মাধুরী প্রভৃতি যোগ করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্যই আমরা ভক্তির বহিরঙ্গে মূর্ত্তি-পরিচর্য্যাদি কায়িক ব্যাপার ও স্তব স্তুতি প্রভৃতি বাচিক ব্যাপার এবং অন্তরে ধ্যান, আসক্তি, রসাস্বাদ ও দশানামক সমাধিবিশেষ প্রভৃতি মানস ব্যাপার দেখিতে পাই। রামানুজ স্বামীও ভক্তিকে উপাসনাবিশেষ বলিয়াছেন। তাই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী অতি বিশদযুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন, বৈদিক উপাসনা মুক্তির প্রতি যেরূপ কারণ, পৌরাণিক ভক্তিযোগও সেইরূপ কারণ। উপাসনার ফল মুক্তি নহে, কিন্তু একাগ্রতা; ভক্তিরও শেষ ফল ভজনীয় পদার্থে চিত্তের তন্ময়ীভাব; মুক্তি নহে। মুক্তি উহার অনেক পরে, তাহা তজ্জনিত সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা [illegible] হয়। সম্যক্ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান একই অর্থের বোধক। তথা একাগ্রতা, [illegible], তন্ময়ীভাব, তদাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তি, সম্প্রজ্ঞাতসমাধি এই সমস্তই তত্ত্বজ্ঞান পদাভিধেয় মুক্তিকারণ জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম। সেই জন্যই অন্যান্য দর্শনে "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" এবং শাঙ্করদর্শনে "পাকস্য বহ্নিবজ্‌জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন সিধ্যতি" ইত্যাদি [illegible] কথা অভিহিত হইয়াছে। শ্লোকটীর মর্ম্মানুবাদ এইরূপ—পাকনিষ্পত্তির প্রতি কাষ্ঠ, স্থালী, চুল্লী ও বহ্নি প্রভৃতি বহু কারণ থাকিলেও যেমন বহ্নি তাহার অসাধারণ কারণ, তেমনি, মুক্তির প্রতি ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কয়েক প্রকার কারণ থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞান তৎপ্রতি অসাধারণ কারণ। লোষ্ট্রের দ্বারা চুল্লীর কার্য্য, তৃণের দ্বারা কাষ্ঠের কার্য্য এবং পত্রপেটকের দ্বারা স্থালীর কার্য্য চলিতে পারে; কিন্তু বহ্নির কার্য্য চলিতে পারে এমন কিছুই নাই। তাহা নাই বলিয়াই কাষ্ঠ চুল্ল্যাদি সাধারণ কারণ ও বহ্নি অসাধারণ কারণ। কাষ্ঠ চুল্ল্যাদি সংযোজনের অব্যবহিত পরে পাক নিষ্পত্তি হয় না, কিন্তু বহ্নি প্রজ্বলনের অব্যবহিত পরে তাহা হয়। সেইজন্য কাষ্ঠাদি [illegible] দূর কারণ বা পরম্পরা কারণ ও বহ্নিকে নিকট অর্থাৎ সাক্ষাৎ কারণ বলা যায়। এইরূপ ভক্ত্যুদ্রেকের অব্যবহিত পরে মোক্ষসিদ্ধি হয় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরে তাহা হয়। সেই জন্যই ভক্তি দূরকারণ ও তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ কারণ। অতএব, ভক্তিকে [illegible]

হিসাবে মুক্তিকারণ বলা যায়, সে হিসাবে মুক্তিকারণ আরও অনেক আছে। অধিক কি বলিব, যে সকল মনোবৃত্তি শাস্ত্রান্তরে রিপু বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকল মনোবৃত্তিও তন্ময়ীভাব উৎপাদন দ্বারা ভক্তির ন্যায় মোক্ষ কারণ হইতে পারে। ভক্তদিগের ভক্তিশাস্ত্রের একটি মাত্র শ্লোক বলিলে বোধ হয় অভিহিত বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইবে। যথা—

> "কামাৎ গোপ্যঃ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
> সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ো স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥"

গোপীরা কামের দ্বারা, কংস ভয়ের দ্বারা, শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষ দ্বারা, বৃষ্ণিবংশীয়েরা কুটুম্বসম্বন্ধের গাঢ়তার দ্বারা, স্নেহের দ্বারা তোমরা অর্থাৎ বসুদেব দেবকী ও নন্দ যশোদা প্রভৃতি এবং ভক্তির দ্বারা আমরা অর্থাৎ অক্রূর প্রভৃতি মোক্ষভাজন হইয়াছে ও হইয়াছি। ভয়ের দ্বারা চিত্ত তন্ময় হওয়ার দৃষ্টান্ত তৈলপায়িকা নামক পতঙ্গ। তৈলপায়িকা, কাচপোকার ভয়ে এত অভিভূত হয় যে, তাহার চিত্ত কাচপোকা-তন্ময় হইয়া পড়ে, ক্রমে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রোতৃবর্গ এখন বুঝুন, ভক্তি মুক্তির প্রতি কিরূপ কারণ। ভক্তি যেমন ভক্তকে তন্ময় করিয়া তুলে, তেমনি, কামক্রোধাদিও কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে কামুক প্রভৃতিকে তন্ময় করিয়া তুলে। ভক্তি যেমন তন্ময়ভাব দ্বারা অবশেষে মোক্ষ কারণ হয়; তেমনি, কামক্রোধভয় প্রভৃতি মনোবৃত্তিও উপযুক্ত অবস্থায় তন্ময়তা উৎপাদন দ্বারা মোক্ষ কারণ হইয়া থাকে। তাহা না হইলে কংস প্রভৃতির মুক্তি হইত না এবং ঋষিও ঐরূপ বচন লিখিতেন না। আসল কথা, তন্ময়তা। তন্ময়তা সাধনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সখীভাবের ভজনও কামজ তন্ময়তা সাধনের উপায়বিশেষ। উপনিষৎ শাস্ত্রও ব্রহ্মোপাসককে ব্রহ্মতন্ময় করাইবার জন্য এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

> "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
> অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥"

প্রণব অর্থাৎ ওঁকার যেন ধনুক, আত্মা অর্থাৎ জীব যেন শর, ব্রহ্ম যেন লক্ষ্য। উপাসক অতি সাবধানে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে জীবরূপ শরদ্বারা বিদ্ধ করিবেন। শর যেমন তন্ময় হয়, তাহার ন্যায় তন্ময় হইবেন। শর লক্ষ্যমধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিলে তাহাকে আর দেখা যায় না; সুতরাং তন্ময় হইয়াছে বলা যায়।

যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি মুনিও "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের দ্বারা ভক্তি নামক ঈশ্বর প্রণিধানকে তন্ময়তাপত্তি নামক সমাধির বৈকল্পিক কারণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে তন্ময়তাপত্তিরূপ সমাধি জন্মে, তেমনি, তাহা ভক্তিনামক ঈশ্বর প্রণিধানদ্বারাও জন্মে। পতঞ্জলির ঈশ্বরপ্রণিধানই ভক্তিমীমাংসার "ঈশ্বরে পরানুরক্তি-র্ভক্তিঃ" এই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে এবং উহারই ভক্তির, উপাসনার ও ধ্রুবানুস্মৃতি নামকত্ব রামানুজের "উপাসনং স্যাৎ ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনাৎ নির্বচনাচ্চ" "মোক্ষ মুক্তির্নিদ্ধ্যাসাৎ

হয় অর্থাৎ তাঁহাদের নির্ব্বাণমুক্তি হয় না। হয়ও না, তাহারা তাহা চাহেও না। এ বিষয়ে শঙ্করের অনেকশত যুক্তিবাক্য থাকিলেও প্রবন্ধবিস্তারের ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। কথা এই যে, দর্শনকারগণ, বিশেষতঃ শঙ্কর, প্রকৃত মুমুক্ষু বৈরাগ্যবান্ অধিকারীদিগের জন্ম জ্ঞানযোগের সুপ্রশস্ত পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। সেজন্ত তাঁহাদের দর্শনে ভক্তিপ্রাধান্ত স্থান পায় নাই। মধুসূদন সরস্বতীও জ্ঞানযোগের ও ভক্তি-যোগের বিভিন্ন অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত কোমল, সহজে গলিয়া পড়ে, যাহাদের বিশ্বাস, বিচার ও প্রমাণ চাহে না, যাহাদের মতি বৈরাগ্যের দিকে আদৌ যায় না, তাহারাই ভক্তিপথের পথিক হোক; আর যাহারা তদ্বিপরীত, তাহারা জ্ঞানপথে গমন করুক।"

শঙ্করের গুপ্তবৌদ্ধতার অনুমাপক চতুর্থ কারণ অনুশীলিত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক পঞ্চম কারণ অনুশীলনে কি পাওয়া যায়।

পঞ্চম কারণ এই যে, শঙ্কর প্রত্যক্ষ জগৎকে মিথ্যা বলেন।

বোধ হয় শঙ্কর বুঝিয়াছিলেন, জগৎ দেখিতে যে প্রকার ইহার তত্ত্ব বা রহস্য সে প্রকার নহে। তত্ত্ব বা রহস্য অন্য প্রকার। কেননা যখনই চিন্তা ও অনুসন্ধান করা যায়, তখনই দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক দৃশ্য আপাত দৃষ্টিতে একপ্রকার, পরন্তু বিচার দৃষ্টিতে অন্যপ্রকার। সুতরাং মনে হয়, দৃশ্যপ্রপঞ্চের ঠিক স্বরূপ কি? তাহা এই বাহ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্ব্বাচিত বা নির্ণীত হইবার নহে। ইন্দ্রিয়গণ ব্যবহারিক প্রমাণ হইলেও পারমার্থিক প্রমাণ নহে। কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গণ ব্যবহার চলিবার উপযোগী এক একটী সামান্যাকারের জ্ঞান জন্মাইয়া ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া দেয়; এইমাত্র তাহাদের শক্তি বা স্বভাব; পরন্তু সে সকলের যাহা ঠিক্ স্বরূপ, তত্ত্ব বা রহস্য, তাহার জ্ঞান জন্মায় না। এই মর্ম্মে শ্রুতি—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

মনে করুন আমরা চন্দ্রমণ্ডলকে বিতস্তিপ্রমাণ দেখি, তাই বলিয়া কি তাহা বিতস্তিপ্রমাণ? তাহা নহে। তাহা অনেক শত যোজন বিস্তৃত। চক্ষু আকাশকে কটাহতলবৎ গোল ও নীলবর্ণ দেখে, অথচ আকাশের স্বরূপ বা তত্ত্ব তাহা নহে। চক্ষু মরুস্থলে জলপ্রবাহ দেখে; অথচ তাহা জল নহে, তাহা সৌর কিরণ। চক্ষু স্বসমীপস্থ তিলকালক দেখে না, তাই বলিয়া তাহার নাস্তিতা হয় না। এইরূপ বিষয়ে প্রমাণচিন্তকগণের কথা এই যে, অতিদূর, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়বধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা, বিকলতা ও শক্তিপ্রতিরোধ, মনের অনবস্থিতি, দৃশ্যের সূক্ষ্মতা ও স্থিতিবৈপরীত্যাদি দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্ব্বদাই বিপর্য্যস্ত। এমন কি যাহা আছে, তাহাকে নাই বলিয়া এবং যাহা নাই তাহাকে আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। ইন্দ্রিয়গণের আর এক দোষ এই যে, তাহারা পশুপক্ষ্যাদিগণের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যগণের মধ্যেও অসমান, অর্থাৎ সমশক্তিক নহে। সেই কারণে আমি যে প্রকার দেখি, তুমি

ঠিক [illegible] [illegible]কার দেখ না। একের দর্শনজ্ঞান অপরের দর্শনজ্ঞানের সহিত কদাচ সমান হয় না; [illegible] কিছু না কিছু প্রভেদ থাকে;—প্রভেদ থাকে বলিয়াই তুমি যাহাকে সুন্দর সুন্দরী দেখ, আমি তাহাকে অসুন্দর অসুন্দরী দেখি। মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই চক্ষু দে[illegible]বার জন্য বটে, কিন্তু সকলের দেখা সমান নহে। এমন অনেক পদার্থ আছে,—[illegible]—যাহাকে পশুরা একপ্রকার দেখে, আমরা আর একপ্রকার দেখি, [illegible] পক্ষীরা অন্য প্রকার দেখে। এমন যে আলোকময় সূর্য্যমণ্ডল, উলূকেরা তাহাকে অন্ধকারময় দেখে। যে অন্ধকারে আমরা কিছুমাত্র দেখিতে পাই না, তাহা [illegible] অধিক অন্ধকারে বিড়াল প্রভৃতিরা দেখিতে পায়। এরূপ দর্শনবিপর্য্যয় দৃষ্টির [illegible]ন কারণকূটের ও দর্শন-প্রক্রিয়ার দোষেও ঘটিতে পারে এবং দৃশ্য পদার্থের [illegible] ঘটিতে পারে; অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের যদি কোন নিয়মিত রূপ, গুণ, শক্তি, সামর্থ্য, [illegible] প্রকার না থাকে, সমস্তই যদি অনির্দ্দিষ্টস্বভাব হয়, তাহা হইলে দর্শন-বিপর্য্যয়ের প্রতি [illegible] অনির্দ্দিষ্টস্বভাবতাকেও কারণান্তর বলিতে পারি।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বা দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তু একই, অথচ আমার নিকট একপ্রকার, অপরের নিকট আর এক প্রকার। মনুষ্যের নিকট একপ্রকার, আবার পশুপক্ষীর নিকট অন্যপ্রকার শক্তিসম্পন্ন। যে ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প মনুষ্যশরীরে নির্ব্বিষ, সেই ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প গোপশুর শরীরে বিষোল্বণ। পক্ষান্তরে আরও দেখা যায়—কোনও পদার্থের আকার প্রকার, পরিমাণ, শক্তি, রূপ, গুণ, সত্তা, কিছুই স্থায়ী নহে, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। আজ এক প্রকার, আবার কাল অন্য প্রকার। সেই সকল পরিবর্ত্তিত প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারটী যে ঠিক্ তদ্‌বস্তুর স্বরূপান্তর্গত, তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? যৌবনই শরীরের তত্ত্ব, না বাল্যই তত্ত্ব, না বার্দ্ধক্যই তত্ত্ব? পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর অন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরের কিছুই থাকে না; অস্থি, মাংস, ত্বক্ ও লোম প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে আমরা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে এই বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডেরও তিন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই;—জাগ্রতে এক প্রকার, স্বপ্নে এক প্রকার, আবার সুষুপ্তিতে অন্য প্রকার। জাগ্রতে বিস্পষ্ট বা জাজ্বল্যমান, স্বপ্নে অস্পষ্ট, সুষুপ্তিতে অভাব বা অভাববৎ। আমরা ভাবি ও [illegible] বটে,—জগতের পরিবর্ত্তন নহে, আমাদের জ্ঞানেরই পরিবর্ত্তন; কিন্তু যদি একই [illegible] আমাদের সকলেরই জাগ্রৎ, সকলেরই স্বপ্ন ও সকলেরই সুষুপ্তি হওয়ার নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, ঐ পরিবর্ত্তন আমার কি জগতের। কল্পান্তকালেই [illegible] আর যুগবিপ্লবেই হউক, সমুদয় জীবের সুষুপ্তি হইলে, তখনও যে এই [illegible] স্বরূপে থাকিবে অথবা এখনকার মত থাকিবে কিংবা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, [illegible] সাক্ষী কে? অতএব, যেমন ঐন্দ্রজালিক বৃক্ষকে ও [illegible] আকৃতি [illegible] বৃক্ষকে আমরা আছে বলিতে পারি, নাই বলিতে পারি, সত্য বলিতে পারি, মিথ্যা

বলিতে পারি, তেমনি এই জগৎকে আছে বলিতে পারি, নাই বলিতেও পারি, সত্য বলিতে পারি, মিথ্যা বলিতেও পারি। ইহাই শঙ্করোক্ত অনির্ব্বাচ্যবাদের অর্থ বা মর্ম্ম। সেই জন্যই শঙ্কর সত্তাসামান্যকে প্রাতীতিক, প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক,—এই চারি প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন, জগতে অন্য প্রকার সত্যতা থাকে থাকুক, পারমার্থিক সত্যতা নাই। যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই সমান থাকে, যাহার ক্ষয়োদয় বা পরিবর্ত্তন কস্মিন্ কালেও নাই, তাই পারমার্থিক সত্য। এরূপ সত্যতা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই নাই।* শঙ্করের এই উপদেশে বুঝিতে হইবে, শঙ্কর যে, জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, সে বলা ঐ ভাবের বলা। তিনি পারমার্থিক সত্যতার নিষেধ ব্যতীত ব্যবহারিক প্রভৃতি সত্যতার নিষেধ করেন নাই; যথা,—

"দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ ॥"

অর্থ এই যে, যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাবৎ এই সকল লৌকিক ব্যবহার ও ব্যবহার্য্য সমস্তই ব্যবহার দশায় সত্যবৎ হইতে থাকে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানে ব্যবহারাতীত হওয়ার পর এ সমস্তই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। এ প্রকারের জগন্মিথ্যাত্ববাদ বৌদ্ধাভিমত কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

অপিচ, শঙ্করের এই দ্বৈতমিথ্যাত্ববাদ সম্বন্ধে আমার মনে অন্য এক প্রকার বিতর্কাদির উদয় হয়। আমার মনে হয়, শঙ্কর দ্বৈতকে মাত্র মিথ্যা ভাবিতে বলিয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে উপাসনা প্রসঙ্গে গুণাতীত ব্রহ্মে সত্য সঙ্কল্পাদি গুণ ভাবিবার অর্থাৎ ধ্যান করিবার উপদেশ আছে; যেমন অক্ষরাত্মক ওঁকারে ব্রহ্ম ভাবিবার অর্থাৎ ধ্যান করিবার আদেশ আছে; সেইরূপ, দ্বৈত থাকিলেও তাহাতে দ্বৈত নাই; দৃষ্ট দ্বৈত মিথ্যা, ঐন্দ্রজালিক বৃক্ষের ন্যায় ও দৃষ্ট রজ্জুসর্প প্রভৃতির ন্যায় মিথ্যা, এইরূপ ভাবিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভাবনার বলে দ্বৈতমিথ্যাত্বে সিদ্ধি লাভ করিলে অর্থাৎ তদ্বশীকৃত হইলে তখন অবশ্যই নিষ্প্রতিবন্ধকে নির্ব্বাণপ্রদ অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান চিরকালের

---

* সত্য শব্দ সৎ শব্দ হইতে উদ্ভূত। "আছে" এইরূপ বোধের বিষয় হইলেই তাহাকে সত্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার বিভাগ বা শ্রেণী স্থির করা আবশ্যক। নচেৎ কার্য্য বা লোকযাত্রা চলিবে না। তাই শঙ্কর বলেন, থাকা অনেক প্রকার। যাবৎ স্বপ্ন তাবৎ তাহার বিষয় 'আছে' বলিয়া বিভাবিত হইয়া থাকে এবং কল্পনার আলম্বন কল্পনাকাল পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। তথা শুক্তিকার রৌপ্যদর্শনবিরোধী না হওয়া পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। আবার এমন বিষয় আছে যে, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান চিরকাল অক্ষুণ্ণ সত্তায় আছে। অতএব, থাকার বা সত্যতার বিভাগ প্রাতীতিক, প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। যাবৎ প্রতীতি, তাবৎ থাকে, পরে থাকে না, এইরূপ হইলে প্রাতীতিক। স্বপ্ন, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি, এই তিন স্থলে প্রাতিভাসিক। গিরি, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বতাদি বিষয়ে ও ঘট, পট, গৃহ, বৃক্ষাদি বিষয়ে ব্যবহারিক এবং কেবলমাত্র আত্মায় পারমার্থিক সত্য স্থির।

ও সমুদায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্ম। ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে অধিক কথা বলিতে পারিলাম না; কেবল বিশ্বাস-উৎপাদনার্থ শঙ্করদীকারের কয়েকটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"অনিবৃত্তেঽনীশস্থত্বে দ্বৈতে তস্য বৃথাত্মতাম্।
বৃদ্ধ্যা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্ত্বৈকাবাদিনা॥
প্রলয়ে তন্নিবৃত্তে তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ।
বিরোধিদ্বৈতভাবেঽপি ন শক্যং বোদ্ধুমদ্বয়ম্॥
অবাধকং সাধকঞ্চ দ্বৈতমীশ্বরনির্ম্মিতম্।
অপনেতুমশক্যঞ্চেদাস্তাং তদ্দ্বিষাত্তে কৃতঃ॥"

এতদ্ভিন্ন আর একটি শ্লোক আছে; সেই শ্লোকটী মণ্ডনের দীক্ষাকালে আচার্য্যের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। যথা,—

"ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ॥"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও পর্য্যালোচনা করিয়া আমার মন শঙ্করকে গুপ্ত বৌদ্ধ বলিতে অগ্রসর হয় না। জানি না, কি জন্য আমার মনে হয়, যেন এদেশের মুনি ঋষিদের মত ও ঘোষণা এইরূপ যে, ভারতবাসীরা সকলে এক হইয়া বেদ রক্ষা করুক, বেদাচার প্রতিপালন করুক, বেদবিধির দাসত্ব করুক,—করিয়া শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, ঈশ্বরভক্ত ও ঈশ্বরনাস্তিক, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই হউক, কিন্তু যিনি বেদবিধির দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইবেন, তাঁহাকে আর্য্যসমাজ-বহির্ভূত হইতে হইবে। এইরূপ আর্য আদেশ বুদ্ধকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই বলিয়াই বুদ্ধ আর্য্যসমাজ-বহিষ্কৃত। কিন্তু শঙ্কর ঐ আদেশ অতি সাবধানতার সহিত চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার দোষ এই যে তিনি কেবল "তত্ত্বজ্ঞান" "তত্ত্বজ্ঞান" করিয়া পাগল হইয়াছিলেন। ঐরূপ পাগলামীকে দোষগুণ যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পারেন।

শঙ্করের পর যে সকল মহাপুরুষ আমাদের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধ অপেক্ষা অধিক চতুর বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের এমনই সুকৌশল যে, বেদের দাসত্ব করিতে হইতেছে না, অথচ বেদবাহ্য বলিয়া অপযশভাজন হইতেও হইতেছে না। আজকাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী ও বেদবিধির অননুগামী দল বিশেষের পুষ্টি অধিক। অথচ তাঁহারাই আজকাল পরম হিন্দু এবং তাঁহাদেরই নিকট শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ! শঙ্করের দল আজও বেদবিধির দাসত্ব করিতেছেন। শঙ্করের সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা অদ্যকার সভায় ব্যক্ত করিলাম, সুধীগণ সে সকল কথার দোষ ও আমার অজ্ঞতার প্রতি ক্ষমা করিবেন।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস মানবধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে অনাত্মবাদী নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া কোটি কোটি মনুষ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; এমন কি, ভক্ত সংখ্যা অনুসারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পৃথিবীর আর সকল ধর্ম্মের মধ্যে তাহাকে সর্ব্ব প্রধান আসনের যোগ্য বলিয়া মানিতে হয়? বুদ্ধদেব প্রকাশ্য ভাবে নাস্তিক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন তাহা নহে, তথাপি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে তাঁহার ধর্ম্মকে 'নিরীশ্বর' ধর্ম্ম বলা অসঙ্গত বোধ হয় না; আর ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে মত ও বিশ্বাস জনসাধারণে প্রচলিত ছিল, তিনি তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা ত্রিবিদ্যাসূত্রে দেখিতে পাই বুদ্ধদেব কি ভাবে আর্য্যদেবতা ব্রহ্মকে বৌদ্ধ মন্দিরে স্থান দান করিয়াছেন। এই সূত্রে ব্রাহ্মণ যুবকদ্বয়ের প্রতি তাঁহার যে উপদেশ আছে, তাহাতে ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বুদ্ধপ্রদর্শিত পথ বিশুদ্ধ নীতিমার্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-দমন, বাসনা-বিসর্জ্জন এই সকল উপায়ে ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, দয়া, বিশ্বব্যাপী মৈত্রী-গুণে, আত্মোন্নতি সাধন করাই তাঁহার মতে ব্রহ্মসম্মিলনের অব্যর্থ উপায়। বৌদ্ধধর্ম্ম-নীতির চারিটী প্রধান তত্ত্ব 'ধর্ম্মচক্র' বলিয়া বৌদ্ধসমাজে প্রসিদ্ধ আছে, স্বয়ং বুদ্ধ সেই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার বিবরণ বুদ্ধজীবনীতে বর্ণিত; সে জীবনী সংক্ষেপে এই—

গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টের পূর্ব্বতন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত কপিলবাস্তু নগরে শাক্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র, তাঁহার মাতা মায়াদেবী, ভার্য্যা যশোধরা ও পুত্র রাহুল। যখন তাঁহার ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন সংসার দুঃখময় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এই দুঃখভার হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধন উদ্দেশে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হন। এই মহান্ সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া একরাত্রে যখন তাঁহার প্রিয়তমা যশোধরা শিশুটিকে কোলে লইয়া রাজভবনে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় তিনি চুপে চুপে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথমে মগধরাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে, পরে গয়ায়, তদনন্তর বারাণসীতে গিয়া ধ্যান ধারণা সাধনা ও ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত বৎসর ধরিয়া তিনি উপোষণ প্রভৃতি তপশ্চর্য্যায় রত থাকিয়া পশ্চাৎ

অভীপ্সিত ফললাভে বঞ্চিত হইয়া তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহার প্রথম পাঁচটী শিষ্য তাঁহাকে উদরপরায়ণ বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হন। এই অসহায় অবস্থায় তিনি এক রাত্রে এক বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রবুদ্ধ হইলেন; তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সেই অবস্থায় তিনি জগতের যে কার্য্য কারণ শৃঙ্খল অবলোকন করেন, তাহা এই:—

অবিদ্যা হইতে সংস্কার ( সংস্কার )
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান ( সংজ্ঞা )
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ
নামরূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়
ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ
স্পর্শ হইতে বেদনা
বেদনা হইতে তৃষ্ণা
তৃষ্ণা হইতে উপাদান ( আসক্তি )
উপাদান হইতে ভব
ভব হইতে জন্ম
জন্ম হইতে রোগ শোক জরা মৃত্যু দুঃখ যন্ত্রণা।

অবিদ্যাই সকল দুঃখের মূল। অবিদ্যা নাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়, সংস্কার বিনষ্ট হইলে সংজ্ঞা বিনষ্ট হয়, পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; পরিশেষে জরা মৃত্যু রোগ শোক, সর্ব্বদুঃখ বিদূরিত হয়। এইরূপে দুঃখের উৎপত্তিকারণ ও মূলোচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিলেন।

এই গভীর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'মার' নামক রাক্ষস, দৈত্য বা শয়তান কত ভয়, কত প্রলোভন দেখাইয়া অশেষ প্রকারে পীড়ন দ্বারা, শয়তান যেমন যীশুখৃষ্টের প্রতি করিয়াছিল, বুদ্ধকেও সেইরূপ বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বুদ্ধ অটল রহিলেন। এইরূপে বুদ্ধত্ব পাইবার পর তিনি একাকী সন্দিগ্ধ মনে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে বিতরণ করিবেন কি না এই সমস্যা। অবশেষে ব্রহ্মা সহাম্পতি স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ও উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করিলেন। ব্রহ্মার প্ররোচনায় বুদ্ধদেব সত্য প্রচারে বাহির হইলেন; প্রথমে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্য সেই পঞ্চ ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান মানসে বারাণসীক্ষেত্রে তাঁহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে বসিবার আসন দিবে না ও তাঁহার কোনরূপ আতিথ্য করিবে না স্থির করিয়াছিল; কিন্তু তিনি

নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার সুন্দর গম্ভীর মূর্ত্তি অমানুষ প্রশান্তভাব দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিল; তথাপি পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া কেহ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে—কেহ তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করে—ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিও না। তথাগত এখন সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, দিব্য জ্ঞানলাভে পূর্ণকাম হইয়াছেন। আমার উপদেশ শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে; এক দিকে বিষয়লালসা, ভোগাসক্তি,—অন্যদিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর শোষণ। আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি—সেই অষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে, ক্লেশের মূলোচ্ছেদ হইবে,—শান্তি ও নির্ব্বাণ লাভ তাহার অব্যর্থ ফল।"

এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা আশ্বস্ত হইলেন ও তখন বুদ্ধদেব যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাই ধর্ম্মচক্র,—তাহাতে চারিটী গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে :—

প্রথম।—সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরামরণ দুঃখময়; যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে মিলনে দুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগ দুঃখময়।

দ্বিতীয়। বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূলকারণ।

তৃতীয়।—এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই দুঃখ-নিবৃত্তি।

চতুর্থ। দুঃখনিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ আছে সেই পথ আশ্রয় করিয়া চলিলেই মুক্তি ও ফল লাভ হয়।

সে পথ কি?—না

১। সম্যক্ দৃষ্টি

২। সম্যক্ সঙ্কল্প—সঙ্কল্প ঠিক রাখা।

৩। সম্যক্ বাক্য—সত্য সরল প্রিয়বাক্য বলা।

৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত—সদাচার।

৫। সম্যক্ আজীব—সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধুজীবিকা অবলম্বন।

৬। সম্যক্ ব্যায়াম—আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন।

৭। সম্যক্ স্মৃতি—ধারণা ঠিক রাখা।

৮। সম্যক্ সমাধি—জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সকলের ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন।

এই অষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে পথে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, অবিদ্যা প্রভৃতি যে কয়েকটী সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট পুণ্যপথে চলিলে দুঃখ, শোক অতিক্রম করিয়া জীব নির্ব্বাণ পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইবেন।

শাক্যবুদ্ধ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সে সময়ে বৈদিক পূজার্চ্চনা কতকগুলি জটিল কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে, এই সকল ক্রিয়াকর্ম্মের উপদেশদাতা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত—

তাঁহার আধিপত্যের সীমা নাই। তিনি ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে*—ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে—ব্রাহ্মণদিগের বাহ্যাড়ম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে—তাঁহার সরল ধর্ম্ম, সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী, আত্মসংযম, সদাচার, প্রচলিত সহজ গ্রাম্য ভাষায় আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রচার করিলেন। তিনি এইরূপে উৎসাহ এবং ওজস্বিতা সহকারে প্রায় বৎসর কাল অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্ষমতানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত থাকেনএবং অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর দেহত্যাগ করেন। বারাণসীতে অবস্থিতি কালে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষু তাঁহার উপদেশক্রমে দীক্ষিত হয়। ক্রমে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বর্ষানন্তর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে একত্র করিয়া এই উপদেশ দিলেন "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আমার উপদেশ লাভে এইক্ষণে পঞ্চরিপু দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছ। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া উচ্চ নীচ সকল লোকের মধ্যে আমার উপদিষ্ট সত্য ঘোষণা কর। আমি এক্ষণকার মত উরুবেলায় বনে গিয়া আমার ব্রত উদ্‌যাপন করি।" উরুবেলায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া তিনি কতিপয় নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন এবং সেখান হইতে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে সশিষ্য যাত্রা করিলেন। রাজা বড় সম্মানপূর্ব্বক বুদ্ধদেবের দর্শনও উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরদিন তাঁহাকে ভিক্ষুমণ্ডলী সহ রাজবাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধদেব যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে বেণুবন (বাঁশ বন) নামক এক সুরম্য উদ্যান গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বৌদ্ধ সমাজকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। বুদ্ধদেব এখানে অনেক বৎসর বর্ষকাল যাপন করেন এবং তাঁহার অনেক উপদেশ এখান হইতেই প্রদত্ত হয় বলিয়া এই স্থান বৌদ্ধদের মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ।

ইত্যবসরে এক সময়ে তিনি কপিলবাস্তু গিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে রাজ্য হইতে প্রজাবৎসল যুবরাজ যখন বৈরাগ্য-দীপ্ত হৃদয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সে এক কাল, আর এইক্ষণে সন্ন্যাসী বেশে, মুণ্ডিত কেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া গৌতম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি যেখানে ছিলেন সত্বর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং কাতর স্বরে কহিলেন "এই কি আমাদের শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ? তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ এ কি কখন সহ্য হয়? হা বৎস! এরূপ কেন হইল?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মহারাজ! আমার কুলধর্ম্ম এই।" মহারাজ কহিলেন "সে কি কথা? তোমা

* আমি এ কথা বলিতে চাহি না যে, বুদ্ধদেব প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন কিন্তু তিনি যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তাহাতে ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই। ........ জাত্যভিমান কেন, তিনি সকল প্রকার অভিমানেরই বিরোধী ছিলেন।

বংশে তোমার জন্ম? ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজপুরুষেরা কি তোমার পিতৃপুরুষ ছিলেন না? তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কখন কি শুনিয়াছে?" গৌতম কহিলেন "আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা আমার পূর্ব্ব পুরুষ। তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথানুসারে আমি ভিখারী বেশে এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ, আত্ম প্রভাবে এবং প্রেমবলে সেই যে মলিনবসন দীন হীন ভিখারী, মহা প্রতাপশালী রাজ রাজেশ্বর অপেক্ষাও আজ তার উচ্চাসন। আমি যে অক্ষয় অমূল্য রত্ন ভেট লইয়া আসিয়াছি, তাহা পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।" শুদ্ধোদন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় রাজা প্রজা মন্ত্রিবর্গ সভাস্থ সকলকে তিনি তাঁহার উপদেশ প্রদান করিলেন। চতুর্ম্মহাসত্য, অষ্টমহামার্গ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, [illegible]া, অনুকম্পা, মৈত্রী, শাশ্বত শান্তিরূপিণী নির্ব্বাণমুক্তি এই সকল সত্য অমৃতধারার [illegible] বর্ষিত হইল। সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন প্রীত হইলেন; তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল, সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল।

যখন রাজপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজ-পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই উপস্থিত হইল, কেবল যশোধরা নাই। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশোধরা কোথায়?" তিনি আসিবেন না শুনিয়া গৌতম তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, যশোধরা মলিনবেশে রুক্ষ আলুলায়িতকেশে ঘরে বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার চিরসঞ্চিত প্রেমাশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে দীনবেশে, অনাহারে, অনিদ্রায়, [illegible] দিনযাপন করিতেছিলেন, রাজা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধের মন গলিয়া [illegible]। তখন তিনি যশোধরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন তাহার এক 'জাতক' গল্প বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ-দেবের উপদেশ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় মন আকৃষ্ট হইল ও বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীশ্রেণী স্থাপিত হইবার পর তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

কপিলবাস্তনিবাসীর মধ্যে অনেকে বুদ্ধ-উপদেশ গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা বৌদ্ধসমাজ-ভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে সিদ্ধার্থের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ একজন—তাঁহার জনৈক আত্মীয়, দেবদত্ত নাপিত উপালি, পণ্ডিত অনিরুদ্ধ। আনন্দ বুদ্ধের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর থাকিয়া তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের মত বেশভূষায় সাজাইয়া তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাহুলের বয়স তখন সাত বৎসর। পাঠাইবার সময় বলিলেন, [illegible] দেখিতেছিস্, ঐ তোর পিতা। ওর কাছে কত টাকা কড়ি ঐশ্বর্য্য আছে,—

[illegible]ছাগর্য্য তোর বাপের ধন ভিক্ষা চাস্।" রাহুল বলিল—"আমার পিতা? রাজাইত আমার বাবা, আর কে?" যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন। রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আপন পৈতৃক সম্পত্তি ভিক্ষা করিল। বুদ্ধ কহিলেন, "বৎস! সোণা, রূপা, মণি, মাণিক্য আমার কাছে নাই। আমার কাছে যে সত্যরত্ন আছে, তাহা আমি দিতে পারি, যদি আমাকে কথা দেও যে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।" এই বলিয়া রাহুলকে তাহার ধারণানুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং বালক পিতৃ-উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। সিদ্ধার্থ গেল, আনন্দ গেল, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দেবদত্ত গেল, এখন তাঁর পৌত্রটিকে তাঁর পার্শ্ব হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল, তাঁর রাজ্যাধিকারী আর কেহই রহিল না। রাজা সিদ্ধার্থের প্রতি এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করাতে সিদ্ধার্থ নিবেদন করিলেন, "মহারাজ যাহা হইয়াছে মার্জ্জনা [illegible] ভবিষ্যতে এরূপ আর হইবে না। পিতৃবোর অনুমতি বিনা অল্পবয়স্ক বালকের [illegible] নিষিদ্ধ—আমি এই নিয়ম করিয়া দিতেছি। এইরূপ অনেক আশ্বাস দিয়া কিছুদিন পরে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজগৃহের বেণুবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

বুদ্ধদেবের মহাবোধি বৃক্ষতলে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কপিলবাস্তু গমন ও তথা হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রায় আঠার মাস কাল অতিবাহিত হয়। এই স্বল্পকালব্যাপী বুদ্ধজীবনীর ইতিবৃত্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সকলে আনুপূর্ব্বিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর কাল নির্ণয় করা সুকঠিন, কেননা সেই সমস্ত গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন মিল নাই। যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তাহা আর কিছুই নয়—গৌতম বুদ্ধের স্মরণীয় কোন কৃত্য অথবা স্মরণীয় কথাবার্ত্তা উপদেশ। এই স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে—কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই ভাগ উপসংহার করা আমার ইচ্ছা।

বৌদ্ধধর্ম্মে সদ্যোদীক্ষিত সুরাপরন্তের একটী বণিক তাঁহার প্রতিবাসী আত্মীয়বর্গকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়া গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করাতে বুদ্ধ কহিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, সুরাপরন্তের লোকেরা বড়ই দুষ্ট, রাগী ও অত্যাচারী, তাহারা তোমার অপবাদ ও নিন্দা করিলে তুমি কি করিবে?" তাহার উত্তর, "আমি চুপ করিয়া থাকিব।" "তাহারা যদি তোমাকে ধরিয়া মারে?" ভিক্ষু কহিল, "আমি তাদের মারিব না।" "যদি তোমাকে বধ করিবার চেষ্টা করে?" উত্তর,—"মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই, শমন ত আসিবেই, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? অনেকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক সময় মৃত্যু চায়, কিন্তু আমি তা করিব না। তাকে ডাকিয়াও আনিব না, আর আসে ত বারণও করিব না।" এই উত্তরে গুরুদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে বাহির হইতে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আর এক সময় একটী যুবতী স্ত্রী তাহার পুত্রটী হারাইয়া পাগলিনী প্রায় হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহার নাম কিসাগোতমী। অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হয় ও একটী পুত্র জন্মে। শিশুটী দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, আর বেড়াইতে শিখিবার বয়সেই সর্পদংশনে মারা পড়ে। গোতমী মৃতশিশুটী কোলে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, যদি কেহ কোন ঔষধ দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারে। একজন বৌদ্ধভিক্ষু স্ত্রীলোকটীকে বলিল,—"তুমি যে ঔষধ চাহিতেছ, আমার কাছে তা নাই। কিন্তু আমি জানি একজন লোক সে ঔষধ দিতে পারেন। ঐ গৈরিকবসনধারী বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে যাও, দিবেন।" গোতমী বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া আপনার কাছে এসেছি, এখন একটা ঔষধ বলিয়া দিন যাতে আমার এই ছেলেটি প্রাণদান পায়।" বুদ্ধদেব কহিলেন—"আচ্ছা বলিয়া দিব যদি আমি যে জিনিষ বলিতেছি আমায় তা আনিয়া দিতে পার; আর কিছু নয়, এক মুঠা সরিষার বীজ।" তখন গোতমী আগ্রহের সহিত আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইলে তখন কহিলেন, কিন্তু একটী সর্ত্ত আছে, এমন ঘরে থেকে আনিতে হইবে যেখানে বাপ, মা, স্বামী, পুত্র কিম্বা ভৃত্য, ইহার কোন একজনের মৃত্যু হয় নাই।" গোতমী তাহাই অঙ্গীকার করিয়া মৃত শিশু কোলে বন্ধু বান্ধবের বাড়ী দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। এক মুঠা সরিষা দিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে মা বাপ-স্বামী পুত্র কি ভৃত্য কেহ মরিয়াছে কি না?" তাহারা বলিল,—"বলেন কি? জীবন্ত লোক অল্প, মৃতের সংখ্যাই অধিক।" কেহ বলে আমার একটি পুত্র মরিয়াছে, কেহ বলে আমার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে; কেহ বলে আমার ভৃত্যটী মরিয়াছে। অবশেষে যেখানে একটী লোকও মরে নাই এমন ঘর না পাইয়া তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা, সরিষার বীজ এনেছ কি? গোতমী বলিলেন, "প্রভো, পাইলাম না। তাহারা বলে "জীবন্ত লোক অল্প, মৃতব্যক্তিই অনেক।" তখন বুদ্ধ তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে প্রশান্তি জন্মিল, তখন সান্ত্বনা লাভ করিয়া বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইলেন।

বৌদ্ধভিক্ষুরা একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবন্! সন্ন্যাসাশ্রমী ভিক্ষুরা স্ত্রীলোকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?

বুদ্ধদেব কহিলেন,—"তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিও না।"

"যদি তাহারা সম্মুখে আসিয়া পড়ে?"

"তাদের দেখিয়াও দেখিও না এবং তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।"

"যদি তাহারা আমাদের সহিত কথা কহে, তাহা হইলে কি করিব?"

"যদি কথা কহিতেই হয়, তবে মনে যেন কোন কুভাব না থাকে, পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত থাকিবে।"

বুদ্ধদেব আরও কহিলেন,—

"বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে মাতৃতুল্য, যুবতীকে ভগিনীতুল্য, অল্পবয়স্কা বালিকাকে দুহিতা সমান জ্ঞান করিবে।

"পরস্ত্রী প্রতি কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা তপ্তলৌহখণ্ড দ্বারা চক্ষু উৎপাটন করাও ভাল।"

...ণী হাবভাবলাবণ্যে পুরুষের হৃদয় বশ করিতে চাহে, সে হৃদয় বজ্রকঠোর হইলেও ...কটাক্ষবাণের নিকট পরাভূত হয়। রমণীর হাসি অশ্রু তোমাদের শত্রু—তাহার ...বন্ধন ভঙ্গেচ্ছা—তার কেশপাশ মুনিজনেরও চিত্তবিক্ষোভকারী।

সাবধান! সংযমী হও, কামরিপুকে হৃদয়ে স্থান দিও না। রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তোমার শ্রমণের ব্রত পালন করিবে।"

এইরূপে তাঁহার জীবনের অশীতি বৎসর গত হইল; এই দীর্ঘকাল বিনা দুঃখ কষ্টে বিনা সঙ্কটে অবাধে কাটিয়া গেল, এমন মনে করিবেন না। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উপর দিয়া কত বিঘ্ন গিয়াছে, তিনি কত বিপত্তির মধ্যে পড়িয়াছেন, বলা যায় না। তথাপি তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। গৃহস্থেরা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বিচ্ছেদে তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহার কত অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় আধিপত্য নাশ ভয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কত সড়যন্ত্র করিয়াছে। তাঁহার শিষ্য দেবদত্ত একবার তাঁহাকে মহাবিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা তিনি নিজে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া গৌতমের পদারূঢ় হন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে তিনি গুরুমারা ফাঁদ পাতিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রুকে ফুসলাইয়া তাঁহার বিপক্ষে উত্তেজিত করেন। রাজা গৌতমকে বধ করিবার নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পর্ব্বত হইতে শিলাখণ্ড তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাকে পদদলিত করিতে যে উন্মত্ত বন্যহস্তী প্রেরিত হয়, সে তাঁহার সামনে গিয়া নিরীহ শান্তভাব ধারণ করিল। পরিশেষে এইরূপ কথিত আছে যে, রাজা অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় পাপ সকল প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন।

এই জীবনী হইতে বুদ্ধদেবের নিত্য নিয়মিত জীবনকৃত্য আমরা কতকটা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু শুধু কল্পনা নহে অনেকানেক বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা তাহা বর্ণিত দেখিতে পাই। তিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোন ... ... সাহায্য ব্যতিরেকে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। ...ন হইতে ভিক্ষার্থে গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে যে সময় টুকু থাকিত, তাহা নির্জ্জনে ধ্যানে যাপন করিতেন। বাহির হইবার সময় হইলে তিনি ...ক্ষুকের ন্যায় বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে কখনো একাকী, কখনও বা ...চরসহ সন্নিহিত গ্রামে কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে

[illegible]জ্যোতিঃ বিনির্গত হইত। বিহঙ্গমের কলরবে এবং আকাশ হইতে মধুর [illegible]নিতে দিগ্বিদিক্ নিনাদিত হইত। তাঁহার শুভাগমনের নিদর্শন দৃষ্টে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ[illegible]বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পুষ্পমাল্য উপহার লইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইত। তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত কে তাঁহার আতিথ্য করিবে। অনুগ্রহ করিয়া আ[illegible] আমার গৃহে পদার্পণ করুন, আপনার জন্ত আপনার অনুচরবর্গের জন্ত আহার প্রস্তুত, এই বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া, উপস্থিত জনের মধ্যে কোন[illegible] স্বামী তাঁহাকে অনুচরবর্গসহ গৃহে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের আতিথ্য ক[illegible]। আ[illegible] শেষ হইলে বুদ্ধদেব সমবেত লোকসকলকে উপদেশ দিতেন। শ্রোতৃ-বর্গের মধ্যে কেহ বা গৃহস্থের মন্ত্র গ্রহণ করিত; আর যাঁহাদের তদপেক্ষা উচ্চাভিলা[illegible] তাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। পরে উঠিয়া তিনি নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগ[illegible] করিতেন; সেখানে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দিবসের. সত্যাস[illegible] কার্য্য সকল স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিতেন। তৎপরে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উপদেশ দিতেন "সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন দুর্লভ। বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ অবহেলা করিও না।" পরে তাঁহার পুষ্পবাসিত কক্ষে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা হইলে স্নান করিতেন। তদনন্তর লোকেরা আশপাশ গ্রাম বা নগর হইতে আসিয়া তাঁহার বাসস্থানে সম্মিলিত হইলে পর তিনি তাহাদের ধীশক্তি ও ধারণা অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; তাঁহারা তাঁহাকে আপন আপন আধ্যাত্মিক অবস্থা জ্ঞাপন করিত; যাহার যাহা জানিবার ইচ্ছা তিনি তাহা পূর্ণ করিতেন; যাহার যে কোন বিষয়ে সংশয়, তাহা মিটাইয়া দিতেন। এইরূপে এক প্রহর রাত্রি কাটিয়া যাইত; পরে সকলকে সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে বিদায় দিতেন। অবশিষ্ট রাত্রি কতক ধ্যান, কতক বা নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং প্রত্যুষে উঠিয়া কাহার কি আবশ্যক, কাহাকে কিরূপ উপদেশ দিতে হইবে, কি উপায়ে লোকের দুঃখমোচন ও কুশল বর্দ্ধন করিবেন, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দিবসের কার্য্য স্থির করিতেন।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ তিন মাসের ঘটনাবলীর সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা হইতে এবং অন্যান্য প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে বর্ষার চারি মাস ছাড়িয়া অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি প্রায় প্রত্যহ আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার বল, স্বাস্থ্য [illegible]র্ঘায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রবুদ্ধ হইবার পর [illegible]চল্লিশ বৎসর তিনি স্বীয় মতানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাটনা হইতে উত্তর-পশ্চিম সরস্বতী পর্য্যন্ত এক দিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশ অন্য দিকে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যাপিয়া তিনি তাঁহার

...দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বহুবিধ জনগণের সমাগমে তিনি মানবপ্রকৃতি—মনুষ্যের ভাব গতি, রীতি নীতি, সুখ দুঃখ, আশা ভরসা তলাইয়া বুঝিবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেবের যখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি কপিলবাস্তু হইতে পূর্ব্বদিকে [illegible] ক্রোশ দূর কুশীনগর যাত্রাকালে 'পাবা' গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আম্রবনে কিছুদিন বিশ্রাম করেন। এই ভূমি চুন্দ নামক জনৈক স্বর্ণকার বৌদ্ধসমাজে দান করিয়াছিল। চুন্দ ভিক্ষুকদের জন্য তণ্ডুল ও বরাহমাংস প্রস্তুত করিল। প্রবাদ এই যে সেই মাংস ভোজন করিয়াই বুদ্ধদেব পীড়িত হন এবং এই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। পথে কুশীনগরের পথে কিয়দ্দূর চলিয়া শ্রান্তিবোধ হওয়াতে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—"আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও।" আনন্দ জল আনিয়া দিলেন। অনতিদূরে কুকুষ্ট নদী বহিতেছিল—তীরে পৌঁছিয়া নদীতে শেষ বারের মত স্নান করিয়া লইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া এবং লোকে পাছে চুন্দার প্রতি দোষারোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে এই আশঙ্কায় আনন্দকে বলিলেন "আমার মৃত্যুর পর চুন্দাকে বলিও সে বড়ই পুণ্যফল উপার্জ্জন করিয়াছে; জন্মান্তরে তাহার কল্যাণ হইবে। তাহার প্রদত্ত অন্নাহার করিয়া আমি মৃত্যুরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম, নির্ব্বাণমুখে উপনীত হইলাম। আমার বুদ্ধত্বের পূর্ব্বে সুজাতার আতিথ্য সৎকার আর এইক্ষণে এই চুন্দার পক্কান্ন উপহার এ দুইই আমার সমান আদরণীয়। এ বিষয়ে যদি কেহ কিছু সন্দেহ প্রকাশ করে, কহিও যে এ কথা আমার নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছ।" অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে কুশীনগরসমীপস্থ হিরণ্যবতী নদীতীরে পৌঁছিয়া গৌতম তথায় কিয়দ্দণ্ড বিশ্রাম করিলেন এবং মল্লদের এক শালবনে গিয়া বৃক্ষতলে ডান কাতে শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আনন্দের বিলাপধ্বনি শুনিয়া বলিলেন "ভাই আনন্দ, আমার জন্য শোক করিও না। আমি ত তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যার জন্ম তারই মৃত্যু—যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়—এমন কি কোন জিনিস আছে যাহার বিনাশ নাই? [illegible] বিলম্বেই হউক, এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু আ[illegible] হইল ভাবিও না। আমার প্রচারিত সত্য সকল, আমার উপদেশ ও অনু[illegible] আমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি—সেই সকল আমার প্রতিনিধি—সেই তোমাদের [illegible]র্শক। আনন্দ, [illegible] অতি যত্নে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ—আশীর্ব্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা ব্রহ্মচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। পাঁচ শত বৎসর কাল

এইরূপ চলিবে। পরে যখন সত্যজ্যোতিঃ সং[illegible]
কালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট [illegible] উহার [illegible]
জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বুদ্ধের নাম কি?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মৈ[illegible]
শালবনে এইরূপ উপদেশ করিলেন।

[illegible] প্রাতঃকালে তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধের প্রতি ক[illegible]
[illegible] আছে কি না। তদুত্তরে আনন্দ কহিলেন—"গুরুদেব! আশ্চর্য্য এই যে, এত
[illegible]র মধ্যে কাহারো একটী বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস অটল, কাহারো মনে তিলমাত্র সংশয় নাই।"
পরে বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "যার জন্ম তার ক্ষয় ও মৃত্যু [illegible]
ভাবী—সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকাল বাস করিবে। তোমরা যত্নপূর্ব্বক সত্যধ[illegible]
করিয়া আপন মুক্তিসাধন কর"। এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন [illegible]
নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইল—প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি এবং শক্রের কণ্ঠ হইতে আকাশবাণী হইল—"হায়! বুদ্ধদেব মর্ত্ত্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল।"

তদনন্তর চক্রবর্ত্তী নৃপতির মরণোত্তর যে অন্ত্যেষ্টি-বিধান শাস্ত্র বিহিত, সেই বিধানানুসারে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কুশীনগরের প্রধান প্রধান নাগরিক কর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার দেহাবশেষ গ্রহণ করিতে অনেকানেক রাজ্য হইতে ভক্তগণ [illegible]
উপস্থিত হইল। সেই দগ্ধদেহের ভস্মরাশি আট ভাগে বিভক্ত হইল এবং [illegible]
উপর এক একটী স্তূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল।

বুদ্ধদেব ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, বৌদ্ধেরা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এদেশে বিদ্যমান ছিলেন ও কোন [illegible]
বা এখান হইতে অন্তর্হিত হন, আমাদের সকলেরই সে বিষয়ে জানিবার কৌতূহল [illegible]
পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাল নিরূপণের বেলায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাস হইতে [illegible]
কিছুই পাওয়া যায় না। যুক্তি ও অনুমান, শিলালিপি ও প্রোথিত ধাতু[illegible]
সাধন ও উপকরণ হইতে যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহাতেই এক প্রকা[illegible]
হয়। তত্রাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদয়াস্ত, উন্নতি অবনতির কাল কতকগুলি [illegible]
নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেই সকল কালনির্ণায়ক নিদ[illegible]
হইতেছে।

প্রথমতঃ বুদ্ধ শাক্যসিংহের মৃত্যুকাল যতদূর জানা যায়, খুব সম্ভব [illegible] বৎসর ধরিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভা হয়; তাহা[illegible] প্রকার

আসেতোরাতুষারাদ্রের্বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপঃ॥

রাজা স্বকীয় কার্য্যকর্ত্তাদিগকে আদেশ করিলেন, একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপরদিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবালবৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে সকলকে সংহার কর। [illegible] বধ না করে, তাহারা বধ্য।

শঙ্করাচার্য্য কুমারিলের উত্তরকালীন লোক, তিনিও বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া [illegible] যেরূপে তিনি হিন্দুসমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গবেষণা ও [illegible] গ্রন্থে শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়। [illegible] চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ সাং খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে [illegible] অনেক বর্ষ অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অন্য নানাবিষয়ে যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে ঐ সময়ে বা তাহার কিছু [illegible] যদি হিন্দুসমাজে তাদৃশ ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে [illegible] ভ্রমণ বিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোন রূপেই সঙ্গত নয়। যখন ঐ [illegible] বিবরণে সেরূপ ধর্ম্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তরকালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। যতদূর জানা গিয়াছে [illegible] রচনার কাল খৃষ্টাব্দ ৮০৪।

উপরে বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; এখন বৌদ্ধধর্ম্মের [illegible] আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। শাক্যমুনি প্রবুদ্ধ হইয়া যে [illegible] নিদান) ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেন, তাহার অর্থ কি? এই দ্বাদশ নিদানের [illegible] পর এক যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা কতদূর যুক্তিসংগত, তাহা আপনারা [illegible] করুন। মোটামুটি এই দেখা যাইতেছে যে অবিদ্যা শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত—[illegible] পত্তির মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের সহিত এই [illegible] শাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। বেদান্ত মতেও অবিদ্যা হইতে [illegible] উৎপত্তি। এই মহারিপু দমন করা উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে [illegible] বুদ্ধের অবিদ্যা এক নহে। বৈদান্তিকেরা বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে [illegible] ধান। এই ব্যবধান দূর হইলে "সোহহং" বলিয়া যে অভেদ জ্ঞান [illegible] ব্রহ্মে মিলন সংঘটিত হয়। সেই মিলনেই মুক্তি। বুদ্ধের অবিদ্যা [illegible] তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অবিদ্যা সেই, যাহা জীবনের [illegible] করিয়া রাখে—সেই বন্ধ [illegible] দূর। যদি কোন [illegible] যে সব [illegible]

আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়। সেই কারণ কি—না বিষয়তৃষ্ণা—তৃষ্ণা হইতে আসক্তি—আসক্তি হইতে জন্ম—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রোগ শোক দুঃখ কষ্ট। এই জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। অবিদ্যা দূর হইলে তাহার নীচের বন্ধনগুলি একে একে টুটিয়া যায়; এক কথায়, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়, এবং নির্ব্বাণপথ উন্মুক্ত হয়।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যে চতুর্ম্মহাসত্যের উপদেশ দিলেন, তাহাই বা কি? ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। (১) জীবের দুঃখ (২) দুঃখের কারণ (৩) [illegible]রোধের (৪) তাহার উপায় নির্দ্ধারণ এবং উপায় চেষ্টা। উপায় নির্দ্ধারণ [illegible] অষ্ট মহামার্গ রূপ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্য মতের অনেক বিষয়ে পরস্পর ঐক্য দেখিয়া অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাংখ্য মত হইতে উৎপন্ন বিবেচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন কাপিল সাংখ্য দর্শন এই বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুদর্শন। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধ ও [illegible] উভয় মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; সেই দুঃখ হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধন চেষ্টা ঐ উভয় মত প্রবর্ত্তনেরই মূলসূত্র। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবাস্তু, বুদ্ধের মাতার নাম মায়া (প্রকৃতি)। এ দুইটিও সাংখ্য মতের পরিচায়ক। বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে বুদ্ধ পূর্ব্ব জন্মে কপিল ছিলেন। শাক্যবংশীয় নৃপতিরা আপনাদের নগর নির্ম্মাণের স্থাননিরূপণ করিতে গিয়া কপিল ঋষির কুটীর দর্শন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর [illegible]নি তাঁহাদিগকে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে নগর নির্ম্মিত হ[illegible]পিলের নামানুসারে তাহার নাম কপিলবাস্তু হইল। সে যাহা হউক এই উভয়মতের যেমন সৌসাদৃশ্য আছে, তেমনি অনেকাংশে ভিন্নতা ও দৃষ্ট হয়। উভয়েই একস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন, উভয়ের ছাড়িবার স্থান এক—মনুষ্যের দুঃখমোচন; কিন্তু গম্য স্থান স্বতন্ত্র এবং গন্তব্যপথও অনেক ভিন্ন। ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য কিন্তু [illegible] লক্ষ্য কিসে সিদ্ধ হয়? কপিল মুনি দুইটি মূলতত্ত্ব মানিয়া চলেন, প্রকৃতি আর পুরুষ। সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে সংসাররূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজদর্পণে তাহা দর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া, প্রকৃতির অজ্ঞানরচিত আবরণ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র রূপে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়ার খেলা থামিয়া যায়; তখনি তিনি দুঃখক্লেশ জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করেন। বুদ্ধ এ সম্বন্ধে তত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনিও বলেন সকলি অনিত্য—সক[illegible] সকলি দুঃখময়; [illegible] পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের মূলে [illegible] কিছুই নাই [illegible] নহে—সাংখ্যের [illegible] [illegible]—কিন্তু [illegible] জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ।

তাঁহার মতানুযায়ী এই নির্ব্বাণ মুক্তি কি, তাহা পরে সবিশেষ আলোচিত হইবে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে যাহাই বলুন, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার নামে যে দর্শন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা শূন্যবাদ বই আর কিছুই নহে। আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, জগতের মূলকারণ ঈশ্বরও মিথ্যা।

কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশেষ বিধান ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক সহজ ধর্ম্মনীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধদেব ন্যায়, সত্য, অহিংসাদি নীতির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া ও সেই সমুদায়ই মানবকুলের সদ্গতি [illegible] বলিয়া তদীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেও দশাজ্ঞা [illegible] প্রচলিত, তন্মধ্যে গৃহস্থ সাধারণের জন্য এই পাঁচটি নির্দ্দিষ্ট আছে—

বধ করিও না।
অপহরণ করিও না।
ব্যভিচার দোষ করিও না।
মিথ্যা কহিও না।
সুরাপান করিও না।

ভিক্ষুকের জন্য তদতিরিক্ত অপর পাঁচটি ব্যবস্থা আছে; যথা, বিকালভোজন, নাট্যাদি দর্শন, উত্তম পরিচ্ছদ, প্রশস্ত শয্যা, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান গ্রহণ, এই পঞ্চ ব্যসন হইতে বিরতি। উচ্চশ্রেণী ভিক্ষুদের জীবনব্রত যারপর নাই কঠোর। শ্মশানে যে সকল ছিন্ন বস্ত্রাদি কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা আপন হস্তে সেলাই করিয়া পরিতে হইত; তাহা[illegible] গেরুয়া বসন। আহার যত সামান্য সাদাসিধা হইতে পারে, আর দ্বারে দ্বারে ভি[illegible]রিয়া তাহাদের ভিক্ষাপাত্রে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে; তদ্ভিন্ন অন্যোপায়ে ধনোপার্জন নিষিদ্ধ। দিনের মধ্যে একাহার, মধ্যাহ্নের পর আহার নিষেধ। বনই তাহাদের আশ্রম বৃক্ষতল তাহাদের আশ্রয় স্থান। সেখানে বড় জোর আসন বিছাইয়া বসিতে পায়, কিন্তু কদাপি শয়ন করিবে না—নিদ্রার সময়েও শয়ন নিষেধ। নিদ্রা যাইবে সোজা বসিয়া বসিয়া। যদি কখন গ্রাম কিম্বা নগরে যাইতে হয় সে কেবল ভিক্ষার জন্য—সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইবে—কখন কখন শ্মশানে গিয়া সংসারের অসারতা চিন্তা ও ধ্যান মননে রাত্রি যাপন করিবে—এই প্রকার কত কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত থাকিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু 'অর্হৎ' পদবী লাভের অধিকারী হইতেন।

উল্লিখিত দশাজ্ঞাশাসনে যে সকল পাপকার্য্য নিষিদ্ধ, তদ্ব্যতীত কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, পরনিন্দা, পরপীড়া প্রভৃতি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মে উপদেশ ও বিধান আছে। যে সমস্ত ধর্ম্মনী[illegible], তাহা নি[illegible] দয়া, অহিংসা চিত্তের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, [illegible] কাহারো হিংসা করিবে না। [illegible]

[illegible] মৈত্রী গুণে শত্রুতা পরাজয় করিবে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে প্রায়শ্চিত্ত ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের বিমোচন হয় ; কিন্তু বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়া উপদেশ দেন, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ ও তদীয় হিতানুষ্ঠান ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভের অন্য উপায় নাই। হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্ম দেশগত জাতিগত নহে ; ইহা মনুষ্য কুলের সর্ব্বাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম ; কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই এধর্ম্মের বিরোধী নহে। দুঃখ ক্লেশ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল মনুষ্যেরই ভাগধেয়। গৌতম প্রদর্শিত নির্ব্বাণপথের যাত্রীদিগের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতির মহত্ব নাই। জাতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে যে পার্থক্য সে কল্পিত, কিন্তু গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যথার্থ পার্থক্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র জন্মিয়াই হয় না, কিন্তু কর্ম্মগুণে। যিনি সদাচারী, শুদ্ধাচারী, তিনিই ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানান্ধ পাপকারীই শূদ্র। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রোধপরায়ণ, হিংসারত, দয়ামায়া শূন্য, সেই চণ্ডাল। মাল্য চন্দন ভস্মলেপন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদল স্ববশে আনিয়াছেন, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইতিপূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ সত্যরূপ ধর্ম্মচক্রের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির প্রধান অঙ্গ। বারাণসীতে বুদ্ধদেব সেই তাঁহার প্রথম উপদেশে যে নির্ব্বাণমুক্তির আদর্শ ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ধারণ করিতেছেন, সেই নির্ব্বাণ পথের চারিটি বিভাগ বা ধাপ আছে এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দশরিপু যে [illegible]কারী ; সেই রিপুদল দমন করিতে করিতে পথিক এক এক ধাপে উপনীত হন ও [illegible] রিপুর উপর জয়লাভ না করিলে গম্যস্থানে পৌঁছান যায় না। তন্মধ্যে দুইটি ভয়ঙ্কর শত্রু, 'রূপরাগ' এবং 'অরূপরাগ'—এক বিষয়-বাসনা, অপর স্বর্গ-কামনা,—এ দুইই অনর্থের মূল। শেষভাগে পৌঁছিয়া মৈত্রীর সহিত মিত্রতাবন্ধন হয়। সকল ধর্ম্মের শিরোদেশে—সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রেম ও মৈত্রী ভাব। মৈত্রী ভাবের দৃষ্টান্ত মাতৃস্নেহ। মাতা যেমন সন্তানকে প্রাণ দিয়াও পোষণ করেন, সেই উদার গভীর মাতৃপ্রেম—যে প্রেম শত্রু মিত্র আত্ম পরে সমান—যে প্রেমের জ্যোতির্ম্ময় দিগ্বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, সেই প্রেম বিতরণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে বুদ্ধদেবের আগমন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে এই সার্ব্বভৌম মৈত্রীভাব জগতে বিস্তার উদ্দেশে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় নামক অজ্ঞতর বুদ্ধের উদয় হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভিধর্ম্ম ভাগ ( দর্শন ) যতই ভ্রান্তিসঙ্কুল ও জটিল হউক না কেন, বুদ্ধের নীতি শিক্ষার উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারিবেনা। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তুষ্টিসাধন করা যে নিতান্তই বৃথা কার্য্য, আর আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয় দমন [illegible] এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান [illegible] বুদ্ধদেব জনসাধারণের

চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। শুধু উপদেশ নহে, [illegible] প্রধান [illegible] লম্বন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ মহান্, তাঁহার [illegible]। বুদ্ধদেবের ধৈর্য্য, দয়া, মায়া, মমতা, প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, যেমন [illegible] মূর্ত্তিতে, তেমনি ভক্তদিগের মানসপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্মবীর ছিলেন সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, তিনি ঘোর বিলাসিতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া পিতৃ-গৃহের অতুল সুখ সম্পত্তি কেমন অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া লোক হিতার্থে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, পরে দ্বাদশ বৎসর কি দুঃসহ তপস্যাবল-বলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ ধরিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণশূদ্রনির্ব্বিশেষে জ্ঞান ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য জাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া কিরূপে ভারতে দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারে জীবন ক্ষেপণ করিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক চিত্তে, উদ্যমের সহিত সমাধা করিয়া যখন শান্ত সমাহিত চিত্তে, আনন্দমনে তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন তখন আকাশবাণী হইল—হায় বুদ্ধদেব অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল! বুদ্ধজীবনের ছবি আমাদের সকলেরই মনশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র অরাজক রাজ্য। বিশ্বসংসার অকাট্য নিয়মে বদ্ধ অথচ তাহার নিয়ন্তা নাই—ধর্ম্মরাজ্যের কোন রাজা নাই। ফলাফলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন ব্যবস্থাপক পুরুষ নাই। পুণ্যের কেহ পুরস্কর্ত্তা নাই, পাপের শাস্তা নাই। দেবতা প্রীত্যর্থ পশুবলি যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল, দেবারাধনা অনাবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনপ্রধান ধর্ম্ম, তাহাতে ভজনের কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এই যে আত্মপ্রভাবে দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য হইতে বিনির্মুক্ত কর, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। সাধনেই সিদ্ধি "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" এই পু[illegible] আমাদের মুক্তিপথের একমাত্র সম্বল। আমাদের আপনার মুক্তিসাধন আপনার [illegible]তে—আত্মপ্রভাবে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুশয্যার শেষ কথাগুলি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"ভাই আনন্দ, আমার জীবনের অশীতি বৎসর অতীত হইয়াছে—দিন ফুরাইয়া আসিল, আমি এইক্ষণে চলিলাম। দেখ আমি আত্মনির্ভরে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতেছি, তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তোমরা আপনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শেখ। তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ—আপনারাই আপনার নির্ভর-দণ্ড। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর—আপনা ভিন্ন অন্য কাহারো উপর নির্ভর করিওনা। আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া শোক করিওনা। আমার জীবন 'ধর্ম্ম ও সত্য' ইহাতেই রাখিয়া যাইতেছি। তাহা অক্ষয় ও

[illegible] পান কর। সংসারের দুঃখ কষ্ট হইতে পরি-
[illegible] চিকিৎসকের ন্যায় তোমাদের জন্য ঔষধ আনিয়াছি—সেই ঔষধ
সেবন কর। আমার উপদেশ মনে রেখো, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়;
সংসারের সকলি ক্ষয়শীল, সকলি অনিত্য। ইহা জানিয়া যত্নপূর্ব্বক তোমরা নিজ নিজ
মুক্তিসাধন কর। এইরূপে আত্মবলে আমার প্রদর্শিত পুণ্যপথে চল—নিশ্চয় তোমাদের
কল্যাণ হইবে; তোমরা দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া অপার শান্তি ও নির্ব্বাণরূপ অমূল্য
নিধি লাভ করিবে।"

মানব প্রকৃতির উচ্ছেদকারী—মনুষ্য সমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন এক অভিনব
ধর্ম্মপ্রণালী কালে নিশ্চয়ই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। বাসনাবিরহিত মনুষ্যে মিলিয়া মনুষ্য
সমাজ গঠিত হয় না। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য আপনা
অপেক্ষা উচ্চতর দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে অক্ষম। আমরা
এমন একজন জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষ চাই, যিনি আমাদের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করিতে তৎপর
—এমন রাজা চাই, যিনি আমাদিগকে সংসারের সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে
সমর্থ—এমন সখা, যাঁহার নিকটে আমাদের সুখ দুঃখ নিবেদন করিয়া আমরা ইহলোকে
[illegible]—পরলোকে সুগতি লাভে সমর্থ হই। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মপ্রভাব অতীব প্রয়ো-
জনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবপ্রসাদ ভিন্ন ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। এই কারণে কাল-
সহকারে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন;
তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বহিষ্কৃত হইবার কারণও এই। বৌদ্ধেরা
ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নীতি প্রণালী যেমনই আবিষ্কৃত করুন, কিন্তু দেখা যায়
অনেকানেক বৌদ্ধক্ষেত্রে ঘোর পৌত্তলিকতা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইয়াছে। যে বুদ্ধদেব
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সেই বুদ্ধদেবের পদাবলম্বী সাধকেরা
তাঁহাকেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "প্রতিমা পূজা,
বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব [illegible] চলিয়া
আসিতেছে। ফাহিয়ান খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে অনেকানেক বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি
দেখিয়া যান। কেবল শাক্য বুদ্ধ নয়, এক এক দেবালয়ে অন্য অন্য বৌদ্ধদেবতার প্রতিমূর্ত্তি
প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে।" এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর
এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ—ওদিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্যপূজা এবং
মূর্ত্তিপূজার আদি গুরু। বুদ্ধদেব যেমনি পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন, তাহার কিয়ৎ-
পরে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শত স্থান শত দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে
পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল; তার সাক্ষী ইলোরা, অজন্টা, খণ্ডগিরি, [illegible]।"—বুদ্ধ গয়ায়
তারাদেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈশালীতে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]
[illegible] নালন্দ বিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, [illegible] [illegible], বাগীশ্বরী ইত্যাদি

অনেক স্থানে অনেকানেক বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অদ্যাপি [illegible] পাওয়া যায়। দেবপ্রসাদ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রভাবের নির্ব্বৃতির কঠোর সাধনার যে বিসদৃশ পরিণাম, তাহা আর এক দিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে ধর্ম্মসাধন ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল। যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জনের প্রয়াসী হইয়াছে তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের গম্ভীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। "হিন্দু মতানুযায়ী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করেন লিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস এই যে ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধব্যক্তিরা অশেষ রূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্য্য সমুদয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন; যেমন বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, গৃহ সর্ব্বলিত পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রকম্পন, পর্ব্বত ও পৃথিবীর গর্ভ দর্শন, ইচ্ছাবলে বায়ু প্রবাহ উৎপাদন, অগ্নি ধারা আনয়ন, নষ্ট বা গুপ্ত বিষয় উদ্ধার করণ ইত্যাদি।"

যদি জিজ্ঞাসা করেন বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব—তাহার বীজমন্ত্র কি? তাহার উত্তর "কর্ম্ম-ফল"। কতকগুলি দর্শনতত্ত্ব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি—এ তত্ত্বটিও তাহ[illegible]। সুকৃতি অনুসারে জীবের সদসদ্গতি হিন্দু শাস্ত্রেরও এই শিক্ষা, এই উপদেশ—ই[illegible] ধর্ম্মের বিশেষত্ব নাই। কেহ রাজা কেহ চাষা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ ধনী কেহ দরিদ্র—কেহ সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছে, কেহ অকারণ কষ্ট ভোগ করিতেছে—অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে; এরূপ অবস্থা বৈষম্যের কারণ কি? জীবনে এই দুঃখ শোক, পাপ তাপ—অন্যায় অত্যাচার এ সকলেরই মীমাংসা "কর্ম্মফল"। ঐহিকে যে অমঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল সেই রহস্য ভেদ করে—সেই প্রহে-লিকার উত্তর বলিয়া দেয়। তবে এই কর্ম্মের প্রাধান্য যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে, তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার মতে কর্ম্মোদ্যমই জীবন—কর্ম্মই দেবতার স্থলাভিষিক্ত বলিলেও অত্যু[illegible]না। আর সকলি ক্ষয়শীল, মৃত্যুর অধীন—কেবল কর্ম্মবলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। বুদ্ধের উপদেশ এই "যেমন বীজবপন করিবে তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে। কর্ম্মবন্ধন কেহই অতিক্রম করিতে পারেনা। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, জানিতেছি, তাহা পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ মাত্র—ভৌতিক জগতে কোন বস্তু স্থির নহে, আধ্যাত্ম জগতেও কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নাই। দেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি, আত্মা কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি, তাহাদের বাস্তব্য নাই। কর্ম্মই একমাত্র সত্য পদার্থ, বিশ্বচরাচর কেবল কর্ম্মের [illegible]। বালকের কর্ম্মফল যুবার জীবনে প্রতিফলিত, যুবকের কর্ম্মফল বৃদ্ধের জীবনে প্রতিফলিত, সেইরূপ তোমার ঐহিকের কর্ম্মফল পারত্রিক জীবনে প্রতিফলিত হইবে। যেমন পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল তুমি ইহ জীবনে ভোগ করিতেছ, সেইরূপ [illegible] পরলোকে [illegible], তবে পাপকর্ম্ম পরিহার কর। পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, কেননা কোন চিন্তা, কোন বাক্য, কোন

কর্ম্ম এ পৃথিবীতে নষ্ট হয়না। আমি সত্য বলিতেছি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেখানে যাও, সমুদ্রে [illegible]বেশ কর অথবা গিরিগুহায় লুকায়িত থাক, তোমার কর্ম্মফল তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে—কিছুতেই তাহা হইতে নিস্তার নাই। তোমার পাপের ফল যেমন দুঃখ ভোগ, সেই-রূপ তোমার পুণ্যের সুফলভাগীও তুমি। বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্মীয় স্বজনবন্ধু যেমন তোমাকে আনন্দে অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ তোমার পুণ্যফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিবে।

এইস্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধীয় যে সকল প্রহেলিকা মানব হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সমর্থক উত্তর সর্ব্বাংশে উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহা কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত রাখিয়াছেন। জীবাত্মার শেষ গতি কি? বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবেন কিনা? এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই সমস্ত গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত হইত না; বুদ্ধদেব সে সকলের যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন—যাহার উত্তর নাই, তাহাও [illegible]ছেন।

[illegible]পুত্র যখন এইসকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন তখন বুদ্ধদেব কহিলেন:—

হে মালুঙ্ক্যাপুত্র—আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি—"এস, আমার শিষ্য হও—আমি তোমাকে বলিয়া দিব জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন—বুদ্ধ মরণোত্তর নবজীবন ধারণ করিবেন কিনা? এই সকল সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি?

মালুঙ্ক্য—না, গুরুদেব, তা দেন নাই।

বুদ্ধ—এই সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ?

মালুঙ্ক্য—না, তাহা নহে।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত—আগে আমাকে বল কার কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে? ফলে এই দাঁড়াইত যে কথা শেষ হইতে না হইতেই সে বাণাহত ক্ষত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

হে মালুঙ্ক্যাপুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা

অধিকারী কিনা, তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। কোশলরাজ ও সন্ন্যাসিনী ক্ষেমার মধ্যে যে কথোপকথন তাহাতে ক্ষেমা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"স্বয়ং বুদ্ধ যাহা প্রকাশ করেন নাই, আমরা তাহা কি বলিব? বুদ্ধের প্রকৃতি সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ গভীর। যদি বল বুদ্ধ অমর, তাহা ভুল—যদি বল তিনি মরণশীল, তাহাও ঠিক নহে।" এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার উপর কাহারো কিছু বলিবার নাই। যে সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগোচর সে বিষয়ে মৌন থাকা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই

বৌদ্ধেরা যদি এইখানে থামিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায়, তাঁহারাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ স্বীকার করেন ইহকালে যিনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন, পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন। কেবল পশু পক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎশিলাদি জড় বস্তু হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাক্যমুনি নিজে অশেষ জন্মচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মের কথা তোমার আমার মত যে-সে লোকের মনে থাকেনা, বুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরাই তাহাদের বিগত জীবন কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন। বুদ্ধদেব পশু পক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জাতকমালায় সন্নিবেশিত আছে। বুদ্ধ জাতকে আত্মার নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখী অভিব্যক্তি নাই—জীবনের ক্রমোন্নতির ভাব লক্ষিত হয় না। কি কারণে কি নিয়মে জীবের অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহা বুঝা যায় না। আমরা দেখিতে পাই চারিবার তিনি মহাব্রহ্ম, বিশ বার ইন্দ্র—তিরাশীবার সন্ন্যাসী—আটারবার রাজা—চব্বিশবার ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ, মৎস্য, বৃক্ষ, চোর, বাজীকর, জুয়াড়ী এবং—এইরূপ কত কত জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বুদ্ধ কখন নারী জন্ম গ্রহণ করেন নাই—ভূত প্রেত রূপেও জন্মান নাই। সকল জন্মেই তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন ও জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে অশেষ দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

পরলোক ও মুক্তি বিষয়ে বৌদ্ধমত জানিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মে আত্ম-তত্ত্বের শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। আত্মার পারলৌকিক গতি ও মুক্তির কল্পনা আত্ম-স্বরূপ লক্ষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আত্মাকে যদি দেহের সহিত অভিন্ন—মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া মাত্র মনে করা যায়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সহজে নিষ্পন্ন হয়। এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের দর্শনাদি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, উপনিষদে আত্মা বলিয়া যাহা নিরূপিত, তাহা শরীর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা যে আমি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন—আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, মন বুদ্ধি নহি—চক্ষু কর্ণ মনোবুদ্ধি আমার। ছান্দোগ্য উপনিষদে

আত্মজ্ঞান বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে প্রজাপতির যে উপদেশ, তাহা শ্রবণ করুন—

"এই দেহ নশ্বর—মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরী, এই দেহ তাঁহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত, এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন আকাশিক চক্ষের তারকে প্রবেশ করে, তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়; যিনি আঘ্রাণ করেন তিনি আত্মা, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন, তিনি আত্মা, মন দিব্যচক্ষুস্বরূপ; আত্মাই এই মনোরূপ দিব্যচক্ষে কাম্য বিষয় সকল দর্শন করত রমণ করেন। আত্মা যতদিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহপাশে বদ্ধ থাকিয়া বিষয় বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সুখ দুঃখে বিচলিত হয়েন; কিন্তু যখন তিনি দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন অশরীরী বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে মিলিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতিকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন—তখনই তিনি উত্তম পুরুষ—তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। দিব্য জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তখন তিনি পরম শান্তি পরমারোগ্য উপভোগ করেন।

উপনিষদের এই উপদেশ—বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ স্বতন্ত্র। যে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপর বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেহ মনের আড়ালে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীবাত্মার পৃথক সত্তা অস্বীকার হিন্দুমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বলে দেহ আত্মা এক। স্বতন্ত্র পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় [illegible] বলিয়া বুদ্ধদেব তাহার উত্তর দানে বিরত ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর অবিশ্বাসের কথা আছে অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়। অতএব আত্মা ছাড়িয়া জড়বাদ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখ দুঃখভোগী জীবের জীবন সমস্যার পূরণ, বুদ্ধদেব এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সমস্যা পূরণের প্রণালী এই :—বৌদ্ধমতে যে সমস্ত উপকরণে জীবের জীবন সংগঠিত; তাহাদের নাম "স্কন্ধ"। এই স্কন্ধ পঞ্চপ্রকার, এই পঞ্চ স্কন্ধ [illegible] জীবে বর্ত্তমান। সেই পাঁচটী এই—

বিষয় প্রপঞ্চ—রূপ;
বিষয়জ্ঞান প্রপঞ্চ—বেদনা;
সংজ্ঞা প্রপঞ্চ—[illegible];

সংস্কার প্রপঞ্চ—বাসনা ;

বিজ্ঞান প্রপঞ্চ (consciousness)

প্রত্যেক স্কন্ধের আবার অন্তর্গত নানা প্রকার বিকার। এই পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জন্ম—তাহাদের বিয়োগে জীবের মৃত্যু। এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

এই পঞ্চ স্কন্ধ কখন কখন 'নাম ও রূপ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়, মোটামুটি বলিতে গেলে জীব নামরূপের সমষ্টিমাত্র। মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নামের অন্তর্গত—দৈহিক ও বাহ্য বিষয় রূপের অন্তর্ভূক্ত।

মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধপুঞ্জের বিয়োগ হইবামাত্র, অন্যত্র তাহার সংযোজন ঘটে, হয় ইহলোকে অথবা অন্যলোকে এইরূপে নূতন নূতন জীব সৃষ্টি হয়। এই কয়েকটি স্কন্ধের যোগাযোগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের চরিত্র—মনুষ্যের আত্মা। এই সমস্ত স্কন্ধের মূলে আত্মা যে আমি, আমি কতক গুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই যে আমি, আমার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে, আজ একরূপ, কল্য অন্যরূপ। শিশু যে, সে বালক নহে; বালক যে, সে যুবা নহে; যুবা যে, সে বৃদ্ধ নহে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে নামের ভিন্নতা, যেমন একই দুগ্ধের পরিবর্ত্তনে ক্ষীর, দধি, ঘোল প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। ইহাতে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—যদি আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবের ভাল মন্দ যোনি-ভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে? আত্মা নাই ত যোনি-ভ্রমণ কাহার? যেমন কথায় বলে, "মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।"—ইহার উত্তরে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে, যদিও আত্মার অঙ্গ সমস্ত উপাদান (স্কন্ধ) ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তথাপি কর্ম্মফল—কর্ম্মবল—অক্ষত থাকে। জীব নিজ নিজ কর্ম্মবলে নূতন জন্ম ধারণ করে। যে সকল সংস্কার এই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কার্য্য করিতেছে, মৃত্যু তাহাদিগকে বিযোজিত করে, কিন্তু কর্ম্ম-বলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীব দেহ হইতে বিশ্লেষিত আত্মার অবয়বগুলি নূতন যোনিতে সংযোজিত হয়—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এইরূপে জীবন-স্রোত অব্যাহত থাকে। পূর্ব্বজন্ম ও নবজন্মের মধ্যে কর্ম্মসূত্রই একমাত্র বন্ধন। মনে করুন, তাড়িত শক্তির ন্যায় কর্ম্মবল বলিয়া একটা শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত হইতেছে—সংসার চলিতেছে। যেমন রথচক্র উঁচু নীচু নানা স্থান, নানা দৃশ্যের মধ্যে দিয়া গমন করে, অথবা দীপশিখা কিয়ৎকাল জ্বলিয়া আবার নিবিয়া যায়—পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠে—তাহাকে পূর্ব্বাপর একই শিখা বলা যায় না অথচ ভিন্নও নহে। এইরূপে কর্ম্মবলে জীবনচক্র নিয়তই ঘূর্ণমান—অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মার অনুবর্ত্তিত্ব—আমার আমিত্ব স্বীকার করেন না। আমার কর্ম্মের স্রোত জীবনে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তা কোন পুরুষ নাই। বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধদের দার্শনিক

তবের সারাংশ এই—আত্মার পৃথক্ সত্তা নাই। দেহ এবং আত্মা ও আত্মার উপাদান সমস্ত মৃত্যুকালে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কর্ম্মবলে সেই সকল ছিন্ন অবয়ব-খণ্ড [illegible] [illegible] নূতন নূতন জড়পিণ্ড ও জীবাকারে পরিণত হইতেছে—বিশ্বসংসার এই অবস্থায় নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। কোন্ত সম্প্রদায়ী লোকেরা ( ইংরাজীতে তাহাদের Positivist বলে ), তাদের মতও কতকটা এইরূপ, তাঁহারা ব্যক্তিকে—পুরুষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে মনুষ্য জাতিকে সংস্থাপিত করেন। মনুষ্যের বিনাশ—মানব জাতির অমরতা। মৃত্যুকালে মনুষ্যের দেহ মন বিযুক্ত হইয়া আদি ভূতে মিশিয়া যায়; যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাঁহার সুকৃতি এবং সাধু[illegible];—অন্য কথায়,—কর্ম্মবল এবং কর্ম্মফল; তাহা তাঁহার, তাঁহার পরবর্ত্তী সন্তান সন্ততি ও অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রবাহিত [illegible]য়া জনসমাজ সংরক্ষণ এবং তাহার উন্নতি-সাধনে সহায়ভূত হয়।

সে যাহা হউক, এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইতেছে, এই কর্ম্মবল কাহার? আমার, তোমার, কি অন্য কোন জীবের? আত্মা বিনষ্ট হইলে, কর্ম্মবল কিসের উপর স্বীয় শক্তি চালনা করিবে? কর্ত্তা ব্যতিরেকেই বা কর্ম্মবল কিরূপে দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে কার্য্য করিবে? বৌদ্ধধর্ম্মের সহস্র ব্যাখ্যাতেও এই সকল প্রশ্নের সমর্থক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ত্তা ছাড়িয়া দিলে, কর্ম্মের বল আপনাআপনি বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বাধীন পুরুষ ছাড়িয়া দিলে, শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব চলিয়া যায়। পরকালে বিশ্বাসও এই আত্মজ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আমি আছি, আমি পরে থাকিব, আমার অস্তিত্ব নিরন্তর বহমান থাকিবে, এই বিশ্বাস পরকাল বিশ্বাসের মূল। আমার অস্তিত্ব লোপে কর্ম্মবলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—পরকালে বিশ্বাসও হীনবল হয়।

তবে কি এই কর্ম্ম নিবন্ধন জন্মের পাকচক্র হইতে জীবের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই? আছে এবং বুদ্ধদেব সে উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন "যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে"। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের শেষ ফল নির্ব্বাণ-মুক্তি। এই নির্ব্বাণ-মুক্তি কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া এই প্রশ্নে আসিয়া পড়িতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণের অনেক কথা, অনেক উপদেশ আছে। তাহার মধ্য হইতে মিলিন্দ ও নাগসেনের নির্ব্বাণ ব্যাখ্যার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"দুঃখ শোক পাপতাপ হইতে মুক্তি লাভ—শান্তি আনন্দ পবিত্রতা—এই নির্ব্বাণ অবস্থা।"

"যিনি স্বীয় জীবনকে পুণ্য [illegible] নিয়োজিত করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করেন, কি দেখেন? জন্ম, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন—সকলই অস্থির—অশান্তি। এই দৃশ্যে তাঁহার শরীর জ্বরে অভিভূত হয়, মন অশান্তিতে পূর্ণ হয়, [illegible] তাঁহার সন্তোষ নাই, তৃপ্তি নাই। পুনঃ পুনঃ জন্ম ভয়ে তিনি সদাই ভীত ও আত [illegible] যেই ভীতি-বলরা আরোগ্য-লাভে অসমর্থ। এই অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন, [illegible]

যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়? এই অশান্তির মধ্যে শান্তি [illegible] যদি এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, সেখানে জন্ম ভয় নাই, [illegible] বাসনার বন্ধন নাই; আসক্তি-বিহীন হইয়া শান্তি, আরাম, নির্ব্বাণ উপ[illegible] [illegible]লেই আমার সকল কামনা পূর্ণ হয়। সাধনাদ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা [illegible] হয়, যেখানে জন্ম-ভয়, শোক-তাপ অতিক্রম করিয়া, তিনি শান্তিলাভ করেন। তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, এতক্ষণ আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম। সেই মোক্ষধাম অর্জ্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন; সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হয়েন, সর্ব্ব[illegible]া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া, এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের অতীত, যাহা স্থায়ী, যাহা সত্য, যাহা অর্হৎ মণ্ডলীর চিরকাঙ্ক্ষিত ফল, তাহা তাঁহার হস্তগত হয়। তখনই তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করেন।"

এই নির্ব্বাণ মুক্তি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে। ধর্ম্মই তাহার আশ্রয় স্থান। চীন, তাতার কাশ্মীর, গান্ধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য যেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধু পুরুষ বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পথে চলিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের অধিকারী। যাঁহার চরিত্র পবিত্র, তিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জ্জন করিয়াছেন; যিনি আসক্তি-বিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করেন।"

নাগসেন আবার কহিলেন, নির্ব্বাণের যেমন স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা যায় না। যে পথ নির্ব্বাণে লইয়া যায়, সে পথ প্রদর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু নির্ব্বাণের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বলা যায় না আর জিনিসটা যে কি তাও স্পষ্ট বলা যায় না।

রাজা। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে দাঁড়ায় এই 'নির্ব্বাণ' কি না 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ তাহা কিছুই নয়।

নাগসেন কহিলেন—"মহারাজ তা নয়—নির্ব্বাণ আছে ইহা সত্য।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও উপনিষদের এই উপদেশ "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র [illegible]উপলভ্যতে," "আছেন" এ বলা ভিন্ন আর কিসে তিনি উপলব্ধ হন?

নাগসেনের এই সমস্ত উপদেশেও নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া গেল না। [illegible]য় আসক্তি নাই, জন্মভয় নাই, মৃত্যুভয় নাই, রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, মমতা-প্রভৃতি [illegible]ই, মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে [illegible]কে বলিতে পারে? কাহার [illegible]রিয়া উঠে? কথিত আছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং [illegible]নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার [illegible]সে অবস্থা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; দেখা যাক্ এই বর্ণনা হইতে বেশী কিছু জান[illegible] না?

[illegible]র তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া উপদেশ করিলেন, [illegible]

... অনিত্য, তোমরা যত্ন পূর্ব্বক আপনারা আপন মুক্তি সাধন কর।" ... কথা তথাগতের শেষ ... ।

... বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে পদনিক্ষেপ করিলেন। প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় সোপানে, দ্বিতীয় সোপান হইতে ... সোপানে, তৃতীয় হইতে চতুর্থ সোপানে; তখনও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, কতক জ্ঞান, কতক আনন্দ অবশিষ্ট আছে। আরও উচ্চে উঠিতে হইবে। চতুর্থ মহাধ্যান-সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি সেই সো... পদক্ষেপ করিলেন, যেখানে কেবল অনন্ত আকাশ বিরাজমান। অনন্ত আকা... সোপান হইতে অনন্ত জ্ঞানের সোপান। অনন্ত-জ্ঞান-সোপান হইতে যথায় পদার্পণ করিলেন, সেখানে কোন চিন্তা, কোন ভাব, কোন মনোবৃত্তি বিদ্যমান নাই,—সকলি শূন্য। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। শূন্যতার অনুভবেও আনন্দ, তাহাও বিনষ্ট করা আবশ্যক। পরে শূন্যতার সোপান হইতে এমন স্থানে উপনীত হইলেন যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী স্থান। এই সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া এমন স্থানে পৌঁছিলেন, যাহা সম্পূর্ণ চেতনাশূন্য, যেখানে সমুদয় মনোবৃত্তি তিরোহিত, সেখানে কোন ভাব জ্ঞানও নাই অভাব-জ্ঞানও নাই। এই শিখর দেশে পৌঁছিবার পর তিনি সোপান পরম্পরা দিয়া নিম্নদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম ধ্যান-সোপানে আসিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয়বার উঠিতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ ধ্যানের উচ্চে আর উঠিতে পারিলেন না, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

বুদ্ধদেব উল্লিখিত প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বৌদ্ধমতে আমরাও সাধনাবলে, পুণ্যবলে, বিষয় তৃষ্ণা পরিহার করিয়া, সত্য সাধুতা স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়া, আমাদের জীবদ্দশায় অথবা পরলোকে এই নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ, জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি। ...বা বলেন, অর্হৎগণ নিজ নিজ পুণ্যবলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ... চরিত্র বৌদ্ধদের আদর্শ চরিত্র। এই নির্ব্বাণাবস্থা জ্ঞান কিম্বা অজ্ঞানাবস্থা, চেতন কিম্বা অচেতন ভাব, বুদ্ধের উপদেশে তাহার ব্যাখ্যা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এ অবস্থা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের অতীত। সেখানে কার্য্যকারণশৃঙ্খল বিদ্যমান নাই। এরূপ অবস্থা "নেতি, নেতি" ভিন্ন আর কোন্ শব্দে ব্যক্ত হইতে পারে? ... বাসনা ছিন্নমূল—দুঃখ, ক্লেশ, আশা ... পরিসমাপ্তি—এক কথায় আমার অস্তিত্ব ... বৌদ্ধদর্শনে মনুষ্য জীবনের এ... —এই শেষ গতি। এখন কথা এই ... উপনিষদের ব্রহ্ম অথবা বুদ্ধের নির্ব্বাণ—আমাদের যথার্থ লক্ষ্যস্থান কি হইতে পারে? এই আদর্শের মধ্যে কোন্টা ঠিক? নির্ব্বাণের অর্থ যদি শূন্যতা হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে মানব প্রকৃতি এই শূন্যতা অবলম্বন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য শূন্যতা চাহেনা, মনুষ্য পুরুষের আশ্রয় চায়। আমরা ...

আধারই দেখিতে পাই, তার সাক্ষী এই বৌদ্ধধর্ম দেখুন। বুদ্ধদেবই কি এ ধর্ম্মের প্রাণ নহেন? আরো দেখুন, ঈশার পুরুষকার খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বস্ব—ঈশাকে ছাড়িয়া দিলে খ্রীষ্টধর্ম্মের আর কি অবশিষ্ট থাকে? মহম্মদ বিহনে মুসলমান ধর্ম্ম কোথায় থাকে? চৈতন্য প্রভুর অস্তিত্ব ছাড়িয়া দিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই বা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? এই সকল ধর্ম্মবীরেরাই মহাপুরুষ। এই সকল মহাপুরুষ সময়ে সময়ে অভ্যুদিত হইয়া মনুষ্যের অচেতন আত্মাকে সচেতন করিয়া তোলেন—দুর্গতি-প্রাপ্ত মনুষ্য সমাজকে উদ্ধার করেন। পুরুষ শব্দ পূর্ণতা-বাচক। ভক্তের উপাস্য দেবতা যে পরমাত্মা তিনিও পুরুষ—তিনি পূর্ণ পুরুষ।—"জ্ঞানে পরিপূর্ণ—প্রেমে পরিপূর্ণ আর অটল প্রশান্ত মহত্ত্বে এবং মঙ্গোত্তমে পরিপূর্ণ।" আমি যে কথাগুলি বলিলাম (বৌদ্ধধর্ম্ম স্বয়ং তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে)। আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ নির্ব্বাণ নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধ ব্রহ্মকে স্বীয় ধর্ম্ম-মন্দিরে স্থান দান করেন নাই; তথাপি তিনি স্বয়ং যেমন অনেকানেক ভক্ত কর্ত্তৃক দেবতারূপে পূজিত হইয়াছেন, সেইরূপ নির্ব্বাণের শূন্যতাও স্বর্গসুখকল্পনায় ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, শূন্যতা আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্মই টিকিতে পারে না।

আমার মনে অনেক সময় এই তর্ক উপস্থিত হয়, বৈদান্তিক মুক্তি আর বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? এই দুই শুনিতে যত ভিন্ন, আসলে তত নয়। বেদান্ত দর্শন বলেন, নদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া স্বীয় নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়, জীবাত্মাও সেইরূপ মোক্ষাবস্থায় নিজত্ব ছাড়িয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। "বেদান্ত দর্শনের চৌতালা দেবমন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; চৌতালায় দেওয়া হইয়াছে তুরীয় অবস্থাকে; এ স্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্য স্থান বা সমাধিস্থান। এ অবস্থায় জীব 'সোঽহম্' জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব লাভ করে—এখানে রোগ নাই শোক নাই, "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।" বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরে নির্ব্বাণ মুক্তিও [illegible] অবিকল প্রতিচ্ছবি। আসল কথা এ অবস্থায় আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য—আমার আমিত্ব বজায় থাকিবে কিনা? যদি আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল, তবে আমি প্রস্তরে পরিণত হই, কিম্বা ব্রহ্মেতে বিলীন হই, অথবা নির্ব্বাণ-মহাসাগরে মিশিয়া যাই, আমার পক্ষে সে একই কথা। আমি জানিতে চাই, আমার ব্যক্তিগত জীবন—আমার আমিত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইবে অথবা ক্রমোন্নতি সহকারে উচ্চ [illegible] উচ্চতর শিখরে আরূঢ় হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাধীনতায় উন্নত হইবে? যদি জিজ্ঞাসা করেন 'আমি কি'—ইহা যুক্তি ও তর্কের কথা নহে, আমরা প্রত্যেকে অন্তরাত্মাতে জ্ঞানালোকে তাহা অনুভব করিতেছি। আমি জড় হইতে পৃথক্—জড় জীব হইতে পৃথক্, এই পার্থক্য হইতেই আমার আমিত্ব ফুটিয়া উঠে। আমার এই আত্মা কর্ম্ম, বাসনা, প্রেম, মমতা ও অন্তরূপ সহস্র আকর্ষণের মধ্য দিয়া, এই

ক্ষণস্থায়ী বাসগৃহে থাকিয়া দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমি যে অনন্ত জীবন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহাতে আমার আমিত্ব সুরক্ষিত থাকিবে। আমার নিজের শুভাশুভের জন্য আমি নিজেই দায়ী; আমার নিজের ফল যখন আমি নিজেই ভোগ করিব; আমার পুণ্যফল পাপের ভোগ আমারই। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বেদান্ত দর্শন এ উভয়ের উপদেশ অনুসারে যদি আমার আমিত্ব লোপেই মুক্তি হয়, তবে আমার পক্ষে এ দুইই সমান। ব্রহ্মেতে আত্মার লয় কিম্বা মহানির্ব্বাণে আত্মার লয় ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? বৌদ্ধধর্ম্ম যদি এই অহংমিকার উচ্ছেদে, এই আত্মনাশে মুক্তি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে বুদ্ধের উপদিষ্ট সার্ব্বভৌম মৈত্রীর আধার কোথায় মিলিবে? অন্যের প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া দিলে, কি প্রেমের মূল শুষ্ক হয় না? আসক্তিবিহীন প্রীতি —এ ত আমাদের কল্পনাতীত? মনুষ্য যদি কখন ঈশ্বর লাভে সমর্থ হন, তবু তাঁহার জীবিত স্রোত পৃথক্ ভাবে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজনীয়। মনুষ্য জন্ম দুঃখময় বলিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করা—কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া স্পন্দহীন অচল নিশ্চেষ্টতার মধ্যে প্রবেশ করা—সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মে কিম্বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া, ইহার পরিণামে মনুষ্যত্বের আর কি অবশিষ্ট রহিল? ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "বৈদান্তিক চৌতালা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরের নির্ব্বাণমুক্তি এ পিঠ ও পিঠ।" বেদান্ত মতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া —বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণ প্রলয়সাগরে ডুবিয়া যাওয়া—ইহার ঊর্দ্ধে আর কিছুই নাই— অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, শূন্যতা, বিনাশ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ।

মহাপরিনিব্বান-সুত্ত।

মহাপরিনিব্বান সুত্ত নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ অংশ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মহা-পরিনির্ব্বাণ সূত্র নামক একখানি মহাযান ( সংস্কৃত ) গ্রন্থ ও মহাপরিনিব্বান সুত্ত নামক একখানি হীনযান ( পালি ) গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় একরূপ। প্রাচীনকালে উভয় গ্রন্থই চীন ও তিব্বত দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং চাইনীজ্ ও তিব্বতীয় ভাষায় উভয় গ্রন্থের অনুবাদ বিদ্যমান আছে। Bunyiu Nanjio তাঁহার Complete Catalogue of the Chinese Tripitaka নামক গ্রন্থের ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০ ও ১২৩ সংখ্যায় ৫ খানি অনুবাদ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচখানি পুস্তক মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থের চাইনীজ্ অনুবাদ মাত্র। উল্লিখিত Cataloguer ১১৮, ১১৯ ও ৫৫২ সংখ্যায় আর তিন খানি অনুবাদ-গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ঐ তিনখানি পুস্তক মহাপরিনিব্বানসুত্ত নামক পালি গ্রন্থের অনুবাদ। ভারত ও চীনের পণ্ডিতগণ বিভিন্নসময়ে এই আটখানি অনুবাদ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

চীনদেশে Northern Siang বংশের রাজত্বকালে ৪২৩ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মরক্ষ নামক পণ্ডিত চীন ভাষায় যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন উহাই ১১৩ সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ বিদ্যমান আছে। Earlier Sung বংশের রাজত্বকালে খৃঃ ৪২৪-৪৫৩ অব্দে Hwui-yen ও Hwui-kwan নামক দুইজন চীনদেশীয় শ্রমণ চীনভাষায় যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রচার করেন উহা ১১৪ সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। চীনদেশীয় Thang বংশের রাজত্বকালে ৬১৮—৯০৭ খৃঃ অব্দে জ্ঞানভদ্র নামক ভারতীয় পণ্ডিত ও Hwui-ning প্রভৃতি চীনদেশীয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রচার করেন উহা ১১৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। Eastern Tsing বংশের রাজত্বকালে ৩১৭-৪২০ খৃঃ অব্দে Fa-hian নামক চাইনীজ্ পরিব্রাজক ও বুদ্ধভদ্র নামক ভারতীয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রের যে চাইনীজ্ অনুবাদ প্রকাশ করেন উহা Bunyiu Nanjio স্বীয় Cataloguer ১২০ সংখ্যায় উল্লিখিত করিয়াছেন। HiouenThsang নামক চাইনীজ্ পরিব্রাজক Thang বংশের রাজত্বকালে ৬১৮-৯০৭ খৃঃ অব্দ মধ্যে যে চাইনীজ্ অনুবাদ প্রকাশ করেন উহা ১২৩ সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। Eastern Tsing বংশের রাজত্বকালে ৩১৭—৪২০ খৃঃ অব্দে পালি

মহাপরিনিব্বানসুত্তের চীনভাষায় দুইবার অনুবাদ হয়। ঐ দুই অনুবাদ-গ্রন্থ ১১৮ ও ১১৯ সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায়ও এই দুই গ্রন্থের অনুরূপ অনুবাদ দৃষ্ট হয়। Western Tsing বংশের রাজত্বকালে ২৯০—৩০৬ খৃঃ অব্দে Po-Fa-tsu নামক পণ্ডিত চীনভাষায় যে অনুবাদ প্রকাশ করেন উহা ৫৫২ সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহের সমালোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে মহাপরিনিব্বানসুত্ত নামক পালিগ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে একবার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। মূল পালিগ্রন্থ অবশ্য খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল।

জার্ম্মান্ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Dr. Oldenberg মহাবগ্‌গ নামক পালিগ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন, উহার ভূমিকায় তিনি বলেন যে মহা-পরিনিব্বান সুত্ত বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে ও প্রথম বোধিসংঘের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। মহাবংশের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দের বৈশাখ মাসে মহা-পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন ও ঐ বৎসর বর্ষাকালে প্রথম বোধি সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব মহাপরিনিব্বান সুত্ত খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বিরচিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ড দেশীয় অধ্যাপক Dr. Rhys Davids, Sacred Books of the East Series মধ্যে মহা-পরিনিব্বানসুত্তের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, উহার ভূমিকায় তিনি বলেন যে মূল মহা-পরিনিব্বানসুত্ত নামক পালিগ্রন্থ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে মহা-পরিনিব্বানসুত্তের রচনাকালসম্বন্ধে কোন বাদানুবাদ উল্লিখিত হইবে না। আমি এই গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবের শেষজীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

রাজগৃহ।

এক সময়ে বুদ্ধদেব রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রু বৃজি জাতির ধ্বংসের নিমিত্ত নানা উপায় কল্পনা করেন। অনায়াসে বৃজি জাতির সমুচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন কি না, তাহা জানিবার জন্ত অজাতশত্রু স্বীয় অমাত্য বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন। এই সময়ে আনন্দ নামক শিষ্য সর্ব্বদা বুদ্ধের সমভিব্যাহারে বিদ্যমান থাকিতেন। বর্ষকার যথাসময়ে বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন "হে গৌতম! মগধরাজ অজাতশত্রু অবনতমস্তকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা করিয়া আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি অক্লেশে মহাসমৃদ্ধিশালী বৃজি জাতির [illegible] করিতে পারিবেন কি না"। বর্ষকারের বাক্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধদেব উত্তর [illegible] ব্রাহ্মণ! (১) যত দিন বৃজিগণ পরস্পর সমবেত থাকিবে, (২) যত দিন উহারা [illegible] মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে, (৩) যত দিন উহারা অবিচারিত আচারের অনুষ্ঠান [illegible]

বিচারিত প্রথার সমুচ্ছেদ সাধন না করিবে, (৪) যত দিন উহারা বৃদ্ধলোকদিগকে সম্মান ও ভক্তি করিবে, (৫) যত দিন উহাদের মধ্যে কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণ পূজিত হইবেন, (৬) যত দিন উহারা চৈত্যসমূহের বন্দনা ও পূজা করিবে, এবং (৭) যতদিন উহারা অর্হদ্গণের রক্ষা ও পালন করিবে; ততদিন বৃজিজাতির অধঃপতন হইবে না, প্রত্যুত উহারা ক্রমেই বৃদ্ধি লাভ করিবে"। বুদ্ধদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বর্ষকার বলিলেন "হে গৌতম! আপনি যে সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন উহার মধ্যে একটীমাত্র প্রতিপালন করিলেও বৃজিগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, সমগ্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহাদের সৌভাগ্য নিশ্চয়ই অচল থাকিবে; হে গৌতম! আমি দেখিতেছি বৃজিজাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ সংঘটন করিতে না পারিলে অজাতশত্রুর প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে, আমি এক্ষণে প্রস্থান করিলাম, আমার অনেক কার্য্য করিতে হইবে"।

অনন্তর বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে আনন্দ অসংখ্য ভিক্ষুকে রাজগৃহ নগরে উপস্থান-শালায় আহ্বান করিলেন। বুদ্ধদেব উপস্থান-শালায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন;—"হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি, উহা শ্রবণ কর। যত দিন তোমরা কর্ম্ম, ভস্য, নিদ্রা ও আমোদ এই সকলে রত না হইবে, যত দিন তোমাদের পাপেচ্ছা প্রবল না হইবে, যতদিন তোমরা পাপমিত্রের আশ্রয় না লইবে ও সতত নির্ব্বাণলাভের উপায় চিন্তা করিবে, ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না"।

"হে ভিক্ষুগণ! অপর সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্ম শ্রবণ কর। যতদিন তোমরা শ্রদ্ধাবান্, হ্রীমান্, বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ, বীর্য্যশালী, স্মৃতিমান্ ও প্রজ্ঞাবান্ থাকিবে; ততদিন তোমাদের ক্ষয় হইবে না"।

"অপর সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্ম এই;—যতদিন তোমরা স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত প্রকার জ্ঞানের ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না"।

"অন্য সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যতদিন তোমরা অনিত্য, অনাত্ম, অশুভ, আদীনব, প্রহাণ, বিরাগ ও নিরোধ এই সাত প্রকার সংজ্ঞার ভাবনা করিবে, ততদিন তোমাদের পতন হইবে না। অর্থাৎ তোমরা ভাবিবে সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য, সকলই অলীক, সকলেরই পরিণাম অশুভ, এবং সকলই পাপময়। এইরূপ ভাবনা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের লাভ, উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপান্তরের অনুৎপত্তি এই চারিটী বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইবে। অনন্তর সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া বাসনা সমূহের ক্ষয় করিবে"।

"অপর ছয়টী অপরিহাণীয় ধর্ম্ম এই;—

যতদিন ভিক্ষুগণ কায়, মন ও বাক্যে ব্রহ্মচারীদের প্রতি মিত্রভাব [illegible] করিবেন, যত দিন ভিক্ষুগণ ভিক্ষালব্ধ [illegible] দ্রব্যসমূহ কেবল নিজে ভোগ না করিয়া শীলবান্ ব্রহ্মচারীদিগকে

কিরণ বিভাগ করিয়া দিবেন, যতদিন ভিক্ষুগণ স্বীয় সদাচার রক্ষা করিবেন ও সদ্ধর্ম্মে তাঁহাদিগের দৃষ্টি থাকিবে ততদিন তাঁহাদিগের ক্ষয় হইবে না"।

অনন্তর বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আনন্দের সমভিব্যাহারে অম্বলট্ঠিকা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে বহু ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ঐ স্থানে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে নানা ধর্ম্মালাপ করেন, ও বলেন শীলপরিশুদ্ধ সমাধি, সমাধিপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপরিশুদ্ধ চিত্ত মহাফল প্রসব করে।

অম্বলট্ঠিকা ও নালন্দা।

কিয়ৎকালপরে তিনি আনন্দের সমভিব্যাহারে নালন্দায় গমন করেন। সেখানে সারিপুত্র নামক শিষ্যের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধদেব নালন্দার প্রাবারিকাম্রবনে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন "হে ভগবন্! আপনার প্রতি আমার এরূপ ভক্তি যে আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে অতীত কালে এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং ভবিষ্যৎকালেও এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন না, যিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী"। তখন বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "হে সারিপুত্র! অতীতকালে যে সকল জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া কি জানিতে পারিয়াছ, তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন, এবং ভবিষ্যৎকালে যে সকল জ্ঞানী লোক আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের চিত্তের সহিত কি তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ তাঁহাদের শীল, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ হইবে? হে সারিপুত্র তুমি কি আমার চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, আমার শীল, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ"?

সারিপুত্র উত্তর করিলেন "হে ভগবন্ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞানিগণের চিত্তের সহ আমার চিত্তের বিনিময় করিতে আমি সমর্থ নহি, আমি কেবল তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রণালী অবগত হইয়াছি। নৃপতিগণ সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহা দৃঢ় প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উহার একটীমাত্র বহির্দ্বার বিদ্যমান থাকে, এবং একজন বিজ্ঞ দ্বারবান্ সতত ঐ বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। দ্বারবান্ পরিচিত লোকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় এবং অপরিচিত লোকদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ঐ বহির্দ্বার ব্যতীত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অপর কোন পথ বিদ্যমান থাকে না। প্রাকারের সন্ধিস্থানে এমন একটী ছিদ্রও থাকে না, যদ্দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বিড়ালও ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। অথচ ঐ বহির্দ্বার দ্বারা সুবৃহৎ প্রাণী ও বস্তুসমূহের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। হে ভগবন্! অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান [illegible] জ্ঞানিগণ [illegible] নির্ব্বাণ একটী দ্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন যে [illegible] হিংসা, আলস্য, বিচিকিৎসা ও মোহ এই পাঁচ প্রকারের প্রতিবন্ধক নিবারণ করা উচিত,

অনন্তর ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, প্রদাশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, শাঠ্য, মায়া, মদ, বিহিংসা, অহ্রী, অনপত্রপা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, অশ্রাদ্ধ্য, কৌসীদ্য, প্রমাদ, মুষিতস্মৃতিতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচার এই চতুর্বিংশতি প্রকার উপক্লেশ অর্থাৎ চিত্তের দূষিত ভাব পরিবর্জন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ অলীক এই চারি প্রকার চিন্তার সতত অনুস্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত প্রকার সম্বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ পরম জ্ঞানের পথ ভাবনা করা বিধেয়। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সম্বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতীত কালের জ্ঞানিগণ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎকালের জ্ঞানিগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বুদ্ধি লাভ করিবেন। ভগবান্‌ও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন।"

পাটলীগ্রাম।

অনন্তর বুদ্ধদেব পাটলীগ্রামে উপস্থিত হন। পাটলীগ্রামীয় উপাসকগণ সমবেত হইয়া বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যা করেন। তিনি আবসথাগারে আসীন হইয়া উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "হে উপাসকগণ! অধার্ম্মিক ও দুঃশীল গৃহস্থগণের পঞ্চপ্রকার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। (১) দুঃশীল গৃহস্থগণ ঘোর দরিদ্রতায় নিপতিত হয়; (২) তাহাদিগের দুর্নাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়; (৩) তাহারা মনুষ্যসমাজে সশঙ্ক অন্তঃকরণে বিচরণ করে; (৪) দেহত্যাগের সময়েও তাহাদের চিত্তের উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় না; এবং (৫) মরণানন্তর তাহারা নিরয়গামী হয়। পক্ষান্তরে সুশীল গৃহস্থগণের পাঁচ প্রকার লাভ দৃষ্ট হয়। (১) সুশীল গৃহস্থগণ মহাসুখ ভোগ করেন; (২) তাঁহাদের সুনাম চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয়; (৩) তাঁহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে মনুষ্য সমাজে বিচরণ করেন; (৪) দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহাদিগের চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না; এবং (৫) মরণান্তর তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে অজাতশত্রুর সুনীধ ও বর্ষকার নামক দুই ব্রাহ্মণ অমাত্য বৃজিজাতির উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত পাটলীগ্রামে এক সুবৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, পাটলীগ্রাম একসময়ে পাটলীপুত্র নামে খ্যাতি লাভ করিবে। সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও বাণিজ্য বিষয়ে উহা শ্রেষ্ঠ নগর হইবে। কিন্তু পরিশেষে অগ্নি, জল ও গৃহবিচ্ছেদ এই ত্রিবিধ কারণে পাটলীপুত্র নগরের ধ্বংস হইবে। অনন্তর তিনি সুনীধ ও বর্ষকারের গৃহে ভোজন করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন, কোন কোন বলবান্ পুরুষ বাহু সঞ্চালন করিয়া গঙ্গাপার হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা নৌকার অন্বেষণ করিতেছেন, কেহ বা ভেলক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুদ্ধদেব সন্তরণ দ্বারা গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং পরপারে [illegible] করিয়া দৃঢ় অন্তঃকরণে নিম্নলিখিত উদান গান করিলেন :—

যে তরন্তি অন্নবং সরং সেতুং কত্বান বিসজ্জ পল্ললানি।
কুল্লং হি জনো পবন্ধতি তিন্না মেধাবিনো জনা তি ॥

সেতু নির্ম্মাণ করিয়া স্রোতস্বতী নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায়, লগুদ্বারা লোকে পল্বলের পরপারে গমন করে, কৃত্রিম সরিৎসমূহ মৃত্তিকা দ্বারা বদ্ধ করা যায়, কিন্তু মেধাবী লোকসমূহ প্রজ্ঞা-দ্বারা মহার্ণব উত্তীর্ণ হন।

কোটিগ্রাম ও নাদিকা।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দ ও ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে কোটিগ্রামে গমন করেন। সেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন "হে ভিক্ষুগণ! চতুরার্য্য-সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় লোকসকল পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে গতায়াত করে। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ-ধ্বংসের উপায় এই চারিটী মহাসত্যের সম্যগ্ জ্ঞানদ্বারা ভবতৃষ্ণার নিবৃত্তি ও পুনর্জন্মের উচ্ছেদ হয়"।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নাদিকা নামক স্থানে উপস্থিত হন, এবং ঐ স্থানে গুঞ্জকাবসথে কিছুকাল বিহার করেন। তথায় তিনি ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম্মাদর্শ নামক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মাদর্শের সারমর্ম্ম এই, যে ব্যক্তি অবিচলিত অন্তঃ-করণে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে আর নরকে বা প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

বৈশালী।

কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধদেব বৈশালী নগরীতে গমন করিয়া আম্রপালী গণিকার গৃহে ভোজন করেন। আম্রপালী গণিকা নীচ আসন গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিনম্রভাবে বলিল "হে ভগবন্! আমার আ[illegible] ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিতেছি, আপনি উহা প্রতিগ্রহ করুন"। বুদ্ধদেব আম্রপালী গণিকাকে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সমুৎসাহিত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

অনন্তর বুদ্ধদেব বেলুবগ্রামে (বিল্বগ্রামে) গমন করেন এবং সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় ভিক্ষুগণ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তিনি তখন আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে আনন্দ! ভিক্ষুগণ আমার নিকটে কি প্রত্যাশা করেন? আমি তোমাদিগের নিমিত্ত প্রকাশ্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, আমার ধর্ম্মে গুহ্য কিছুই নাই। তোমরা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, ধর্ম্মদীপ প্রজ্বলিত কর, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিও না, নিজেই নিজের আশ্রয় হও। হে আনন্দ! আমার পরিনির্ব্বাণের পর যিনি ধর্ম্মের শরণ লইবেন, ধর্ম্মদীপ প্রজ্বলিত করিবেন, বিমুক্তিলাভের নিমিত্ত নিজের উপর নিজে নির্ভর করিবেন এবং অন্যের আশ্রয় লইবেন না, তিনিই ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবেন"।

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালী নগরীর চাপালচৈত্যে গমন করিয়া তথায় কিছুকাল [illegible] করেন। এই সময়ে পাপাত্মা মার আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল "হে ভগবন্!

নির্বাণ লাভ করুন, আপনার পরিনির্ব্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে"। বুদ্ধদেব উত্তর করেন, হে মার! যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা সমূহ বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত ও ধর্ম্মানুধর্ম্মচারী না হইবেন, ততদিন আমি পরিনির্ব্বাণ-গত হইব না; হে মার! যতদিন লোকসমাজে ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রচারিত না হইবে, ততদিন আমি পরিনিবৃত্ত হইব না; হে মার! ব্যস্ত হইও না, অদ্যাবধি তিন মাসের পর আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব"।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন "হে আনন্দ! বিমোক্ষের আটটী সোপান বিদ্যমান আছে। (১) যাহাদের মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে তাহারা বাহ্য জগতে রূপ দেখিতে পায়; ইহাই বিমোক্ষের প্রথম সোপান। (২) মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান নাই অথচ বহির্জগতে রূপ দেখিতে পায়; ইহাই বিমোক্ষের দ্বিতীয় সোপান। (৩) মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহির্জগতে রূপ দৃষ্ট হয়না; ইহা তৃতীয় সোপান। (৪) রূপ জগৎ অতিক্রম করিয়া "আকাশ অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশানন্ত্যায়তনে বিহার করে; ইহাই বিমোক্ষের চতুর্থ সোপান। (৫) আকাশনন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "জ্ঞান অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনে বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের পঞ্চম সোপান। (৬) বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকিঞ্চন্যায়তনে বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের ষষ্ঠ উপায়। (৭) আকিঞ্চন্যায়তন অতিক্রম করিয়া "জ্ঞানও নাই, অজ্ঞানও নাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের সপ্তম সোপান। (৮) নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ের নিরোধ সাধন পূর্ব্বক সংজ্ঞাবেদয়িতৃনিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের অষ্টম সোপান।

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে আনন্দ বৈশালীর সমগ্র ভিক্ষুকে কূটাগারশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ভিক্ষুগণ! আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছি; তোমরা সুন্দর রূপে উহার পর্য্যালোচনা কর। লোকের হিত ও সুখের নিমিত্ত জগতে ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রতিষ্ঠ কর। হে ভিক্ষুগণ আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি, তাহার মধ্যে বক্ষ্যমাণ সপ্তত্রিংশৎ বিষয় তোমরা সম্যক্ রূপে ধারণ করিবে। সেই সপ্তত্রিংশৎ বিষয় এই:—চারিটী স্মৃত্যুপস্থান, চারিটী সম্যক্প্রহাণ, চারিটী ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও অষ্টাঙ্গমার্গ।

কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল, ও পদার্থ সমূহ অলীক; এই প্রকার ভাবনার নাম চতুঃস্মৃত্যুপস্থান। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অনর্জ্জিত পুণ্যের উপার্জ্জন, পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ ও নূতন পাপের অনুৎপত্তি; এই চারি প্রকার চেষ্টার নাম চতুঃসম্যক্প্রহাণ। সমাধির ক্ষমতা লাভের নিমিত্ত অভিলাষ, চিন্তা, উৎসাহ

অপ্রবিংশকে চারিটী ঋদ্ধিপাদ বলে। শ্রদ্ধা, সমাধি, বীর্য্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটী পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পাঁচ পদার্থ আবার পঞ্চ বল নামে ও অভিহিত হয়। স্মৃতি, ধর্ম্মপ্রবিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটীর নাম সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীর নাম অষ্ট আর্য্যমার্গ।

এই সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ লইয়া আমি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমরা এই ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে আলোচনা কর ও লোক সমাজে প্রচার কর। হে ভিক্ষুগণ! আমি তিন মাসের পর পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব। তোমরা সাবধান হইয়া কার্য্য কর। অনন্তর তিনি বক্ষ্যমাণ গাথা গান করিলেন ;—

পরিপক্কো বয়ো মহ্হং পরিত্তং মম জীবিতং।
পহায় বো গমিস্সামি কতং মে সরণমত্তনো॥
অপ্পমত্তা সতিমন্তো সুসীলা হোথ ভিক্খবো।
[illegible]হিতসংকপ্পা সচিত্তম্ অনুরক্খথ॥
[illegible]স্মিং ধম্মবিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি।
পহায় জাতিসংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতি॥

আমার বয়স পরিপক্ক হইয়াছে, জীবনের অল্প অবশেষ আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া যাইব, আমার নিজের আশ্রয় আমি স্থির করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অপ্রমত্ত, সমাহিত ও সুশীল হও, স্থিরসংকল্প হইয়া স্বীয় চিত্ত পর্য্যবেক্ষণ কর। যিনি প্রমাদ-পরিশূন্য হইয়া এই ধর্ম্মে বিহার করিবেন, তিনি জন্ম ও সংসারের উচ্ছেদ করিয়া দুঃখের চিরধ্বংস করিতে পারিবেন।

অনন্তর বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে ভণ্ডগ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন,—"হে ভিক্ষুগণ! শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি এই চতুঃপদার্থের অননুশীলন-বশতঃ লোক সকল সংসার পথে দীর্ঘকাল সংধাবন করে"।

ভণ্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ও ভোগনগর।

তদনন্তর বুদ্ধদেব হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ও ভোগনগরে যথাক্রমে [illegible]ছেন। তিনি ভোগনগরে আনন্দচৈত্যে বিহার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আসিয়া তোমাদিগকে বলেন, তিনি অমুক বাক্যটী ভগবানের মুখে শুনিয়াছেন, বা ভিক্ষুসংঘের নিকটে ঐ বাক্যের উপদেশ পাইয়াছেন, অথবা কোন আবাসে অনেক জন স্থবির-ভিক্ষু মিলিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত বাক্য বলিয়াছেন, অথবা কোন এক বিদ্বান্ ভিক্ষুর মুখ হইতে ঐ বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন ; তাহা হইলে তোমরা তাঁহার কথায় আগ্রহতঃ আস্থা বা অনাস্থা কিছুই স্থাপন করিও না ; তাঁহার কথিত বাক্যটী সূত্রপিটক ও বিনয়পিটকের সহিত মিলাইয়া দেখিও, যদি সূত্রে বা বিনয়ে উহার অনুরূপ বাক্য বিদ্য-

মান থাকে, তাহা হইলে জানিবে, উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিও। আর যদি সূত্রে বা বিনয়ে বাক্যটী দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জানিবে উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী দূষিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইলে, তাঁহার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও না"।

পাবা ও কুশীনগর।

অনন্তর বুদ্ধদেব পাবা নামক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক শিষ্যের আম্রবনে বিহার করেন। চুন্দ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল "হে ভগবন্! ভিক্ষুসংঘের সহ সমবেত হইয়া আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন"। বুদ্ধ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধপ্রকার খাদ্য ও প্রভূত শূকরমাংস প্রস্তুত করিল। পরদিন বুদ্ধ চুন্দের আলয়ে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন "হে চুন্দ! তুমি শূকরমাংস আমাকে পরিবেশন কর, এই ভিক্ষুসংঘকে উহা প্রদান করিও না। মনুষ্য-লোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে বুদ্ধ ভিন্ন এমন কেহ নাই, যিনি শূকরমাংস ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে পারেন। হে চুন্দ! আমাকে পরিবেশন করিবার পর যে শূকরমাংস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত কর"। তাঁহার বাক্যানুসারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল।

চুন্দের গৃহে ভোজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের লোহিতপ্রবাহিকা ব্যাধি অর্থাৎ রক্তা-মাশয় জন্মে। তিনি সেই অবস্থায়ই কুশীনগরাভিমুখে গমন করেন। পথমধ্যে তিনি আনন্দকে বলেন "হে আনন্দ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তুমি একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত্ত করিয়া এই বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর। আমার পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর"। অনন্তর বুদ্ধদেব জলপান করিয়া কথঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

সেই সময়ে পুক্কুস নামক আলাড় কালামের কোন শিষ্য কুশীনগর হইতে পাবাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বুদ্ধকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "অহো! প্রব্রজ্যার কি অসীম প্রভাব। এক সময়ে আলাড় কালাম কোন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন পাঁচ শত শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না বা উহার শব্দ শুনিতে পাইলেন না"। পুক্কুসের কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন "হে পুক্কুস! আমি এক সময়ে আতুমা নামক স্থানে তুষাগারে তপস্যা করিতেছিলাম, তখন অবিরত মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ নিঃসরণ হইতেছিল। সেই সময়ে তুষাগারের দুইজন কৃষক ও চারিটী বলীবর্দ প্রাণত্যাগ করে। যেখানে সেই কৃষকদ্বয় ও বলীবর্দচতুষ্টয় বিনষ্ট হয়, সেই স্থানে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়! এখানে কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম "আমি কিছুই জানি না"। সেই লোক তখন আমাকে বলিল "মহাশয়! মেঘবর্ষণ, মেঘ-গর্জ্জন, বিদ্যুৎ স্ফুরণ, ইহার কিছুই আপনি দেখিতে পান নাই? আপনার কর্ণে কোন শব্দ

মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে ও পাঁচ শত ভিক্ষুর সমাগমে প্রথম বোধিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজগৃহ নগরে বৈভার পর্ব্বতের পার্শ্বে ও সপ্তপর্ণী গুহার সমীপে সভা সংস্থাপনের নিমিত্ত অজাতশত্রু এক গৃহ নির্ম্মাণ করেন। সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহাকাশ্যপ বিনয় ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উপালি ও আনন্দ যথাক্রমে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর করেন।

**২য় বোধিসংঘ**

মহাবংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ও চুল্লবগ্গের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, বৈশালীর কতিপয় ভিক্ষু কয়েকটী ধর্ম্মনিয়ম ভঙ্গ করায় খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে বৈশালী নগরীর বালুকারাম বিহারে কালাশোকের রাজত্বকালে দ্বিতীয় বোধিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। সভায় সাত শত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন এবং স্থবির রেবত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবারেও প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপিত হয়।

**৩য় বোধিসংঘ**

মহাবংশের পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, তৈর্থিকগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত সমূহ বুদ্ধের প্রচারিত মত বলিয়া স্থাপন করিত। উহারা প্রকৃত ভিক্ষু সাজিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিত ও যথার্থ ভিক্ষুদের সহিত উপোসথ ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মাশোকের নিকট নিবেদন করেন, "মহারাজ! আমরা তৈর্থিকগণের সহিত একত্র উপোসথ করিব না"।

তদনুসারে ধর্ম্মাশোক তৈর্থিকগণকে [illegible] বিহার হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। তদনন্তর পাটলীপুত্র নগরে খৃঃ পূঃ ৩২[illegible] অব্দে ধর্ম্মাশোকের [illegible] তৃতীয় বোধিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে তথায় সহস্র ভিক্ষু সমবেত হন এবং মোগ্গলিপুত্ত তিস্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি কথাবত্থুপ্পকরণ নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদ সমূহ নিবারণ করেন।

**৪র্থ বোধিসংঘ**

ডম্ পোই ছোই ভুং নামক তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে খৃঃ পূঃ [illegible] অব্দে কনিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরের কুশান নামক স্থানে একটী বোধিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। কনিষ্ক, পহ্লব, শিখী জলন্ধর ও কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। এই সময়ে অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব কনিষ্ককে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত জ্ঞানযশঃ নামক ভিক্ষুকে কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। জ্ঞানযশঃ চতুর্থ বোধিসংঘের সভায় উপস্থিত ছিলেন। বসুমিত্র ও পূর্ণকের তত্ত্বাবধানে এই সভা পরিচালিত হয়। এই সভায় [illegible] ভিক্ষু ও [illegible] অর্হৎ আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধগণ অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ধর্ম্মমত ছিল। ঐ সকল ধর্ম্মমত হইতে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য কনিষ্ক ৪র্থ বোধিসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন।

---